কাণ্টের দর্শন

(আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'কান্টদর্শনের তাৎপর্য' অবলম্বনে)

(An Introduction to the Philosophy of Kant)

ডঃ রাসবিহারি-দাস এম. এ., পি-এইচ. ডি.

ডিরেকটার, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফিলসফি; ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি; দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, সাগর বিশ্ববিদ্যালয়; দর্শনের রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; দর্শন বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৫৫), হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও (১৯৬২) গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম জার্মানী; মূল সভাপতি, ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস (১৯৫৬)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

KANTER DARSHAN
By Dr. Ras Vihary Das

প্রথম পর্ষদ সংস্করণ

প্রকাশকাল—জুন, ১৯৭৯

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
আর্য ম্যানসন ((নবমতল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীবিমল দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীমন্মথ সিংহ রায়
রূপলেখা
২২ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মূল্য : পনের টাকা।

Published by Pradyumna Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in regional languages at the University level, launched by the Govt. of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

স্বর্গত

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহোদয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে ভক্তিভরে

এই পুস্তক অর্পিত হইল।

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ একথা নিজে বলিয়া, অথবা অপরের কাছে শুনিয়া, আমরা ভারতবাসী অনেকে অনেক সময় বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন এবং দর্শন বলিতে কি বুঝায়, ভাল করিয়া জানেন, তিনি ভারতবাসী হইলে নিশ্চয়ই বর্তমান ভারতের দার্শনিক চিন্তার কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিবেন না। পাশ্চাত্ত্য যে কোন সভ্যদেশের তুলনায় দর্শনের ক্ষেত্রে বর্তমান কালের শিক্ষিত ভারতীয়দের দৈন্যই তাঁহার চক্ষে পরিলক্ষিত হইবে এবং বর্তমান সময়ে ভারতে মৌলিক দার্শনিক চিন্তার অভাবের কথা ভাবিয়া তিনি ব্যথিত না হইয়া পারিবেন না।

অথচ এক সময়ে এদেশ যে দার্শনিক চিন্তার অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল, একথা কেহ অস্বীকার করিবে না। নিতান্ত উত্তরাধিকার সূত্রেই আমরা যে গৌরবের অধিকারী হইতে পারিতাম, সে গৌরব হইতে আমরা কিরূপে এত সহজে বিচ্যুত হইলাম, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

যে সব কারণে চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য আসিয়াছে, তাহাদের একটি বোধ হয় এই যে, বহুদিন ধরিয়া উচ্চাঙ্গের প্রায় সব বিচারই আমাদের কাছে বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া আসিয়াছে। বিদেশী ভাষাতেই আমাদিগকে লিখিতে, পড়িতে ও ভাবিতে হইয়াছে। ভাষার সঙ্গে ভাবের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিদেশী ভাষা আমরা যতই ভাল করিয়া শিখি না কেন, ঠিক মাতৃভাষার মত তাহার উপর আমাদের অধিকার জন্মে না এবং বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া আমরা যে ভাব পাই, তাহা উচ্চাঙ্গের হইলেও, সে ভাব গভীর ও স্পষ্ট ভাবে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। ফলে সে ভাব সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তও হয় না, নিজস্বও হইয়া উঠে না। সুতরাং তাহাদ্বারা সবল ও সতেজ ভাবে বিচার-আলোচনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। যাহা দুর্বলভাবে আমরা পাইলাম, তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে আমাদের মনে যে সব চিন্তার উদ্রেক হইবে, তাহাও দুর্বল ও নিস্তেজ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

বহুদিন পূর্বে এই বিষয়ে আমি যখন ভাবিয়াছি, তখন আমার মনে হইয়াছে, বাংলা ভাষায় তথা অন্যান্য দেশীয় ভাষায় বর্তমান কালের দার্শনিক চিন্তাধারা প্রসার লাভ করিলে, দর্শনের ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে পারে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমি অনেককে দেশীয় ভাষাতে দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার অনুরোধের উত্তরে কেহ কেহ বলিতেন, বাংলা বা অন্য কোন দেশীয় ভাষায় আধুনিক দার্শনিক চিন্তা প্রকাশ করিতে গেলে উপযুক্ত শব্দই ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমি মনে করিলাম, কান্টের মত আধুনিক, বিরাট ও দুরূহ দার্শনিকের কথা যদি আমি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে বাংলায় দার্শনিক চর্চার বিরুদ্ধে অন্ততঃ ভাষাগত কোন আপত্তি উঠিতে পারিবে না।

আমার প্রধান উদ্দেশ্য—বাংলা ভাষায় দার্শনিক বিষয় আলোচনা করিয়া আমার দেশবাসীর কাছে দার্শনিক চিন্তা কিয়ৎ পরিমাণে সহজ করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কান্টের দর্শন কেন বাছিয়া লইলাম তাহা নিতান্ত নিষ্কারণ নয়। কান্ট যে পাশ্চাত্ত্য জগতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তাহা অনেকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তাঁহার দর্শনের সব কথা মোটামুটি ভাবে বলিতে পারিলে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার অনেক মূল কথাই সাধারণ ভাবে বলা হইয়া যায়। তাহার উপর আমার আর একটি ব্যক্তিগত হেতুও আছে। আমি অনেক স্থলে কান্টের কথা গ্রহণ করিতে না পারিলেও, তাঁহার নিকট হইতে দার্শনিক শিক্ষা যেরকম পাইয়াছি, অন্য কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের নিকট হইতে সেরকম পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমি যে-গুরুর কাছে নানা বিষয়ে অত্যধিক ঋণী, কান্ট তাঁহার প্রিয় দার্শনিক ছিলেন এবং তিনি আমাকে কান্টের গ্রন্থও কিছু পড়াইয়াছিলেন। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে বেদের পঠন ও পাঠনের দ্বারা যে রকম ভাবে ঋষি-ঋণ শোধ করা হইত, সে রকম ভাবে, আমি ভাবিলাম, কান্টের কথা যদি বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য ভাবে প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে কান্টের কাছে ও গুরুর কাছে আমার যে ঋণ, তাহা আংশিক ভাবে পরিশোধ হইতে পারে।

যে মহামনীষী আমার প্রতি নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া আমার পুস্তকের উপসংহার রূপে "কান্টদর্শনের তাৎপর্য" লিখিয়া দিয়াছেন আমি তাঁহার

কাছেই এই পুস্তক প্রণয়ন-বিষয়ে সব চেয়ে বেশী ঋণী। তিনিই আমাকে প্রথমে কাণ্টের গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই আমি কান্টীয় দর্শনের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। বাংলা ভাষায় দার্শনিক আলোচনা করিতে তিনিই আমাকে উৎসাহিত করেন। তাঁহার উৎসাহ ও আশ্বাস না পাইলে কাণ্টের দর্শন বাংলা ভাষায় বিবৃত করার মত দুরূহ কাজে আমি কখনই হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না। আমার লিখিত পুস্তকের কোন মূল্য না থাকিতে পারে, কান্টীয় দর্শনের দুরূহ কথা বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করার আমার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রয়াসকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতের বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী যে তাঁহার পরিণত বয়সের দার্শনিক ভাবসম্পদ, আমাদের ও পরবর্তিকালের বাঙ্গালীদের উপকারের জন্য, বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমার সকল চেষ্টা সার্থক হইয়া গিয়াছে, নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

আমার পরম দুর্ভাগ্য যে কয়েক বৎসর আগেই এই পুস্তক সম্পূর্ণভাবে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও, নানা কারণে, তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য মনোযোগের সহিত আমার পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরামর্শে স্থানে স্থানে পুস্তকের ভাষা ও ভাব যথাসম্ভব পরিবর্তন করিয়া দিয়াছি। তবে যে ভাব ও ভাষা নিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইল, তাহার জন্য আমিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, কোন কোন জায়গায় কালিদাস বাবু কাণ্টের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে একমত নহেন। বিচারী, বুদ্ধিমান পাঠক "কাণ্টদর্শনের তাৎপর্য" ও আমার বিবৃতির মধ্যেও কোন কোন স্থানে পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন। ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয় নহে। কাণ্টের নিজের দেশেও তাঁহার ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা সকলে কান্টীয় দর্শন ঠিক একরকম ভাবে বুঝেন না। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হওয়াতে কান্টীয় দর্শনের মর্মার্থও বিভিন্ন পাঠক বিভিন্ন রূপে বুঝিয়া থাকেন। তবে আমার বিশ্বাস, আমি যে সব কথা লিখিয়াছি, তাহা কোথাও একেবারে অমূলক নহে। কাণ্টের নিজের, বা তাঁহার নির্ভরযোগ্য

কোন ভাষ্যকারের কথায়, তাহার আধার বা আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়াই আমার ধারণা।

পুস্তকের ভাষা যাহাতে সহজবোধ্য হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক পারিভাষিক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক স্থলেই পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। কোন পারিভাষিক শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি মনোযোগী পাঠকের পক্ষে পুস্তকের অর্থগ্রহণে ভাষার জন্য কোন অসুবিধা হইবে না।

কাণ্টের অর্থ বুঝিতে Kemp Smith-এর বিশদ অনুবাদ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। জার্মান টীকাকারদের মধ্যে আমি Riehl, Reininger ও Messer-এর কাছেই সমধিক ঋণী; বিশেষতঃ Messer-এর *Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft* হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

বাংলা ভাষায় দার্শনিক সাহিত্য এখনও খুব সমৃদ্ধ নয়। আমাদের সাহিত্যের এই ক্রটি আমার পুস্তকের দ্বারা যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীভূত হয়, সহৃদয় পাঠকদের মধ্যে যদি দার্শনিক চিন্তা কিঞ্চিৎ প্রসার লাভ করে তাহা হইলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বুঝিব এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
২০শে জুলাই, ১৯৫০ ইং

শ্রীরাসবিহারীদাস সানাতনি

—গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

1. The Self & the Ideal.
2. The Essentials of Advaitism.
3. The Philosophy of Whitehead.
4. A Handbook to Kant's *Critique of Pure Reason.*

পুস্তকপর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা

ডঃ রাসবিহারী দাশ লিখিত "কাণ্টের দর্শন" বইটি বহুদিন অমুদ্রিত থাকায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষককুলের প্রয়োজন বিবেচনা করে পর্ষদের দর্শনবিদ্যা সমিতির মাননীয় সদস্যবৃন্দ বইটি পুণর্মুদ্রনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তটি কিছু প্রাচীন হলেও এ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন বিলম্বিত হয় নানা কারণে। পর্ষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এ জাতীয় কিছু প্রয়োজনীয় অথচ অমনোযোগ-প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা নিয়ে থাকি। তার একটি ফলশ্রুতি সুধী পাঠকবর্গ পেয়েছেন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'ন্যায় পরিচয়' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রনের মধ্য দিয়ে। সে কাজে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ রীতিমাফিক অনুমতি ইত্যাদি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। অনুরূপভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ রয়েছি স্বর্গত অধ্যাপক দাশের পুত্রকন্যাদের কাছে যাঁরা ত্বরিৎ সহযোগিতায় আমাদের উদ্যম প্রাণিত করেছেন। এখন শিক্ষার্থী পাঠককুল যদি বইটিকে পূর্বের মতই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন, পর্ষদের উদ্যোগ সার্থক বিবেচিত হয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রকল্প রূপায়নে আমরা নৈতিক সমর্থন পাই।

কলকাতা
জুন ১৯৭৯

প্রদ্যুম্ন মিত্র
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

প্রত্যেক মানুষই এক নির্দিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্মিয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা গঠিত হইয়া উঠে। পরে হয়ত তাহার কাজকর্মের দ্বারা সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থারই পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাদ্বারাই সে পুষ্ট হইয়া উঠে। যে শক্তির দ্বারা সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবে, সে শক্তি তাহাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেই, অন্ততঃ আংশিকভাবে, আহরণ করিতে হয়। একথা শুধু সাধারণ লোকদের পক্ষে বা শুধু ভৌতিক ব্যাপারেই খাটে, তাহা নহে, অসাধারণ লোকদের পক্ষেও এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও খাটে।

আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা শুধু গাছপালা, ঘর-বাড়ী বা জলবায়ু-দ্বারাই গঠিত নয়; যে রকম চিন্তাধারা, শিক্ষাদীক্ষা বা সংস্কৃতির মাঝে আমরা জন্মাই, তাহাও আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ধরিতে হয়। কোন বিশেষ সময়ে কোন সমাজে এক বিশেষ চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, সেই সময়ে যাহারা সেই সমাজে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সেই চিন্তাধারাদ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাহাদের নিজের চিন্তার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে, তাহাদের সময়কার সাধারণ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক হয়।

অতি মহান্ ব্যক্তিরাও তাঁহাদের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ের চিন্তাধারার প্রভাব এড়াইতে পারেন না। যে ব্যক্তি তাঁহার মৌলিক চিন্তার দ্বারা বিশ্বকে বিমোহিত করেন, তাঁহার মৌলিকতাও তাঁহার সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। কাণ্টের বেলায়ও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে কাণ্টের গণনা হইয়া থাকে। তিনি যে দার্শনিক জগতে এক নূতন চিন্তাধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার মৌলিকতার মূলে তাঁহার পূর্বগামী দার্শনিকদের দান স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাণ্টের সময় জার্মাণীতে লাইব্‌নিট্‌সের[১] মতের বেশী প্রচার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দর্শন সম্বন্ধে যে সব বই পড়ান হইত, সেগুলিতে লাইব্‌নিট্‌স ও তৎশিষ্য ভল্‌ফের[২] মতেরই ব্যাখ্যা থাকিত। লাইব্‌নিট্‌স ছিলেন মতের প্রতিষ্ঠাতা, ভল্‌ফ্‌ ছিলেন টীকাকার মাত্র। সুতরাং কাণ্টের সময়ে জার্মাণীতে প্রচারিত দার্শনিক মতকে লাইব্‌নিট্‌সের মত বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই মতের বিশেষত্ব ছিল যুক্তিবাদ[৩] ব বুদ্ধি-বাদ[৪]। আমাদের জ্ঞান কি করিয়া হয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রধানতঃ দুইটি উত্তর দিতে পারা যায়। প্রথমতঃ বলিতে পারা যায় যে, চোখকান দিয়া দেখিলে শুনিলেই আমাদের জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবই যাবতীয় জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে। যাঁহারা এই রকম কথা বলেন, তাঁহাদের মতে বাহ্যেন্দ্রিয়ই জ্ঞানের প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। এই মতকে দৃষ্টিবাদ[৫] বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়জন্য সকল প্রকারের জ্ঞানকে যেমন প্রত্যক্ষ বলা হয়, সেই রকম দৃষ্টিকে ইন্দ্রিয়জন্য সব জ্ঞানের প্রতিনিধিরূপে ধরিয়া যাহাদের মতে এই রকম জ্ঞানই মৌলিক বা প্রকৃত জ্ঞান, তাহাদের মতকে দৃষ্টিবাদ বলা যাইতে পারে। দেখিয়া শুনিয়া যে আমাদের জ্ঞান হয়, ইহা আপামর সর্বসাধারণ লোকেরই মত। দ্বিতীয়তঃ, এই কথাও বলিতে পারা যায় যে, বুদ্ধিদ্বারা, তর্কযুক্তি করিয়া, যে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই মতকে যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদ বলা যাইতে পারে। লাইব্‌নিট্‌স এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। দৃষ্টিবাদ সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যুক্তিবাদ তত সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তথাপি এই মতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্ত্য-জগতের অনেক বড় দার্শনিকই এই যুক্তিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। শুধু ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনেক সময়েই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। চোখের কাছে চন্দ্র ও সূর্যকে অতি ছোট বলিয়াই দেখায়। কিন্তু তাই বলিয়া চন্দ্রসূর্যকে আমরা বাস্তবিক অত ছোট বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যদি জ্ঞান হইত, তাহা হইলে জ্ঞানলাভের জন্য লোকেরা দর্শনবিজ্ঞানের আশ্রয় লইত না। কোন বিষয়ে

১। Leibnitz.
২। Wolff.
৩। Rationalism.
৪। Intellectualism.
৫। Empiricism.

তথ্য নির্ধারণ করিতে হইলে, সে বিষয়ে আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিতে হয়। বিচার করা ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়, বুদ্ধির কাজ[১]। মানুষের যেমন ইন্দ্রিয় আছে, অনেক পশুরই সেই রকম ইন্দ্রিয় আছে। অনেক পশুর ঘ্রাণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি মানুষের চেয়ে প্রবল। শুধু বুদ্ধিতে, বিচারে, মানুষ অন্য পশুদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; এবং বিচারের সাহায্যেই মানুষ বিশ্বসম্বন্ধে পশুদের চেয়ে ভাল জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আমাদের চাক্ষুষ জ্ঞান যে অনেক সময়েই ভ্রমাত্মক, তাহা বিচারী পুরুষ মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

এখানে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা হইতে সহজেই মনে হইবে, বুদ্ধিদ্বারা আমরা যে রকম জ্ঞান পাই, ইন্দ্রিয় দ্বারা সে রকম জ্ঞান পাই না। তবে কি এই রকম মানিব যে, মানুষের মধ্যে ইন্দ্রিয়[২] ও বুদ্ধি[৩] বলিয়া দুই রকমের জ্ঞানশক্তি রহিয়াছে; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক রকমের জ্ঞান হয় এবং বুদ্ধি-দ্বারা বিজাতীয় অন্য প্রকারের জ্ঞান হয়? লাইব্‌নিট্‌স্ বুদ্ধিগম্য জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের মধ্যে এই রকমের বিজাতীয়ভেদ মানিতেন না। বুদ্ধির দ্বারা আমরা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অস্পষ্টরূপে, অনেকটা ভ্রমাত্মকভাবে, জানিতে হয়। জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রকারের বৈজাত্য নাই; প্রামাণ্যে ও স্পষ্টতায় তারতম্য রহিয়াছে মাত্র বৌদ্ধিক জ্ঞান স্পষ্ট ও প্রমাত্মক; ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান অস্পষ্ট ও অনেক স্থলেই অপ্রমা। প্রকৃত জ্ঞানের কারণ বুদ্ধিই; যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয় বলি, তাহাকে বুদ্ধিরই এক প্রকার নিকৃষ্ট স্বরূপও বলা যাইতে পারে। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের জন্য আমাদিগকে দেখাশোনার অপেক্ষা করিতে হয় না; শুধু বিচার করিয়াই আমরা সত্য নির্ধারণ করিতে পারি। ইন্দ্রিয় যখন বুদ্ধিরই এক প্রকার নিকৃষ্ট স্বরূপ, তাহাদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান ত অনেক সময়েই হইবে না, বরং প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে মাত্র।

সে যাহাই হউক, বুদ্ধিদ্বারা বস্তুসম্বন্ধে যে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান হইতে পারে, সে বিষয়ে বুদ্ধিবাদীরা নিঃসন্দেহ। কাণ্টেরও প্রথমে এই মত ছিল।

দৃষ্টিবাদীদের চিন্তাধারা অন্য প্রকারের। লক্, বার্কেলী ও হিউম্‌কেই দৃষ্টি-বাদীদের অগ্রণী বলিয়া ধরা হয়। হিউমের মতের সঙ্গে পরিচিত হওয়াতেই

১। দৃষ্টিবাদীরাও বৌদ্ধিক বিচারের উপযোগিতা স্বীকার করেন। তবে তাঁহাদের মতে বৌদ্ধিক বিচারও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানসাপেক্ষ।

২। Sense. ৩। Intellect, Understanding.

কাণ্টের চিন্তা নূতন পথে চলিতে থাকে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, (বুদ্ধিবাদের) নির্বিচার নিদ্রা[১] হইতে হিউম্‌ই আমাকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। হিউমের বক্তব্য কি বুঝিতে হইলে, দৃষ্টিবাদের মূল কথা কি এবং তাহার অর্থ শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়, দেখিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, দৃষ্টিবাদের আসল কথা, জ্ঞান অনুভবসাপেক্ষ। অনুভব বলিতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, তাহাই এখানে বুঝিতে হইবে। এই অনুভব না হইলে জ্ঞান হয় না। দৃষ্টিবাদের পুরোহিত লক্‌ বলেন, আমরা যখন জন্মাই তখন কোন রকমের ধারণা নিয়া জন্মাই না; আমাদের মন একেবারে খালি থাকে, যেন একখানা অলিখিত কোরা কাগজ[২]। পরে যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহাদের (বাহ্য বস্তুর) দাগ বা ছাপ আমাদের মনের উপর পড়ে। তাহা হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। নানা রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ফটোগ্রাফের ক্যামেরাতে যেমন বস্তুর রূপ প্রতিফলিত হয় তেমনি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর রূপ আমাদের মনে অঙ্কিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে জ্ঞানের সামগ্রীই আমরা লাভ করি না, কি যে জানিব, সে বিষয়ই ত পাই না। যে বস্তু আছে, তাহাই জানা যায়; বস্তু থাকিলেই জানা যাইবে, এমন নয়, কিন্তু জানিতে হইলে বস্তুর থাকা বা অস্তিত্ব আবশ্যক। কিন্তু বস্তু যে আছে, তাহা আমরা কি করিয়া বুঝিতে পারি? বস্তুর ছাপ যদি আমাদের মনের উপর পড়ে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারি বস্তু আছে; এবং বস্তুর ছাপ শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবের ভিতর দিয়াই মনের উপর পড়িতে পারে। ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে বস্তুর শুধু মানসকল্পনা হইতে পারে, তাহা দ্বারা জ্ঞান হয় না। জ্ঞান হইতে হইলে মূলে ইন্দ্রিয়ানুভব থাকা চাই।

হিউম্‌ও এই সব কথা জানিতেন। তবে তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন, আমরা অনেক জিনিসই আছে বলিয়া ধরিয়া লই, এবং জানি বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহাদের কোন বাস্তব ছাপ আমাদের মনে নাই। উদাহরণার্থ কার্য-কারণ-সম্বন্ধের কথাই বিচার করিয়া দেখা যাউক। আমাদের ধারণা, কারণ থাকিলে কার্য হইবেই। যে কারণ তাহার কার্য উৎপাদন করিতে পারে

১। **Dogmatic slumber,**

২। *Tabula rasa.*

না, সে কারণ কারণই নয়। কারণ বর্তমান থাকিলে কার্য না হইয়াই পারে না; ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কার্যকারণ এক প্রকারের অবশ্যম্ভব[১] সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধ না থাকিলেই নয়। কিন্তু সে কথা আমরা কি করিয়া বুঝি? তাহার কি কোন বাস্তব ছাপ আমাদের মনের উপর পড়ে বা আছে? কারণ ও কার্য বলিতে আমরা প্রধানতঃ দুইটি পূর্বাপর ঘটনাই[২] বুঝিয়া থাকি, তাহাদের পূর্বটিকে অপরটির কারণ বলি, এবং পূর্বটি ঘটাতেই অপরটি ঘটিয়া থাকে বলিয়া মনে করি। কারণ ও কার্য দুইটি ঘটনা, কোনটিই নিত্য নয়। কারণ নিত্য হইলে তাহার কার্যও নিত্য হইত, নিত্য পদার্থ কখনই জন্য বা উৎপাদ্য হয় না, এবং যে জন্য নয়, সে কার্যও নয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কারণ ও কার্য দুইটি অনিত্য ঘটনা মাত্র। নিত্য পদার্থ ত আমাদের অনুভবেই আসে না। আমরা যাহা অনুভব করি, যাহার ছাপ আমাদের মনের উপর পড়িয়া থাকে বা পড়িতে পারে, তাহা শুধু এক ঘটনাপ্রবাহ। এক ঘটনার পর অন্য ঘটনা পর পর ঘটিয়া যাইতেছে; এই ঘটনাপ্রবাহই আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং আমাদের জ্ঞান অনুভূত বা অনুভূয়মান ঘটনাপ্রবাহেই সীমাবদ্ধ। এই ঘটনাবলীর মধ্যে যে দুই ঘটনাকে আমরা সর্বদা এক সঙ্গে ঘটিতে দেখি, তাহাদিগকেই কার্যকারণরূপে সম্বন্ধ বলিয়া মনে করি। নিয়ত পূর্ববর্তীকে কারণ বলি, এবং তাহা দ্বারাই পরবর্তী ঘটনা উৎপাদিত হয় বলিয়া মনে করি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, কোন এক ঘটনাকে কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদের দুইটি বিষয় জানিতে হইবে। প্রথমতঃ সেই ঘটনাকে অন্য এক ঘটনার নিয়ত পূর্ববর্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ বুঝিতে হইবে যে, সেই ঘটনার দ্বারাই অন্য ঘটনাটি উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এই কথাগুলি আমরা কি করিয়া জানিতে পারি? একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার পূর্ববর্তী, একথা না হয় সাক্ষাৎ অনুভবেই পাইলাম, কিন্তু নিয়মপূর্বক সর্বদাই যে সে ঘটনা অপর ঘটনার পূর্বে থাকে, সে কথা আমরা কি করিয়া জানি?

এখানে ইহা বলিতে পারা যায় না যে, যেহেতু সেটা কারণ, সেহেতু তাহা সর্বদাই পূর্বে থাকিবে; কেননা সেটাকে কারণ বলিয়া কি করিয়া বোঝা যায়, তাহাই এখানে বিচার করা হইতেছে। নিয়ত পূর্ববর্তী বলিয়া

১। Necessary.

২। Event.

যদি তাহাকে না বুঝিতে পারি, তাহা হইলে তাহাকে কারণ বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি না। আমরা বড় জোর এই কথা বলিতে পারি, যতদূর আমরা দেখিয়াছি, ঐ ঘটনাটি অপর ঘটনার পূর্বে ঘটিয়াছে; কিন্তু অনেক বার পূর্বে থাকিলেই সর্বদাই পূর্বে থাকিবে, একথা প্রমাণিত হয় না। অন্ততঃ একথা সত্য যে 'সর্বদা পূর্বে থাকা' কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান বা অনুভবের বিষয় হয় না। কিন্তু কোন ঘটনা 'সর্বদা পূর্বে থাকে' একথা যদি না জানি, তবে সেটা যে কারণ, একথা কি করিয়া জানিব?

আচ্ছা, এমনও ত হইতে পারে যে একটি ঘটনা একবার মাত্র ঘটিয়াছে, দ্বিতীয়বার আর ঘটে নাই, কিন্তু একবার ঘটিয়াই ঘটনান্তরের কারণ হইয়াছে। বার বার ঘটিয়া অপরের কারণ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। একবার মাত্র ঘটিয়াও কোন ঘটনা ঘটনান্তর উৎপন্ন করিয়াছে, একথা ভাবিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। এরকম স্থলে কোন ঘটনাকে কারণরূপে বুঝিতে হইলে, তাহা সর্বদা অন্য ঘটনার পূর্বে থাকে, একথা আমাদের বুঝিবার দরকার নাই। শুধু পূর্বে আছে, একথা বুঝিলেই চলিবে।

কিন্তু কোন কিছু পূর্বে থাকিলেই কারণ হইবে, একথা বলা চলে না। কোন এক ঘটনার পূর্বে হাজার ঘটনা ঘটিতে পারে; কোন্‌টি তাহার কারণ? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি, যে ঘটনাকে আমরা কারণ বলিয়া বুঝিব সে ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের অন্ততঃ এ কথাটি জানিতে হইবে যে তাহা অন্য কোন ঘটনাকে উৎপন্ন করে। কিন্তু এক ঘটনা অন্য ঘটনাকে উৎপন্ন করে, একথা কোথা হইতে পাই এবং কি করিয়া জানি? আমরা তলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, আমাদের এমন কোন অনুভব নাই, যে অনুভবে, এক ঘটনা যে ঘটনান্তরকে উৎপন্ন করে বা করিতেছে, সেকথা অনুভব করি বা দেখিতে পাই। কোন ঘটনার অনুভবে শুধু সেই ঘটনাই থাকে, অন্য কিছু থাকে না। এক ঘটনার অনুভবের পর অন্য ঘটনার অনুভব হইয়া থাকে। প্রথম ঘটনার অনুভবে আমরা এমন কিছু মোটেই পাই না যাহা আমাদের বলিয়া দিতে পারে যে ঐ ঘটনা অপর ঘটনাকে উৎপন্ন করে, করিতেছে বা করিবে। আর সে কথা জানিতে না পারিলে ঐ পূর্বতন ঘটনা যে অপর ঘটনার কারণ, তা বলিবার আমাদের কোন অধিকার থাকে না। কোন ঘটনার অনুভবেই, তাহা যে অন্য ঘটনা উৎপন্ন করে, সে কথা মোটেই পাওয়া যায় না। অন্য ঘটনার অনুভব না

হইয়া 'অন্য ঘটনা উৎপন্ন করে' ইহার অনুভব হইতে পারে না। সুতরাং কোন ঘটনার অনুভবে, 'অন্য ঘটনা উৎপন্ন করে' এই কথা পাইতে হইলে, সেই ঘটনার অনুভবেই অন্য ঘটনার অনুভব হওয়া দরকার; কিন্তু ইহা অসম্ভব; কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, এক ঘটনার অনুভবে সেই ঘটনাই পাওয়া যায়, অন্য কিছু পাওয়া যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কার্যকারণ ধারণার উপজীব্য কোন আধার আমাদের কোন অনুভবেই নাই। এই ধারণার অনুরূপ কোন কিছুর ছাপ আমাদের অনুভবে আসে না। অনুভবের ভিত্তি না থাকাতে আমাদের তথাকথতি কার্যকারণজ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলিতে পারা যায় না। বস্তুর মধ্যে কার্যকারণরূপ কোন সম্বন্ধ বা বন্ধন নাই। এক ঘটনার পর আর এক ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে মাত্র। তাহাদের মধ্যে শুধু পৌর্বাপর্য রহিয়াছে, বাস্তবিক কোন বন্ধন নাই, যাহার জোরে, এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনাও ঘটিতে বাধ্য বলিয়া বলিতে পারা যায়। এ রকম বাস্তবিক বন্ধন না থাকিলেও আমরা অভ্যাস বশে বন্ধনের কল্পনা করিয়া থাকি। দুই ঘটনাকে একসঙ্গে দেখিতে দেখিতে আমরা এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ি যে প্রথম ঘটনার অনুভব হইলেই দ্বিতীয় ঘটনার প্রত্যাশা না করিয়া আমরা পারি না। তথাকথিত কার্যকারণের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি, সে সম্বন্ধ বাস্তবে আর কিছুই নয়, এক ঘটনা অনুভবের পর ঘটনান্তরের তীব্র প্রত্যাশার নামান্তর মাত্র। সম্বন্ধটা বস্তুতে নাই, সেটা শুধু আমাদের মনে।

তাহা হইলে, হিউমের মতে, দেখা যায়, কার্যকারণের মধ্যে কোন যোগসূত্র আমরা অনুভবে পাই না। তাই যদি হয়, তাহা হইলে ত বস্তুতে যে আমরা কার্যকারণসম্বন্ধ আরোপ করি, তাহা ভ্রম মাত্র। আমাদের অনেক জ্ঞানের সঙ্গেই কার্যকারণসম্বন্ধ জড়িত আছে। এই সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়াই আমরা বিজ্ঞানে ও লৌকিক জীবনে অনেক নিয়মের কল্পনা করিয়া থাকি; কিন্তু বিচার করিয়া ত কার্যকারণসম্বন্ধের মনগড়া ভিত্তি ছাড়া বাস্তবিক কোন ভিত্তি পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় আমাদের যে সব জ্ঞানের মূলে কার্যকারণসম্বন্ধের কল্পনা রহিয়াছে, সে সব জ্ঞানের প্রামাণ্য কি করিয়া মানিয়া নিতে পারা যায়? সুতরাং আমরা দেখিতেছি, দৃষ্টিবাদ শেষে সন্দেহবাদে[১] গিয়া দাঁড়ায়। আমরা যাহা জানি বলিয়া মনে করি, অনেক স্থলেই

১। Scepticism.

তাহা বাস্তবিক জানি না; সুতরাং বস্তুর প্রকৃত স্বরূপসম্বন্ধে সন্দেহই জাগিয়া উঠে।

জ্ঞানের মূলভিত্তি শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর স্থাপিত করিতে গেলে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। জ্ঞান বলিতে আমরা প্রবহমান ক্ষনস্থায়ী ঘটনাবলীর খণ্ড খণ্ড অনুভবই বুঝি না। নানা সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, নানা যোগসূত্রের আবেষ্টনে জ্ঞানের কাঠামো গড়িয়া উঠে। শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবে[১] এই সব সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যায় না। বুদ্ধিদত্ত সম্বন্ধের জোরেই জ্ঞান দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবে নির্ভরশীল দৃষ্টিবাদী বুদ্ধির দেওয়া সম্বন্ধকে বাস্তব বলিয়া মানিতে পারে না। তাই জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে তাহার সন্দেহ না হইয়াই পারে না। সেইজন্য কাণ্ট অনেক স্থলেই দৃষ্টিবাদীকে সন্দেহবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কাণ্টের প্রশ্ন

কাণ্টের শিক্ষাদীক্ষায় যে বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য ছিল, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। হিউমের মতের সঙ্গে পরিচিত হওয়াতে তাঁহার উপর দৃষ্টিবাদেরও যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। দুই মতের মধ্যেই যে সত্যের অংশ আছে তাহা তিনি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলেন। দীর্ঘকাল চিন্তার ফলে তিনি যে দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহাতে বুদ্ধিবাদ ও দৃষ্টিবাদ উভয়ের দানই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অমর গ্রন্থ 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার'[২]-এর প্রারম্ভেই তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন, অনুভবের আগে আমাদের কোন জ্ঞানই হয় না। অনুভব না হইলে জ্ঞানের বিষয়বস্তুই বা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? বাহ্যবস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসাতেই ত কোন কিছুর ভান আমাদের মানসপটে উদিত হয়। আমাদের কাছে যাহা ভাসে, সেই ভানাবলীর তুলনা করিয়া যথাযোগ্যভাবে যূথীকরণ[৩] ও পৃথক্‌করণের[৪] দ্বারাই আমাদের বুদ্ধি বিষয়জ্ঞানের সৃষ্টি করে। এখানে ভান বলিতে, যাহা আমাদের মনের সম্মুখে দাঁড়ায় বা ভাসে তাহাই[৫] বুঝিতেছি। সে জিনিসটা

১। Sense-experience.

২। Critique of pure Reason.

৩। Synthesis.

৪। Analysis.

৫। Representation (*Vorstellung*)

মনের বাহিরে কি ভিতরে, বাস্তব কি অবাস্তব, সে প্রশ্ন এখানে উঠিতেছে না। এখন যখন আমরা গাছ বা টেবিল দেখি, তখন তাহা বাস্তব ও বাহিরে আছে বলিয়াই দেখি বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক বিচার করিলেই বোঝা যাইবে যে, প্রথম হইতেই আমাদের বাস্তব-অবাস্তব, বাহির-ভিতরের কোন কল্পনা থাকে না। সদ্যোজাত শিশুর কাজে গাছের কোন অর্থ নাই। প্রথমতঃ ইহা ভান মাত্র। বিভিন্ন ভাবে পাওয়া বিভিন্ন ভানকে আমরা একত্র করিয়া বিষয়ের সৃষ্টি করি। টেবিল বলিতে এখন আমরা বিশিষ্ট আকারের এক কঠিন জড় পদার্থ বুঝিয়া থাকি বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের জ্ঞানে আমরা টেবিলকে বিভিন্ন ভানের সমষ্টিরূপেই পাই। আজকালকার অনেক দার্শনিকও বলেন, ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয়রূপে গাছ, টেবিল প্রভৃতি জড় পদার্থ মোটেই পাওয়া যায় না। আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু আভাস মাত্র পাই; এবং এই ইন্দ্রিয়দত্ত আভাস[১] হইতে জড় বস্তুর[২] কল্পনা রচনা[৩] করিয়া থাকি। সে যাহাই হউক, কাণ্ট বলিতেছেন, আমাদের বিষয়-জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভব হইতেই সম্ভবপর হয়। এই বিষয়জ্ঞানকেই লৌকিক বা প্রাকৃত জ্ঞান[৪] বলা যাইতে পারে। এই প্রাকৃত জ্ঞান শুধু ক্ষণস্থায়ী, ব্যক্তিগত ভান নিয়াই গঠিত নয়। গাছপালা, ঘরবাড়ী প্রভৃতি পরস্পরসম্বদ্ধ, আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী বস্তু প্রাকৃতজ্ঞানের বিষয়[৫]। কিন্তু এই জ্ঞানের বিষয় যাহাই হইক না কেন, ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে কখনই এই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত না। এইখানে কাণ্ট দৃষ্টিবাদের মূলকথা মানিয়া নিতেছেন। কিন্তু তিনি আরও বলেন, ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে জ্ঞান না হইলেও, শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারাই আমাদের জ্ঞান গঠিত নয়। ইন্দ্রিয়ানুভব হইলে পরে আমাদের জ্ঞান হয়; কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রিয়াণুভবের দ্বারাই আমাদের জ্ঞান হইয়া যায়। জ্ঞান বলিতে সাধারণতঃ লৌকিক বা প্রাকৃত জ্ঞান বুঝিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি, প্রাকৃত জ্ঞান শুধু ভান দিয়াই গঠিত নয়; তার জন্য বিষয় চাই। ভানাবলীই সুসম্বদ্ধ হইয়া বিষয়রূপে পরিণত হয় বটে, কিন্তু ভানাবলী স্বয়ং, অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, সুসম্বদ্ধ হইয়া

১। **Sense-datum.**
২। **Material thing.**
৩। **Construct.**
৪। **Experience.**
৫। **Object.**

উঠিতে পারে না। শুধু বুদ্ধিই ভাবাবলীর সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে। সুতরাং দেখিতেছি, যে বিষয় ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না, বুদ্ধিই সে বিষয়ের সৃষ্টি করে। এই গুরুতর কথা এখন বুঝিতে না পারা গেলেও, আশা করা যায় পরে বোঝা যাইবে। আপাততঃ এই বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কাণ্টের মতে শুধু ইন্দ্রিয়ানুভব হইতে আমরা যাহা পাই, তাহাতে আমাদের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না, আমাদের ভিতর হইতেও কিছু দিতে হয়। আমাদের বুদ্ধিক্রিয়া ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়ানুভব কখনই জ্ঞানে পরিণত হয় না। এখানে কাণ্ট বুদ্ধিবাদীদের মতই সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, শুধু ইন্দ্রিয়ানুভব দ্বারাই জ্ঞান হয় না, এবং শুধু বুদ্ধির দ্বারাও জ্ঞান হয় না; জ্ঞানের জন্য দুইই আবশ্যক। জ্ঞান শুধু বাহির হইতে কিছু পাওয়া নয়, বুদ্ধিকেও নিজের কিছু দিতে হয়। আমাদের জ্ঞানে বুদ্ধির নিজ হইতে যে কি দান রহিয়াছে, সে কথাই কাণ্টীয় দর্শনে আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে।

একথা বুঝিতে হইলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধি নিজের থেকে এমন অনেক বিধান[১] করিতে পারে, যেগুলির সত্যতা নির্ধারণ করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর নির্ভর করিতে হয় না। আমাদের প্রথমে দেখিতে হইবে যে, বিজ্ঞান বলিতে আমরা যে রকম জ্ঞান বুঝি, সে রকম জ্ঞান শুধু অনুভব হইতে পাওয়া যায় না। কোন বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের গুণধর্ম নির্ধারণ করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। যে কথা একজনের বেলা খাটে, অন্যের বেলা খাটে না, এক জায়গায় সত্য, অন্য জায়গায় সত্য নয়, এ রকম কথায় বিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এ রকম কথায় ব্যক্ত হয় না আমার এখন ক্ষুধা পাইয়াছে, কিংবা আজ এখানে বৃষ্টি হইতেছে, এই কথা জানিবার বা জানাইবার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান এমন কথা বলিতে চায়, যাহা সব জায়গায় সব সময়ই খাটে। বৈজ্ঞানিক বিধান সার্বত্রিক[২] হওয়া চাই এবং তাহা দ্বারা কোন অবশ্যম্ভব[৩] তথ্য ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। উত্তাপে জিনিসের পরিসর বাড়ে, একটা বৈজ্ঞানিক বিধান; একটা সার্বত্রিক ও অবশ্যম্ভব কথা। শুধু আমাদের দেশে এবং আজকালই উত্তাপে জিনিসের পরিসর

১। Proposition or judgment.
২। Universal.
৩। Necessary.

বাড়ে, একথা বলা হইতেছে না। সব সময় সব জায়গায়ই উত্তাপে জিনিসের পরিসর বাড়ে। একথা অবশ্যম্ভবও বটে, কেননা কোন জিনিসই উত্তপ্ত হইলে না বাড়িয়া পারে না। বাস্তবিক পক্ষে অবশ্যম্ভবত্ব ও সার্বত্রিকত্ব দুই কথা নয়। যে কথার অন্যথা হয় না, অর্থাৎ যাহা অবশ্যম্ভব, তাহাই সব সময় সব জায়গায় খাটে। অন্যথা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, অর্থাৎ কোথাও কোন অপবাদ[১] হইতে পারিলে, কোন কথাকে ঠিক ঠিক সার্বত্রিক বলিতে পারা যায় না। 'মানুষ মর' বলিলে এই রকম সার্বত্রিক ও অবশ্যম্ভব বিধানই বুঝায়; কেননা এই কথার অর্থ এই নয় যে, মানুষেরা আজকালই মরিতেছে। একথার অর্থ, মানুষ সব সময় সব জায়গাই মরে ও মরিবে এবং কোথাও অমর হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকে না।

এই রকম সার্বত্রিক ও অবশ্যম্ভব কথা বলিতে গেলে শুধু অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের চলে না। শুধু অনুভবের জোরে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যতদূর দেখা গিয়াছে, কোন বিষয় এই রকম ঘটিয়াছে, কিন্তু সব সময় সব জায়গায়ই যে এই রকম ঘটিবে (সার্বত্রিক) এবং অন্য রকম যে হইতেই পারে না (অবশ্যম্ভব), সে কথা শুধু অনুভব হইতে বলিতে পারা যায় না। সব সময় ও সব জায়গার কথা কোন অনুভবেরই বিষয় হয় না। অনেক দূর পর্যন্ত দেখিলেও, যতদূর দেখা গিয়াছে, তত দূরের কথাই বলিতে পারা যায়, সর্বত্র বা সর্বদার কথা শুধু অনুভব হইতে বলা যায় না। কোন বস্তু কি রকম, অনুভবে বুঝিতে পারি, কিন্তু অন্য রকম যে হইতেই পারে না, যে রকম আছে সে রকম যে তাহার না হইলেই নয়, একথা কোন অনুভবেই প্রকাশ পায় না। অনুভবের জোরে বলিতে পারি, গোলাপ লাল; কিন্তু গোলাপকে যে লালই হইতে হইবে, লাল না হইয়া পারিবে না, সে কথা অনুভবে পাই না। সুতরাং দেখিতেছি, বিজ্ঞানে আমাদের যেরকম জ্ঞানের প্রয়োজন, শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবে সে রকম জ্ঞান পাওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবিক কি কোন জ্ঞান এমন আছে, যাহার সত্যতা অনুভবের আশ্রয় না লইয়াও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি? দেখা যাউক, আছে কি না।

'এ ফলটি লাল', 'এই দেওয়ালটা সাদা' এই সব কথার কোনটাই না দেখিয়া সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বলিতে পারা যায় না। ক্ষুরধার বুদ্ধিতে

১। Exception.

দীর্ঘকাল বিচার করিয়াও, যতক্ষণ না চোখ মেলিয়া দেখা গিয়াছে, ততক্ষণ পুরোবর্তী ফল লাল কি না তাহা নির্ণয় করা যাইবে না। কেননা ফল হইলেই লাল হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। 'ফলটি লাল' এই বিধানে 'ফলটি' হইল উদ্দেশ্য[১] এবং 'লাল' হইল বিধেয়[২]। এখানে উদ্দেশ্য হইতে বিধেয়ের কোন কল্পনাই করিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি বলি, 'লাল ফুলটি লাল' অথবা 'মানুষ জীব,' তাহা হইলে বিধেয়ের দ্বারা নূতন কিছু বলা হয় না। আমাদের উদ্দেশ্যের যে কল্পনা আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়াই বিধেয়কে পাইতে পারি। লাল ফুল যে লাল, সে কথা জানিবার বা বুঝিবার জন্য আমাদের নূতন করিয়া ইন্দ্রিয়ানুভবের দরকার হয় না। চোখ কান বুঝিয়াও আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, 'লাল ফুল লাল' কিংবা 'মানুষ জীব'। কেননা লাল না হইয়া লাল ফুল হয় না এবং জীব না হইয়াও মানুষ হয় না। মানুষের কল্পনার মধ্যে জীবের কল্পনাও অন্তর্ভূত আছে। পক্ষান্তরে 'এই ফুলটি লাল' একথা শুধু অনুভব দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। যে কথা সত্য কি মিথ্যা, শুধু অনুভব হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে অনুভবের পর সিদ্ধ হয় বলিয়া অনুভবসিদ্ধ বা পরতঃ-সিদ্ধ[৩] বলা যাইতে পারে। যে কথার উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া বিধেয়কে পাওয়া যায় না, বিধেয়ের দ্বারা নূতন কোন কল্পনা উদ্দেশ্য-কল্পনাতে যুক্ত করা হয়, তাহাকে যৌগিক[৪] বিধান বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, যৌগিক বিধান অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। বিধেয়ে নূতন কিছু বলিতে হইলে, অনুভব ব্যতীত কিসের উপর নির্ভর করিয়া সে কথা বলিব? সুতরাং বিধান যৌগিক হইলে যে অনুভবসিদ্ধ বা পরতঃসিদ্ধ হইবে, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এমনও ত অনেক কথা আছে, যাহাতে বিধেয়দ্বারা নূতন কিছু বলা হয় না, উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করিয়াই বিধেয়কে পাওয়া যায়। এরকম বৈশ্লেষিক বা অযৌগিক[৫] বিধানের সত্যতা উপলব্ধি করিতে অনুভবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। এগুলি অনুভবনিরপেক্ষ; অনুভবের অপেক্ষা না করিয়া, অনুভবের আগেই

১। **Subject.**
২। **Predicate,**
৩। ***Aposteriori***
৪। **Synthetic.**
৫। **Analytic.**

সত্য বলিয়া ধরিয়া নিতে পারা যায় বলিয়া এরকম বিধানকে পূর্ব্বতঃসিদ্ধ[১] বলা যাইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি, সার্বত্রিক বিধান করিতে পারাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং আরও দেখিয়াছি, অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া সার্বত্রিক বিধানে পৌঁছিতে পারা যায় না। যে কথা অনুভবনিরপেক্ষ বা পূর্ব্বতঃসিদ্ধ, তাহাই ঠিক ঠিক সর্ব্বদা ও সর্বত্র খাটিতে পারে। এখন দেখিলাম অযৌগিক বা বৈশ্লেষিক বিধানের জন্য অনুভবের অপেক্ষা করিতে হয় না। বিজ্ঞান যদি সার্বত্রিক বিধান করিতে চায়, এবং সার্বত্রিক বিধান হইলে যদি অনুভব-নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক হয়, এবং বৈশ্লেষিক বিধানই যদি অনুভবনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলে কি বুঝিব বিজ্ঞান বৈশ্লেষিক বিধান নিয়াই সন্তুষ্ট থাকে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, বাস্তবিক বিজ্ঞান কি চায় এবং বৈশ্লেষিক বিধান হইতে আমরা বাস্তবিক কি পাই, তাহা বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞান সার্বত্রিক বিধান করিতে চায় বটে। কিন্তু তাহাদ্বারা আমাদের জ্ঞানের পরিসরও বাড়াইতে চায়। যে কথা সব জায়গায়ই খাটে, বিজ্ঞান শুধু সে কথাই বলিতে চায় না, যে কথায় আমাদের জ্ঞান বাড়ে, সে কথা বলাই বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈশ্লেষিক বিধানে কিন্তু আমাদের জ্ঞান বাড়ে বলিয়া মোটেই মনে হয় না। 'মানুষ জীব' বলিলে নূতন কথা কি শিখিলাম? মানুষ যে কি, একথা যে জানে, সে মানুষ যে জীব, সে কথাও জানে। সুতরাং মানুষ জীব বলাতে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান মোটেই বাড়িয়াছে বলিয়া বলা যায় না। বৈশ্লেষিক বিধানের দ্বারা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার বা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু তাহাদ্বারা নূতন কিছু জানা গেল বলা যায় না। নূতন কিছু জানিতে হইলে আমাদের যৌগিক বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যৌগিক বিধাণের দ্বারাই আমরা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন কথা জানিতে পারি। সুতরাং বিজ্ঞান বাস্তবিক যৌগিক বিধানই করিতে চায়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যৌগিক বিধান অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে; এবং অনুভবসিদ্ধ হইলে ত সার্বত্রিক হয় না। আর বিজ্ঞান ত সার্বত্রিক বিধানই করিতে চায়। অতএব দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞান যে রকম বিধান করিতে চায়, তাহাদের যৌগিকও হওয়া চাই, অনুভবনিরপেক্ষও হওয়া চাই। তাহা কি সম্ভবপর? কি করিয়া অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান সম্ভবপর হইতে

১। *Apriori*

পারে, তাহাই কাণ্টের মুখ্য প্রশ্ন[১]। কাণ্টের মতে অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান গণিতে ও পদার্থবিজ্ঞানে[২] বর্তমান রহিয়াছে; তত্ত্ববিজ্ঞানেও[৩] আছে। গণিতে ও পদার্থবিজ্ঞানে যে সব অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান রহিয়াছে, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে কাণ্টের মনে সন্দেহই নাই। শুধু কি করিয়া সেগুলি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার উপপত্তি প্রদর্শনই কাণ্টের প্রধান কাজ। গণিতের ও বিজ্ঞানের অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধানের উপপত্তি হওয়াতে গণিত ও বিজ্ঞানের উপপত্তি হইয়া গেল। গণিতে ও বিজ্ঞানে যে কি করিয়া এবং কি অর্থে আমরা জ্ঞান লাভ করি, কাণ্ট তাহা আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তত্ত্ববিজ্ঞানে যে সব যৌগিক বিধান করা হয়, কাণ্ট দেখাইয়াছেন, সেগুলির উপপাদন করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং গণিত ও বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা যে রকম জ্ঞানলাভ করি, কাণ্টের মতে তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা আমরা সে রকম জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। এই সব কথার প্রকৃত অর্থ কাণ্টের সমস্ত দর্শন আলোচনা করিলেই সম্যকরূপে বোঝা যাইবে। আপাততঃ দেখা যাউক, কিরকম বিধানকে কাণ্ট যৌগিক অথচ অনুভবনিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ গণিতের কথাই ধরা যাউক। '৫+৭=১২' ইহাকে কাণ্ট যৌগিক অথচ অনুভবনিরপেক্ষ বলিয়াছেন। গণিতের সব বিধানই যে অনুভবনিরপেক্ষ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; কেননা, গণিতের বিধান সব জায়গায়ই খাটে; তাহাদের সত্যতা অনেক জায়গায় দেখিয়া শুনিয়া নির্ধারণ করিতে হয় না। পাঁচ আর সাত যে বার, তাহা এক জায়গায় বুঝিলেই বুঝিব সব জায়গায় লাগিবে। জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞা এক চিত্রে প্রমাণিত হইলেই স্বরূপতঃই প্রমাণিত হইল বলিয়া বোঝা যায়; বার বার নানা চিত্রে তাহা আর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় না। সুতরাং বোঝা গেল গণিতের বিধান মাত্রই অনুভবনিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সেগুলি কি যৌগিক? কাণ্ট বলেন, হাঁ, তাহারা যৌগিক। উপরের দৃষ্টান্তই ধরা যাউক ৫+৭=১২; এখানে ৫+৭ উদ্দেশ্য এবং ১২ বিধেয়। উদ্দেশ্যতে পাঁচ ও সাতকে যোগ করার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু পাঁচ, সাত বা যোগ করার

১। How are synthetio judgments *apriori* possible?
২। Physics
৩। Metaphysics

মধ্যে ত কোথাও বিধের ১২কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাঁচ, সাত ও যোগের কল্পনাতেই বার'র কল্পনা আসিয়া যায় না। সুতরাং ৫+৭=১২ বলিলে আমরা নূতন কিছু জানি। সেইরকম জ্যামিতিতে যখন বলা হয়, সরলরেখা দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী লঘুতম দূরত্ব ব্যক্ত করে, তখন আমরা একটি যৌগিক বিধান পাই; কেননা রেখার সারল্য আর দূরত্বের লঘুতা এক কথা নয়। সারল্য রেখার এক গুণ[1] প্রকাশ করে। লঘুতা দূরত্বের পরিমাণ[2] বুঝাইতেছে। গুণ ও পরিমাণ ভিন্ন পদার্থ। একটা জানিলেই অন্যটা জানা যায় না।

বিজ্ঞানেও এরকম যৌগিক বিধান আছে। যখন আমরা বলি, কোন কিছু ঘটিলেই তাহার কারণ থাকিবে, তখন আমরা যৌগিক বিধানই করিয়া থাকি। কোন কিছু ঘটা ও তাহার কারণ থাকা দুইটি বিভিন্ন কথা। কোন কিছু ঘটিলে আমরা শুধু এই বুঝিব যে, যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, তাহা আগে ছিল না, পরে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে কারণ থাকিতে হইবে সে কথা আমরা কোন কিছুর ঘটার কল্পনা হইতে মোটেই পাই না। 'মানুষের' কল্পনার ভিতরে যেমন 'জীবের' কল্পনা নিহিত আছে, সেরকম ঘটার কল্পনার মধ্যে কারণের কল্পনা নিহিত নাই। সুতরাং উক্ত বিধানটি যে যৌগিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বিধান অনুভবনিরপেক্ষও বটে, কেননা, যখন আমরা বলি, কোন কিছু ঘটিলে তাহার কারণ থাকিবে, তখন আমাদের অর্থ এই নয় যে, যত দূর দেখিয়াছি প্রত্যেক ঘটনারই কারণ রহিয়াছে; আমরা বলিতে চাই, দেখি আর না দেখি, ঘটনা হইলেই তাহার কারণ থাকিবে। এই বিধানটি সার্বত্রিক ও অবশ্যম্ভব, সুতরাং অনুভবনিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ।

তত্ত্ববিজ্ঞানেও এইরকম বিধান আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য সববিষয়ই ত কোন না কোন প্রাকৃত বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়া থাকে; তত্ত্ববিজ্ঞান অতীন্দ্রিয়[3] বিষয় নিয়াই আলোচনা করিয়া থাকে। জীবাত্মা, জগৎ ও ঈশ্বরই মুখ্যতঃ তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আত্মা বা ঈশ্বর ত ইন্দ্রিয়-গোচর নহেন; জগৎ যদিও আমরা দেখিয়া থাকি, তথাপি জগতের আদি বা

১। Quality
২। Quantity
৩। Supersensible

অন্ত আমরা দেখিতে পারি না; জগতের আদি অন্তের কথা তত্ত্ববিজ্ঞান আলোচনা করিয়া থাকে। জগৎ সাদি না অনাদি, তত্ত্ববিজ্ঞান নির্ধারণ করিতে চায়। জগৎকে সাদিই বলি, কিম্বা অনাদিই বলি, আমরা প্রত্যেক স্থলেই যৌগিক বিধান করিতেছি; কেননা, জগতের কল্পনার মধ্যে সাদিত্ব বা অনাদিত্বের কল্পনা নিহিত নাই। জগৎ বলিতে সাদি পদার্থই বুঝিতে হইবে কিংবা অনাদি পদার্থই বুঝিতে হইবে, এমন কিছু বলিতে পারা যায় না। আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধেও আমরা অনেক যৌগিক বিধান করিয়া থাকি। এই সব অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধানের কোন উপপত্তি হইতে পারে কি না কাণ্ট বিচার করিয়া দেখিতে চান।

গণিতে ও বিজ্ঞানে যে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি, এ বিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহই ছিল না। গণিতে ও বিজ্ঞানে তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, গণিত ও বিজ্ঞান দিন দিন উন্নতির পথে যাইতেছে। আর যাঁহারা এইসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের নিজের শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতদ্বৈধ নাই। এই অবাধ অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিকদের মধ্যে ঐকমত্য, তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রামাণ্যই ঘোষিত করে বলিয়া ধরিয়া নিতে পারা যায়। সুতরাং গণিতে বা বিজ্ঞানে অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান সম্ভবপর কিনা সেটা আমাদের প্রশ্ন নয়। ঐসব শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কাণ্ট নিঃসন্দেহ ছিলেন; এবং ঐসব শাস্ত্রে অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তাহা (বিধান) যে সম্ভবপর, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। শুধু তথাবিধ যৌগিক বিধান কি করিয়া সম্ভবপর হইল, তাহার উপপত্তি বা সঙ্গতি প্রদর্শনই কাণ্টের কাজ।

কিন্তু তত্ত্ববিজ্ঞানের বেলায় এরকম কথা বলিতে পারা যায় না। কত প্রাচীনকাল হইতে লোকেরা তত্ত্ববিজ্ঞান বা দর্শনের আলোচনা করিয়া আসিতেছে। কত প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাঁহাদের সমস্ত জীবন ও শক্তি দর্শনের আলোচনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দর্শনের কোন রকমের উন্নতি হইতেছে বলিয়া ত বলিতে পারা যায় না। প্রাচীন কালে প্লেটো এরিস্টোটল্ যে সব প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন, আমরা প্রায় সেই সব প্রশ্নেরই সমাধানের জন্য এখনও ব্যস্ত আছি। কিন্তু কোন রকম সর্ববাদিসম্মত মীমাংসারই ত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং দর্শনের অগ্রগতি বা

উন্নতির ত মোটেই কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। ঐকমত্যের ত কথাই নাই। দর্শনশাস্ত্রে এমন কোন কথা পাওয়াই দুষ্কর, যে কথা সব দার্শনিকই মানেন। এক দার্শনিক যদি এক কথা বলেন, তাহা হইলে অন্য কোন না কোন দার্শনিক তাহার প্রতিবাদ করিবেনই করিবেন। এমতাবস্থায় দর্শনশাস্ত্রে আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করি, একথা কে জোর করিয়া বলিতে পারে? গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানকে যেমন জ্ঞানসমষ্টি বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি, তত্ত্ববিজ্ঞান বলিতে সেরকম কোন জ্ঞানসমষ্টি আমরা বুঝিতে পারি না। তত্ত্ববিজ্ঞানে বাস্তবিক জ্ঞানলাভ সম্ভবপর কি না—অর্থাৎ তত্ত্ব-বিজ্ঞানই সম্ভবপর কিনা—এই প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। সুতরাং তত্ত্ববিজ্ঞানের বেলায় কাণ্ট বিচার করিতে চান, অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান তাহাতে মোটেই সম্ভবপর কিনা। গণিতে ও পদার্থবিজ্ঞানে এবম্বিধ যৌগিক বিধানের উপপত্তি দেখাইতে গিয়া যেরকম অবস্থায় তাহা সম্ভবপর বলিয়া কাণ্ট নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন, তত্ত্ববিজ্ঞানের বেলায় সে রকম অবস্থা সম্ভবপর নয়। অতএব কাণ্টের সিদ্ধান্ত এই যে তত্ত্ববিজ্ঞানে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারি না, অর্থাৎ তথাকথিত তত্ত্ব-বিজ্ঞান কোন বিজ্ঞানই নয়। জ্ঞান বলিতে কাণ্ট গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে যে রকম জ্ঞান পাওয়া যায়, সেরকম জ্ঞানই বুঝিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি যখন বলেন, তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না, তখন বুঝিতে হইবে গণিতে ও পদার্থবিজ্ঞান যেরকম জ্ঞানলাভ হয়, তত্ত্ববিজ্ঞানে সে রকম জ্ঞান লাভ করা যায় না।

এই বিষয়টি উপসংহারের আগে যৌগিক ও অযৌগিক বিধান সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা বাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে। এই দুই প্রকার বিধানের উদাহরণ কাণ্ট এই রকম দিয়াছেন:—বৈশ্লেষিক বা অযৌগিক বিধান—'জড়পিণ্ডের বিস্তার (বা দৈশিক পরিমাণ) আছে'; যৌগিক বিধান —'জড়পিণ্ডের গুরুত্ব আছে'। যে বিধানে উদ্দেশ্যের কল্পনার মধ্যে বিধেয়ের কল্পনা আসিয়া যায়, তাহাকে বৈশ্লেষিক বা অযৌগিক বিধান বলা হইয়াছে। জড়পিণ্ড হইলে তাহার বিস্তার বা দৈশিক পরিমাণ থাকিবেই; ইহাতে অন্যথা হয় না। জড়পিণ্ডের কল্পনাতে দৈশিক পরিমাণ বা বিস্তারের কল্পনা আসিয়া যায়; সুতরাং যখন জড়পিণ্ডের বিস্তার আছে বলা হয় তখন নূতন কিছু যোগ করা হয় না। কিন্তু গুরুত্ব বা ওজনের কল্পনা জড়পিণ্ডের কল্পনাতে

আসে না। জড়পিণ্ডের বাস্তবিক ওজন আছে বটে, কিন্তু জড়পিণ্ডের কল্পনাতে ওজনের কল্পনা আসে না। জড়পিণ্ড বলিতে শুধু বিস্তারবান পদার্থই বুঝিতে পারা যায়, তাহার গুরুত্ব বা ওজন আছে কি না, সে কথা শুধু অনুভব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জড়পিণ্ডের বাস্তবিক ওজন ও বিস্তার দুইই থাকে, তবে জড়পিণ্ড বলিতে বিস্তারবান পদার্থ বুঝিব, গুরুত্ববান বুঝিব না, ইহার নিয়ামক কি? কাহারও কাছে জরপিণ্ডের কল্পনাতে ওজনের কল্পনা না আসিতে পারে, কিন্তু কাহারও কাছে জড়পিণ্ডের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ওজনের কল্পনাও ত আসিতে পারে। এবং যদি আসে, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, 'জড়পিণ্ডের গুরুত্ব আছে' একথা অন্যের কাছে যৌগিক হইলেও, তাহার কাছে অযৌগিক হইয়া যাইবে?

আমরা যখন এই রকম প্রশ্ন উত্থাপন করি, তখন মনে হয় যেন যৌগিক-অযৌগিক ভেদ আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের জ্ঞানে যদি আগেই উদ্দেশ্য ও বিধেয় যুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিধানটি হইবে অযৌগিক, এবং যদি আগেই জ্ঞানে উদ্দেশ্য বিধেয়যুক্ত না থাকে, বিধানের দ্বারাই প্রথমে যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিধানটি হইবে যৌগিক। কাণ্টের অর্থ কিন্তু সে রকম নয়। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কি জানি বা না জানি, তাহার উপর যৌগিক অযৌগিক ভেদ নির্ভর করে না। পদার্থের অর্থের উপর নির্ভর করে। কোন্ পদার্থের কি অর্থ, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না; তাহা হইলে তর্ক যুক্তি করাই কঠিন হইয়া পড়ে। কোন্ কথায় কে কি বুঝিবে, তাহার কোন নিয়ম থাকে না। সুতরাং দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের জন্য পদার্থের অর্থ নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হয়। শাস্ত্রকারেরা, বৈজ্ঞানিকেরা বা প্রত্যেক শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞেরা যে কথার যে অর্থ সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার সেই অর্থই বুঝিতে হয়। উদ্দেশ্য বিধেয়ের এই রকম নির্দিষ্ট অর্থ ধরিয়াই বিচার করিতে হয়, উদ্দেশ্যের অর্থের মধ্যে বিধেয়ের অর্থ নিহিত আছে কি না। যদি উদ্দেশ্যের অর্থের মধ্যে বিধেয়ের অর্থ নিহিত থাকে, তাহা হইলে অযৌগিক বিধান হয়; যদি না থাকে, তাহা হইলে যৌগিক বিধন হয়। পদার্থের এই রকম শাস্ত্রীয় বৈজ্ঞানিক বা ন্যায়সম্মত অর্থ ধরিয়াই কাণ্টের যৌগিক অযৌগিক বিধানভেদ বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানরাজ্যে কোপার্ণিকীয় বিপ্লব

কাণ্ট বলিলেন বটে, গণিতে ও বিজ্ঞানে অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বাস্তবিক অর্থ কি দাঁড়ায়, আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। অনুভবনিরপেক্ষ যৌগিক বিধান করিতে পারার অর্থ এই যে, আমরা অনুভব না করিয়াই বিষয় সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিতে পারি। কিন্তু অনুভব না করিয়াই বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? বিষয় যে কিরূপ, তাহা চোখ কান দিয়া দেখা শোনার আগে আমরা কি করিয়া বলিব?

আমরা বিষয় বলিতে সাধারণতঃ স্বতন্ত্র জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তু বুঝিয়া থাকি। আমরা জানি, বা না জানি, বিষয় থাকেই, মনে করি। বিষয়ের সত্তা বিষয়েই আছে। বিষয়ের সত্তা ও স্বরূপের জন্য বিষয় অন্য কাহারও কাছে দায়ী নয়, অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বিষয়কে স্ব-তন্ত্র বা স্বগতসত্তাক[১] বস্তু বলিয়াই ভাবিয়া থাকি। যখন, আমরা ইহাকে জানি, তখন ইহার রূপ আমাদের জ্ঞানে প্রতিফলিত হয় বলিয়া মনে করি। বস্তুর প্রতিকৃতি জ্ঞানে ভাসিয়া থাকে এবং জ্ঞানকে সত্য হইতে হইলে বিষয়ের অনুরূপ হইতে হয়। বিষয়ের স্বগত রূপ জানাই যখন জ্ঞানের উদ্দেশ্য, তখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়েরই প্রাধান্য বুঝিতে হয়। এই জন্য অনেকে জ্ঞানকে জন্য এবং বিষয়কে জনক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই মত স্বীকার করিলে দৃষ্টিবাদী মতই মানিতে হয়। আর বলিতে হয়, অনুভবব্যতিরেকে জ্ঞানই হয় না। কিন্তু কাণ্ট দেখিলেন যে, যদি তাহাই সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা গণিতে ও বিজ্ঞানে যে সার্বত্রিক বিধান করিয়া থাকি, তাহা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং আমাদের মানিতেই হইবে, অনুভব ছাড়াও বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। বুদ্ধিবাদীরা এরকম জ্ঞান সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এইরকম জ্ঞানের কি উপপত্তি দেখাইতে পারেন?

বুদ্ধিবাদীরাও[২] বিষয়কে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মানেন। জ্ঞেয় বস্তু যখন জ্ঞাতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তখন জ্ঞাতার মধ্যে বা তাহার জ্ঞান শক্তির

১। Thing-in-itself.
২। বুদ্ধিবাদ (rationalism) বলিতে এখানে বিজ্ঞানবাদ (idealism) বুঝিতে হইবে না।

মধ্যে বিষয়ের কোন আভাসই পাওয়া যাইবে না। এমতাবস্থায় শুধু আমাদের জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আমরা বিষয় সম্বন্ধে যে বিধান করিব, সে বিধান বিষয়ের উপর কিরূপে লাগিতে পারে? বিষয় ত স্বতন্ত্র বস্তু, তাহার উপর আমাদের কোন জোর চলিবে না। বরং বিষয়ের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানকে খাপ খাওয়াইতে হইবে। কিন্তু এখানে যখন বলা হইতেছে, অনুভব না করিয়াই বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায়, তখন ত এইরূপই বোঝা যায় যে, আমাদের বুদ্ধির নির্দেশানুসারেই বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারিত হয়।

লইব্‌নিট্‌স্‌পন্থী বুদ্ধিবাদীরা বলেন, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা বিষয় নিয়মিত হয় না, বিষয়ের দ্বারাও বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত নয়। তথাপিও যে আমরা শুধু বুদ্ধিদ্বারাই, অনুভবব্যতিরেকেও, বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহার অন্য কারণ আছে। বিষয় স্বতন্ত্র বটে, বিষয়ের স্বরূপ বা সত্তা আমাদের ইচ্ছাতে পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু বিষয়ের অস্তিত্ব আমাদের উপর নির্ভর না করিলেও, ভগবান বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া মানিতে হয় এবং যে ভগবান বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের বুদ্ধিও সেই ভগবানের নিকট হইতেই পাইয়াছি। বুদ্ধি যখন বিষয়কে জানিবার জন্যই আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তখন আমাদের মনে করিতে হইবে, ভগবান বুদ্ধিকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, বিষয়ের স্বরূপ যে রকম, বুদ্ধি সেই রকমই ভাবিয়া থাকে। ইহাতে বিষয় বুদ্ধিদ্বারা প্রভাবিত হয় না, বুদ্ধিও বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত নয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বকীয় নিয়মানুসারেই চলিতেছে। বিষয়বস্তুও তাহাদের নিয়মানুসারেই চলিয়াছে। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টির এমনই মহিমা, ভগবান্ প্রথম হইতেই বুদ্ধি ও বিষয়কে এমন কৌশলের সহিত রচনা করিয়াছেন যে, বুদ্ধিতে যখন যেরূপ ভাসে, বস্তুতেও তখন সেই রূপই থাকে। বুদ্ধি ও বস্তুতে এক 'প্রাক্‌প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যে'র [১] ফলেই এই রকম হইয়াছে। এক কারিগর যেমন দুইটি ঘড়ি এমন ভাবে তৈয়ার করিতে পারে যে একটি ঠিক অপরটির অনুরূপই চলিয়া থাকে, ভগবানও তেমনি আমাদের বুদ্ধি ও বিষয়কে পরস্পরের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। দুইটি ঘড়ির মধ্যে কোন

১। Pre-established Harmony.

রকমের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া না হইয়াও, এক ঘড়ি অন্ত ঘড়ি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা কোন প্রকারে প্রভাবিত না হইয়াও, দুইটি ঘড়িতে একই সময় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি বুদ্ধির অনুরূপ বিষয়, ও বিষয়ের অনুরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে। এই মত মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, আমাদের বুদ্ধিতে এরকম একটা প্রবণতা আছে যে, বিষয়ের স্বরূপানুযায়ী বৃত্তিই আমাদের মনে উদিত হয়। কিন্তু এই প্রবণতা কতদূর পর্যন্ত মানিব?—কাণ্ট বলেন, ইহার ত কোন সীমা নির্দেশই করা যাইবে না। বস্তুর ব্যাপক বা অবশ্যম্ভব রূপ সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, সে সম্বন্ধে না হয় বৌদ্ধিক প্রবণতা মানিয়া লওয়া গেল। কোন বস্তুকে অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে দ্রব্য[১] হইতে হইবে। একথা না হয় বুদ্ধির স্বভাবসিদ্ধ বস্তুনুযায়ী প্রবণতার জোরেই বলা গেল; কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে খুঁটিনাটি যে কথাই বলা যাইবে, তার জন্যই কি এক বৌদ্ধিক প্রবণতা মানিতে হইবে? বিষয়সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বুদ্ধির স্বভাব হইতেই জানা যাইতে পারে; কিন্তু সব কথাই জানা যাইবে এমন ত বলা যাইতে পারা যায় না।

আরেক কথা: এই রকম মত মানিলে, বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহার জন্যই আমাদের বুদ্ধির স্বভাব বা গঠনের উপর নির্ভর করিতে হয়। যখন বলি, প্রত্যেক ঘটনারই কারণ আছে, তখন একথার অর্থ এই দাঁড়ায় —আমাদের বুদ্ধির গঠনই এইরূপ যে, ঘটনার কথা ভাবিতে গেলে তাহার কারণের কথা না ভাবিয়া পারা যায় না। এই রকম হইলে বিষয়ের স্বরূপ বা বিষয়গত ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। কার্যকারণসম্বন্ধে আমাদের শুধু ভাবিবার এক অপরিহার্য ধারাই প্রকাশ পায় না; এই সম্বন্ধের দ্বারা বিষয়গত এক বাস্তবিক ধর্মই ব্যক্ত করিতে চাই।

এই সব কারণে কাণ্ট্ মনে করেন, বুদ্ধিবাদীরা যে বুদ্ধি ও বিষয়ের মধ্যে এক প্রাক্‌প্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্যের দ্বারা আমাদের বৈষয়িক জ্ঞানের উপপাদন করিতে চান, সে উপপত্তি যুক্তিসহ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি আমাদের বিষয়জ্ঞানের উপপত্তির জন্য জ্ঞান ও বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা আছে, তাহাই আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিতে চান। দৃষ্টিবাদের সমালোচনা করিয়া দেখিলেন বুদ্ধিকে বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে

১। Substance.

হইলে, আমাদের সকল জ্ঞানের সম্যক্ উপপত্তি হয় না। সুতরাং বৈষয়িক জ্ঞানে বুদ্ধি বিষয়সাপেক্ষ একথা বলিতে পারা যায় না। এখন বুদ্ধিবাদের সমালোচনায়ও দেখিলেন যে, বুদ্ধি ও বিষয়কে পরস্পর নিরপেক্ষ মনে করা যায় না। জ্ঞানের উপপত্তির জন্য একটি পন্থাই অবশিষ্ট রহিল; সেটা এই বিষয়কেই বুদ্ধিসাপেক্ষ মনে করা। কাণ্ট্ এই পন্থাই অবলম্বন করিলেন।

অনুভবের আশ্রয় না লইয়া বিষয় সম্বন্ধে যৌগিক বিধান কি করিয়া করিতে পারা যায়, এইত ছিল কাণ্টের প্রশ্ন। আমরা যদি মনে করি, বিষয়ের স্বরূপই আমাদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সহজেই এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। আমাদের বুদ্ধি যদি বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, বিষয়ই যদি বুদ্ধি দ্বারা বা বৌদ্ধিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে অনুভবের অপেক্ষা না করিয়াও যে আমাদের বুদ্ধি বিষয় সম্বন্ধে বিধান করিতে পারিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আমরা সাধারণতঃ মনে করি, জ্ঞানের জন্য বুদ্ধি বিষয়ের উপরই নির্ভর করে। এখানে বলা হইতেছে, জ্ঞানে বিষয়রূপে আমরা যাহা পাই, তাহার স্বরূপ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে! কি করিয়া বিষয়ের স্বরূপ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহা পরে আস্তে আস্তে স্পষ্ট করিয়া দেখান যাইবে। কাণ্ট্ যাহা বলিতেছেন, তাহা যে আমাদের সাধারণ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, আপাততঃ তাহাই আমাদের বক্তব্য। এর জন্যই বলা হয়, কাণ্ট্ জ্ঞানরাজ্যে কোপার্ণিকীয় বিপ্লব[১] আনিয়া দিয়াছেন। কাণ্ট্ নিজের মুখেই এই কথা প্রথমে বলিয়াছেন। কোপার্ণিকাসের আগে লোকেরা মনে করিত, আমরা স্থির হইয়া পৃথিবীতে দাঁড়াইয়াছি এবং সূর্য ও তারকাগণ আমাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে। এই কল্পনাতে জ্যোতিষশাস্ত্রে অনেক কথার উপপত্তি হইতেছিল না। সূর্য ও তারকাগণ (আপেক্ষিক ভাবে) দাঁড়াইয়া আছে এবং আমরাই পৃথিবীর সহিত ঘুরিতেছি, এই রকম কল্পনার দ্বারা ঐসব কথার উপপত্তি হয় কিনা কোপার্ণিকাস্ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তাহাতে ঐসব কথার সহজেই উপপত্তি হইয়া যায়। কোপার্ণিকাসের সময় হইতে বিশ্ব সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের কল্পনা বদলাইয়া গেল। এই কারণে, কোপার্ণিকাস জ্যোতিষ বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিলেন, বলা

১। **Copernican Revolution.**

হয়। জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমূল পরিবর্তিত করিয়া কাণ্ট্ জ্ঞান রাজ্যে সেই রকম বিপ্লব আনিয়া দিয়াছেন বলিয়া কাণ্ট্ নিজে মনে করিতেন এবং অদ্যাবধিও অনেক মনীষী মনে করিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে সূর্য ও তারকাগণই ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, তাহারাই যেন গতিশীল। কিন্তু বাস্তবিক গতি তাহাদের মধ্যে নয়। দর্শকের অবস্থাবিশেষের জন্য শুধু গতির প্রতীতি হয় মাত্র। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বিষয়ের যে রূপ আমরা দেখি, তাহা স্বতন্ত্রভাবে বিষয়েই আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জ্ঞাতার বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তির উপর বিষয়ের স্বরূপ নির্ভর করে। এই খানেই জ্ঞান সম্বন্ধে কাণ্টের মতের এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধে কোপার্ণিকাসের মতের সাদৃশ্য।

বিষয় বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্বগতসত্তাকে স্বতন্ত্র বস্তুই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কাণ্ট্ বিষয় বলিতে স্বতন্ত্র বস্তু বুঝিতেছেন না। স্বতন্ত্র বস্তু বুদ্ধি-সাপেক্ষ হইতে পারে না। স্বতন্ত্র বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি না—কাণ্টের মতে তাহা জানা যায় না। কিন্তু জ্ঞানে আমরা যাহা পাই, তাহাই আমাদের বিষয়, এবং এই বিষয়ের স্বরূপ আমাদের বুদ্ধি বা জ্ঞান শক্তির উপর নির্ভর করে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমাদের বুদ্ধির উপর যদি বিষয় নির্ভর করে, তাহা হইলে ত যে যেমন বুঝিবে, বিষয় তেমনই হইবে। এমতাবস্থায় জাগৃতি ও স্বপ্ন, প্রমা ও ভ্রম, সত্য ও মিথ্যার কোন ভেদই থাকিবে না। উহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ব্যক্তিগত বুদ্ধি বা জ্ঞানের কথা কাণ্ট্ বলিতেছেন না। আমরা বিভিন্ন লোকে যখন বিভিন্ন প্রকার বুঝি, তখন সত্যের সন্ধান পাই না, আমাদিগকে তখন বৈয়ক্তিক কল্পনাতে অবদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বুদ্ধিভেদের উপরেও আমাদের সাধারণ জ্ঞানশক্তি বলিয়া একটা জিনিস আছে, যাহা সকলের মাঝেই এক, এবং যাহার বলেই আমাদের পরস্পরের মাঝে কোন রকমে বোঝাপড়া হইতে পারে। তোমার বুদ্ধি হইতে যদি আমার বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হইত তাহা হইলে তোমার কথাবার্তা, যুক্তিতর্ক আমি বুঝিতেই পারিতাম না। অতএব সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান এক সাধারণ জ্ঞানশক্তি আমাদের মানিতে হয়। এই সাধারণ জ্ঞানশক্তি বা বুদ্ধির উপরেই বিষয়ের স্বরূপ নির্ভর করে। এই সাধারণ বোধশক্তি যখন এক, তখন বিভিন্ন লোকের

কাছে :বিষয়ের বিভিন্ন রূপের কোন কথাই উঠিতে পারে না। আরেক কথা, বিষয়ের স্বরূপ বুদ্ধির :উপর নির্ভর করিলেও বিষয়টি বুদ্ধি দ্বারাই সম্পূর্ণ তৈরী হইয়া উঠিয়াছে, এমন কথা বলা যাইতেছে না। বিষয়ের সাধারণ ব্যাপকরূপই 'বুদ্ধি দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে। বিষয়ের বিশেষ বিশেষ গুণ-ধর্ম্ম শুধু বুদ্ধি দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। টেবিল বলিলে, একেবারে না দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি, এটা একটা দ্রব্য হইবে এবং এর দৈনিক পরিমাণ থাকিবে, কিন্তু তাহা কি রংএর হইবে, কতখানি ছোট বড় হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অনুভবের প্রয়োজন। বিষয়ের কোন রূপের জন্য বুদ্ধির কাছে বিষয় কতটা ঋণী, তাহা ক্রমে ক্রমে পরে বোঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, কাণ্টের দর্শনে জ্ঞানবিচারেরই প্রাধান্য। জ্ঞান সম্ভবপর হইতে হইলে, কি রকম বস্তুস্থিতি আবশ্যক, কি রকম পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে—এই সব কথা কাণ্ট্ আগেই নির্ধারণ করিতে চান। কাণ্টের পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা এই রকম ভাবে তাঁহাদের দার্শনিক বিচার আরম্ভ করেন নাই। বস্তু আছে এবং আমরা তাহা জানিতে পারি, এই কথা তাঁহারা ধরিয়াই লইয়াছিলেন। সব বিষয়েই জ্ঞান সম্ভবপর এই কথা ধরিয়া নিয়াই তাঁহারা ঈশ্বর, আত্মাও জগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। কাণ্ট্ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহাদেয় কথার মধ্যে অনেক বিরোধ রহিয়াছে। বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে সম্ভবপর, এটা তাঁহাদের নির্বিচার মতবাদ[১] মাত্র। কাণ্টের পূর্ববর্তী সব দর্শনই এই দোষে দুষ্ট। কাণ্ট বলেন, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার আগে, কি রকম পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া নির্ধারণ কর; আমরা জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝি, তাহা কি রকম অবস্থায় সম্ভবপর হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহ আগে বিচার করিয়া দেখ। 'দার্শনিক চিন্তার এই রকম পদ্ধতিকে[২] তিনি "সবিচার পদ্ধতি"[৩] এই আখ্যা দিতে চান। এই পদ্ধতির সারমর্ম এই যে, বস্তুসম্বন্ধে, সম্ভবপর, একথা নির্বিচারে শুধু ধরিয়া লইব না, কি রকম অবস্থায়, কতদূর আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব, তাহা আগে বিচার করিয়া দেখিব।

১। **Dogmatism** ২। **Method** ৩। **Critical Method**

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংবেদনিক আকার[১]—দেশ ও কাল

আমরা দেখিয়াছি, কাণ্টের মতে জ্ঞানে আমরা যাহা পাই, যে বিষয়কে আমরা জানি, তাহা জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নয়। বিষয় আমাদের জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু জ্ঞেয় বিষয় আমাদের জ্ঞানসাপেক্ষ একথার অর্থ কি? বিষয় বলিতে যদি জ্ঞানের বিষয়ই বুঝি, তাহা হইলে জ্ঞান না থাকিলে যে বিষয়ের বিষয়ত্ব থাকে না, একথা ত অতি সহজেই বোঝা যায়। তবে বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ এই কথা বলিয়া কাণ্ট্ বিশেষ কি বলিলেন?

উপরোক্ত অর্থে আমরা যখন বলি, বিষয় জ্ঞানসাপেক্ষ, তখন আমরা এই মাত্র বুঝি, বিষয়কে জানিতে গেলে জ্ঞানের দরকার; শুধু জ্ঞাত হইবার জন্য বিষয় জ্ঞানের অপেক্ষা করে, আর কিছুর জন্য নয়। আমরা বিষয়ে যাহা কিছু জানি, তাহা সবই বস্তুগত গুণধর্ম; শুধু জ্ঞাততাটুকু বিষয় জ্ঞান হইতে পায়। কাণ্ট্ কিন্তু শুধু এই কথাই বলিতেছেন না। তিনি বলেন, জ্ঞাততা ছাড়াও বিষয়ের অত্যাবশ্যক অনেক রূপ আছে, যাহার জন্য বিষয় আমাদের জ্ঞানশক্তির কাছে ঋণী। তিনি অবশ্য বলেন না যে, আমাদের জানার উপরই বিষয়ের অস্তিত্ব নির্ভর করে। তিনি শুধু বলেন, বিষয়কে আমরা যে যে রূপে জানিয়া থাকি, এবং যে সব রূপকে বস্তুগত বলিয়া মনে করি, তাহার অনেকগুলিই বস্তুগত নয়। আমাদের বুদ্ধিগত রূপই বিষয়ে ভাসে, জানিবার প্রকারকেই বস্তুর ধর্ম বলিয়া মনে করি। আমাদের জ্ঞানশক্তি হইতে বিষয় কি কি রূপ পাইয়া থাকে, তাহা কাণ্ট্ একে একে দেখাইয়াছেন।

আমাদের জ্ঞানশক্তির মধ্যে দুই প্রকারের ভেদ কাণ্ট্ করিয়াছেন। এক সংবেদনশক্তি[২], আর দ্বিতীয় বোধশক্তি বা বুদ্ধি[৩]। সংবেদনশক্তির কথাই প্রথমে আলোচনা করা যাউক। এই শক্তি আপনা হইতে আমাদের জ্ঞানে নূতন কিছু দিতে পারে না। আমাদের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া হইতে

১। Forms of Sensibility

২। Sensibility

৩। Understanding

এই শক্তির বলে নানা রকমের ভান আমাদের মনে জাগিতে পারে মাত্র। এই জন্য কাণ্ট্ সংবেদন শক্তিকে পরতঃক্রিয়া[১] বলিয়াছেন। শুধু ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতে যে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানই সংবেদনশক্তির কাজ। সে ভান বা ভানের যে অংশ আমাদের উপর বাহ্যপদার্থের ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহাকেই সংবেদন[২] বলা হইতেছে। এই সংবেদনের দ্বারাই আমাদের বিষয়ের সাক্ষাৎকার বা অনুভব[৩] হয়। আমরা বুদ্ধিতে অনেক কিছুরই কল্পনা করিতে পারি, এবং অনুমানের দ্বারা অনেক দূরের পদার্থও জানিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ সাক্ষাৎকার বা অনুভব হয় না। আমাদের পক্ষে বিষয়ের সাক্ষাৎকার বা অনুভব একমাত্র সংবেদনের দ্বারাই হইতে পারে। ভগবানের পক্ষে সংবেদন ব্যতিরেকে শুধু, বুদ্ধির দ্বারাই, বিষয়ের অনুভব হইতে পারে। আমাদের বেলায় কিন্তু অনুভব মাত্রই সাংবেদনিক বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব।

সংবেদনশক্তি সম্বন্ধে দুইটি কথাই মুখ্যভাবে জানিতে হইবে; প্রথম কথা, এই শক্তি নিজের থেকে কিছু দিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, সংবেদনশক্তির বলেই বিষয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার হইতে পারে। জ্ঞানের বিষয় আমরা সংবেদনের দ্বারাই পাইয়া থাকি। এই সব বিষয়ে বোধশক্তি বা বুদ্ধির[৪] সহিত সংবেদনশক্তি বা সংবেদনার[৫] খুবই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংবেদনা যেখানে বাহির হইতেই কিছু নিতে পারে[৬], বুদ্ধি সেখানে নিজের থেকেই কিছু দিতে পারে। বুদ্ধির ক্রিয়া আপনা থেকেই হয় বলিয়া বুদ্ধিকে স্বতঃক্রিয়[৭] বলা যাইতে পারে।

সংবেদনার দ্বারা বিষয়কে পাইলেও, বিষয় যে কি তাহার নিরূপণ বা অধ্যবসান বুদ্ধি দ্বারাই হইয়া থাকে। ধরা যাউক, আমার সামনে একটি সবুজ পাতা রহিয়াছে। আমি চোখ মেলিয়া দেখিয়া সবুজ পাতা বলিয়া জানিলাম। সবুজ পাতাই এখানে আমার জ্ঞানের বিষয়। সবুজ পাতাকে যে জ্ঞানে পাইলাম তাহা সাংবেদনিক বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের দ্বারাই পাইলাম। চোখ মেলিয়া দেখিয়াছি বলিয়াই, আমার সামনে পাতা রহিয়াছে বলিয় জানিয়াছি। কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে একথা জানা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং সংবেদনের দ্বারা যে জ্ঞানের বিষয় পাই,

১। Receptive ২। Sensation ৩। Intuition ৪। Understanding
৫। Sensibility ৬। Receptive ৭। Spontaneous

একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা কতটুকু পাইলাম? 'সবুজ পাতা' এই জ্ঞানে বুদ্ধির নিজের থেকে কিছু দান আছে কি?

আমাদের কাছে এখন এমন মনে হয় যেন 'সবুজ পাতা' সবটাই ইন্দ্রিয়ানুভব হইতে পাইয়াছি। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। চোখ দিয়া না দেখিলে, সবুজ পাতা বলিয়া বোঝা যাইত না, একথা খুবই সত্য। কিন্তু শুধু চোখেই একথা বলিয়া দিতে পারে না যে, যাহা দেখিতেছি, তাহা একটি সবুজ পাতা। শুধু চোখের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, নবজাত শিশুর বা পশুপক্ষীর চোখে যাহা দেখা যাইবে, আমার চোখেও তাহাই দেখা যাইবে। তাহারা যেমন সবুজ পাতা বলিয়া না বুঝিতে পারে, আমার চোখও তেমনি দৃশ্যবস্তুকে সবুজপাতা বলিয়া নিরূপণ করিতে পারে না। চোখ ত শুধু রং ও আকারই দেখিতে পারে, চোখ দিয়া শুধু 'রঙীন একটা কিছু' বুঝিতে পারা যাইবে। একটা বিশিষ্ট রংএর, বিশিষ্ট আকারের একটি পদার্থ সামনে রহিয়াছে, একথা চোখ বলিতেও পারে, কিন্তু, রংটা যে সবুজ এবং পদার্থটা যে পাতা, তাহা চোখ বলিতে পারে না। তার জন্য বুদ্ধির দরকার। কেন বুদ্ধির দরকার?

সবুজ বলিতে যে রং বুঝায়, তার চাক্ষুষ অনুভব, নিশ্চয়ই চোখ দিয়া হইতে পারে। কিন্তু চাক্ষুষ অনুভবে যাহা পাইলাম, তাহকে যখন 'সবুজ' আখ্যা দেই, তখন আমাদের মন চাক্ষুষ অনুভবে যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, ততটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। সবুজ বলিতে ঠিক এখনই যাহা অনুভব করিলাম, শুধু তাহাই বুঝায় না; ঠিক এই মাত্র যাহার অনুভব হইল, এবং যাহা কেবল এই অনুভবেই আবদ্ধ, তাহার হয়ত কোন নামই দেওয়া যায় না। সবুজ বলিতে বাস্তবিক এক প্রকারের বর্ণসামান্যকে বুঝায়, এবং সেই বর্ণসামান্য সবুজ পাতায় যেমন আছে, সবুজ ঘাসেও তেমনি আছে, অন্যান্য সবুজ পদার্থেও আছে। যখন কোন বিষয়কে সবুজ নাম দেই, তখন বহু পদার্থে বিদ্যমান এই বর্ণসামান্যের কথাই আমাদের মনে আসে। কোন বস্তুকে সবুজ নাম দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঐ বস্তুকে আমাদের পূর্বদৃষ্ট সবুজ পদার্থ রাশির শ্রেণীভুক্ত করিয়া তুলি; অর্থাৎ এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাকে তজ্জাতীয় যাহা কিছু আগে দেখিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দেই। এই নাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সামান্য জ্ঞান হয়, বা এককে যে বহুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা চোখের কাজ নয়। চোখের সামনে

শুধু একটি পদার্থই রহিয়াছে, তাহারই জ্ঞান চোখের দ্বারা হইতে পারে। সামান্য জ্ঞানে এককে যে-বহুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সে-বহু চোখের সামনে নাই, এবং এককে বহুর বা অন্যের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া চোখের কাজ নয়। বুদ্ধির দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

সবুজ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা পাতার বেলায়ও খাটে। পাতা বলিতেও একটি সামান্য পদার্থ বুঝায়, এবং সেই সামান্যজ্ঞান চোখের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। শুধু এইই নহে। যখন, বলি 'সবুজ পাতা', তখন আমরা বুঝি, পাতা একটা দ্রব্য[১] এবং তাহাতে সবুজ নামক গুণ[২] রহিয়াছে। পাতাকে দ্রব্য এবং সবুজকে গুণ বলিয়া না বুঝিলে সবুজ পাতা বলিতে আমাদের কিছু বোঝা হয়, বলা যায় না। কিন্তু এই দ্রব্য ও গুণের কল্পনা চোখ তৈরি করিয়া দিতে পারে না, বুদ্ধিনির্মাণ বলিয়াই মানিতে হয়। দ্রব্য ও গুণের কল্পনা বুদ্ধি নিজ হইতেই দিয়া থাকে। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে যে ভেদ ও সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে ভেদ ও সম্বন্ধ ঠিক চোখ দিয়া দেখি বলিতে পারা যায় না। বুদ্ধিদ্বারাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

আশা করি, 'সবুজ পাতা' এই চাক্ষুষ জ্ঞানেও বুদ্ধির কতটুকু কাজ ও দান রহিয়াছে, অনেকটা স্পষ্ট হইয়াছে। কাণ্টের মতে বুদ্ধি ও সংবেদনার যোগেই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। শুধু একটির দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান হয় না। সংবেদনের দ্বারা কোন বিষয়ের অনুভব[৩] বা সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যদি সামান্যজ্ঞান[৪] না থাকে, তাহা হইলে সে সাক্ষাৎকার ত অন্ধ। চোখ দিয়া রং একটা কিছু দেখিলাম বটে, কিন্তু তাহাকে যদি লাল, সবুজ, পীত বা অন্য কিছু বলিয়া না বুঝিলাম তবে কি জানিলাম? লাল, সবুজ বা পীত বলিয়া বোঝাই সামান্যজ্ঞানের বিষয় করা। সামান্যজ্ঞান ছাড়া যেমন অনুভব স্পষ্ট বা পরিষ্কার হয় না, তেমনি অনুভব ছাড়াও সামান্যজ্ঞানে স্পষ্ট অর্থ হয় না। যে সামান্যের অনুভবযোগ্য বিশেষ রূপ চোখের সামনে, অন্ততঃ মানস চোখের সামনে, ভাসে না তাহা ত আমাদের কাছে শূন্যাকার মাত্র। সবুজের কল্পনা কখনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না, যতক্ষণ না তাহাকে অনুভবে ধরিতে পারি। তাই কাণ্ট্

১। Substance
২। Quality
৩। Intuition
৪। Concept

বলিয়াছেন, সামান্যজ্ঞান ব্যতিরেকে অনুভব অন্ধ[১], এবং অনুভব ব্যতিরেকে সামান্যজ্ঞানও শূন্যাকার[২]। প্রকৃত জ্ঞানে দুইএরই সমাবেশ চাই। আমরা যখন কিছু জানি, তখন বিশেষের মধ্যেই সামান্যকে জানি অথবা সামান্যের ভিতর দিয়া বিশেষকেই জানি। নিঃসামান্য বিশেষ কিংবা নির্বিশেষ সামান্য কোন প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় হয় না। সামান্যকে পাইতে হইলে বুদ্ধি চাই, আর বিশেষের অনুভব সংবেদনের দ্বারাই হইতে পারে। বুদ্ধির কাজ সংবেদনা দ্বারা হয় না; আর সংবেদনার কাজও বুদ্ধি করিতে পারে না; একথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

আপাততঃ সংবেদন বা সংবেদনজন্য অনুভবই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমাদের অনুভবে বা জ্ঞানে যাহা ভাসে বা প্রতিভাত হয়, তাহাকে অবভাস[৩] বলিতে পারা যায়। এই অবভাসে আকার[৪] ও উপাদান[৫] এই ভেদ করিতে পারা যায়। যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা নিরাকার অবস্থায় প্রতিভাত হয় না। অবভাসের আকারও চাই, উপাদানও চাই। অবভাসের মধ্যে যেটুকু সংবেদনের দ্বারা আমাদের অনুভব আসে, যাহা সংবেদনের অনুরূপ[৬] তাহাকেই উপাদান বলা হইতেছে। যখন একখানা সাদা কাগজ দেখি, তখন সাদা চতুষ্কোণ কিছু আমাদের অনুভবে আসে। সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ানুভব দ্বারা শুধু সাদাটাই পাওয়া যায়; সুতরাং সাদাই হইল এই অনুভবের উপাদান। চতুষ্কোণত্ব তাহার আকার মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে সাকার উপাদানই ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাণ্ট্ বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়ানুভব বা সংবেদন হইতে যাহা পাওয়া গেল, তাহাকে ত উপাদানই বলা হইল, যে আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়া উপাদান আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, সে আকারে ও সংবেদন হইতে আসে না। সে আকার সংবেদন যোগ্য নহে, তাহা প্রথম হইতেই আমাদেয় মনের মধ্যে একপ্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যথাযোগ্য সংবেদন উপলক্ষে আমাদের অনুভূত উপাদান (রূপ, রস, স্পর্শাদি) ঐ আকার ধারণ করিয়া আমাদের সাক্ষাতে প্রতিভাত হয়। যে আকার

১ Blind
২ Empty
৩। Appearance
৪ Form
৫ Matter
Correspond

অনুভব হইতে আসে না, অথচ যে আকার ধারণ করিয়াই আমাদের অনুভূত উপাদান আমাদের কাছে প্রতিভাত হইতে পারে, সে আকারকেও কাণ্ট্ কখন কখন শুদ্ধানুভব[১] বলিয়াছেন।

আমরা দৈশিক ও কালিক পদার্থই অনুভব করিতে পারি। (সংবেদন-জন্য জ্ঞানকেই অনুভব[২] বলা হইতেছে। আমাদের অন্য কোন প্রকারের অনুভব হয় না। ভগবানের সংবেদন ব্যতিরেকে শুধু বুদ্ধির দ্বারাও অনুভব হইতে পারে। মানুষের আন্তর বা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অনুভবই হইতে পারে না।) আমরা যাহা কিছু অনুভব করি তাহা কোন দেশে বা কোন কালেই অনুভব করিতে পারি। কাণ্টের মতে দেশ[৩] ও কাল[৪] আমাদের অনুভবেরই আকার, স্বতন্ত্র বস্তু বা বাস্তব ধর্ম নহে। দেশপরিচ্ছিন্ন ও কালপরিচ্ছিন্ন হইয়াই যে পদার্থসকল আমাদের অনুভবে আসে, তাহা সহজেই বুঝিতে ও স্বীকার করিতে পারা যায়। প্রশ্ন হইতেছে, আমাদের যে দেশবোধ ও কালবোধ হয় বা আছে, তাহা বাহ্য বা আন্তর পদার্থের অনুভব হইতে পাই, না সর্বপ্রকারের অনুভবের আগেই আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে, এবং অন্য পদার্থের অনুভবের সঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া জ্ঞানে ভাসে মাত্র। কাণ্ট্ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন, দেশবোধ বা কালবোধ পদার্থের অনুভব হইতে আসে না, তার আগেই বর্তমান বলিয়া মানিতে হয়।

যাঁহারা বলিবেন অনুভব হইতেই দেশকালের জ্ঞান আমাদের হইয়াছে, তাঁহাদের মানিতে হইবে যে, দৈশিক ও কালিক পদার্থের অনুভব হইতে আমাদের দেশের ও কালের সামান্যজ্ঞান হইয়াছে। দেশের বেলায় বাহ্যানু-ভবের এবং কালের বেলায় আন্তরানুভবের আশ্রয় লইতে হয়; আমরা বাহ্যানুভবে যে সব পদার্থ পাই, তাহারা দেখিতে পাই একের বাহিরে অন্য অথবা পাশাপাশি রহিয়াছে। এই প্রকারের অনুভব হইতেই দেশবোধের উৎপত্তি হয়। আন্তর অনুভবেও দেখিতে পাই, এক অনুভবের পর অন্য অনুভব আসে, এক পদার্থ জানার পর অন্য পদার্থ জানা যায়, কখন কখন একাধিক পদার্থও এক সঙ্গে জানা যায়। এই ক্রম[৫] কিংবা যৌগপদ্য[৬] কালিক ধর্ম। এই ক্রম ও যৌগপদ্যের অনুভব হইতেই কালের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই রকম কথা কেহ কেহ বলিতে পারেন।

১। Pure intuition.
২। Intuition.
৩। Space.
৪। Time.
৫। Succession.
৬। Simultaneity.

কাণ্ট্ বলেন, দেশ ও কালের জ্ঞান এইরকম ভাবে উৎপন্ন হয় না। পূর্ব হইতেই আমাদের যদি দেশবোধ বা কালবোধ না থাকিত, তাহা হইলে দৈশিক বা কালিক পদার্থের অনুভবই সম্ভবপর হইত না। আমাদের বাহ্যানুভবে শুধু দৈশিক পদার্থই পাইয়া থাকি। কোন বস্তু কোন-না-কোন স্থানে আছে, আমরা বাহ্যানুভবে জানিতে পাই। আমাদের দেশবোধ আছে বলিয়াই আমাদের পক্ষে এই রকম সম্ভবপর হয়। দেশ বলিতে যে কিপদার্থ বুঝায়, তার মোটেই কোন বোধ না থাকিলে, দৈশিক পদার্থের অনুভবই সম্ভবপর হইত না। কালের বেলাও ঠিক এই কথাই খাটে। সুতরাং দৈশিক ও কালিক পদার্থের অনুভব হইতে আমাদের দেশবোধ ও কালবোধ জন্মিয়া থাকে, একথা ভুল। প্রথম হইতে আমাদের মনে দেশবোধ ও কালবোধ রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের দৈশিক ও কালিক অনুভব হইতে পারে। ঐ রকম অনুভব হইতে দেশবোধ ও কালবোধ উৎপন্ন হয়, বলা যায় না। কাণ্ট্ একথা বলিতেছেন না যে সব প্রকারের অনুভবের আগেই শুধু দেশের বা শুধু কালের জ্ঞান স্পষ্টভাবে আমাদের হইয়া থাকে। কাণ্ট্ নিশ্চয়ই মানিবেন যে, অন্য পদার্থের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও কালের জ্ঞান হইয়া থাকে। শুধু তাঁহার বক্তব্য এই যে, রূপ-রসাদির জ্ঞান যেমন সংবেদনজন্য দেশ-কালের জ্ঞান সে রকম সংবেদনজন্য নয়, দেশ-কালের অনুরূপ কোন সংবেদনই নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, দেশবোধ বা কালবোধ আমরা বাহির হইতে আহরণ করি না, আমাদের ভিতর হইতেই জ্ঞানে ভাসিয়া থাকে। দেশবোধ ও কালবোধের উৎপত্তি অনুভব হইতে না হইলেও অনুভবেই তাহাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

দেশবোধ ও কালবোধ যে অনুভব হইতে আসে না, সে কথা কাণ্ট্ অন্য যুক্তির দ্বারাও দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, দেশবোধ ও কালবোধ একপ্রকারের অবশ্যম্ভবত্ব[১] রহিয়াছে, এবং যাহা অবশ্যম্ভব, যাহা হইবেই, বা থাকিবেই, তাহার জ্ঞান অনুভব হইতে পাওয়া যায় না। এ কথা আগেও বলা হইয়াছে। দেশবোধ বা কালবোধ যে অবশ্যম্ভব বা অপরিহার্য, তাহা কি করিয়া বোঝা যায়? আমরা দেখি, যাহা অনুভবে পাই, তাহা না থাকিলেও চলে; তাহার অভাব সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়। বস্তুর

১। Necessity

রূপ, রস, গন্ধ আমরা অনুভব হইতে পাই, বস্তুতে সেগুলি না থাকিলেও পারে; অর্থাৎ বস্তুতে আমরা সেগুলির অভাব কল্পনা করিতে পারি। ঐসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ ব্যতিরেকেও বস্তুর কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু দেশ ও কালের অভাবে কল্পনা করিতে পারি না। দেশ ও কালের অভাব ভাবিতে গেলে আমরা জ্ঞানে কিছুই পাই না। যখন অনুভবদত্ত সব কিছুরই অভাব কল্পনা করিতে পারা যায়, কিন্তু দেশকালের অভাব কল্পনা করিতে পারা যায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দেশবোধ ও কালবোধ অনুভব হইতে আসে না। অনুভব হইতে যাহা আসে, তাহা না থাকিলেও চলিতে পারে, অনুভবদত্ত পদার্থ অবশ্যম্ভব বা অপরিহার্য নয়, কিন্তু দেশ কাল জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য, সুতরাং বুঝিতে হইবে, এগুলি অনুভব হইতে আসে না।

দেশ কালের অভাব মোটেই কল্পনা করা যায় না, ঠিক একথা কাণ্টের বক্তব্য নয়। যখন বলি, দেশ কাল কোন বাস্তব পদার্থ নয়, তখন নিশ্চয়ই দেশ কালের অভাব ভাবিয়া থাকি। কিন্তু দেশ কাল থাকিবে না, অথচ কোন প্রকারের অবভাস থাকিবে, এর কল্পনা করিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ-ধর্ম রহিত হইয়া, শুধু দৈশিক বিস্তার নিয়াই, কোন পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এর কল্পনা আমরা করিতে পারি। কিন্তু দেশশূন্য কোন বাহ্য অবভাসের কল্পনাই আমরা করিতে পারি না। কালের বেলাও তাই। শূন্যকাল ভাবিতে পারি, কিন্তু কালশূন্য কোন অবভাসের কল্পনাই সম্ভবপর নয়। আমরা দেখিয়াছি, অবভাসের মধ্যে আমরা যাহা সংবেদন হইতে পাই, তাহাতে কোন প্রকারের অপরিহার্যতা নাই। কিন্তু দেশ ও কাল একেবারে অপরিহার্য। দৈশিক ও কালিক আকার নিয়াই পদার্থ অনুভূত বা প্রতিভাত হইতে পারে। সুতরাং কাণ্ট্ মনে করেন, দেশ ও কাল আমাদের সংবেদনের আকার মাত্র এবং সংবেদনশক্তিতেই অন্তর্নিহিত আছে। আমাদের অনুভবশক্তিই রকমভাবেই গঠিত যে, কোন কিছু আমাদের দ্বারা অনুভূত হইতে হইলে দৈশিক বা কালিক আকার ধারণ করিয়াই অনুভূত হইতে পারে।

কাণ্ট্ আরও দেখাইয়াছেন যে, দেশ ও কাল সামান্যজ্ঞানের বিষয় নয়, অনুভবেরই বিষয়। অনেকগুলি বস্তু দেখার পর আমাদের সামান্যের জ্ঞান[১] হয়। অনেকগুলি ঘট দেখিয়া আমাদের ঘটসামান্যের জ্ঞান হয়। সে রকম

১। General concept

অনেক দেশ ও অনেক কালের অনুভব হইতে আমাদের দেশ ও কালের জ্ঞান হয় না। আমরা যখন নানা দেশ বা নানা কালের কথা বলিয়া থাকি, তখন বাস্তবিক বিভিন্ন দেশ ও কালের কথা ভাবি না। নানা দেশ ও নানা কাল বলিতে একই দেশ ও একই কালের অংশ সমূহের কথাই বুঝিয়া থাকি। এমন নয় যে, এই রকম খণ্ডদেশ ও খণ্ডকালই আগে পাই এবং তাহা হইতে দেশ ও কালের সামান্যজ্ঞান লাভ করি। যেগুলিকে খণ্ডদেশ বা খণ্ডকাল বলিতেছি, সেগুলিকে প্রথমেই পাওয়া যায় না। একই দেশ ও একই কালকে পরিচ্ছিন্ন[১] করিয়াই নানাদেশ ও নানাকালের কল্পনা করিতে হয়। বাস্তবিক দেশ এক, কালও এক। একজাতীয় একাধিক বস্তু না থাকিলে সামান্যজ্ঞান হয় না। সুতরাং দেশ ও কালের জ্ঞান সামান্যজ্ঞান নয়, অনুভব মাত্র। ব্যক্তিকে (অর্থাৎ এককে) অনুভবেই পাওয়া যায়, সামান্য-জ্ঞানে নয়। আগেই যদি খণ্ডকাল বা খণ্ডদেশের জ্ঞান হইয়া পরে সমগ্র কাল বা দেশের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে না হয় দেশকালবোধকে একপ্রকার সামান্যজ্ঞান বলিতে পারা যাইত। কিন্তু এখানে দেখিতে পাই, সমগ্রের-জ্ঞানই আগে আসে এবং তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া অংশের কল্পনা করিতে হয়। এমতাবস্থায় দেশকালবোধকে সামান্যজ্ঞান না বলিয়া অনুভবই বলিতে হয়।

আরেক কথা। দেশ ও কালকে আমরা অনন্ত[২] বলিয়া মনে করি। অনন্ত বলিতে এখানে আমরা মহৎ পরিমাণই[৩] বুঝি। কিন্তু সামান্যের আবার পরিমাণ থাকিবে কি করিয়া? সামান্যকে ত অনেক ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকিতে হয় এবং অনেক ব্যক্তির ছোট বড় বিভিন্ন পরিমাণ হওয়া স্বাভাবিক। এরকম স্থলে সামান্যের কোন বিশিষ্ট পরিমাণ থাকিলে বিভিন্ন পরিমাণের ব্যক্তিতে তার থাকা সম্ভবপর হয় না। অতএব সামান্যের বাস্তবিক কোন পরিমাণই নাই, স্বীকার করিতে হয়। সামান্যের যখন কোন পরিমাণই থাকে না, তখন মহৎপরিমাণবিশিষ্ট দেশকাল যে সামান্যজ্ঞানের বিষয় নয়, তাহা না মানিয়া পারা যায় না।

১। Limited.

২। Infinite.

৩। Infinite magnitude.

ঘট ও ঘটসামান্যের মধ্যে ব্যক্তি ও জাতির সম্বন্ধ, অবয়ব ও অবয়বী বা অংশ ও সমগ্রের[১] সম্বন্ধ নয়। এক ঘটসামান্যই সমান ভাবে বিভিন্ন ঘট বিরাজ করে। কোন ঘট কখনই অংশরূপে ঘটসামান্যের অন্তর্ভূক্ত নয়। দেশ ও কালের বেলায় দেখি, তথাকথিত খণ্ড দেশ বা খণ্ড কাল একই দেশ বা একই কালের অংশ মাত্র। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আমাদের দেশবোধ বা কালবোধ সামান্য জ্ঞান নয়, অনুভব মাত্র। জাতির জ্ঞানই সামান্য জ্ঞান, ব্যক্তির জ্ঞান অনুভবেই পাওয়া যায়।

এপর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা গেল যে দেশকালবোধ অন্য কোন অনুভব হইতে উৎপন্ন হয় না। উহা সব অনুভবের আগেই আমাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে। তথাপি দেশকালবোধ নিজে অনুভবই, সামান্য জ্ঞান নয়। দুইটি কথা জানা গেল, প্রথম কথা—দেশকালবোধ অনুভবজন্য নহে, অনুভবনিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ[২], দ্বিতীয় কথা—দেশকালবোধ সামান্য জ্ঞান নহে, অনুভব।

এখানে দেশকালের যে কল্পনা দেওয়া হইতেছে, তাহা হইতেই, দেশকাল সম্পর্কে আমরা যে সব বিধান করিয়া থাকি, তাহাদের সম্যক্ উপপত্তি হইতে পারে। এই সব বিধাস যৌগিক[৩] এবং তাহা দ্বারা কোন অবশ্যম্ভব বা অবশ্যগ্রাহ্য[৪] কথা ব্যক্ত হইয়া থাকে। দেশ সম্বন্ধে বিধান আমরা জ্যামিতিতে পাই। জ্যামিতির সব বিধান দেশের উপরই লাগে। এই সব বিধান যে যৌগিক ও আবশ্যম্ভবিক[৪] তাহা আগেই দেখা গিয়াছে। জ্যামিতির কোন কথা, কোন জাগতিক ঘটনার মত শুধু সত্য বলিয়া দেখা গিয়াছে এমন নহে; আমরা মনে করি সেকথা সত্য হইতে বাধ্য এবং অবশ্যগ্রাহ্য। দেশবোধ অনুভবনিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ হওয়াতেই দেশ সম্বন্ধে অবশ্যম্ভব কথা বলিতে পারা যায়। দেশবোধ অনুভবজন্য হইলে দেশ সম্বন্ধে অবশ্যম্ভব কোন বিধান করিতেই পারা যাইত না।

আর দেশবোধ অনুভব হওয়াতে ঐ সব বিধানের যৌগিকতার উপপত্তি হয়। ঐ সব বিধানে নূতন কিছু জানা যায় বলিয়াই তাহাদিগকে যৌগিক

১। Part and whole.
২। A *Priori*.
৩। Synthetic.
৪। Necessary.

বলা হয়। দেশবোধ সামান্তজ্ঞান হইলে তাহা হইতে নূতন কিছু জানিতে পারা যাইত না, কেননা সামান্তজ্ঞানকে আমরা শুধু বিশ্লেষণই করিতে পারি, এবং এই বিশ্লেষণের দ্বারা সামান্তজ্ঞানে যাহা আছে, তাহাই পাওয়া যায়, নূতন কিছু পাওয়া যায় না। নূতন কিছু পাইতে হইলে অনুভবের দরকার। দেশবোধ অনুভব বলিয়া দৈশিক বিধানপূর্ণ জ্যামিতি শাস্ত্র হইতে আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

দেশের সম্বন্ধে এখানে যাহা বলা হইল, তাহা কালের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কাল সম্বন্ধেও আমরা যৌগিক বিধান করিয়া থাকি এবং তাহাতে কোন অবশ্যম্ভব কথা ব্যক্ত হইয়া থাকে। বিভিন্ন কাল যে ক্রমিকই[১] হয়, যুগপৎ[২] বিদ্যমান থাকিতে পারে না, কিংবা কালের মধ্যে যে শুধু পূর্বাপর ভেদই থাকে, দেশের মত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থাকে না—এই সব কথা আমরা স্বতঃসিদ্ধের মত ধরিয়া লই। এগুলি যে যৌগিক ও আবশ্যম্ভবিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব কথার উপপত্তি তখনই হইতে পারে যখন আমরা কালবোধকে দেশবোধের মত পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব বলিয়া মানি।

কাল সম্পর্কে কাণ্ট পরিবর্তন[৩] ও গতির[৪] কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কোন বস্তুর পরিবর্তন বুঝিতে হইলে একই বস্তুতে বিভিন্ন অবস্থার কল্পনা করিতে হয়। যে অবস্থাকে 'আছে' বলিয়া ভাবিলাম, তাহাকেই 'নাই' বলিয়া ভাবিতে হয়। গতির বেলাও ঠিক এই রকম। কোন বস্তুর গতির কথা ভাবিতে গেলেই সেই বস্তুর একই যায়গায় 'অবস্থান' ও 'অনবস্থানের' কথা ভাবিতে হয়। যে স্থানে কোন বস্তু আছে বলিয়া ভাবিলাম, সে স্থানে ঐ বস্তুর না থাকার কথা না ভাবিয়া তাহার গতি বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু এই রকম পরস্পরবিরুদ্ধ কথা শুধু বুদ্ধির সাহায্যে ভাবিতেই পারা যায় না। শুধু কালের অনুভবেই এইসব বিরোধের সমাধান হইতে পারে। আমাদের কালের অনুভব আছে বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারি যে, একই অবস্থা বিভিন্ন সময়ে একই বস্তুতে 'আছে' ও 'নাই' হইতে পারে। একই বস্তু যদি বিভিন্ন সময়ে একই স্থানে থাকে ও না থাকে, তাহা হইলে কোন বিরোধ হয় না।

১। Successive.
২। Simultaneous.
৩। Change.
৪। Motion.

জ্যামিতির কথা বা গতিবিজ্ঞানের[১] কথা শুধু কল্পনার কথা নহে, বস্তুতেও সে সব কথা লাগে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অনুভবের আগেই, বস্তুর গুণধর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইতে পারে। অন্ততঃ দৈশিক ও কালিক গুণধর্মের কথা আমরা আগেই বলিয়া দিতে পারি, তার জন্য আমাদের অনুভবের অপেক্ষা করিতে হয় না। জ্যামিতির কথা এবং গতি-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা সব আমরা অনুভব হইতে পাই না, অনুভব হইতে সেই সব কথা জানিতে হইলে তাহাদের মধ্যে কোন প্রকারের আবশ্যম্ভ-বিকতা[২] থাকিত না। আর দৈশিক ও কালিক ধর্ম সম্বন্ধে এই সব পূর্বতঃসিদ্ধ কথা খাটে। ইহা হইতে বোঝা যায় দেশ ও কাল স্বতন্ত্র বাহ্য পদার্থ নয়, আমাদের অনুভবেরই আকার মাত্র। স্বতন্ত্র পদার্থ হইলে অনুভব ব্যতিরেকে দেশ কাল সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারা যাইত না। একভাবে দেশকালকে জ্ঞাতারই ধর্ম[৩] বলিতে পারা যায়। আমরা এমন ভাবেই গঠিত, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান শক্তিই এবম্বিধ, যে কোন বস্তুকে অনুভব করিতে হইলে, তাহাকে দৈশিক ও কালিক আকার দিয়াই আমরা অনুভব করিতে পারি। দৈশিকতা ও কালিকতা বস্তুর ধর্ম্ম নহে, আমাদের অনুভবেরই প্রকার মাত্র।

দেখা গেল দেশ ও কাল স্বতন্ত্র বস্তু নয়, স্বতন্ত্র বস্তুর ধর্ম্মও নয়। স্বতন্ত্র বস্তু হইলে বা স্বতন্ত্র বস্তুর ধর্ম্ম হইলে দেশ কাল সম্বন্ধে অনুভবের আগে কিছু বলিতে পারা যাইত না। স্বতন্ত্র বস্তু হইবে বা স্বতন্ত্র বস্তুর ধর্ম্ম হইবে, অথচ অনুভব না করিয়াই সেই সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারিব, ইহা অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, দেশ কাল সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহে পূর্বতোবিধান করিতে পারি। সুতরাং বুঝিতে হইবে দেশ কাল স্বতন্ত্র কিছু নয়।

যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়াও নিতে চাই, দেশ কাল স্বতন্ত্র কিছু, তবুও দেখি, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কোন বোধযোগ্য কল্পনাই করিতে পারি না। দেশ কাল বলিতে ত দৈশিক ও কালিক বস্তু বুঝায় না, এই সব বস্তু যাহাতে আছে, তাহাকেই দেশ কাল বলি। কিন্তু অন্য সব বস্তু সরাইয়া ফেলিলে দেশ বা কাল বলিতে এক বিশাল অবস্তু[৪] ছাড়া আর কিছুই থাকে না। দেশ

১। Mechanics.

২। Necessity.

৩। Subjective.

৪। *Unding* = nothing.

যেন পার্শ্বহীন, তলহীন আধার; কাল যেন তীরহীন, জলহীন স্রোতস্বিনী। এগুলি বস্তু হিসাবে কি? কিছুই নয়।

সুতরাং দেখিতেছি, স্বতন্ত্র বস্তুরূপে দেশ কালের অস্তিত্ব খুঁজিতে যাওয়া নিরর্থক। আমাদের মাঝেই আমাদের জ্ঞানের আকার রূপে তাহারা বিদ্যমান। বাহ্য কোন পদার্থ অনুভব করিতে গেলে দৈশিক আকারেই আমাদের অনুভব করিতে হয়। আন্তর কোন পদার্থ অনুভব করিতে গেলে কালিক আকারেই অনুভব করিতে হয়। কালিক ভাবে অনুভব করার অর্থ এখানে ক্রমিক ভাবে,[১] অর্থাৎ একটার পর আর একটার, অনুভব করা। সাক্ষাৎ ভাবে কালই আন্তর অনুভবের আকার; বাহ্য অনুভবকেও, বিচার করিয়া দেখিলে, পরিশেষে আন্তর প্রত্যয়ে পর্যবসিত করিতে হয়। অন্ততঃ আন্তর অনুভব ব্যতিরেকে বাহ্য কোন অবভাসেরই জ্ঞান হয় না। সুতরাং পরোক্ষভাবে বাহ্য অনুভবের জন্যও কালের প্রয়োজন। অতএব এক অর্থে কালকে আন্তর ও বাহ্য সব অনুভবেরই আকাররূপে, এবং দেশকে শুধু বাহ্য অনুভবের আকাররূপে মানিতে পারা যায়।

দেশকাল বলিয়া স্বতন্ত্র বস্তু নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশকালের ভান[২] বা প্রত্যয় ত রহিয়াছে। এই প্রত্যয় মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক বলিবার কোন কারণ নাই। রজ্জুকে যখন সর্প বলিয়া দেখি, তখন সর্পজ্ঞান ভ্রান্ত বলিয়া বলা যায়। সর্পজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিবার কারণ এই যে, এই মুহূর্তে যাহাকে সর্প বলিয়া জানিলাম, পর মুহূর্তে তাহাকেই রজ্জু বলিয়া দেখিলাম; আমি যাহাকে সর্প বলিয়া দেখিতেছি, অন্যেরা তাহাকে রজ্জু বলিয়া দেখিতেছে। দেশকালবোধ কিন্তু মোটেই এই রকম নয়। এই মুহূর্তে দৈশিক ও কালিকাকারে আমার পদার্থের জ্ঞান হইল, আর পরবর্তী মুহূর্তে দৈশিক ও কালিক আকার ছাড়িয়াই আমার পদার্থের জ্ঞান হইতে লাগিল, এ রকম কখনও হয় না। অথবা আমি শুধু পদার্থসমূহ দেশকালে দেখিতেছি, অন্যেরা সে রকম দেখিতেছে না, এ রকমও বস্তুস্থিতি নয়। দেশ-কালবোধে আমার ব্যক্তিগত কোন দোষগুণের পরিচয় পাওয়া যায় না; দেশকালবোধ সাধারণ মানব বুদ্ধিরই ধর্ম। আমাদের সাধারণ মানবীয় বুদ্ধিরই গঠন এই রকম যে, আমাদের কাছে কিছু প্রতিভাত হইতে হইলে

১। Successively.

২। Vorstellung—representation, Idea.

শুধু দেশকালেই প্রতিভাত হইতে পারে। দৈশিক বা কালিক আকার ব্যতিরেকে কোন পদার্থের অনুভবই আমাদের হয় না। সুতরাং রজ্জুস্থলে সর্পজ্ঞানকে যে রকম মিথ্যা বলিতে পারা যায়, দেশকালবোধকে সে রকম মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক বলিতে পারা যায় না।

বিষয় যদি আছে বলিয়া মনে করি, তবে দেশকালকে আছে বলিতে হয়; কেননা বিষয় ত শুধু দৈশিক ও কালিক আকার নিয়াই বিষয়রূপে দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং আমাদের লৌকিক বা প্রাকৃত জ্ঞানে দেশকালকে বাস্তব[১] বলিয়াই মানিতে হয়। এই অর্থেই কাণ্ট্ বলিয়াছেন, দেশকালের প্রাকৃত বাস্তবতা[২] রহিয়াছে। কিন্তু আমরা আগে দেখিয়াছি, দেশকাল স্বতন্ত্র বস্তু বা বস্তুর ধর্ম নহে, মানবীয় জ্ঞানের আকার মাত্র। সুতরাং প্রাকৃত জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলে, দেশকালকে বাস্তব না বলিয়া জ্ঞানিক[৩] বলিয়াই মানিতে হয়। এই অর্থেই কাণ্ট্ দেশকালের অপ্রাকৃত জ্ঞানিকতার[৪] কথা বলিয়াছেন। বেদান্তের ভাষায় বলিতে পারা যায়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেশকাল সত্য বটে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। বৈদান্তিক কল্পনা সর্বতোভাবে কাণ্টীয় কল্পনার সঙ্গে খাপ নাও খাইতে পারে, সেই জন্য এখানে যেমন বলা হইল দেশকালের প্রাকৃত বাস্তবতা এবং অপ্রাকৃত জ্ঞানিকতা রহিয়াছে, এই বলিলেই চলিবে। কাণ্ট্ দেশকালের যে রকম কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে দেশকালকে বিষয়গত[৫] এবং জ্ঞানগত[৬] দুইই বলা চলে। দেশকাল বিষয়গত রূপ এই জন্য যে, দেশকাল ছাড়া কোন বিষয়ই প্রতিভাত হইতে পারে না। দৈশিক ও কালিক আকার ছাড়িয়া দিলে বিষয়ের বিষয়ত্বই থাকে না। অপর দিকে আবার দেশকাল বিষয়কে জানিবার আমাদের জ্ঞানেরই এক প্রকার মাত্র। বিষয়কে আমরা দৈশিক ও কালিক আকারেই জানি। ইহা আমাদের মানবীয় জ্ঞানেরই এক বিশিষ্ট ধর্ম মাত্র। আমাদের জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলে দেশকাল বলিয়া কিছুই থাকে না, কেননা দেশকাল আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু নয়।

১। Real.
২। Empirical reality.
৩। Ideal.
৪। Transcendental ideality.
৫। Objective.
৬। Subjective.

দেশকালের জ্ঞানিকতা বুঝিবার জন্য দেশকালকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। কাণ্টের মতে (এবং আরও অনেকের মতে) রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি যে সব গুণ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করিয়া থাকি সেগুলি বস্তুগত ধর্ম নয়; আমাদের ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রিয়ের গঠনের উপর তাহারা নির্ভর করে। বিভিন্ন লোকের ইন্দ্রিয়-শক্তি বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। যে বস্তুকে একজন সাদা বলিয়া দেখিল সেই বস্তুকেই অন্য ব্যক্তি অবস্থা বিশেষে পীত বলিয়া দেখিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে এই রকম বৈয়ক্তিক ভেদ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশকালের জ্ঞান বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন প্রকার হয় না। সকল মানুষেরই দেশকালবোধ এক প্রকার। রূপ, রস, স্পর্শাদি আমাদের দৈহিক গঠনের উপরই নির্ভর করে এবং প্রত্যেক মানুষেরই দেহ রচনা অল্পাধিক পরিমাণে বিভিন্ন হওয়াতে, রূপরসাদিবোধও বিভিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু দেশকালবোধ আমাদের জ্ঞানশক্তির উপর নির্ভর করে এবং জ্ঞানশক্তি সকলের মাঝেই একই রূপ থাকাতে আমাদের সকলের দেশকালবোধ একই প্রকার। আরেক কথা, আমরা কল্পনাতে যদি রূপরসাদি সরাইয়া ফেলি[১] তাহা হইলে বিষয় 'নাই' হইয়া যায় না। কিন্তু যখন দেশকাল সরাইয়া ফেলি, তখন কোন বিষয়ই থাকে না।

কাণ্টের মতে, তিনি যে দেশকালের কল্পনা দিয়াছেন, তাহাতে সব বিষয়ের যে রকম উপপত্তি হয়, অন্য কোন কল্পনাতে তেমন হয় না। তাঁহার সময় নিউটন ও লাইব্‌নিট্‌সের মতেরই প্রাধান্য ছিল। দেশকাল সম্বন্ধে নিউটনের বা লাইব্‌নিট্‌সের যাঁহারই মত গ্রহণ করি না কেন, কাণ্ট্‌ দেখাইয়াছেন, কোন না কোন অনুপপত্তি থাকিয়া যায়। নিউটনের মতে দেশ ও কাল দুইটি সর্বব্যাপক স্বতন্ত্র বাস্তব পদার্থ। তাহাদের মধ্যেই সব কিছু থাকে, অর্থাৎ তাহারা সর্বাধার এবং অনন্ত ত বটেই। ধরিয়া লইলাম তাহাদের মধ্যে সব কিছুই থাকে, কিন্তু তাহারা নিজে কি?—কিছুই ত নয়। নিউটনের মতে দুইটি স্বতন্ত্র ও অনন্ত বাস্তব অবস্তুর[২] সত্তাই মানিতে হয়। নিউটনের মতের গুণ এই যে, এই মতে গণিতের পূর্বতো-জ্ঞান সম্ভবপর হয়। দেশ সর্বাধার হওয়াতে, অর্থাৎ সব পদার্থকেই দেশে

১। **Abstract.**
২। **Nonentity.**

থাকিতে হয় বলিয়া, জ্যামিতির সব কথা (দৈশিক বিধান) অবাধে তাহাদের উপর লাগিতে পারে। সুতরাং অনুভবের আগেই পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইতে পারে। লাইব্‌নিট্‌স্‌ স্বতন্ত্র বাস্তব দেশকাল মানিতেন না। তাঁহার মতে আমাদের বস্তু বিষয়ক অস্পষ্ট অনুভব হইতে দেশকালবোধ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং দেশকাল আনুভবিক বা অনুভবসাপেক্ষ পদার্থ। কাজে কাজেই দৈশিক ও কালিক বিধান শুধু আমাদের অনুভবের ভিতরেই লাগিতে পারে, বা সত্য হইতে পারে। সব পদার্থের উপর লাগিবে, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। সুতরাং এই মতে৷ গণিতের পূর্বতো-জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে না। যে দেশকাল নিয়া গণিতের কারবার তাহাদের সত্তাই যখন অনুভব সাপেক্ষ, তখন গণিতের কথা অনুভবের আগে বা বাহিরে সর্বত্রই লাগিবে এমন কথা বলা যায় না। তবে লাইব্‌নিট্‌সের মতের একটা গুণ এই যে এই মতে দেশকালপরিচ্ছেদ-রহিত অতীন্দ্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইতে কোন বাধা থাকে না। দেশকালকে যখন মুক্তকণ্ঠে অনুভবের ভিতরেই স্থান দেওয়া হইল, তখন বস্তু মাত্রেরই যে দেশপরিচ্ছেদ বা কালপরিচ্ছেদ থাকিবে, তাহা বলা চলে না। সুতরাং দেশকালাতীত বস্তুর (যথা ভগবানের) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমাদের আপত্তি থাকিতে পারে না। নিউটনের মতে এই গুণ পাই না। তিনি যখন দেশকে সর্বব্যাপী ও অনন্ত বাস্তব বস্তু বলিয়া মানিলেন, তখন তাঁহার মতে দেশের বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। অতএব তাঁহার মতে অতীন্দ্রিয় দেশপরিচ্ছেদরহিত পদার্থই মানা চলে না। দেশপরিচ্ছেদ ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভবপর নহে, এমন কি ভগবানেরও নয়, কেননা দেশ যদি বাস্তব ও সর্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত তিনি অতিক্রম করিতে পারিবেন না। কাণ্ট্‌ বলেন তাঁহার মতে, উপরোক্ত দুই মতের দোষ নাই, অথচ গুণ রহিয়াছে। যৌগিক পূর্বতোবিধান[১] কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা তিনি দেখাইয়াছেন, অথচ তিনি দেশকালপরিচ্ছেদরহিত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানেরও যায়গা রাখিয়াছেন। কেননা তাঁহার মতে দেশকালপরিচ্ছেদ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভবেই লাগে, অন্যত্র নয়।

১। Synthetic a *priori* judgment.

তৃতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধিক প্রকার

কাণ্টের মুখ্য প্রশ্ন, পূর্বতোজ্ঞান কি করিয়া সম্ভবপর হয়। প্রকৃত জ্ঞান অনুভব ও বুদ্ধির যোগেই হইয়া থাকে। আমরা অনুভবের বিচার পূর্ব অধ্যায়ে করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি দেশ ও কাল আমাদের সংবেদন জন্য অনুভবেরই আকার মাত্র, বাস্তব পদার্থ নয়। কোন কিছু জানিতে হইলে অনুভবের দরকার, এবং অনুভব শুধু দৈশিক ও কালিক রূপেই সম্ভবপর হয়। সুতরাং কোন বিষয় জানিবার আগেই আমরা বলিতে পারি, সে বিষয় দেশে ও কালে থাকিবে। দেশপরিচ্ছেদ বা কালপরিচ্ছেদ না থাকিলে কোন বিষয় অনুভবই করা যায় না, এবং অনুভব না করিয়া জানাও যায় না। অতএব আমরা বলিতে পারি, আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার দৈশিক ও কালিক রূপ থাকিবেই। আর দেশকালের জ্ঞান আমাদের বাহির হইতে আহরণ করিতে হয় না, আমাদের মাঝেই পূর্বতোভাবে[১] বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে এই অর্থে বিষয় সম্বন্ধে পূর্বতো-জ্ঞান কিরূপে সম্ভবপর, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। কোন বিষয় জানিবার বা অনুভব করিবার আগেই আমরা বলিতে পারি, তাহার দৈশিক বা কালিক আকার থাকিবে, এবং দৈশিক ও কালিক আকার বলিতে কি বুঝায়, তাহাও আমরা পূর্ব হইতেই জানি। সুতরাং অনুভবের দিক দিক দিয়া পূর্বতোজ্ঞানের উপপত্তি হইল।

কিন্তু শুধু অনুভবের দ্বারাই আমাদের জ্ঞান হয় না। চারি দিক হইতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের মনের উপর সর্বদাই অজস্র ছাপ পড়িতেছে। শুধু সংবেদনের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়, শুধু এক বহুত্বময়[২] বিশৃঙ্খলারই[৩] ধারণা জন্মিতে পারে মাত্র।

১। *A priori.*

২। **Manifold.**

৩। **Chaos.**

সংবেদনের দ্বারা আমাদের যে বহুতার[১] ভান হয়, তাহাকেই যথাযোগ্য-ভাবে বুদ্ধির দ্বারা সুসম্বদ্ধ করিয়া আমরা বিষয়ে পরিণত করি, সংবেদন-লব্ধ বহুতা বুদ্ধিজন্য বিষয়রূপ ধারণ না করিলে আমাদের বাস্তবিক কোন জ্ঞান হয় না। এখন প্রশ্ন হইবে, সংবেদনলব্ধ বহুতাকে বুদ্ধি কি করিয়া বিষয়রূপে পরিণত করে? ইহার উত্তরে এই বুঝিতে হইবে যে, যে বহুকে আমরা সংবেদনের দ্বারা পরপর বা এক সঙ্গেই অসম্বদ্ধ অবস্থায় পাই, বুদ্ধি তাহাতে সুসম্বদ্ধ করিয়াই বিষয় সৃষ্টি করে। এই উত্তরের মূল কথা এই, সম্বন্ধ জ্ঞান সংবেদনের দ্বারা হয় না, বুদ্ধির দ্বারাই হইতে পারে। আমাদের যখন কমলালেবুর জ্ঞান হয়, তখন সংবেদনের দ্বারা তার রূপ রস প্রভৃতির জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে কমলালেবুর মধ্যে দ্রব্যগুণ-সম্বন্ধে বা গুণগুণি-সম্বন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে, সে জ্ঞান সংবেদনের দ্বারা হয় না। দ্রব্যগুণ-সম্বন্ধের অনুরূপ আমাদের কোন সংবেদনই নাই; এ-সম্বন্ধ আমরা শুধু বুদ্ধির দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারি। সুতরাং সংবেদনের দ্বারা আমরা যে বহুতাকে পাই, তাহাকে যথাযথ ভাবে বুদ্ধিদ্বারা সুসম্বদ্ধ করিলেই বিষয় তৈরী হয়। বুদ্ধি কিন্তু যে কোন ভাবে যে কোন ধারায় সম্বদ্ধ করিতে পারে না। অনুভবের যেমন দেশকালই আকার, (অনুভব বলিতে সংবেদনরূপ বা সংবেদনজন্য অনুভবই এস্থলে বুঝিতে হইবে) অর্থাৎ কোন কিছু অনুভব করিতে হইলে যেমন দৈশিক ও কালিক রূপেই অনুভব করিতে হয়, বুদ্ধিও তেমনই কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারেই অনুভবলব্ধ পদার্থকে সম্বদ্ধ করিতে পারে। দেশকাল যেমন বাহ্য কোন বাস্তব পদার্থ নয়, তাহাদিগকে যেমন মানব মনেরই এক রকম ধর্ম বলিতে পারা যায়, তেমনি যে সব বিশিষ্ট প্রকারে বুদ্ধি অনুভবলব্ধ বহুতাকে সম্বদ্ধ করিয়া বিষয় রূপে পরিণত করে, সে সব প্রকারও বুদ্ধি বাহির হইতে আহরণ করে না, সেগুলি বুদ্ধিরই নিজস্ব ধর্ম, বুদ্ধি হইতেই তাহাদের উদ্ভব, এবং অনুভূত পদার্থে তাহারা অর্পিত বা প্রযুক্ত হইয়া বিষয়ের রূপ প্রদান করে। বুদ্ধ্যর্পিত সম্বন্ধের জোরেই অনুভূত পদার্থের বিষয়ত্ব নিষ্পন্ন হয়।

আমরা অনেক আগেই দেখিয়াছি, আমাদের অনুভব শক্তি পরতঃক্রিয় এবং বুদ্ধিশক্তি স্বতঃক্রিয়, অর্থাৎ কোন কিছু অনুভব করিতে হইলে বাহ্য-

১। Manifold.

পদার্থের উপর আমাদের নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু শুধু বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার জন্য আবার বাহিরের সাহায্যের দরকার হয় না। বুদ্ধিক্রিয়া আপনা হইতেই চলিতে পারে। সুতরাং যে সব বিশিষ্ট প্রকারে সুসম্বদ্ধ করিয়া বুদ্ধি বিষয়কে বুঝিয়া থাকে, সেগুলির জন্য বুদ্ধি অন্য কাহারও কাছে ঋণী নয়, সেগুলি বুদ্ধির নিজেরই ধর্ম বলিতে পারা যায়। এই সব কথা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারেই সম্বদ্ধ হইয়া যদি কোন কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে এবং এই সব প্রকার যদি আমাদের বুদ্ধিরই ধর্ম হয়, তাহা হইলে ত কোন কিছু জানার আগেই আমরা বিষয় সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিতে পারিব। কেননা আমাদের বুঝিবার প্রকারের উপরই যখন বিষয়ের স্বরূপ নির্ভর করে, তখন আমাদের বুদ্ধিশক্তির পরীক্ষা দ্বারা আমরা যদি সেই সব প্রকার নিরূপণ করিয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে ত কিরূপ পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইবে, তাহা অনায়াসেই বলিতে পারিব। এই জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ানুভবের মোটেই কোন দরকার হয় না। সম্পূর্ণ পূর্বতোভাবেই এই জ্ঞান আমরা পাইতে পারি। তাই কাণ্ট্‌ তাঁর মুখ্য প্রশ্নের সমাধানের জন্য, অর্থাৎ পূর্বতোজ্ঞানের উপপত্তির জন্য, বুদ্ধিশক্তির পরীক্ষা দ্বারা, আমাদের বিষয় জ্ঞানের মূলে যে সব বৌদ্ধিক প্রকার নিহিত আছে, সেগুলি নিরূপণের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি অনুভবলব্ধ বহুতাকে কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ করিয়া বুদ্ধি বিষয়রূপে পরিণত করে। একথার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে, কি প্রকারের সম্বন্ধের কথা বলা হইতেছে এবং বিষয় বলিতে এখানে বাস্তবিক কিরকম পদার্থ বুঝিতে হইবে, তাহা আমাদের ভাল করিয়া বোঝা উচিত।

প্রথমে বিষয়ের কথাই বিবেচনা করা যাউক। বিষয় বলিতে জ্ঞানের বিষয়ই বুঝিতে হইবে। আর জ্ঞান বলিতে কাণ্ট্‌ সাধারণতঃ প্রাকৃত জ্ঞানই[১] বুঝিয়া থাকেন। ঘটপট, ঘরবাড়ী, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়পর্বত, গ্রহতারা, চন্দ্রসূর্য প্রভৃতি যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাকেই প্রাকৃত বা লৌকিক জ্ঞান বলা হইতেছে। (এই জ্ঞানকেই সুসঙ্গত ও সুসম্বদ্ধ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা যায়[২]।) প্রাকৃত জ্ঞানে এই সব

১। **Empirical Knowledge.**
২। **Scientific Knowledge.**

পদার্থকে আমরা এক প্রকৃতির অঙ্গভূত বলিয়াই মনে করি। বিষয় বলিতে আমরা বৈয়ক্তিক কোন মানস প্রত্যয়কে বুঝিব না। সে পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব সাধারণের জ্ঞান হইতে পারে এবং যাহা এক প্রকৃতিরই অঙ্গ, তাহাকেই বিষয় বলা হইতেছে। আমার ব্যক্তিগত মানসিক কল্পনা সর্ব সাধারণের জ্ঞানের বিষয় হয় না, এক প্রকৃতিতে বা জগতে ঘটপটাদির যে রকম সর্বজন-বিদিত স্থান রহিয়াছে, আমার মানস প্রত্যয়ের সে রকম স্থান নাই। সুতরাং বিষয় বলিতে ঘটপটাদিই বুঝিব।

যখন আমরা ঘট দেখি, তখন কাণ্টের মতে, শুধু অনুভবের সাহায্যেই আমাদের ঘটজ্ঞান হয় না। অনুভবের দ্বারা শুধু রূপের বা ইন্দ্রিয়গোচর অন্য কোন গুণধর্মের জ্ঞানই হইতে পারে; কিন্তু এই সব গুণধর্ম যে গুণগুণিসম্বন্ধে ঘটদ্রব্যে সমবেত হইয়া আছে, সে কথা কোন ইন্দ্রিয়ানুভবেই ভাসে না। আমরা যাহাকে ঘট বলি, তাহা চোখের কাছে এক ভাসমান প্রত্যয় বা ভান মাত্র। ইহাকে ঘটের ছায়া বলিলেও পারা যায়। ইন্দ্রিয়-গোচর গুণধর্মকে গুণগুণিসম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াই বুদ্ধি দ্রব্যরূপে ঘটকে বুঝিয়া থাকে। দ্রব্যগুণসম্বন্ধ কিংবা দ্রব্যত্ব বা গুণত্ব অনুভবলব্ধ পদার্থ নয়, এগুলি শুধু বুদ্ধিগম্য। অনুভবে আমরা যাহা পাই, তাহাকে বাস্তবিক গুণও বলিতে পারা যায় না; কেন না শুধু দ্রব্যেরই গুণ হইতে পারে, কেবল গুণের কোন অর্থ হয় না; দ্রব্য হইতে ভিন্ন হইয়াও এক বিশিষ্ট-ভাবে দ্রব্যের সহিত সম্বদ্ধ পদার্থকেই গুণ বলা যায়। এত কথা নিশ্চয়ই শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন অনুভবেই পাওয়া যায় না। বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে হয়। অনুভবের কাছে যাহা ভান মাত্র ছিল, তাহাই বুদ্ধির দ্বারা সুসম্বদ্ধ হইয়া বিষয়ে পরিণত হয়।

দ্রব্যগুণসম্বন্ধ আমাদের বুঝিবারই একটি প্রকারবিশেষ। তেমনই কার্যকারণসম্বন্ধ। দণ্ডাঘাতে যখন কোন ঘট ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আমরা দণ্ডাঘাতকে ঘটভঙ্গের কারণ বলিয়া নির্দেশ করি। কিন্তু আমরা বাস্তবিক অনুভবে কি পাই? বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যে দুই পদার্থকে দণ্ড ও ঘট মনে করি, অনুভবের কাছে তাহারা দুইটি ভান মাত্র। শুধু অনুভবে এক ভানের পর আরেক ভান পাওয়া যায়, কিন্তু একটা যে অন্যটার কারণ, তাহা শুধু অনুভবে ভাসে না, বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে হয়। আমরা শুধু অনুভবের নজরে দেখিলে প্রথমে দণ্ডাঘাতরূপ দণ্ডঘটসংযোগ দেখিতে পাই, তারপরই ঘটের

খণ্ডীকৃত রূপ দেখি; কিন্তু দণ্ডাঘাতের দ্বারাই যে ঘটভঙ্গ হইল, সেকথা শুধু অনুভব হইতে পাই না। দ্রব্যগুণসম্বন্ধ যেমন কেবল বুদ্ধিগম্য, কার্য-কারণসম্বন্ধও সেইরকম। কার্যত্ব বা কারণত্ব ধর্ম বুদ্ধিবলেই বুঝিতে পারা যায়।

আমরা লৌকিক জগতে যে সব পদার্থকে বিষয়রূপে ভাবিয়া থাকি, তাহারা দ্রব্যগুণ, কার্যকারণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াই তাহাদের বিষয়ত্ব লাভ করে। আমাদের সমস্ত প্রাকৃতজ্ঞানের মূলেই এই সব সম্বন্ধ বর্তমান রহিয়াছে। এবং এসব সম্বন্ধ যখন বুদ্ধিদ্বারাই সম্ভবপর হয়, তখন এ কথাও এক রকম বলা চলে যে, বুদ্ধিই বিষয়ের সৃষ্টি করে। সে যাহাই হউক, আপাততঃ আমাদের বুঝিতে হইবে, আমরা অনুভবে যাহা পাই, তাহা বুদ্ধি দ্বারা কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়াই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। যেসব বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়াই পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেসব প্রকারের দ্বারা বিষয়েরই প্রকারভেদ নির্ণীত হয়, একথাও বলিতে পারা যায়। অন্ততঃ বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল্ পদার্থের প্রকারভেদ নির্দেশের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই শব্দই কাণ্ট্ সম্বন্ধাত্মক বৌদ্ধিক প্রকারের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। বুদ্ধি দ্বারা যে সব কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়াই পদার্থ আমাদের লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাদিগকেই এখানে বৌদ্ধিক প্রকার বলা হইতেছে। এই অর্থে কাণ্ট্ ক্যাটিগরী[১] শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দ তিনি এরিস্টোটল হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এরিস্টোটল্ যে অর্থে ক্যাটিগরী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কাণ্ট্ হয়ত ঠিক ঠিক সেই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তথাপি যে উভয় ব্যবহারের মধ্যে অর্থের সাম্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, ক্যাটিগরী শব্দ এরিস্টোটল্ হইতে গ্রহণ করিলেও, এরিস্টোটল্ ক্যাটিগরীর যে তালিকা দিয়াছেন, কাণ্ট্ সে তালিকা মানিয়া লন নাই। এরিস্টোটল্ কি কি মৌলিক প্রকারের বিষয় হইতে পারে, তাহার বিচার করিয়া যে সব প্রকার (ক্যাটিগরীরূপে) নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলিই যে সব প্রকার, তাহার চেয়ে অধিক বা কম যে প্রকার ভেদ হইতে পারে না, তাহার কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। কাণ্টের মতে এরিস্টোটল্

১। Category

যে সব প্রকারের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার মনে যেমন আসিয়াছে, তেমনই বলিয়া গিয়াছেন। সেগুলিকে কোন এক বিশিষ্ট নিয়ম অনুসারে নির্দেশ করেন নাই, অথবা তাহাদের মূলভূত কোন এক তত্ত্ব হইতে বাহির করেন নাই। ফলে তাহাদের মধ্যেই যে বিষয়ের প্রকার ভেদ নিঃশেষিত হইয়াছে, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। আর এরিস্টোট্‌লের সব প্রকারই যে বৌদ্ধিকপ্রকার তাহাও বলা যায় না ; কোন কোনটা অনুভবেরও বিষয় বটে, শুধু বুদ্ধির বিষয় নয়। এই সব দোষ এড়াইবার জন্য কাণ্ট শুধু বুদ্ধিশক্তিরই বিচার প্রণিধানপূর্বক করিতে লাগিলেন এবং বুদ্ধিশক্তির ব্যাপক কোন ধর্ম হইতে যাবতীয় বৌদ্ধিক প্রকারের নিরূপণ হইতে পারে কিনা দেখিতে চাহিলেন।

বুদ্ধিশক্তির বৈশিষ্ট্য কোথায়? কি কাজ করিবার জন্য বুদ্ধির দরকার হয়? কাণ্ট্‌ দেখিলেন বিচারই[১] বুদ্ধির কাজ। যে জ্ঞানক্রিয়া কোন বিধানে[২] ব্যক্ত করা যায়, তাহাকেই বিচার বলা হইতেছে। (কোন কোন স্থলে বিচার অর্থেই বিধান শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে।) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জ্ঞান সাধারণতঃ বিচারদ্বারাই বা বিচাররূপেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। আমরা যখনই কিছু জানি, তখনই কোন কিছু কোন কিছুর সম্বন্ধে জানিয়া থাকি। যখন বলি, এই ফুলটি লাল, তখন 'এই ফুলটি' সম্বন্ধেই কিছু জানিতেছি ; এটা যে লাল, সে কথাই জানিতেছি। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাহাই উদ্দেশ্য[৩] এবং যাহা বলা হয় তাহা বিধেয়[৪]। উদ্দেশ্যবিধেয়াত্মক বাক্যকেই মুখ্যতঃ বিধান বলা হইয়াছে। আমাদের সব বিচারেই উদ্দেশ্য-বিধেয়ের ভেদ ও সম্বন্ধ নিহিত থাকে। বিচারই বিধানে আত্মপ্রকাশ করে। যে বিচার বিধানে ব্যক্ত করা যায় না, সে বিচার বিচারই নয়, জ্ঞানই নয়। বিধানে ব্যক্ত করিতে না পারার অর্থ—কাহার সম্বন্ধে কি জানিতেছি, বলিতে না পারা। এবং কাহার সম্বন্ধে কি জানিতেছি, যদি বলিতে না পারি, তাহা হইলে 'জানিতেছি' বা 'বিচার করিতেছি', একথা বলা অনর্থক।

বুদ্ধিশক্তি[৫] আর বিচারশক্তি[৬] একই পদার্থ। সবজাতীয় বিধানের বিচার করিলে বিচারশক্তি বা সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিরই বিচার হইয়া থাকে। এই

১। Judgment.
২। Proposition.
৩। Subject.
৪। Predicate.
৫। Understanding.
৬। Faculty of judgment.

বিচারবৃত্তির আলোচনা করিয়াই কাণ্ট্ সমস্ত যৌক্তিক প্রকারের নিরূপণ করিয়াছেন। কাণ্টের মতে আমরা কি কি প্রকারের বিচার বা বিধান করিতে পারি, তাহার পর্যাপ্ত আলোচনা তর্কবিজ্ঞানে[১] আছে। কি কি প্রকারের বিচার হইতে পারে, তাহা যদি জানা যায়, তাহা হইলে তদনুরূপ কি কি বিশিষ্ট প্রকারে সুসম্বদ্ধ করিয়া পদার্থকে বিষয়রূপে পাওয়া যায়, তাহাও জানা যায়। বিচার বা বিধানের প্রকার ভেদ হইতে যৌক্তিক প্রকারের স্বরূপ নির্ধারণ করাই কাণ্টের উদ্দেশ্য। তর্কবিজ্ঞানে সর্বপ্রকারের বিধানকে গুণ[২], পরিমাণ,[৩] সংসর্গ[৪] ও অবস্থা[৫] ভেদে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। গুণ, পরিমাণ প্রভৃতি শব্দের এখানে পারিভাষিক অর্থ বুঝিতে হইবে। গুণভেদে 'হাঁ' কি 'না', 'আছে' কি 'নাই' বোঝা যায়। যেমন 'মানুষ মর', 'গরু ঘাস খায়' এসব কথা অস্তিবাচক[৬], 'মানুষ মর নয়', 'গরু ঘাস খায় না' এসব কথা নাস্তিবাচক[৭]। যে কোন বিধানই হয় অস্তিবাচক হইবে, না হয় নাস্তিবাচক হইবে। এই অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচকের ভেদকেই বিধানের গুণভেদ বলা হয়। পরিমাণ ভেদে বিধানকে সামান্য[৮] ও বিশেষ[৯] এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সামান্য বিধানে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সমগ্রভাবে বিধান করা হয়, অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদে যাহা বুঝায়, তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই কিছু বলা হয়। যথা, 'সব মানুষই মর'। এখানে মানুষকে উদ্দেশ্য করিয়া যে মরত্বের বিধান করা গেল, তাহা সব মানুষ সম্বন্ধেই বলা হইতেছে। আমরা বলিতেছি, সব মানুষই মর। এইরূপ বিধানকে সামান্য বিধান বলা যায়। বিশেষ বিধানে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আংশিকভাবে কিছু বলা হয়, অর্থাৎ যাহা বলা হয়, বা যাহার বিধান করা হয়, তাহা বিচার্যমান উদ্দেশ্যের সকলের সম্বন্ধে বলা হয় না, তাহাদের কতিপয়ের সম্বন্ধেই বলা হইয়া থাকে। যথা, কোন কোন মানুষ জ্ঞানী। এখানে সব মানুষ সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে না, কতিপয় মানুষ সম্বন্ধেই বলা হইতেছে, তাহারা জ্ঞানী। এই রকম বিধানকে বিশেষ বিধান বলা হয়। সংসর্গ ভেদে বিধানকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়;

১। Logic
২। Quality
৩। Quantity
৪। Relation
৫। Modality
৬। Affirmative
৭। Negative
৮। Universal
৯। Particular

তাহাদিগকে অবাধ[১], বৈতর্কিক[২] ও বৈকল্পিক[৩] বলা যাইতে পারে[৪]। অবাধ বিধানে খুব সোজাসুজিভাবে কিছু বলা হয়; ইহাতে 'যদি—তবে' 'কিংবা' ইত্যাদির দ্বারা কোনরূপ বিতর্ক বা বিকল্পের অবতারণা করা হয় না। এই রকম বিধানে যাহা বলা হয়, তাহা কোন প্রকার উপাধি বা বিশেষের দ্বারা সংকুচিত নয়। যদি বলি 'দুধ সাদা', তখন এই কথা বলি না যে, কোন বিশেষ অবস্থায় বা কোন উপাধির যোগে দুধ সাদা হইয়া থাকে। অবাধে বা নিরবচ্ছিন্নভাবেই দুধ সাদা—ইহাই আমাদের বক্তব্য। এই রকম বিধানকে অবাধ বা নিরবচ্ছিন্ন বিধান বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন বলি, যদি বৃষ্টি হয়, তবে ভূমি আর্দ্র হয়, তখন অবাধে বা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভূমির আর্দ্রভাবের কথা বলা হয় না। ভূমির আর্দ্রভাব বৃষ্টি হওয়ার উপর নির্ভর করে। এখানে 'যদি—তবে'র দ্বারা এক বিতর্কের অবতারণা করা হইতেছে। সুতরাং এই রকম বিধানকে বৈতর্কিক বিধান বলা যাইতে পারে। আরেক রকম বিধানে 'যদি—তবে'র দ্বারা কোন বিতর্কের উত্থাপন না করিয়া একাধিক বিকল্পের কথা বলা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে বলিতে পারি, সে হয় বোকা, নয় দুষ্ট। এই রকম কথায় আমরা বলিতেছি, সে বোকা কিংবা দুষ্ট। সে বোকাও হইতে পারে, দুষ্টও হইতে পারে। বোকা যদি না হয়, তবে দুষ্ট হইবে এবং দুষ্ট না হইলে বোকা হইবে। সে বোকা অথবা দুষ্ট এই রকম বিধানকে বৈকল্পিক বিধান বলা যাইতে পারে। অবস্থা ভেদেও বিধানকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, তাহাদিগকে আবশ্যম্ভবিক[৫] ভাবিক[৬] ও সাম্ভবিক[৭] বিধান বলা যাইতে পারে। যে কথায় অবাধে 'হাঁ' কি 'না' না বলিয়া শুধু সম্ভাবনা মাত্র বুঝাইয়া থাকে, তাহাকে সাম্ভবিক বিধান বলা যাইতে পারে। যখন বলি 'হয় ত ভগবান আছেন' তখন সোজাসুজিভাবে ভগবান আছেন কি না, তাহা কিছুই বলি না, তাঁহার থাকার সম্ভবনা মাত্র ব্যক্ত করি। এইরকম 'বনে বাঘ থাকিতে পারে', 'হয়ত মঙ্গল গ্রহে লোক আছে', এইগুলিও সাম্ভবিক বিধান। যে সব বিধানে 'হাঁ' কি 'না' বলা হয়, সোজাসুজিভাবে কোন কিছুর অস্তিত্বের বা অভাবের কথা বলা হয়, তাহাদিগকে

১। Categorical
২। Hypothetical
৩। Disjunctive
৫। Necessary
৬। Assertory
৭। Problematic

৪। প্রথমতঃ বিধানকে অনৌপাধিক ও ঔপাধিক এইভাবে বিভক্ত করিয়া ঔপাধিক বিধানকে বৈতর্কিক ও বৈকল্পিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ভাবিক বিধান বলা যাইতে পারে। এই সব বিধানে শুধু বস্তুর ভাব বা থাকা না থাকার (না থাকাও এক প্রকারের ভাব) কথাই ব্যক্ত হয়। থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে, কিংবা না থাকিয়াই পারে না—এরকম কিছু বলা হয় না। যথা 'ভগবান আছেন', 'ভগবান নাই', মানুষ মাত্রেই মর' ইত্যাদি। যে সব বিধানে কোন কিছু অবশ্যই আছে, না থাকিলেই নয়, এই রকম ভাব প্রকাশ করা হয় তাহাদিগকে অবশ্যম্ভবিক বিধান বলা যাইতে পারে। যথা 'মানুষকে মরিতেই হইবে' 'ভগবান অবশ্যই আছেন'।

উপরে বিধানকে গুণভেদে দুই ভাগে এবং পরিণামভেদেও দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাই সাধারণ প্রথা। কাণ্ট্ এই গুণ ও পরিমাণ বিভাগের প্রত্যেক বিভাগে এক তৃতীয় প্রকারের ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। উপরে পরিমাণভেদে বিধানকে সামান্য[১] ও বিশেষ[২] এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সামান্য বিধানে সকলের[৩] সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, এবং বিশেষ বিধানে কতিপয়ের[৪] সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। কিন্তু যে বিধানের উদ্দেশ্য একটি মাত্র ব্যক্তি, সে বিধানকে কোন বিভাগে ফেলা যাইবে? যদি বলি 'সক্রেটিস জ্ঞানী ছিলেন', তাহা হইলে কি সামান্য বিধান করিলাম, না বিশেষ বিধান করিলাম? কাণ্টের সময়ে চলিত মতে, এবং এখনও অনেক সময়, এইরূপ বিধানকে সামান্য বিধানই বলা হয়, কেননা, উদ্দেশ্য যখন একটি মাত্র ব্যক্তি, তখন সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলাতে উদ্দেশ্যান্তর্গত সকলের সম্বন্ধেই কিছু বলা হইয়াছে, ধরিয়া নিতে পারা যায়। কিন্তু কাণ্ট্ দেখাইলেন, 'সব মানুষ মর' এবং 'সক্রেটিস জ্ঞানী' পরিমাণ হিসাবে এক রকমের বিধান নয়। অসংখ্য ব্যক্তি সম্বন্ধীয় বিধানকে যে অর্থে সামান্য বিধান বলা যায়, এক ব্যক্তি সম্বন্ধীয় বিধানকে সে অর্থে সামান্য বিধান বলা যায় না; কাণ্ট্ এই রকম বিধানকে ঐকিক[৫] বিধান বলিয়াছেন। সুতরাং কাণ্টের মতে, পরিণামভেদে বিধানকে সামান্য, বিশেষ ও ঐকিক এই তিন ভাবে বিভক্ত করিতে হয়।

১। Universal.

২। Particular

৩। All

৪। Some

৫। Singular

গুণভেদে আমরা বিধানকে অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচক এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এখানেও কাণ্ট এক তৃতীয় ভেদের অবতারণা করেন। আমরা দেখিয়াছি অস্তিবাচক বিধানে উদ্দেশ্য বস্তু যে কি, তাহাই আমরা বলিয়া থাকি; নাস্তিবাচক বিধানে বস্তু যে কি নয়, তাহাই বলা হয়। কাণ্ট্ বলেন, এরকমও বিধান থাকে, যাহাতে বস্তু যে কি নয়, তাহাই বলিতে চাই (যার জন্য এরকম বিধান নাস্তিবাচক নয়) কিন্তু যাহা বলি, তাহাতে বস্তুটা যে কি নয়, তাহাই বোঝা যায় (যার জন্য এরকম বিধানকে অস্তিবাচকও বলা যায় না)। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা পরিষ্কার হইবে। আমরা যদি বলি 'এই ফুলটি লাল' তাহা হইলে একটি অস্তিবাচক বিধান পাওয়া যায়; যদি বলি 'এই ফুলটি লাল নয়' তাহা হইলে নাস্তিবাচক বিধান পাওয়া যায়। কিন্তু যদি বলি, 'এই ফুলটি অলাল' তাহা হইলে কি রকম বিধান হইল? দেখা যায় যেন, ফুলটি যে কি, তাহাই বলা হইতেছে, (সুতরাং বিধানটি অস্তি-বাচক); কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে, তাহা, অর্থাৎ প্রকৃত বিধেয়, ত অসীমের কোঠায় পড়িয়া আছে, এবং ফুলটি যে কি, তাহা আমরা ধরিতে পারিতেছি না। জগতের যাবতীয় পদার্থকে লাল ও অলাল রূপে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। লালের মধ্যে কি আছে, তার একটা সাধারণ কল্পনা করিতে পারা যায়। লাল বিভাগে যে বস্তুই পড়ুক না কেন, তার একটা বিশেষ ধর্ম আমরা জানি, সেটা তার লাল রং। কিন্তু অলালের মধ্যে লাল ব্যতীত জগতের যাবতীয় পদার্থই আছে। তাহাতে সাদা, নীল, কাল যেমন আছে, তেমন সরু, মোটা, হাল্কা, ভারী, বুদ্ধিমান, বোকা প্রভৃতি সবই আছে, কেননা এগুলিকে 'লাল নয়' বা 'অলাল' বলিতে পারা যায়। এই অলাল বৃত্তের পরিধিকে অসীমও বলা যাইতে পারে। অস্তি-বাচক বিধানে উদ্দেশ্যকে কোন এক বিশেষ কোঠায় ফেলা হয়; নাস্তি-বাচক বিধানে উদ্দেশ্যকে কোন একটা বিশেষ কোঠার বাহিরে রাখা হয়। আর এই তৃতীয় প্রকারের বিধানে উদ্দেশ্যকে এক (লাল) কোটার বাহিরে অন্য এক (অলাল) কোঠার ভিতরে ফেলা হয় বটে, কিন্তু সে কোঠা এতই বৃহদায়তন যে তাহাকে অসীমের তুল্য বলিতে পারা যায়। এই কারণে এই রকম বিধানকে ('এই ফুলটি অলাল') অসীম[১] বিধান বলা হইয়াছে।

১। Infinite

অস্তিবাচক বিধানে বস্তুর কি আছে বলা হয়, নাস্তিবাচক বিধানে বস্তুর কি নাই, তাহাই বলা হয়, এবং অসীম বিধানে বস্তুর কি আছে তাহাই বলা হয় কিন্তু তাহার অর্থ এইরূপ যে তাহাতে বস্তুর যে কি নাই, তাহাই শুধু বোঝা যায়।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, কাণ্টের মতে বিধানকে প্রথমতঃ (পারিভাষিক অর্থে) পরিমাণ, গুণ, সংসর্গ ও অবস্থা ভেদে চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, এবং প্রত্যেক বিভাগের আবার তিন প্রকারের ভেদ রহিয়াছে। সুতরাং মোটের উপর বার (১২) রকমের বিধান পাওয়া যায়। যে কোন বিধানই এই বার প্রকারের মধ্যে পড়িবে। অর্থাৎ বিচার করিতে গেলে এই বার প্রকারের মধ্যেই আমরা আবদ্ধ থাকি, এবং এই বার প্রকারই আমাদের বিচারের পক্ষে পর্যাপ্ত।

এই বার প্রকারের বিধান হইতে কাণ্ট্ আমাদের বিচার পদ্ধতির বারটি বিশেষ প্রকার বা ক্যাটিগরী আবিষ্কার করিয়াছেন। বিচারই বিধানে প্রকাশ পায়, সুতরাং বিশিষ্ট প্রকারের বিধানে বিচারের বা বুদ্ধিরই একটি বিশিষ্ট প্রকার আত্মপ্রকাশ করে। তর্কবিজ্ঞানের উপর কাণ্টের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি মনে করিতেন, আমাদের যত প্রকারের বিচার হইতে পারে, তাঁহার পর্যাপ্ত আলোচনা তর্কবিজ্ঞানে হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে ভাবিলেন, আমাদের জ্ঞান ব্যাপারে যে সব বৌদ্ধিক প্রকারের আবশ্যক হইতে পারে, সেগুলি তর্কশাস্ত্রালোচিত বিভিন্ন প্রকারের বিধান হইতেই বাহির করিতে পারা যাইবে। কার্যতঃও তিনি সেই পথ অবলম্বন করিলেন।[১]

পরিমাণভেদে বিধানকে ঐকিক, বিশেষ ও সামান্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই তিন প্রকারের বিধান হইতে কাণ্ট্ একত্ব[২] বহুত্ব[৩] ও সমগ্রত্ব[৪] এই তিন প্রকারের বৌদ্ধিক প্রকারের সন্ধান পান। গুণভেদে বিধানকে অস্তিবাচক, নাস্তিবাচক ও অসীম এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই তিন প্রকারের বিধান হইতে কাণ্ট্ যথাক্রমে

১। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে প্রকারগুলি অন্য ভাবে কাণ্ট্ আগেই পাইয়াছিলেন, বা জানিতেন। সেগুলির পরে তার্কিক বিধানগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ বা সঙ্গতিই দেখাইয়াছেন।

২। Unity ৩। Plurality ৪। Totality

সত্তা[১] অসত্তা[২] ও পরিচ্ছেদ[৩] এই তিনটি বৌদ্ধিক প্রকার বাহির করিয়াছেন। অস্তিবাচক বিধান করিলে সহজেই কিছু আছে বুঝায়। তেমনি নাস্তিবাচক বিধান হইতে কিছু নাই বুঝিতে পারি। যখন অসীম বিধান করা হয়, তখন সোজাসুজি ভাবে 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলা হয় না। নামে বা পারিভাষিক অর্থে অসীম বিধান বটে, কিন্তু বাস্তবিক তার দ্বারা কোন কিছুকে সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন করা হয়। আমরা দেখিয়াছি এরূপ বিধানে এমনভাবে 'হাঁ' বলা হয়, যাহাতে 'না'র অর্থ আসিয়া পড়ে। পরিচ্ছেদের অর্থও তাই। যখন কোন কিছুকে পরিচ্ছন্ন মনে করি, তখন তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আছে বা নাই মনে করি না। কোন বিশেষ ভাবে আছে, কোন বিশেষ ভাবে নাই, ইহাই পরিচ্ছন্নের অর্থ দাঁড়ায়। যদি কোন বস্তুকে কাল-পরিচ্ছন্ন মনে করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে বস্তু এক কালে আছে, অন্য কালে নাই। দেশাদি পরিচ্ছেদের বেলাও তাই।

সংসর্গ ভেদে বিধানকে নিরবচ্ছিন্ন, বৈতর্কিক ও বৈকল্পিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই তিন প্রকারের বিধান হইতে যথাক্রমে দ্রব্যগুণভাব,[৪] কার্যকারণভাব[৫] ও পারস্পরিক কার্যকারণতা[৬] এই তিন বৌদ্ধিক প্রকার পাওয়া গিয়াছে। অবস্থাভেদে বিধানকে সাম্ভবিক, ভাবিক ও আবশ্যম্ভবিক এই তিন ভাগে ভাগ করা গিয়াছে। এই তিন প্রকারের বিধান হইতে যে তিনটি বৌদ্ধিক প্রকার পাওয়া গিয়াছে তাহাদিগকে যথাক্রমে সম্ভব ও অসম্ভব,[৭] অস্তিত্ব[৮] ও নাস্তিত্ব, এবং আবশ্যম্ভবিকত্ব ও কাদাচিৎকত্ব[৯] বলা যাইতে পারে।

উপরে কাণ্টের যে বিখ্যাত বারটি বৌদ্ধিক প্রকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা এইরূপ :—পরিমাণভেদে—১ একত্ব, ২ বহুত্ব ও ৩ সমগ্রত্ব; গুণভেদে —৪ সত্তা, ৫ অসত্তা ও ৬ পরিচ্ছেদ; সম্বন্ধ ভেদে—৭ দ্রব্যগুণভাব, ৮ কার্যকারণভাব ও ৯ পারস্পরিক কার্যকারণতা; অবস্থা ভেদে—১০ সম্ভব অসম্ভব, ১১ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, ও ১২ আবশ্যম্ভবিকত্ব ও কাদাচিৎকত্ব।

১। Reality
২। Unreality or negation
৩। Limitation
৪। Substance and Accidents
৫। Cause and effect
৬। Reciprocal causation
৭। Possibility and impossibility
৮। Existence and nonexistence
৯। Necessity and contingence

এই তালিকাটি পরীক্ষা করিলেই সহজেই দেখা যায় যে প্রথম ছয়টি যে রকমের, বাকী ছয়টি ঠিক সেই রকমের নয়। প্রথমতঃ দেখা যায়, আগের ছয়টি প্রকারের প্রত্যেকেরই একটি নাম রহিয়াছে। শেষের দিকে যেন একটি প্রকারের মধ্যেই দুইটি দুইটি নাম রহিয়াছে। যেমন—দ্রব্যগুণ, কার্য-কারণ, সম্ভব ও অসম্ভব ইত্যাদি। ইহা খুব গুরুতর পার্থক্য নয়, কেন না দুইটি নাম থাকিলেও সেগুলি বাস্তবিক স্বতন্ত্র দুইটি যৌক্তিক প্রকারের নাম নয়। মনে রাখিতে হইবে, এখানে যৌক্তিক প্রকারের কথাই বলা হইতেছে। আমরা কি কি বিশিষ্ট প্রকারে বিচার করিয়া থাকি বা বিষয়কে বুঝিয়া থাকি, তাহাই বলা হইতেছে। একই প্রকারের বিচারে দ্রব্যগুণ সম্বন্ধ ভাসিয়া উঠে। এমন নয় যে, একপ্রকারের বিচারে দ্রব্য পাওয়া গেল, আর ভিন্ন প্রকারের বিচারে গুণ পাওয়া যাইবে। দ্রব্য বুঝিলে গুণও বুঝিতে হয়। কার্যকারণও এইরূপ; কারণ বুঝিলে কার্যও বুঝিতে হয়। সুতরাং একই প্রকারের বিচারে দ্রব্যগুণভাব বা কার্যকারণভাব আমাদের কাছে ফুটিয়া উঠে। অতএব বুঝিতে হইবে, দ্রব্যগুণভাবে বা কার্যকারণভাবে দুই প্রকারের বিচার পদ্ধতি প্রকাশ পায় না, একই প্রকার পাওয়া যায়। সম্ভব, অসম্ভব, অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব প্রভৃতির বেলাও তাই।

এই ত গেল নামগত পার্থক্য। একটু বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রথম দুই (গুণ ও পরিমাণ) বিভাগে যে সব প্রকারের নাম করা গিয়াছে, তাহারা বিষয়ের স্বগত রূপই ব্যক্ত করে। সে রূপ বিষয়ের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের উপর কিংবা অন্য কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে না। বিষয়কে যখন আমরা এক বা বহু মনে করি, অথবা সৎ বা অসৎ বলিয়া বিবেচনা করি, তখন বিষয়ের বিষয়ান্তরের সঙ্গে বা অন্য কিছুর (যথা জ্ঞানের) সঙ্গে সম্বন্ধের কথা উঠে না। যাহা এক বা বহু, সৎ বা অসৎ, তাহা নিজে নিজেই এক বা বহু, সৎ বা অসৎ হইতে পারে। দ্রব্যগুণ বা কার্যকারণ সে রকমের নয়। গুণ না থাকিলে দ্রব্য দ্রব্যই হইবে না; যে কারণের কার্য নাই, সে কারণ কারণই নয়। দ্রব্যগুণ বলিতে এক বিশিষ্ট প্রকারের বিষয়কেই বুঝায়, এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের সম্বন্ধের জন্যই তাহাদের দ্রব্যগুণ আখ্যা হইয়া থাকে। পরস্পরের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের সম্বন্ধের জন্যই বিষয়কে আমরা দ্রব্যগুণরূপে বুঝিয়া থাকি। কার্যকারণের বেলাও তাই। বিষয় বিষয়ের সহিত এক বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়াই কার্যকারণভাব লাভ করে;

অর্থাৎ দুইটি বিষয়কে যখন কার্যকারণভাবে বোঝা যায়, তখন এই বোঝা যায় যে, তাহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধের জন্যই তাহাদিগকে কার্য-কারণ বলা হইয়া থাকে। অবস্থা ভেদে যে সব প্রকারের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলির দ্বারা অবশ্য বিষয়ের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বোঝা যায় না। যখন কোন বিষয়কে সম্ভবপর বা অসম্ভব বলা যায়' তখন বিষয়গত কোন রূপ বা ধর্মের কথা বলা হয় না। নিজে নিজে বিষয় শুধু এক বা বহু, সৎ বা অসৎ ইত্যাদিই হইতে পারে। সম্ভবপর বা অসম্ভবের দ্বারা বিষয় বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধের কথাও বোঝা যায় না। বিষয় বিষয়ের সঙ্গে দ্রব্যগুণ, কার্যকারণ ইত্যাদি রূপেই সম্বন্ধ হইতে পারে। অথচ নিজে নিজে যদি বিষয় সম্ভবপর বা অসম্ভব না হইতে পারে, তাহা হইলে ত স্পষ্টই বোঝা যায় যে অন্য কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াই বিষয় এই রূপ বা আকার লাভ করে। কাণ্ট্ বলেন, আমাদের জ্ঞানের সম্পর্কেই বিষয়ের ঐ আকার বুঝিতে পারা যায়। বিষয় নিজে নিজে 'আছে' কিংবা 'নাই' হইতে পারে; কিন্তু 'হয়ত বা আছে' (সম্ভবপর) কিংবা 'নিশ্চয়ই নাই' [অসম্ভব], এ রকম কথায় বিষয়ের নিজগত কোন রূপ প্রকাশ পায় না। বিষয়ের এতাদৃশ রূপ আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। বিষয় সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহার জোরেই বিষয়কে সম্ভবপর বা অসম্ভব বলিতে পারি।

অতএব দেখা গেল, পরিমাণ ও গুণ ভেদে যে সব বৌদ্ধিক প্রকার পাওয়া যায়, সেগুলি বিষয়ের নিজগত রূপ প্রকাশ করে, সম্বন্ধ ও অবস্থা ভেদে যে সব প্রকার পাওয়া যায়, সেগুলি বিষয়ের কোন না কোন সম্বন্ধ প্রকাশ করে। সম্বন্ধভেদে যে সব প্রকার পাওয়া যায়, তাহার বিষয় বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞাপক; আর অবস্থা-ভেদে যে সব প্রকার পাওয়া যায়, তাহাদের দ্বারা জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বুঝিতে পারা যায়।

কাণ্ট্ এই প্রকারগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; গুণ ও পরিমাণ ভেদে যে সব প্রকার পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে গাণিতিক[১] এবং বাকী-গুলিকে যান্ত্রিক[২] আখ্যা দিয়াছেন। এই দুই কথার প্রকৃত অর্থ পরে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে।

১। Mathematical

২। Dynamical

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকারের প্রামাণ্য

কাণ্টের মতে জ্ঞানের জন্য অনুভব ও বুদ্ধি দুইই আবশ্যক। অনুভবের আকার দেশ ও কাল, অর্থাৎ কোন কিছু অনুভব করিতে হইলে দেশে ও কালেই অনুভব করিতে পারা যায়। আমরা দেখিয়াছি, দেশ ও কাল স্বতন্ত্র বস্তু বা বস্তুনিষ্ঠধর্ম নহে; আমাদের অনুভবশক্তিরই ধর্ম। বিষয়কে দৈশিক ও কালিক রূপে অনুভব করাই মানবীয় জ্ঞানের ধর্ম, অন্য কোন রূপে অনুভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অনুভবের যেমন বিশিষ্ট আকার রহিয়াছে, বুদ্ধিরও তেমনি রহিয়াছে। বিষয়কে বুঝিতে হইলে কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারেই বুঝিতে পারা যায়। এই বিশিষ্ট প্রকারগুলিকে বৌদ্ধিক প্রকার বলা হইয়াছে। দেশকাল ব্যতিরেকে যেমন আমরা কোন বিষয় অনুভব করিতে পারি না, তেমনি এইসব বৌদ্ধিক প্রকার ব্যতিরেকেও আমরা কোন বিষয়ে বুঝিতে পারি না, বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারি না। দেশ ও কালকে যেমন অনুভবশক্তির ধর্ম বলা হইয়াছে, তেমনি এইসব বৌদ্ধিক প্রকারকেও আমাদের বোধশক্তির ধর্ম বলা যাইতে পারে। সহজ কথায় বলিতে পারা যায়, আনুভবিক আকার [দেশ ও কাল] ও বৌদ্ধিক প্রকার (একত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি) মূলে আমাদের মাঝেই আছে। সেগুলি বিষয়ের উপর লাগাইয়া আমরা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু সেগুলি বাহ্যবস্তু নয়, বাহ্যবস্তুর ধর্মও নয়, সেগুলিকে আমরা বাহ্যবস্তু হইতে আহরণ করি না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে রূপ বা আকার আমাদের মাঝে আছে, তাহা বিষয়ে কি করিয়া লাগিতে পারে? বিষয়কেই আমরা এক বা বহুরূপে, দ্রব্যগুণ বা কার্যকারণরূপে জানিয়া থাকি। বাহ্যপদার্থ কি করিয়া বুদ্ধিগত আকার ধারণ করিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে—ইহা হইল এখানে মহা প্রশ্ন। কাণ্ট্ তাঁহার প্রসিদ্ধ 'বৌদ্ধিক প্রকারের অপ্রাকৃত প্রমাণে'[১] এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধিক আকার

১। Transcendental deduction of the Categories

যে কি করিয়া বিষয়ে লাগিতে পারে, তাহার প্রমাণের আবশ্যকতা আছে, একথা কাণ্ট্ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধিক আকারের প্রামাণ্য প্রদর্শনের জন্যও তিনি চেষ্টা বা পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই।

আনুভবিক আকার [দেশ ও কাল] কি করিয়া বিষয়ে লাগিতে পারে, তাহার কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই। কেননা কোন কিছুর অনুভব হইতে হইলেই যখন দেশকালের ভিতর দিয়াই হয়, তখন দেশকাল বিষয়ে লাগে কিনা কিংবা কি করিয়া লাগে এরূপ প্রশ্ন উঠে না। তবে এমন কথাও ত বলা যাইতে পারে যে, কোন কিছু বুদ্ধিদ্বারা জানিতে হইলেই যখন বৌদ্ধিক আকারের প্রয়োগ করিতে হয়, এবং ঐসব আকারের ভিতর দিয়াই যখন আমাদের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখন বৌদ্ধিক আকার বিষয়ে লাগে কিনা এবং কি করিয়া লাগে, তাহারই বা প্রমাণের কি প্রয়োজন? কিন্তু এখানে পার্থক্য আছে। দেশ কাল অনুভবের বিষয়েই লাগিয়া থাকে, অন্য কোথাও লাগে না; সুতরাং অনুভাব্য বিষয়ে দেশকাল বাস্তবিক লাগিতে পারে কিনা এরকম আশঙ্কা সহজে মনে উঠে না। কিন্তু বৌদ্ধিক প্রকার আমরা অননুভাব্য অতীন্দ্রিয়-পদার্থেও লাগাইয়া থাকি। ঘটপটাদিকে যেমন দ্রব্য বলিয়া মনে করি, তেমন আত্মা বা ভগবানকেও দ্রব্যরূপে ভাবিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক আত্মা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থকে দ্রব্যাদিরূপে ভাবা প্রমাণসঙ্গত নহে এবং এক জায়গায় কোন কিছুর অপ্রামাণ্য বুঝিতে পারিলে অন্য জায়গায়ও তার অপ্রামাণ্যশঙ্কা হইতে পারে। অননুভাব্য অতীন্দ্রিয়পদার্থে দ্রব্যাদি কল্পনা বাস্তবিক না লাগিলেও আমরা যেমন ভ্রান্তভাবে লাগাইয়া থাকি, অনুভবলব্ধ ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ সমূহেও দ্রব্যাদিকল্পনার প্রয়োগ সেইরূপ ভ্রমাত্মক কিনা এ শঙ্কা সহজেই উঠিতে পারে। সুতরাং অনুভবলব্ধ বিষয়ে যে বৌদ্ধিক আকার সব লাগিতে পারে তাহার প্রমাণের দরকার আছে।

আর একটি কথা। বিষয় ছাড়া জ্ঞান হয় না, এবং বিষয় আমরা অনুভব হইতেই পাই; অনুভব ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমরা বিষয় লাভ করিতে পারি না। সুতরাং অনুভবের রূপ বা আকার [দেশ কাল] যে বিষয়ে লাগিবেই সে সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই হইতে পারে না। অনুভবের দ্বারা বিষয় লাভ হইলে তাহাতে বৌদ্ধিক আকার লাগাইয়া আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু অনুভবশক্তি (সংবেদনশক্তি) ও বোধশক্তি

একই পদার্থ নয়; সুতরাং অনুভবলব্ধ বিষয়ে বৌদ্ধিক আকার যে লাগিবেই তাহার কোন নিয়ম বা প্রমাণ নাই। সেই জন্যই কাণ্ট্‌কে অনেক কষ্ট করিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে বাস্তবিকই অনুভাব্য বিষয়ে বৌদ্ধিক আকার প্রযুক্ত হইতে পারে। এমন যদি হইত, বৌদ্ধিক আকার ব্যতীত কোন কিছুর অনুভবই হয় না অর্থাৎ বৌদ্ধিক আকার ব্যতিরেকে আমরা কোন বিষয়ই লাভ করিতে পারি না, তাহা হইলে বৌদ্ধিক আকার বিষয়ে লাগে কিনা সে প্রশ্ন উঠিত না, এবং লাগিবে বলিয়া প্রমাণের দরকার হইত না।

অনুভবের দ্বারাই যদি বিষয় লাভ করিয়া ফেলিলাম, তাহা হইলে তাহার উপর আবার বৌদ্ধিক আকার প্রয়োগের প্রয়োজন কি? তাহার প্রয়োজন এইজন্য যে শুধু অনুভবের দ্বারা যাহা পাই, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলিতে পারা যায় না। অনুভব ও বুদ্ধি উভয়ের সাহায্যেই আমাদের প্রাকৃত জ্ঞান ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনুভবলব্ধ পদার্থ বৌদ্ধিক আকার ধারণ করিয়াই আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয় হয়। বৌদ্ধিক আকার না পাইলে অনুভূত পদার্থ অনেকটা অনির্বাচ্য বা অনির্দেশ্য অবস্থায় থাকে। তাহাকে এক বা বহু, দ্রব্য, গুন, কার্য বা কারণ কিছুই বলা যাইতে পারে না। অনেকের মতে বুদ্ধিক্রিয়া ব্যতিরেকে শুধু অনুভবের দ্বারা কোন জ্ঞানই হয় না। সে কথা হয়ত ঠিক সত্য নাও হইতে পারে, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই সত্য যে বৈজ্ঞানিক বা লৌকিক[১] জ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা শুধু অনুভবের দ্বারা হয় না। এরকম জ্ঞানের বিষয় দ্রব্যগুণাদি আকার নিয়াই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। অথচ এই সব আকার আমাদের সংবেদন জন্য অনুভবের[২] বিষয় নয়। অনুভবের যাবতীয় বিষয় অনুসন্ধান করিয়াও এগুলি আবিকার করিতে পারা যায় না। অনুভবে রূপ রসাদি পাওয়া যায়, কিন্তু একত্ব, বহুত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি অনুভবে পাওয়া যায় না। এগুলি বুঝিবার প্রকার মাত্র, অথবা বুদ্ধিরই বিষয়। অনুভবের বিষয় না হইয়াও কি রূপে অনুভবের বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাই ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিবার কথা।

আমাদের প্রাকৃত বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রত্যক্ষের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দেখিয়া শুনিয়া যাহা পাই, তাহাই ত লৌকিক জ্ঞানের বিষয় এবং এই

১। Empirical

২। Sense-experience

লৌকিক জ্ঞানই সুসবদ্ধ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পরিণত হয়। কাণ্ট্ যদি দেখাইতে পারেন, আমাদের যে কোন লৌকিক জ্ঞান হইতে হইলেই বৌদ্ধিক আকারের প্রয়োজন, বৌদ্ধিক আকার ব্যতিরেকে কোন কিছুই আমাদের লৌকিক জ্ঞানে প্রবিষ্ট হয় না, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, সব লৌকিক বিষয় সম্বন্ধেই আমাদের বৌদ্ধিক আকার সত্য হইবে। লৌকিক জ্ঞানে যে, বৌদ্ধিক আকার নিহিত আছে, তাহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্য কোন বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। একত্ব বহুত্বাদি বৌদ্ধিক প্রকার যে কোন লৌকিক জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলেই পাওয়া যায়। সুতরাং বৌদ্ধিক আকার প্রকৃত পক্ষে লৌকিক জ্ঞানে আছে কিনা তাহা প্রমাণের বিষয় নহে। প্রমাণ করিতে হইবে যে ঐ সব আকার ব্যতিরেকে লৌকিক জ্ঞান সম্ভবপরই নহে; কোন পদার্থকে লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হইতে হইলে বৌদ্ধিক আকার ধারণ করিতে হইবেই হইবে। লৌকিক জ্ঞান বা লৌকিক বিষয়ের সম্ভাবনার[১] মূলেই বৌদ্ধিক আকার নিহিত রহিয়াছে। এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বৌদ্ধিক আকারের জোরেই লৌকিক জ্ঞান বা বিষয় সম্ভবপর হইয়া থাকে। সুতরাং এক দৃষ্টিতে বুদ্ধিকেই বিষয়ের কারণ বলিতে পারা যাইবে। বৌদ্ধিক আকার ব্যতিরেকে যখন বিষয় বিষয়ই হইবে না, আর বৌদ্ধিক আকার বুদ্ধির নিজস্ব ধর্ম বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে যখন পূর্বতোজ্ঞান হইতে কোন বাধাই নাই, তখন বিষয় সম্বন্ধেও আমাদের অনায়াসে পূর্বতোজ্ঞান হইতে পারে। কোন বিষয় অনুভব না করিয়াই আমরা বলিতে পারিব, তাহার একত্ব বহুত্ব প্রভৃতি ধর্ম থাকিবেই থাকিবে। এই রকমভাবে সার্বত্রিক পূর্বতোজ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে।

এইমাত্র ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বুদ্ধি বিষয়ের কারণ, বিষয়ের বিষয়ত্বই বৌদ্ধিক আকারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহা হইতে যদি কেহ মনে করেন, বুদ্ধি বিষয়ের সৃষ্টি করে, বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি হইতে তেমন বিষয় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাংঘাতিক ভুল হইবে। বিষয়ের সত্তা বিষয়ে আছে, সে সত্তা দান বা হরণ বুদ্ধির কর্ম নয়। যে জিনিস 'নাই' তাহাকে বুদ্ধি 'আছে' করিতে পারে না; এবং যাহা 'আছে' তাহাকেও 'নাই' করিতে পারে না। বৌদ্ধিক আকার বিষয়ে লাগে বা

১। Possibility of experience or possibility of the objects of experience.

বিষয় সম্বন্ধে খাটে শুধু এই মাত্র বলিতে পারা যায়। কাণ্ট্ বলিয়াছেন বটে, কোন বস্তুই বৌদ্ধিক আকার ধারণ না করিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, কিন্তু বৌদ্ধিক আকার ধারণ না করিয়া কোন বস্তু থাকেই না, একথা তিনি বলেন নাই, বলিতে চাহেনও নাই।

বৌদ্ধিক আকার বিষয়ে লাগিবেই—সে কথা কাণ্ট্ কি করিয়া প্রমাণ করিলেন? 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারের'[১] প্রথম সংস্করণে তিনি এক প্রকারের প্রমাণ দিয়াছেন, দ্বিতীয় সংস্করণে অন্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক দুই প্রমাণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। প্রথম প্রমাণে বুদ্ধিগত ব্যাপারের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় প্রমাণে বিষয়গত বিচারই বেশী আছে। সুতরাং এক প্রমাণ অন্য প্রমাণে বিরোধী ত নয়ই, পরন্তু পরিপূরক মাত্র। কাণ্টের উদ্দেশ্যের পক্ষে অবশ্য বিষয়গত[২] প্রমাণেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। বিষয়ই কি করিয়া বৌদ্ধিক আকার ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না, তিনি মুখ্যতঃ তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তার জন্য যদি আগে বুদ্ধির পক্ষে বিষয়ের গ্রহণ বা উপলব্ধি কি করিয়া সম্ভবপর হয়, তাহা ভাল করিয়া বোঝা যায়, তাহা হইলে বিষয়ের পক্ষে বৌদ্ধিক আকার গ্রহণ কেন অপরিহার্য তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে বোঝা যাইবে। ১ম সংস্করণে বুদ্ধিগতও প্রামাণ্যের সঙ্গে বিষয়গত প্রামাণ্যও দেখান হইয়াছে। তবে ২য় সংস্করণেই বিষয়গত প্রামাণ্য স্পষ্টতর হইয়াছে। আমরা এখানে বুদ্ধিগত প্রামাণ্যের আলোচনা প্রথমে করিব।

আমাদের জ্ঞানে বুদ্ধি কি কাজ করে, তাহার বিচার করিলে দেখা যায়, একীকরণ[৩] বা মেলনই[৪] বুদ্ধির প্রধান কাজ। আমরা কোন এক বিশিষ্ট জ্ঞানকে 'এই ফুলটি লাল' বলিয়া কথায় ব্যক্ত করিতে পারি। এ রকম জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভবপর হয়। বুদ্ধিই 'ফুল' ও 'লাল'কে একত্র ধরিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই এই রকম জ্ঞান সম্ভবপর হইয়াছে। এখানে বলা যাইতে পারে বটে, বাস্তব জ্ঞানে যে পদার্থ 'লাল ফুল' রূপে এক হইয়াছিল, বুদ্ধি ত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'ফুলটি' 'লাল' এইরূপ পৃথক ভাবে দেখাইতেছে। তথাপি তলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, এই পৃথককরণও ফুল ও লালকে একত্র ধরিয়া রাখার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের কোন জ্ঞানই এই মৌলিক

১। Critique of Pure Reason
২। Objective
৩। Subjective
৪। Synthesis

একীকরণ ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না। একীকরণের অর্থ যাহা এক ছিল না তাহাকে এক করা—অর্থাৎ যাহাতে বহুতা, অনৈক্য বা ভেদ রহিয়াছে, তাহাকে একভাবে দেখা—বা তাহাতে ঐক্য বিধান করা। সুতরাং এ কথা যদি সত্য হয় যে একীকরণ ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই হয় না, তবে এইই দাঁড়ায় যে আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার মধ্যে কোন না কোন প্রকারের ভেদ বা বহুতা রহিয়াছে। বাস্তবিক বটেও তাই। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহা কিছু না কিছু দেশ ব্যাপিয়া আছেই, এবং যাহা দেশে বা কালে থাকে, তাহাকে ভাগ করিতে পারা যাইবেই; অর্থাৎ তাহাতে আত্যন্তিক অভিন্নতা বা নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য পাওয়া যাইবে না। আমরা জ্যামিতিতে বিন্দুর কল্পনা করিয়া থাকি বটে, কিন্তু কোন বিন্দুই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। কাণ্টের মতে প্রকৃত জ্ঞান হইতে হইলে, প্রথমে ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব দরকার; বলা বাহুল্য কোন বিন্দুই আমাদের এতাদৃশ অনুভবের বিষয় নয়। দেশ কালই যখন আমাদের অনুভবের আকার, অর্থাৎ আমাদের অনুভূত বিষয় যখন কিছু না কিছু দেশ বা কাল ব্যাপিয়া থাকিবেই থাকিবে; তখন একথা নিশ্চয়ই মানিতে হয় যে, আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, তাহা কখনই অণুপরিমাণ নহে; তাহাতে কিছুটা মহত্ত্ব বা বহুত্ব সর্বদাই থাকে। এই অনুভবলব্ধ বহুতাই[১] আমাদের জ্ঞানের অন্তিম উপাদান। আমাদের জ্ঞানীয় বিষয় এই বহুতা হইতেই বুদ্ধিক্রিয়ার ফলে গঠিত হইয়া উঠে।

আমাদের ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবে বা সংবেদনে যাহা আসে, তাহা এই বহুতা মাত্র; ইহাকে এর চেয়ে অধিক কোন নাম বা রূপ দিতে পারা যায় না। আমাদের জ্ঞানের বিষয় ইহা হইতে গঠিত হইতে হইলে প্রথমে এই বহুতাকে এক প্রতীতিতে ধরিতে পারা উচিত। এর জন্য একীকরণশীল বুদ্ধির সাহায্যের দরকার। বুদ্ধিই অনুভবদত্ত বহুতাকে একত্র গ্রহণ করিয়া এক (ঐক্যযুক্ত) প্রতীতিতে পরিণত করে। আমাদের কাছে একটি রেখার ভান বা প্রতীতি হইতে হইলে রেখার বিভিন্ন ভাগের অনুভব হওয়া দরকার; এবং শুধু বিভিন্ন ভাগকে পর পর দেখিয়া গেলেই সমগ্র রেখার জ্ঞান হইবে না। এখানে বুদ্ধির এক বিশেষ কাজ রহিয়াছে। সব ভাগকে জ্ঞানে এক সঙ্গে ধরিয়া রাখিতে হইবে। তাহাতেই এক (ঐক্যযুক্ত) প্রতীতি হয়; তাহা না হইলে সমগ্র রেখার এক রেখা বলিয়া ভান হইত

১। Manifold of sense

না। অনুভবলব্ধ বহুত্বাকে এক প্রতীতিতে ধরিয়া রাখাই বুদ্ধির প্রাথমিক একীকরণের কাজ। ইহাকেই কান্ট্ 'অনুভবে গ্রাহণিক একীকরণ (মেলন)'[১] নাম দিয়াছেন। বিভিন্ন ভাগকে এক সঙ্গে গ্রহণ[২] করা হইয়াছে বলিয়া গ্রাহণিক মেলন বলা হইল। এই মেলন সাক্ষাৎ (পরোক্ষে নয়) জ্ঞানেই হয় বলিয়া 'অনুভবে'[৩] বলা হইয়াছে।

উপরের দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে, রেখার বিভিন্ন ভাগকে এক প্রতীতিতে ধরিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন ভাগের যদি পর পর অনুভব হইয়া থাকে, তবে সব ভাগকে এক সঙ্গে কোথায় পাওয়া যাইবে? আর আমাদের স্বীকার করিতে হয় সব ভাগের এক সঙ্গে অনুভব হয় না। এক সঙ্গে অনুভব হইয়া গেলে অনুভূত পদার্থে বহুত্বার বা পরিমাণের বোধ হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক ভাগের পর অন্য ভাগের অনুভব হয়, এবং যখন শেষের ভাগের অনুভব হইতেছে, তখন অগ্রগামী ভাগগুলির অনুভব হইতেছে না। এমতাবস্থায়, সব ভাগগুলি যখন এক সঙ্গে উপলব্ধ নয়, তখন বুদ্ধি সব ভাগকে এক সঙ্গে কি করিয়া গ্রহণ করিবে? তার জন্য আর একটি বুদ্ধিক্রিয়ার প্রয়োজন। যে সব ভাগের অনুভব হইয়া গিয়াছে, সেগুলির স্মরণ বা কল্পনায়[৪] তাহাদের পুনরাবৃত্তি[৫] করা যাইতে পারে। যে ভাগের অনুভব হইল, তাহা যদি অনুভাবের পরই আমাদের জ্ঞান হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আগেকার অনুভব আমাদের কোন বিষয়জ্ঞানের সহায়ই হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হয়, অনুভূত পদার্থকে আমরা অনুভবক্ষণের পরে ও স্মরণে বা কল্পনায় ধরিয়া রাখিতে পারি। সব ভাগকে এক প্রতীতিতে পাইতে হইলে, যাহা অনুভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে কল্পনায় পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিয়া, যাহা বর্তমানে অনুভূত হইতেছে তাহার সহিত এক সঙ্গে ধরিতে হয়। ইহাকেই 'কল্পনায় স্মারণিক একীকরণ'[৬] বলা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে গ্রাহণিক মেলনের জন্য স্মারণিক মেলনও অত্যাবশ্যক। বিষয়ের সব ভাগ যখন এক সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভাব পাওয়া যায় না, তখন শুধু স্মরণের সাহায্যেই সব ভাগের এক সঙ্গে গ্রহণ বা উপলব্ধি সম্ভবপর হইতে পারে।

১। Synthesis of Apprehension in Intuition
২। Apprehension
৩। In Intuition
৪। In Imagination
৫। Reproduction
৬। Synthesis of Reproduction in Imagination

স্মরণই বা কি করিয়া সম্ভবপর হয়? আমাদের একটা কিছু অনুভব করার পর কল্পনাতে বা স্মৃতিতে একটা কিছু উদ্বুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু যাহা অনুভব করা গিয়াছে, এবং যাহা উদ্বুদ্ধ হইল, তাহা যদি এক না হয়, বা এক বলিয়া বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে প্রকৃত ভাবে স্মরণ হইয়াছে, একথা বলিতে পারা যায় না; এবং তাহাতে আমাদের বিষয়জ্ঞানের কোন সাহায্যই হয় না। সুতরাং বিষয়জ্ঞানের জন্য আমাদের অবশ্য মানিতে হয় যে, আমাদের এখন যাহা স্মরণ হইতেছে, তাহাই পূর্বে অনুভূত হইয়াছিল। আমাদের কল্পনাতে বা স্মৃতিতে যে প্রতীতি আসিল, তাহাকে পূর্বানুভবের প্রতীতি বলিয়া আমাদের চিনিতে পারা উচিত। আগে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখন স্মরণ করিতেছি, এই রকম আমাদের প্রত্যভিজ্ঞান[১] হওয়া উচিত। এক বিশিষ্ট প্রকারের একীকরণের ফলেই স্মৃত ও অনুভূতের মধ্যে ঐক্য বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকারের একীকরণকে কাণ্ট্ 'বিগ্রহে প্রাত্যভিজ্ঞানিক একীকরণ'[২] বলিয়াছেন। দুই বা ততোধিক প্রতীতিতে একই বিষয়ের গ্রহণকেই বিগ্রহ[৩] বলা যাইতে পারে। ইহাকেই সামান্যজ্ঞান* বলা চলে। দুই বা ততোধিক ঘট প্রতীতিতে যে একই ঘটত্বের প্রতীতি হয়, সেই রকম প্রতীতিকেই বিগ্রহ বলা হইতেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে অনুভবের প্রতীতি ও স্মরণের প্রতীতি যে একই প্রতীতি, সে বোধ বাস্তবিক বিগ্রহাত্মক জ্ঞানই বটে। এখানেও প্রতীতিতে একই বিষয়েরই গ্রহণ হইতেছে। সুতরাং এতৎস্থলীয় একীকরণকে 'বিগ্রহে প্রাত্যভিজ্ঞানিক একীকরণ' বলা অসঙ্গত হয় নাই।

এই যে তিন প্রকারের মেলন বা একীকরণের[৪] কথা বলা হইল, তাহা বুদ্ধির তিনটি পৃথক পৃথক স্বতন্ত্র ক্রিয়া নয়। আমরা দেখিয়াছি, একটির সঙ্গে অপরটি কি রকম ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মনে হয় যেন তিন রকমের মেলনই একই সঙ্গে ঘটিয়া থাকে। আমরা বিচারের সাহায্যেই তাহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে বুঝিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের একটিকে ছাড়িয়া অপরটি কখনো সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমরা এমনও বলিতে

১। Recognition

২। Synthesis of Recognition in Concept

৩। Concept

৪। Synthesis

পারি, এই তিন প্রকারের মেলন বাস্তবিক বুদ্ধির একই মেলাপকক্রিয়ার[১] তিনটি দিক মাত্র। এই ত্রিবিধ মেলন আমাদের সব বিষয়জ্ঞানের মূলেই রহিয়াছে। এখানে এবং অধিকাংশস্থলেই লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে যে রকম বিষয়ের কথা ভাবিয়া থাকি, সে রকম বিষয়ই বুঝিতে হইবে। উপরে রেখার দৃষ্টান্ত দিয়া ভিন্ন প্রকার মেলন বুঝিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। এখন কোন একটা লৌকিক সাধারণ বিষয় নিয়া ঐ সব মেলনের কথা একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ধরা যাউক, আমি বাগানে একটি ফুল দেখিলাম। এই যে ফুল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইল, ইহাকে বিষয় জ্ঞান বলা যাইবে। এই রকম জ্ঞান নিয়াই আমাদের লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গঠিত। কাণ্টের কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এই ফুল জ্ঞানের মধ্যেই তিন প্রকারের মেলন বর্তমানে থাকা উচিত। কাণ্টের মতে এই ফুল জ্ঞানের মধ্যেও নানা উপাদান[২] রহিয়াছে, এবং সেইগুলি আমাদের মেলাপক বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে একত্র ধৃত বা সমাবিষ্ট হইয়া আছে বলিয়াই ফুলরূপ বিষয়ের জ্ঞান হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ফুল জ্ঞানের মধ্যে আমাদের বুদ্ধি নিজ থেকে যে কিছু করিয়াছে, তাহা আমাদের মনেই হয় না। মনে হয় যেন আমরা কিছুই করি নাই, ফুলটি আপনা হইতেই আমাদের জ্ঞানে ভাসিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। এখন যদি আমরা কোন একটি কথা - যেমন 'আমার'—কোথাও লেখা দেখি তাহা হইলে মনে হয় যেন সমস্ত শব্দটাই একসঙ্গে চোখে বা বুদ্ধিতে ভাসে, তার জন্য বুদ্ধির দ্বারা আমাদের কিছু করিতে হয় না, শুধু চোখ মেলিলেই হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আ-মা-র-কে আমরা পর পর দেখিয়া তাহাদিগকে বিশিষ্ট ভাবে একত্র করিয়া 'আমার' এই কথা বুঝি। যাঁহারা অধিক বয়সে কোন বিদেশী ভাষা শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের খুব ভাল করিয়া মনে থাকিবে যে 'আমার' শব্দের মত তিন অক্ষরের বিদেশী কোন শব্দ (বিশেষতঃ স্বল্পপরিচিত লিপিতে) ঠিক 'আমার' এর মতই আমাদের নয়নেন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হইলেও, তিনটি অক্ষরকে পর পর দেখিয়া, তাহাদিগকে মনে মনে একত্র মিলিত করিয়াই শব্দটি যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়; দেখা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় না। কোন কোন বালক যখন প্রথম বানান

১। Synthetic activity

২। Elements

শিখিতে আরম্ভ করে, তখন বুদ্ধির মেলাপক শক্তির দৌর্বল্যবশতঃ পর পর সব অক্ষর চিনিয়া গেলেও সম্পূর্ণ শব্দটি যে কি হইল, তাহা বলিতে পারে না। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যেখানে আপাত-দৃষ্টিতে কোন প্রকারের বুদ্ধি ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না, সেখানেও বুদ্ধি ক্রিয়া বর্তমান থাকে। অভ্যাসের ফলে বুদ্ধি ক্রিয়া খুব সহজ হইয়া গিয়াছে, এবং খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় বলিয়া আমরা কোন ক্রিয়ারই স্পষ্ট পরিচয় পাই না। বাস্তবিক প্রত্যেক বিষয়েরই এক প্রকারের বহুতা রহিয়াছে। সে বহু বুদ্ধির মেলাপক বৃত্তির অভাবে কখন এক বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। সুতরাং 'ফুল' বলিয়া এক ক্ষণিক প্রতীতি হইতে হইলেও বৌদ্ধিক মেলনের প্রয়োজন। 'অনুভবে গ্রাহণিক মেলনের'[১] ফলেই এক (অখণ্ড) প্রতীতি হইতে পারে। কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে হইলে তাহার মূলে এক প্রতীতি চাইই চাই, এবং প্রাতীতিক ঐক্য বুদ্ধির মেলাপক ক্রিয়ার ফলেই সম্ভবপর হয়।

কিন্তু যখন ফুল বলিয়া কোন বিষয়কে বুঝি, তখন শুধু এক প্রতীতি মাত্র বুঝি না। প্রতীতি ত উদয় হইয়া একটু পরেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিষয় ত অনেক সময় পর্যন্তই থাকে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রতীতি হইয়া থাকে, যত জ্ঞাতা তত প্রতীতি, কিন্তু বিষয় একই। মোটামুটি বলিতে পারা যায়, একই বিষয়ের অনেক প্রতীতি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা বিষয়কে প্রতীতি হইতে ভিন্ন ভাবিয়া থাকি; কিন্তু বিষয়কে আমরা কোথায় পাই? বিষয়কে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের প্রতীতি দ্বারাই উপলব্ধি করিতে হয়; প্রতীতির ভিতর দিয়াই বিষয়কে পাইতে হয়। অথচ বিষয় প্রতীতি মাত্র নয়; তবে বিষয় কি? প্রথমতঃ এই বলিতে পারা যায় যে, অনেক প্রতীতির এক প্রকার ঐক্যের নামই বিষয়। উপরে যে ফুলের দৃষ্টান্ত দেওয়া গিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ বিচার করা যাউক। ফুল বলিয়া যে বিষয়কে বুঝি, তাহাকে সকালে দেখা গিয়াছে, দুপুরেও দেখা যাইতেছে। কিছু দূর থেকে দেখা যায়, কাছে গিয়াও দেখা যায়, ডান দিক থেকে দেখিতে পারি, বাম দিক থেকেও দেখিতে পারি। প্রত্যেক বারই একটি প্রতীতি হইতেছে। এই সব প্রতীতি স্পষ্টই বহু, কিন্তু এই বহু প্রতীতির পশ্চাতে একই বিষয় আছে, মনে করি; অথচ প্রতীতিভিন্ন বিষয় বলিয়া অন্য কিছু

১। Synthesis of Apprehension in Intuition

আমরা জ্ঞানে পাই না। সুতরাং বিচার করিলে বোঝা যায় যে, আমাদের জ্ঞানের বিষয় 'ফুল' কতকগুলি বিশিষ্ট প্রকারের প্রতীতির ঐক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু প্রতীতিগুলির ঐক্যসাধন করিতে হইলে সবগুলি ত এক সঙ্গে পাওয়া দরকার। সব প্রতীতিকে একসঙ্গে কি করিয়া পাওয়া যাইবে? দূরের প্রতীতি নিকটে গেলে থাকে না; সকালের প্রতীতি দুপুরে পাওয়া যায় না। একথা একদিকে সত্য বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের জ্ঞান ক্ষণিক প্রতীতিতেই আবদ্ধ নয়। আমাদের জ্ঞান যদি ক্ষণস্থায়ী বর্তমান প্রতীতি মাত্রে পর্যবসিত হইত, তাহা হইলে কোন বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভবপর হইত না। জ্ঞানী অজ্ঞানীতে কোন পার্থক্য থাকিত না। আমরা জানি একবার কোন জ্ঞান হইয়া গেলে বিষয়ের অবর্তমানেও জ্ঞানকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যায়। একবার যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা সহজে লুপ্ত হয় না, সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে আবশ্যকমত পুনরুদ্বুদ্ধ করিতে পারা যায় বলিয়াই কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। ভূয়োদর্শনের ফলে লোক জ্ঞানীপদবাচ্য হইতে পারে। স্মরণশক্তির বলেই আমরা একবার জ্ঞাত জ্ঞানকে পুনরুদ্বুদ্ধ করিতে পারি। জ্ঞানের এই পুনরুদ্বোধন বা পুনরুৎপাদনের নামই স্মরণ। আমরা যে প্রতীতির কথা বলিয়া আসিতেছিলাম, তাহাও এক প্রকারের জ্ঞান বই আর কিছু নয়। সুতরাং একবার এক প্রতীতি হইয়া গেলে তাহার পুনরুদ্বোধন খুব কঠিন ব্যপার নয়। অতএব যে সব প্রতীতির আমরা ঐক্য সাধন করিতে চাই, সে সবগুলিকে যে একসঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বর্তমান থাকিতে হইবে, তাহা নহে। আমাদের মাত্র একটি প্রতীতিই সাক্ষাৎভাবে বর্তমান থাকিতে পারে। তাহার পূর্বগামী প্রতীতি সব অতীতের গর্ভেই ডুবিয়া থাকে। তথাপি আমরা স্মৃতিশক্তির বলে ঐগুলিকে পুনরুদ্বুদ্ধ করিয়া বর্তমান প্রতীতির সঙ্গে মিলাইতে পারি। এই মেলনের জন্য পুনরুদ্বুদ্ধ প্রতীতিকে কল্পনাতে বর্তমান প্রতীতির সঙ্গে একত্র ধারণ করিতে হয়। এইজন্য এরকম মেলনকে 'কল্পনায় স্মারণিক মেলন'[১] বলা হইয়াছে।

১। Synthesis of Reproduction in Imagination

কল্পনায় অনেকগুলি প্রতীতিকে শুধু একত্র করিলেই কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় না। সব প্রতীতি যে একই বিষয়ের প্রতীতি, সেই বোধ হইলেই সব প্রতীতির মধ্যে বাস্তবিক ঐক্য সাধিত হয় এবং তাহা দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়। কোন প্রতীতি উপলক্ষে, অন্য যে সব প্রতীতি 'পুনরুদ্বুদ্ধ' হইয়া বর্তমান প্রতীতির সহিত ঐক্য প্রার্থী হইল, তাহাদিগকে একই বিষয়ের প্রতীতি বলিয়া চিনিতে পারা উচিত। ঐ সব প্রতীতি ত একবার হইয়া গিয়াছে; তাহার জন্যই তাহারা এখন পুনরুদ্বুদ্ধ হইয়াছে বলা যায়, এবং সেই জন্যই 'চিনিতে' পারা বা পরিচয়ের কথা উঠে। যাহা এখন দেখা যাইতেছে, তাহাকে পূর্বদৃষ্ট কোন ব্যক্তি হইতে অভিন্ন বুঝিতে পারাকেই চিনিতে পারা বলে। ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। দুই বা বহুর মধ্যে এককে ধরিতে পারা, অর্থাৎ তাহাদের ঐক্য বুঝিতে পারাই প্রত্যভিজ্ঞানের বিশেষত্ব। যখন কোন ব্যক্তিকে চিনি, তখন এইই বুঝি যে, পুরোবর্তী ও পূর্বদৃষ্ট ব্যক্তি উভয়ে একই। সামান্যজ্ঞানে[১] আমরা ঠিক এই জিনিসই দেখিতে পাই। অনেকগুলি ফুলকে যখন এক জাতীয় ফুল (যথা জবা) বলিয়া বুঝি, তখন আমরা এই সব ফুলের ভিতর এক প্রকারের ঐক্য দেখিতে পাই, অর্থাৎ সকলের মধ্যে একই বস্তু রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারি। এই বহুর মধ্যে এককে গ্রহণ করা অথবা এক প্রতীতির দ্বারা বহুর গ্রহণ করাকেই বিগ্রহণ[২] বলা যাইতে পারে। ইহারই নামান্তর সামান্যজ্ঞান। এই বহুগ্রাহক এক প্রতীতিকে[৩] বিগ্রহ[৪] বলিতে পারা যায়। কোন বিষয়ের জ্ঞানের জন্য, তৎসম্বন্ধীয় প্রতীতি সবকে একই বিষয়ের প্রতীতি বলিয়া চিনিয়া (প্রত্যভিজ্ঞান) যখন তাহাদের ঐক্য সাধন করা হয়, তখন তাহাকে 'বিগ্রহে প্রাত্যভিজ্ঞানিক মেলন'[৫] বলা যাইতে পারে।

এই যে তিন প্রকার মেলন বা একী করণের কথা বলা হইল, তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন তিনটি স্বতন্ত্র জিনিস নয়। একটির মধ্যে অন্যটি জড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা ত আপাতদৃষ্টিতে শুধু বিষয়জ্ঞান (যথা ফুল) বলিয়া একটি মাত্র পদার্থই পাই। কাণ্টের সূক্ষ্ম বিচারের ফলে এই এক বিষয়-

---

১। Conception
২। Conception
৩। *Vorstellung*, representation, idea
৪। Concept, *Begriff*
৫। Synthesis of Recognition in Concept

জ্ঞানের মূলে তিন প্রকারের একীকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির স্বরূপ প্রণিধান পূর্বক বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় একটির মধ্যে অন্যটি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। তিনটিকে আমরা যথাক্রমে গ্রহণ[১], স্মরণ[২] ও প্রত্যভিজ্ঞান[৩] আখ্যা দিয়াছি। আমরা অনুভবে[৪] বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকি, কল্পনাতে[৫] বিষয়ের স্মরণ বা পুনরুদ্বোধন করিয়া থাকি এবং বিগ্রহে[৬] বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেকটিই এক এক প্রকারের একীকরণ। গ্রহণে আমরা অনুভবলব্ধ বহুকে একত্র ধারণ করিয়া এক (অখণ্ড) প্রতীতিতে উপনীত হই। এক প্রতীতি না হইলে কোন বিষয়জ্ঞানই হইতে পারে না, সুতরাং এতাদৃশ সব জ্ঞানের মূলেই গ্রাহণিক মেলন বা একীকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। স্মারণিক মেলনে যখন পূর্বানুভূত প্রতীতিনিচয়ের পুনরুদ্বোধন হয়, তখন তাহাতেও গ্রাহণিক মেলন অন্তর্ভুক্ত থাকে; কেননা যাহাদের উদ্বোধন হয়, তাহারা এক এক প্রতীতি হিসাবেই উদিত হয়, এবং তাহাদের প্রত্যেকের একত্ব এই গ্রাহণিক একীকরণের উপরই নির্ভর করে। অতএব স্মারণিক একীকরণে গ্রাহণিক একীকরণ গৃহীত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার স্মরণকে সহায় করিয়াই প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভবপর হয়। প্রত্যভিজ্ঞানে আমরা পূর্বানুভূত প্রতীতি ও বর্তমান প্রতীতি যে একই প্রতীতি, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহার জন্য স্মরণ অত্যাবশ্যক; কেননা স্মরণের আশ্রয় না লইয়া পূর্বানুভূত প্রতীতি কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্মরণের ভিতরে যেমন গ্রহণ, তেমনি প্রত্যভিজ্ঞানের ভিতরে স্মরণ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। গ্রহণে আমরা এক প্রতীতি লাভ করি; স্মরণে এক প্রতীতিধারা[৭] বা প্রতীতিরাশি[৭] আমরা পাই, এবং প্রত্যভিজ্ঞানে এক বিগ্রহে[৬] উপনীত হই। প্রত্যেক বিষয়জ্ঞানেই এই সব বর্তমান রহিয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, গ্রহণেই যখন বিষয়ের প্রতীতি হইয়া গেল তখন স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানের কি প্রয়োজন? কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, শুধু গ্রাহণিক প্রতীতিতেই বিষয় জ্ঞান হয় না। গ্রহণের ফলে ত আমরা একটি মাত্র প্রতীতি পাই। আমরা কখনই মনে করি না যে

১। Apprehension.
২। Reproduction.
৩। Recognition
৪। Intuition.
৫। Imagination
৬। Concept, *Begriff*
৭। Series

বিষয়ের স্বরূপ এই প্রতীতিমাত্রে পর্যবসিত। যখন ফুল বলিয়া আমার কোন বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন আমি বুঝি বিষয়টি আমার বর্তমান প্রতীতির আগেও ছিল এবং পরেও থাকিবে। কিন্তু এই আগে ও পরে থাকার অর্থ কি? জ্ঞানের দিক হইতে বলিতে গেলে এইই বলিতে হয় যে, আমার বর্তমান প্রতীতির আগে ফুলটির আরো অনেক প্রতীতি হইয়াছিল বা হইতে পারিত, এবং পরে হইবে বা হইতে পারিবে। অতএব অনেক প্রতীতির সমাবেশই বিষয়ের কল্পনা হইতে পারে। আরেক কথা; আমি যখন কোন বিষয়কে ফুল বলিয়া প্রত্যক্ষ করি, তখন আমার মন একেবারে ফুলজ্ঞানশূন্য থাকে না। সকলেই জানেন, আমাদের বর্তমান প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অনুভব আমাদের পূর্বানুভব ও স্মৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আগেও আমার ফুল প্রতীতি হইয়াছিল বলিয়া সে প্রতীতিকে স্মরণ করিয়া বর্তমান প্রতীতিকে ফুলবিষয়ক প্রতীতি বলিয়া চিনিতে পারিলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাতিরেকে কোন প্রত্যক্ষই হয় না।।

আমরা যখন কোন লৌকিক বিষয়কে প্রত্যক্ষ করি, তখনই তাহাকে ফুল, বৃক্ষ, ঘর ইত্যাদিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ফুল, বৃক্ষ, ঘর প্রভৃতি সব প্রতীতিতেই সামান্যজ্ঞান নিহিত থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফুল জ্ঞানকে ধরা যাউক। ফুল ত অনেকগুলি (ফুল জাতীয়) পদার্থের সাধারণরূপ ব্যতীত আর কিছু নয়। অনেক প্রতীতির ভিতর দিয়া, বা অনেক প্রতীতির ফলেই, এই সাধারণ প্রতীতি বা সামান্য জ্ঞান হইতে পারে। ইহাকেই (ইহা দ্বারা বিশেষভাবে বিষয়কে গ্রহণ করা হয় বলিয়া) বিগ্রহ বলা হইয়াছে। এক অর্থে বিগ্রহই প্রত্যক্ষের প্রাণ বলিতে পারা যায়। কি দেখিলাম যদি বলিতে না পারি, তাহা হইলে দেখা দেখাই হয় না। কি দেখা হইল বলিতে গেলেই সামান্যজ্ঞান বা বিগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু বাস্তবিক বিগ্রহের দ্বারা কি হয়? বিগ্রহ অনেকগুলি প্রতীতিকে নিয়মবদ্ধভাবে[১] একই প্রতীতিতে মিলিত করিয়া দেয়। বহু প্রতীতির নিয়মিত ঐক্য সাধনই বিগ্রহের কাজ; এবং এই নিয়মবদ্ধ ঐক্যের দ্বারাই বিষয়জ্ঞান সম্ভবপর হয়। বিষয়টা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করি।

১। **According to a rule.**

যখন ফুলের প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ কোন পুরোবর্তী পদার্থকে ফুল বলিয়া বুঝি, তখন সেই ফুলবোধের মধ্যে অনেকগুলি প্রতীতি নিয়মিতভাবে মিলিত হইয়া আছে বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখিতেছি, ফুল বলিতে গাছ, মাছ বা চাঁদের কথা ভাবি না; ঐসব প্রতীতি ফুল প্রতীতির কোন অঙ্গই হয় না। শুধু ফুলজাতীয় যে সব প্রতীতি হইয়া গিয়াছে, সে সব প্রতীতির সঙ্গেই বর্তমান ফুলপ্রতীতির কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এখন কোন পদার্থকে যখন ফুল বলিয়া বুঝি, তখন আমার বর্তমান প্রতীতির সঙ্গে পূর্বানুভূত অনেকগুলি (ফুল জাতীয়) প্রতীতির ঐক্য আছে বুঝি। কিন্তু সে ঐক্য কোথায়?

বলা যাইতে পারে, সব ফুলের মধ্যে ফুলত্ব বলিয়া এক সাধারণ ধর্ম আছে, এবং তাহার জ্ঞান হওয়ার নামই সব ফুল প্রতীতির মাঝে যে ঐক্য আছে, তাহা জানা বা বোঝা। কিন্তু ফুলত্বই বা কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, ফুলত্ব একটি অখণ্ডোপাধি পদার্থ, ইহাকে আর কিছুর দ্বারা বুঝাইতে পারা যাইবে না, আপনা আপনি—অর্থাৎ ফুলত্বকে ফুলত্ব বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু ফুলকে যদি ফুলত্ব দিয়া বুঝিতে হয়, এবং ফুলত্ব যে কি, তাহা যদি বলিতে না পারি, তাহা হইলে ত ফুল বলিতে বেশী কিছু বোঝা গেল না। সুতরাং কাণ্ট্, ফুলত্বরূপ এক অখণ্ড জাতির সাহায্য না নিয়া ফুলবিগ্রহের অন্য প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি অবশ্য বলিবেন, সব ফুলজ্ঞানেই ফুলবিগ্রহ বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু এই বিগ্রহের অর্থ কতকগুলি প্রতীতির নিয়মিত ঐক্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফুল বলিতে আমরা এক অবিশ্লেষ্য প্রতীতি বুঝি না। নানা বিশিষ্ট প্রকারের প্রতীতি এক বিশিষ্টভাবে সমাবদ্ধ হইয়া আমাদের ফুল (বিষয়ক) প্রতীতি গঠিত করে। যখন ফুল বলিয়া কিছু দেখি, তখন কতকগুলি বিশিষ্ট প্রকারের প্রতীতি আমাদের মনে জাগ্রত হয়। আমরা জানি, ফুলের পাপড়ি আছে, তাহা লোহার মত শক্ত নয়; ফুল গাছ থেকে জন্মায়, পাথরে জন্মায় না; কোন গাছ বা লতার গায়ে লাগিয়া থাকে, যখন খুসী উড়িয়া বেড়ায় না। এই প্রকারের অনেকগুলি প্রতীতি নিয়মিত ভাবে একত্র মিলিত করিয়াই আমরা ফুলের বিগ্রহ তৈরী করি। এই নিয়মবদ্ধ ঐক্যের বা ঐক্যবোধের নামই বিগ্রহ। যেখানে এ ঐক্যের অভাব, সেখানে বিগ্রহ হয় না, সুতরাং বিষয়জ্ঞানও হয় না। যাহাকে

আমরা ফুল বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাকে হাতে নিয়া যদি দেখি, লোহার মত শক্ত বা পাথরের মত ভারী, অথবা হাতে নিতে গেলে যদি তাহা উড়িয়া পলাইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, আমাদের লক্ষিত বস্তুকে ফুল মনে করা ভুল হইয়াছে, এবং আমাদের তৎকালীন ফুলবোধের দ্বারা কোন বিষয়কে আমরা জানি নাই।

আমাদের প্রত্যেক বিষয়বোধের মূলেই এই নিয়মবদ্ধ ঐক্য বর্তমান আছে। যেখানে কোন নিয়মিত ঐক্য পাওয়া যায় না, সেখানে বিষয়জ্ঞানই হয় না। যে বরফ আজ সাদা, কাল লাল, আজ ঠাণ্ডা কাল গরম, সে বরফ বরফই নয়। বিষয়ের নির্দিষ্ট নিয়মিতরূপ না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞান হইত না। কোন বস্তু যে কি, তাহা বলিতেই পারিতাম না। বিষয়গত নিয়ম না থাকিলে আমরা চেতনাহীন হইয়া যাইতাম, একথা বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে, বৈজ্ঞানিক অর্থে আমাদের কোন বিষয়জ্ঞান হইত না। আমরা দণ্ড বলিতে অনেক কিছুই বুঝি, যেমন ইহা দ্বারা কাহাকেও আঘাত করিতে পারা যায়। ইহার মধ্যে এও বুঝি যে দণ্ড আপনা হইতে চলিতে পারে না। কোন বস্তুকে দণ্ড মনে করিয়া তার কাছে গেলে যদি তাহা চলিতে আরম্ভ করে, তবে বুঝি যাহাকে দণ্ড মনে করিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিক দণ্ড নয়। আমাদের দণ্ডবোধে যে ঐক্যের জ্ঞান হয়, সে ঐক্যে গতিশীলতার স্থান নাই বলিয়া 'গতিশীল দণ্ড' কোন বিষয়েরই জ্ঞান নয়। সব সময়ই বিষয়জ্ঞানে এরকম ঐক্যের বা নিয়মের জ্ঞান বর্তমান থাকে বলিয়াই যখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি, তখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠি। এই নিয়ম বা ঐক্যের কল্পনা আমাদের মনে না থাকিলে, যাহাকে ফুল মনে করিয়াছি, তাহা উড়িয়া গেলে, কিংবা যাহাকে দণ্ড মনে করিয়াছি, তাহা চলিতে থাকিলে, আমাদের অবাক হইবার কোন কারণই থাকে না। অতএব আমাদের স্বীকার করিতে হয়, যখনই আমাদের বিষয়জ্ঞান হয়, তখনই আমরা অনেকগুলি ভূত ও ভাবী প্রতীতিকে নিয়মবদ্ধভাবে একত্র মিলিত করিয়া থাকি। এই মেলন বা একীকরণ ব্যতিরেকে কোন বিষয়জ্ঞানই হয় না। এই মেলন বুদ্ধির মেলাপক শক্তির বলেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। সুতরাং এক অর্থে বুদ্ধিই বিষয়কে গঠিত করে বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধিক একীকরণের ফলেই বিষয় পাওয়া যায়। এই একীকরণ কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকারেই হইয়া থাকে। এই একীকরণের প্রকারভেদকেই কাণ্ট ক্যাটিগরি বা বোধাকার[১] নাম দিয়াছেন। অনেক সময় ইহাদিগকে বিগ্রহ[২] ও বলিয়াছেন। আমাদের অনুভবলব্ধ প্রাতীতিক বহুতা কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকারের বৌদ্ধিক একীকরণের ফলে বিষয়ে পরিণত হয়। প্রথমতঃ অনুভব[৩] দ্বারাই প্রতীতি[৪] লাভ করি। সব প্রতীতিতেই একরকমের বহুত্ব থাকে, তাহাদিগকে দ্রব্যগুণ, কার্যকারণ প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকারে একীকৃত করিয়া বুদ্ধি[৫] বিষয় গঠিত করে। সুতরাং দ্রব্যগুণাদি বোধাকার বা বৌদ্ধিক-প্রকার[৬] যে বিষয়ে লাগিবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এই সব বোধাকার বৌদ্ধিক একীকরণের প্রকারভেদ মাত্র, এবং এই রকম একীকৃত না হইয়া যখন বিষয়ই সম্ভবপর হয় না, তখন বিষয়মাত্রে যে বোধাকার লাগিবেই, সে কথা সহজে বোঝা যায়। এতাবৎ যাহা বলা হইল, তাহাই বোধাকার বা বৌদ্ধিক প্রকারের প্রামাণ্যের পক্ষে যথেষ্ট বলা যাইতে পারে। এই প্রমাণে বুদ্ধি ক্রিয়ার সমধিক বিচার আছে বলিয়া ইহাকে বুদ্ধিগত প্রমাণ[৭] বলা হইয়াছে। বিষয়ের দিক হইতে বিচার করিয়াও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বাস্তবিক বিষয়গত প্রমাণ[৮] ও বুদ্ধিগত প্রমাণে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। বিষয়গত প্রমাণে বুদ্ধিক্রিয়ার উল্লেখ নাই, কিংবা বুদ্ধিগত প্রমাণে বিষয়ের উল্লেখ নাই, তাহা নহে। কোন প্রমাণে কিসের বিচার বেশী করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই নামভেদ হইয়াছে। যাহা হউক বিষয়ের দিক্ ধরিয়া এ সম্বন্ধে আরো কিছু বিচার করা যাউক।

দেখা গিয়াছে বিগ্রহ ব্যতিরেক বিষয় বোধ হয় না। কতকগুলি প্রতীতির একীকৃত রূপের নামই বিগ্রহ। বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়াই বিষয় দাঁড়ায়। কোন বিগ্রহে একীকৃত (বিগৃহীত) না হইলে প্রতীতি সব আলগা আলগা পড়িয়া থাকে; তাহাতে কোন বিষয়ই গঠিত হয় না। সুতরাং বিষয়-বোধের জন্য বিগ্রহ অত্যাবশ্যক। কিন্তু বিষয় ছাড়া কি বিগ্রহ দাঁড়াইতে পারে? বিগ্রহ বলিলেই ত প্রশ্ন উঠে কাহার বিগ্রহ? ঘট, পট একটা কিছুর

১। Category
২। Concept
৩। Intuition
৪। *Vorstellung*=Representation
৫। Understanding
৬। Category
৭। Subjective Deduction
৮। Objective Deduction

বিগ্রহ বলিতে হয়। বিগ্রহ হইবে, অথচ কোন বিষয়ের বিগ্রহ হইবে না, এমন কথা সম্ভবপর নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিগ্রহ ব্যতীত যেমন বিষয় বোধ হয় না, তেমনি বিষয় ছাড়াও বিগ্রহের জ্ঞান হয় না। বিষয়ের মূলে বিগ্রহ, না বিগ্রহের মূলে বিষয়, একথা সুস্পষ্টভাবে বলিতে না পারা গেলেও, তাহারা যে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে, একথা অন্ততঃ বলা যাইতে পারে। আর বিষয়ের অবধারণই যে বিগ্রহের কাজ, তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায়। এখন দেখা যাউক জ্ঞান ব্যাপারে বিষয়ের স্থান কোথায়? প্রথমতঃ সহজেই বোঝা যায় যে, বিষয় ছাড়া জ্ঞানই হয় না। বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের কোন অর্থই থাকে না। যে জ্ঞানের কোন বিষয় নাই, সে জ্ঞান জ্ঞানই নয়। তারপর দেখিতে পাই বিষয় দ্বারা জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জ্ঞান ত এক মানসিক ব্যাপার; এই ব্যাপার বিষয়নিরপেক্ষ হইলে যখন খুসী, যাহা তাহা জানিতে পারা যাইত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সম্ভবপর নহে। স্থান ও কাল বিশেষে শুধু বিষয় বিশেষেরই জ্ঞান হইতে পারে, বিষয়ান্তরের জ্ঞান হইতে পারে না। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক জিনিস আমাদের দেখিতে শুনিতে হয়; আবার অনেক সাধ্যসাধনার ফলেও আমাদের বাঞ্ছনীয় বস্তু অনেক সময় আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না। আমাদের জ্ঞান ব্যাপার যে যদৃচ্ছাক্রমে না চলিয়া বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলে, তাহার কারণ বিষয়। কোন নির্দিষ্ট স্বরূপের বিষয় বর্তমান থাকে বলিয়াই যখন খুসী যাহা তাহা জানিতে পারা যায় না। যাহাকে ঘট বলিয়া জানিতেছি, তাহাকে এই মুহূর্তে শক্ত ও পর মুহূর্তে নরম বলিয়া জানিব না। ঘট পাথরের মত শক্ত না হইলেও কখনই তুলার মত নরম হইবে না; মুদ্গরাঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু গলিয়া যাইবে না, বা উড়িয়া যাইবে না। এই নিয়মবদ্ধতার একদিক আমরা বিগ্রহের আলোচনায় দেখিতে পাইয়াছি। বিগ্রহই বিভিন্ন প্রতীতিকে নিয়মবদ্ধভাবে একীকৃত বা একত্রিত করিয়া থাকে এবং বিষয়েই তাহার একত্রিত বা একীভূত হইয়া থাকে। যে প্রতীতিনিচয়ের একীভাবে বিষয় গঠিত হয়, তাহাতে এক-প্রকারের অবশ্যম্ভবতা[১] আমরা দেখিতে পাই। যে ক, খ, গএর নিয়মিত মেলনে একটি বিষয় গঠিত হয়, সে মেলনে ক, খ, বা গএর স্থান থাকিবেই থাকিবে। আমরা বিষয়টিকে ক খ-গ বলিয়া জানিতে ভুল করিতে পারি; সেইক্ষেত্রে ক-খ এর সঙ্গে একত্র গএর স্থান সর্বদা নাও হইতে পারে। গএর স্থানে হয়ত চ

১। Necessity

হইবে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, যদি ক খ গ উপাদানে কোন বিষয় গঠিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়ে ক, খ বা গএর কোনটাই না থাকিয়া পারিবে না। এই যে 'না থাকিয়া না পারা' বা অবশ্যম্ভবতা, তাহা কোথা হইতে আসিল? প্রত্যেক বিষয়ের কল্পনাতেই এই অবশ্যম্ভবতার কল্পনা আসে। ইহাতেই বিষয়ের বিষয়ত্ব। কান্টের মতে সব অবশ্যম্ভবতার মূলেই কোন না কোন অলৌকিক কারণ[১] বর্তমান থাকে। লৌকিক বা প্রাকৃত কারণের দ্বারা অবশ্যম্ভবতার উৎপত্তি হয় না। লৌকিক উপায়ে শুধু কোথায় কি আছে বা ঘটে, তাহাই বলিতে পারা যায়; কিন্তু 'থাকিবেই' বা 'ঘটিবেই' এমন কথা বলিতে পারা যায় না। তার জন্য অলৌকিক কারণের প্রয়োজন। যে অলৌকিক কারণের দ্বারা বিষয়গত অবশ্যম্ভবতার উৎপত্তি কান্ট্ করিতে চান, তাহাকে তিনি 'অলৌকিক সম্বিজ্ঞান[২] আখ্যা দিয়া দিয়াছেন। এই অলৌকিক সম্বিজ্ঞানই কান্টীয় দর্শনের, অন্ততঃ কান্টীয় মতে জ্ঞানজগতের, মূলতত্ত্ব।

এই অলৌকিক সম্বিজ্ঞান বস্তুটি কি, বিচার করিয়া দেখা যাউক। আমরা দেখিয়াছি, বিগ্রহের দ্বারা বিভিন্ন প্রতীতির একীকরণের ফলে বিষয় লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সব প্রতীতি ত একসঙ্গে সাক্ষাৎ অনুভবে পাওয়া যায় না। স্মরণের দ্বারাই বেশীর ভাগ প্রতীতির উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্মরণের অর্থ পূর্বানুভূত প্রতীতির কল্পনায় পুনরুদ্বোধন। কিন্তু পূর্বানুভূত প্রতীতি শুধু পুনরুদ্বুদ্ধ হইলেই কাজ চলে না। কল্পনায় উদ্বুদ্ধ প্রতীতি ও পূর্বানুভূত প্রতীতি যে একই প্রতীতি, তাহা বুঝিতে হইবে। 'এই' প্রতীতিকে 'সেই' প্রতীতি বলিয়া চিনিতে পারা উচিত। ইহাকে পারিভাষিক ভাষায় 'বিগ্রহে-প্রাত্যভিজ্ঞানিক ঐক্য' বলা হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞান ব্যতিরেকে শুধু পুনরুদ্বোধনের দ্বারা জ্ঞানের কোন সাহায্য হয় না। এবং এই প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভবপর হওয়ার জন্য, যে জ্ঞানে[৩] প্রথম প্রতীতি ভাসিয়াছিল, সেই জ্ঞানেই দ্বিতীয় প্রতীতির উদয় হওয়া আবশ্যক। আমি কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিব আর তুমি তাহা স্মরণ করিবে বা তোমার তাহার প্রত্যভিজ্ঞান হইবে, এরকম কখনই হয় না। সেই রকম এক জ্ঞানে[৩] অনুভব, ও জ্ঞানান্তরে স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। একই জ্ঞানে[৩] অনুভব, স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞান হওয়া উচিত। এই জ্ঞানগত ঐক্য ব্যতিরেকে স্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞান সম্ভবপর নয়।

১। Transcendental ground
২। Transcendental Apperception
৩। Consciousness

আমরা বলিয়াছি, বুদ্ধি বিভিন্ন প্রতীতিকে নিয়মবদ্ধ ভাবে একত্র মিলাইয়া বিষয় গঠিত করে। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, দুই বা ততোধিক প্রতীতি একত্র মিলিত হইতে হইলে যে বুদ্ধির মেলাপক ক্রিয়ার দ্বারা তাহা সম্ভবপর হয়, তাহাকে অর্থাৎ সেই বুদ্ধিকে এক হইতে হইবে। প্রথম প্রতীতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে যদি বুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রতীতির সঙ্গে প্রথম প্রতীতির মেলন কখনও সম্ভবপর নয়। প্রথম প্রতীতি যে বুদ্ধির কাছে আসিল, দ্বিতীয় প্রতীতি সেই বুদ্ধির কাছে আসিলেই সে বুদ্ধি এক থাকিয়া তাহাদের ঐক্য সম্পাদন করিতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের একীকৃত করিয়া বিষয় গঠিত করিতে পারে। একীকরণের জন্য একই বুদ্ধির প্রয়োজন, বুদ্ধি নিজে এক থাকিলে দুই বা ততোধিক প্রতীতির ঐক্য সম্পাদন করিতে পারে। বুদ্ধি নিজে ভিন্ন হইয়া গেলে, অর্থাৎ এক বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া ভিন্ন বুদ্ধি উদিত হইলে, তাহাদের দ্বারা কোন কিছুর ঐক্য হইতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি বিষয় বোধের মূলে গ্রহণ, স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞান বর্তমান রহিয়াছে। স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানের জন্য যে-আমি প্রথমে কোন কিছু গ্রহণ করিলাম, সে-আমিকেই স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানের বেলায় বিদ্যমান থাকিতে হয়। আমার প্রাকৃত জ্ঞানে যে সব প্রতীতি প্রবিষ্ট হইয়া আমার জ্ঞানকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে, সে সব প্রতীতিই আমার প্রতীতি। প্রত্যেক প্রতীতির সঙ্গেই স্পষ্টভাবে 'আমি বোধ' বর্তমান না থাকিলেও প্রত্যেক প্রতীতিকেই 'আমি জানি'[১] বলিয়া বিশেষিত করা যাইতে পারে। 'আমার প্রতীতি হইতেছে' এবং 'আমি প্রতীতিকে জানিতেছি' প্রায় একই কথা। শেষ বিচারে দেখা যাইবে, আমাদের শুধু প্রতীতি নিয়াই কারবার। প্রতীতিকেই নানা ভাবে মিলাইয়া মিশাইয়া নানা প্রকারের বিষয় গঠিত করি। আর প্রতীতি সব সময়ই আমার তোমার বা অন্য কারো হইবে। যে প্রতীতি আমার বা তোমার বা অন্য কারোই নয়, অর্থাৎ যে প্রতীতি কোন জ্ঞানীয় ঐক্যে স্থান পাইতে পারে না, সে প্রতীতির থাকা না থাকায় জ্ঞানজগতের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ঐ রকম নিরাশ্রয় প্রতীতি সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয় না। আমরা যে সব প্রতীতি পাই, এবং যে সব প্রতীতি আমাদের জ্ঞানের কাজে লাগিয়া থাকে, সে সবই কোন না কোন জ্ঞাতার

১। I think.

জ্ঞানে পড়িয়া থাকে। জ্ঞাতা বা 'আমি' বলিতে ত তাহাকেই বুঝায়, যাহা দ্বারা বিভিন্ন জ্ঞানের বা প্রতীতির ঐক্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমি থাকাতেই (অর্থাৎ আমি এক থাকাতেই, দুই 'আমি'র কোন অর্থ হয় না,) বিভিন্ন প্রতীতির একীকরণ সম্ভব হয়। সুতরাং প্রত্যেক প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে 'আমি জানি' একথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও 'আমি জানি' বলার স্বরূপ-যোগ্যতা আছে। আমাকে (জ্ঞাতাকে) আশ্রয় করিয়াই যখন প্রতীতি উদ্ভূত হয়, তখন প্রত্যেক প্রতীতিকেই 'আমি জানি' বলিতে স্বরূপতঃ কোন বাধা হইতে পারে না।

কিছু আগে এক জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, একই জ্ঞানে[১] বিভিন্ন প্রতীতি ভাসিলে তাহাদের ঐক্য হইতে পারে। বিষয়ের ঐক্যের জন্য জ্ঞানের ঐক্যের প্রয়োজন। তার পর বুদ্ধির[২] কথা বলা হইল। যে বুদ্ধির মেলাপক ক্রিয়ার[৩] দ্বারা বিভিন্ন প্রতীতির ঐক্য সম্পাদিত হইবে, সে বুদ্ধিকে একই থাকিতে হইবে। এখন আবার বলিলাম, আমি[৪] এক না থাকিলে আমার বলিয়া কোন জ্ঞানই হইবে না; আর যে জ্ঞানকে কেহই 'আমার' বলিতে পারিবে না, সে জ্ঞান জ্ঞানই নয়। এই সব বিভিন্ন কথায় বাস্তবিক বিভিন্ন বিষয় প্রতিপাদিত হইতেছে না; একই বস্তু বিভিন্ন ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র।

প্রথমে জ্ঞানের কথাই বিচার করা যাউক। বলা হইয়াছে, একই জ্ঞান থাকিলেই বিষয় বোধ হইতে পারে। কিন্তু সে জ্ঞানটি কিরূপ? যে সব জ্ঞান আমরা জানি, তার সবটিইত ভিন্ন ভিন্ন। আমরা ঘট জানি, পট জানি, ঘরবাড়ী গাছপালা জানি; কিন্তু এসব প্রাকৃত বা লৌকিক জ্ঞানের কোনটিই একভাবে বর্তমান থাকে না। অথচ এক জ্ঞান না থাকিলে কোন বিষয়ই যে জানা যায় না, অর্থাৎ কোন লৌকিক জ্ঞানই সম্ভবপর নয়, সে কথাও ত মিথ্যা নয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে জ্ঞানের একত্বের ফলে অন্য সব লৌকিক জ্ঞান সম্ভবপর হয়, সে জ্ঞান লৌকিক জ্ঞান নয়। সেই জন্যই কাণ্ট্ তাহাকে 'অলৌকিক সম্বিজ্ঞান'[৫] আখ্যা দিয়াছেন। এই অলৌকিক সম্বি-

১। Consciousness.
২। Understanding
৩। Synthetic activity
৪। I
৫। Transcendental Apperception

জ্ঞানের ঐক্যের ফলে, অথবা কাণ্টের কথায়, সম্বিজ্ঞানের অলৌকিক ঐক্যের[১] ফলে, অন্য সব জ্ঞান সম্ভবপর হয়। দেখা যাইতেছে, এই সম্বিজ্ঞান ঘটজ্ঞান পটজ্ঞানের মত কোন জ্ঞানই নয়। ইহা এক অলৌকিক জ্ঞানীয় শক্তি[২] বিশেষ। এই শক্তির মাহাত্ম্যেই আমাদের সব জাগতিক জ্ঞান হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানে[৩] আমাদের যে সব মানসিক শক্তির আলোচনা থাকে বা হইতে পারে, সম্বিজ্ঞানকে সে রকম কোন বাস্তবশক্তি মনে করিলে কিন্তু ভুল হইবে। এ শক্তি মনেরও অতীত। এই শক্তির বলে যেমন সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হয়, তেমন মনের ও তাহার শক্তিরও জ্ঞান হইয়া থাকে। এই শক্তির জ্ঞান জগতের ভিত্তি। এই মূল শক্তিকে মানসিক অন্যান্য শক্তির মধ্যে এক শক্তি বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। এই শক্তিকে অন্তর্নিরীক্ষণে[৪] কখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না। সব প্রত্যক্ষই ইহার বলে হয়। শুধু দার্শনিক বিচারে আমরা বুঝিতে পারি, এরকম এক মৌলিক শক্তি না মানিলে, এক জ্ঞানীয় একীকরণ শক্তি ধরিয়া না নিলে, কোন জ্ঞানেরই উপপত্তি হয় না।

যে শক্তির বলে আমাদের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে বুদ্ধি[৫] বলা যায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, অলৌকিক সম্বিজ্ঞান আর বুদ্ধি একই পদার্থ। তবে বুদ্ধির ক্রিয়া প্রাকৃত জ্ঞানের ভিতরেও দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধির দ্বারাই নানা লৌকিক বিচার[৬] করা হইয়া থাকে। অনেক কিছু দেখিয়া শুনিয়া লৌকিক বিচার করিতে হয়। এখানে যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা শুদ্ধবুদ্ধি[৭] নয়, কেননা তাহা দেখা শোনার উপর নির্ভর করে। যে বুদ্ধির বলে দেখাশোনাই সম্ভবপর হয়, তাহাকেই অলৌকিক সম্বিজ্ঞান বা শুদ্ধবুদ্ধি[৭] বলা যাইতে পারে।

এই বুদ্ধিকেই আবার 'আমি' বলা হইয়াছে। আমি বলিতে স্থূল দৃষ্টিতে এক দেহধারী মনুষ্য বুঝায়। তাহার কথা এখানে বলা হইতেছে না। এমন কি, সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, বাসনা কল্পনা, ভাবনা চিন্তার যে জ্ঞানময় সমষ্টিকে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে 'আমি' বলিতে পারা যায়, সে

১। Transcendental unity of Apperception
২। Faculty
৩। Psychology
৪। Introspection
৫। Understanding
৬। Empirical Judgment
৭। Pure Understanding

'আমি'র কথাও এখানে হইতেছে না। ভাবনা কল্পনা প্রভৃতির সমষ্টিরূপ আমি এক লৌকিক পদার্থ। ইহাকে লৌকিক আমি[১] বলা যাইতে পারে; ইহার আলোচনা লৌকিক মনোবিজ্ঞানে হইয়া থাকে। যে 'আমি'র কথা এখানে হইতেছে, সে অলৌকিক আমি[২]। সে আমির একত্বের জোরেই বিভিন্ন প্রতীতি একীকৃত বা মিলিত হইয়া বিষয় গঠিত করিতে পারে। সব প্রতীতির সঙ্গেই এই আমি বর্তমান থাকাতে তাহাদের একীকরণ ও বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়। ইহার জন্যই সব প্রতীতিকেই 'আমি জানি' বলিয়া বিশেষিত করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা সব প্রতীতিকেই 'আমি জানি' বলিয়া সজ্ঞানে গ্রহণ করি। আমাদের অসংখ্য নানা প্রতীতি অবিরত হইয়া যাইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে 'আমি জানি' এই কথা নিশ্চয়ই আমাদের মনে ভাসিতেছে না। কিন্তু প্রতীতি যখন আমার, (এবং আমার না হইলে আমার কাছে প্রতীতির কোন অর্থ ই থাকে না), তখন প্রত্যেক প্রতীতিরই 'আমি জানি' বলিয়া বিশেষিত হইবার স্বরূপ-যোগ্যতা আছে।

যাহা হউক, এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, অলৌকিক সম্বিজ্ঞান বা সম্বিজ্ঞানের আলৌকিক ঐক্য, শুদ্ধবুদ্ধি বা আমি—এই সবই একই পদার্থের বিভিন্ন নাম মাত্র। ইহাকে কখন কখন স্বসম্বিৎ[৩] ও বলা হইয়াছে। আসল কথা বুঝিতে হইবে, আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের মূলে যে সব প্রতীতি রহিয়াছে, সে সবই একই সম্বিজ্ঞান, বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিষয়। স্বসম্বিৎএর দ্বারা এই জ্ঞানীয় ঐক্যকে নির্দেশ করা হয়।

এই যে সম্বিজ্ঞানের ঐক্যের কথা বলা হইল, সে ঐক্যের স্বরূপ কি, বুঝিতে হইবে। কাণ্ট্‌ যে বারটি বোধাকার বা বৌদ্ধিক প্রকারের দ্বারা জ্ঞান হয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের একটি একত্ব। সেই একত্ব এবং সম্বিজ্ঞানের একত্ব কি এক? আমাদের বুঝিতে হইবে যে, এই দুই একত্ব[৪] এক পদার্থ নয়। একত্বরূপ বোধাকার বিষয়েই প্রযোজ্য। বিষয় ত সম্বিজ্ঞানের একীকরণের ফলেই গঠিত হয় বা উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিষয়গত ঐক্য আর সম্বিজ্ঞানের ঐক্য এক জিনিস নয়। অর্থাৎ যে অর্থে

১। Empirical Ego
২। Transcendental Ego
৩। Self-consciousness
৪। Unity

বিষয়কে এক বা বহু বলা যাইতে পারে, সে গাণিতিক বা লৌকিক অর্থে সম্বিজ্ঞান এক নয়। সম্বিজ্ঞানের ঐক্যকে অলৌকিক ঐক্য বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে আকারগুলিকে যদি সাম্বিজ্ঞানিক একীকরণের প্রকারভেদ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায়, সম্বিজ্ঞানের ঐক্য এবং তার এক বিশিষ্ট প্রকার (একত্ব) কখনই এক হইবে না। কেননা যে কোন সামান্যের[১] রূপ তার কোন এক বিশেষের[২] সমতুল্য হয় না।

একই সম্বিজ্ঞান, বুদ্ধি বা আমি আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের মূলে থাকিবে। কিন্তু কি রকমভাবে এক থাকিবে? এক নির্বিকার নিষ্ক্রিয় আমি বা জ্ঞান অভিন্নভাবে সব অবস্থায় বর্তমান—ইহাই কি বলা হইতেছে? বিষয়গত ঐক্যের সঙ্গে যার যোগাযোগ নাই, এরকম নিঃসঙ্গ ঐক্যের[৩] কথা এখানে বলিতেছেন না। সম্বিজ্ঞানের যে ঐক্যের ফলে বিষয়গত ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে, সে ঐক্যই এখানে প্রতিপাদ্য বুঝিতে হইবে, অন্য ঐক্য নয়। প্রতীতির যে নিয়মবদ্ধ ঐক্যের বলে বিষয় সৃষ্টি হয়, সে ঐক্য শুধু সাম্বিজ্ঞানিক একীকরণের ফলেই সম্ভবপর হয়। বৈষয়িক একীকরণের জন্য সম্বিজ্ঞানের ঐক্য আবশ্যক। বৈষয়িক একীকরণেই সাম্বিজ্ঞানিক ঐক্যের পরিচয় ও প্রমাণ। সাম্বিজ্ঞানিক ঐক্যের আর কোন অর্থ নাই। বিভিন্ন প্রতীতির যোগে বা সংশ্লেষণের দ্বারা (একীকরণের দ্বারা) বিষয় সৃষ্টি করে বলিয়া সম্বিজ্ঞানের ঐক্যকে যৌগিক বা সাংশ্লেষিক ঐক্য[৪] বলা হইয়াছে। বিষয় গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রতীতিকে একত্র মিলিত বা সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিতে হইলে সম্বিজ্ঞানের যে স্বরূপের প্রয়োজন, তাহাকে তাহার ঐক্য বলা হইয়াছে। এ ঐক্য সংযোজনশীল ঐক্য।

আরেক রকম ঐক্যের কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি। সব প্রতীতির মধ্যে আমরা যদি এমন এক পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া পাই, যাহা প্রত্যেকের মধ্যেই এক অভিন্ন অবস্থায় বর্তমান থাকে, তাহা হইলেও এ রকমের ঐক্য পাওয়া হয়। এই ঐক্যবোধের জন্য দুই বা ততোধিক প্রতীতির সংযোজনের প্রয়োজন হয় না, প্রত্যেকের মধ্যেই সেই এক পদার্থ পাওয়া যায়। আমরা যদি মনে করি, প্রত্যেক প্রতীতির মধ্যেই অভিন্ন অবস্থায় 'আমি' বর্তমান

১। Genus
২। Species
৩। Analytical unity
৪। Synthetic unity

আছে, এক প্রতীতির 'আমি' অন্য প্রতীতির 'আমি' হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন, আমি = আমি, তাহা হইলে 'আমি'র যে ঐক্যের কল্পনা হয়, সে ঐক্য সাংশ্লেষিক[১] নয়, বৈশ্লেষিক[২] মাত্র। কান্ট্ সে রকম ঐক্যের কথা বলিতেছেন না। দুই বা বহু প্রতীতির একত্র সংযোজনের মধ্যেই যে ঐক্য পাওয়া যায়, শুধু সে ঐক্যই কান্ট্ অলৌকিক সম্বিজ্ঞানের বেলায় মানিতেছেন।

ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে যাঁহারা সুপরিচিত, তাঁহারা বেদান্তের সাক্ষী বা সাংখ্যের পুরুষের কল্পনার সাহায্যে অলৌকিক সম্বিজ্ঞানের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তবে দুইটি বিষয়ে ভেদের কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। পুরুষ বা সাক্ষী না থাকিলে যেমন জ্ঞান হয় না, তেমন অলৌকিক সম্বিজ্ঞান ব্যতিরেকেও জ্ঞান সম্ভবপর নয়। কিন্তু পুরুষ বা সাক্ষী একই অভিন্ন অবস্থায় সব প্রতীতিতে বর্তমান থাকে, তাহাদিগকে উদ্ভাসিত করাই তাহার কাজ, তাহাদিগকে সংযোজিত করা তাহার কাজ নয়। আরেক কথা, পুরুষ বা সাক্ষীকে আমরা 'আছে' বলিয়া মনে করিতে পারি। অলৌকিক সম্বিজ্ঞানকে সে রকম সত্তাবান[৩] কোন পদার্থ ই বলা হইতেছে না। জ্ঞানব্যাপারের উপপত্তির জন্য দার্শনিক বিচারে এরকম একটি জ্ঞানীয়[৪] পদার্থ উপলব্ধ হয় বা মানিতে হয়, এই পর্যন্ত। ইহা হইতে তাহাকে কোন রকমের বাস্তব সত্তা দেওয়া চলে না। আমি তুমি আছি, ঘটপটাদিও আছে, কিন্তু সম্বিজ্ঞানকে সে রকম আছে বলিতে পারা যায় না।

আমরা বৌদ্ধিক প্রকারের[৫] বিষয়গত প্রামাণ্যের[৬] বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কান্ট্ দেখাইলেন, আমাদের সমস্ত বিষয়জ্ঞানের মূলে সম্বিজ্ঞানের অলৌকিক ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রশ্নের কি সমাধান হইল?

যে বারটি বোধাকারের[৭] কথা কান্ট্ বলিয়াছেন, সেগুলি বাস্তবিক আমাদের বিষয়বোধের প্রকার ভেদ মাত্র। সেগুলিকে সেইজন্য বৌদ্ধিক-প্রকার[৫]ও বলা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, সাম্বিজ্ঞানিক একীকরণ না

১। Synthetic
২। Analytic
৩। Real
৪। Logical
৫। Forms of understanding
৬। Objective Validity
৭। Categories

হইলে কোন বিষয়ই গঠিত হয় না। এই একীকরণ বা মেলন[১] সাধারণ আখ্যা মাত্র। বিভিন্ন প্রকারে এই একীকরণ সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে সব বিভিন্ন প্রকারে সাম্বিজ্ঞানিক একীকরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেগুলিই বৌদ্ধিক প্রকার। অর্থাৎ বিভিন্ন বোধাকার বা বৌদ্ধিক প্রকার সম্বিজ্ঞানের অলৌকিক ঐক্যেরই প্রকার ভেদ বা প্রকটরূপ মাত্র। সুতরাং 'সাম্বিজ্ঞানিক ঐক্য বা একীকরণ ব্যতিরেকে বিষয় গঠিত হয় না' আর 'বৌদ্ধিক প্রকার ব্যতিরেকে বিষয় সম্ভবপর নয়', একই কথা। অতএব কাণ্টের মতে, বৌদ্ধিক প্রকার ব্যতিরেকে যখন বিষয়ই সম্ভবপর নয়, তখন এই সব প্রকার যে বিষয়ে লাগিবেই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইহাই বৌদ্ধিক প্রকার বিষয়গত প্রমাণ।

১। Synthesis

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধিক প্রকারের সাকারয়ণ[১]

আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধি ও অনুভবের সহযোগে জ্ঞান হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবে যাহা লব্ধ হয়, তাহাই বৌদ্ধিক প্রকারের দ্বারা বিগৃহীত[২] হইলে বিষয়বোধ জন্মায়। বৌদ্ধিক প্রকারগুলি বিগ্রহ বিশেষ; তাহাদিগকে শুদ্ধ বিগ্রহও[৩] বলা যায়। সেগুলি অনুভবলব্ধ বহুতাতে প্রযুক্ত হইলে পরে জ্ঞান জন্মে। বুদ্ধিগত বিগ্রহ বা প্রকারকে অনুভবলব্ধ বহুতাতে লাগাইতে হইবে, তাহা হইলেই জ্ঞানলাভ হয় ও বিষয় পাওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি এক রকমের পদার্থ, আর অনুভব অন্য রকমের। বুদ্ধিগত প্রকার যে অনুভবে লাগিবেই এমন কথা কে বলিতে পারে? বুদ্ধি ও অনুভব বিভিন্নরূপে কল্পিত হওয়াতেই তাহাদের পরস্পর সহকারিতার বা মিলনের জন্য এক তৃতীয় পদার্থের প্রয়োজন হইয়াছে, দেখা যায়। বুদ্ধি ও অনুভবের মিলন কি করিয়া সম্ভবপর হয়, অথবা বুদ্ধিগত প্রকার অনুভবলব্ধ বহুতাতে কি করিয়া লাগে, তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। কাণ্ট্ বলেন, অনুভব ও বুদ্ধির মধ্যবর্তী যদি এমন কোন পদার্থ পাওয়া যায়, যাহার অনুভব ও বুদ্ধির সঙ্গে সাম্য রহিয়াছে, তাহা হইলে সেই মধ্যবর্তী পদার্থের দ্বারা বুদ্ধি ও অনুভবের মিলন হইতে পারে। কাণ্ট্ মনে করেন, কালই সে রকম পদার্থ। কাল অনুভবের শুদ্ধ আকার[৪]। শুদ্ধ আকার বলিতে এই বুঝিতে হইবে যে, শুদ্ধকালের সঙ্গে অনুভাব্য কোন বিষয়ের সংমিশ্রণ নাই। আমরা যাহা কিছু জানি, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাতেই উপাদান[৫] ও আকার[৬] বলিয়া দুই ভেদ করিতে পারা যায়। উপাদান সব সময়েই অনুভব হইতে আসে; বুদ্ধিই সেই উপাদানকে আকার দিয়া জ্ঞানের বিষয় করে। যখনই 'শুদ্ধ বিগ্রহ', 'শুদ্ধ আকার' ইত্যাদি শুদ্ধ কিছুর কথা বলা হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, অনুভাব্য উপাদানের সহিত তাহার সংমিশ্রণ হয় নাই।

১। Schematism of the categories
২। Conceived
৩। Pure concepts
৪। Pure form
৫। Matter
৬। Form

যখন কালকে অনুভবের শুদ্ধ রূপ বা আকার রূপে ভাবি, তখন কালকে কালপরিচ্ছিন্ন অন্য কোন পদার্থের সহযোগে ভাবি না। উপাদানরহিত শুদ্ধ আকারের কথাই ভাবি। এই কাল শুদ্ধ বলিয়া বুদ্ধির সঙ্গে তার সাম্য রহিয়াছে, কেননা বুদ্ধির নিজস্ব স্বরূপ ত শুদ্ধই বটে। শুধু আকার বা প্রকার নিয়াই বুদ্ধির কারবার। কালের বুদ্ধির সহিত যেমন সাম্য রহিয়াছে, তেমন অনুভবের সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে; কেননা আমরা দেখিয়াছি, যাহা কিছু আমাদের অনুভবে আসে, তাহা কালিক আকারেই অনুভূত হইতে পারে। সুতরাং কালকে বুদ্ধি ও অনুভবের মধ্যবর্তী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় এবং কালকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধিক প্রকারও অনুভবলব্ধ জ্ঞানোপাদানে প্রযুক্ত হইতে পারে।

আমরা যে সব বৌদ্ধিক প্রকারের কথা বলিয়া আসিতেছি, সেগুলি মূলতঃ তার্কিক বিচারের[১] প্রকার মাত্র। অনুভাব্য উপাদানের সঙ্গে তাহাদের কোন সংস্রব নাই। বাস্তব জ্ঞানের কোন বিষয়ই তাহাদের মধ্যে উপলব্ধ নয়। তাহারা একান্ত বুদ্ধিগত পদার্থ। শুদ্ধ বুদ্ধিক্রিয়ার কতকগুলি মৌলিক প্রকার মাত্র তাহারা ব্যক্ত করে। অতি সাধারণভাবে তাহাদের ধারণা করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন রকমের উপাদান বা পরিচ্ছেদের আশ্রয় না লইয়া তাহাদের স্বগত রূপের কল্পনা করাও দুষ্কর। যাহা হউক, বৌদ্ধিক প্রকার যে শুদ্ধ বুদ্ধিক্রিয়ার নিজস্ব ধর্ম, তাহা আমরা সাধারণভাবে বুঝিতে পারি। কিন্তু বুদ্ধিক্রিয়া ত কোথাও, কোনও উপাদানের উপর, লাগিবে; তাহা না হইলে বুদ্ধিক্রিয়ার সার্থকতাই বা কি এবং ব্যক্তই বা হইবে কি করিয়া? সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন উপাদান না পাইলে বুদ্ধিক্রিয়া চলিতেই পারে না, অথচ আমাদের জ্ঞানীয় সব উপাদান ইন্দ্রিয়ানুভব হইতেই আসে; অনুভবেরই কাছে উপাদান আসে, বুদ্ধির কাছে তাহা লভ্য নয়। এমতাবস্থায় কি করা যায়? রূপরসাদি বাস্তব অনুভব বুদ্ধির পক্ষে অলভ্য হইলেও কালরূপ শুদ্ধানুভব বুদ্ধির কাছে অগম্য নয়। কালকে যেমন অনুভবের রূপ[২] বলা হয়, তেমন তাকে শুদ্ধানুভবও[৩] বলা হয়। বৌদ্ধিক প্রকার বা বুদ্ধি ক্রিয়ার নিজস্ব রূপ আমাদের কাছে অব্যক্ত ও নিরাকার, বুদ্ধিক্রিয়া কালের উপর প্রযুক্ত হইয়াই আমাদের কাছে আপেক্ষিক ভাবে

১। Logical Judgment ২। Form of Intuition ৩। Pure Intuition.

ব্যক্ত হয় ও সাকারতা লাভ করে। বুদ্ধিক্রিয়া বা বৌদ্ধিক প্রকারকে কালিক রূপ দেওয়ার নামই 'প্রকারের সাকারয়ণ'[১] (সাকার করণ)।

রূপ-রসাদির জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়ানুভব হইতেই আসে। শুধু বুদ্ধিদ্বারা সেগুলি কখনই উপলব্ধ হয় না। অনুভবলব্ধ জ্ঞানীয় উপাদানকে বুদ্ধি শুধু প্রকারিত[২] বা প্রকারের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন[৩] করিতে পারে। প্রকার পরিচ্ছেদ লাগানই বুদ্ধির কাজ এবং তাহার ফলেই জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয়। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রকারপরিচ্ছেদ রূপরসাদি অনুভাব্য উপাদানের উপর লাগিতে পারে না। রূপরসাদি বুদ্ধিলব্ধ না হওয়াতে, বুদ্ধিগত প্রকার অন্য কিছুর সাহায্য না লইয়া তাহাদের উপর সাক্ষাৎভাবে লাগিতে পারে না। প্রকার-পরিচ্ছেদ প্রথমতঃ কালের উপর লাগে; এবং আমাদের সব অনুভবেরই রূপ কাল বলিয়া (সব অনুভবই কালিক হওয়াতে), যে সব প্রকার কালের উপর লাগিয়াছে, সেগুলি সব অনুভবের উপরই লাগিতে পারে। কিন্তু কালের উপর প্রকার-পরিচ্ছেদ লাগার অর্থ কি?

আমাদের বাহ্যানুভবের করণরূপে যদি চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে বাহ্যকরণ[৪] বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের আন্তরানুভবের করণরূপেও এক অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ[৫] মানিতে হয়। রূপরসাদির যেমন বাহ্যানুভব হয়, তেমন সুখদুঃখাদির আন্তরানুভব হয়। আমরা আন্তরানুভব ও বাহ্যানুভব দুইই মানিতে বাধ্য। কিছু বিচার করিলে দেখা যাইবে, তথাকথিত বাহ্যানুভবের মূলেও আন্তরানুভব বিদ্যমান রহিয়াছে। বিচারে দেখা যায়, রূপরসাদিও শেষ দৃষ্টিতে প্রতীতি মাত্র, এবং প্রতীতি ত অন্তঃকরণের অবস্থাভেদের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং বলিতে হইবে অন্তঃকরণ ও আন্তরানুভব সব জ্ঞানের মূলেই রহিয়াছে। বাহ্যানুভবের আকার দেশ এবং আন্তরানুভবের আকার কাল বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বাহ্যানুভব হইতে গেলে দেশেই হইয়া থাকে, এবং আন্তর অনুভব হইতে হইলে কালেই হইতে পারে। আন্তরানুভবের রূপ যখন কাল, এবং অন্তঃকরণের দ্বারাই যখন আন্তরানুভব সম্ভবপর হয়, তখন কালকে অন্তঃ-করণেরই[৬] রূপ বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ কাল ও অন্তঃকরণ যে খুবই

১। Schematism
২। Categorised
৩। Determined
৪। Outer sense
৫। Inner sense
৬। Form of Inner sense

ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, তাহা স্বীকার করিতে হয়। কালের উপর প্রকার-পরিচ্ছেদকে লাগান বা কালকে প্রকারপরিচ্ছিন্ন করা আর অন্তঃকরণকে বিশিষ্টভাবে প্রবর্তিত বা পরিণমিত করা একই কথা। অন্তঃকরণকে প্রকারানুরূপ[১] পরিণমিত[২] করিলে, অর্থাৎ এক অর্থে কালকেই প্রকার-পরিচ্ছিন্ন করিলে, যাহা কিছুর অনুভব অন্তঃকরণ দিয়া হইবে, যাহা কিছুর কালিক রূপ বা আকার থাকিবে, তাহার উপরই প্রকারের ছাপ থাকিয়া যাইবে। এই ভাবেই বৌদ্ধিক প্রকার অনুভাব্য উপাদানে গিয়া লাগিতে পারে।

এখানে একটু প্রণিধান পূর্বক দেখিতে হইবে, অন্তঃকরণের প্রকারানুযায়ী পরিণাম কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে। আমরা যখন ঘট দেখি, বা গাছ দেখি, তখনও অন্তঃকরণের একপ্রকার পরিণাম হয়। কিন্তু সে পরিণামের জন্য বাহ্যানুভবই দায়ী। এখানে সম্পূর্ণ বিষয়-নিরপেক্ষভাবে, এমন কি সব বিষয়-জ্ঞানেরই আগে, অন্তঃকরণকে পরিণমিত করিবার কথা হইতেছে। এরকম পরিণাম শুধু কল্পনা[৩] দ্বারাই সম্ভবপর হয়। অন্তঃকরণের যে সব পরিণাম বিষয়ানুভবের দ্বারা ঘটে না, সে সব পরিণাম শুধু কল্পনা দ্বারাই হইয়া থাকে বুঝিতে হয়। কিন্তু এ কল্পনা কি রকমের কল্পনা? আমরা ঘট দেখিয়া থাকিলে, ঘট আমাদের সম্মুখে না থাকিলেও আমরা কল্পনার সাহায্যে মনে ঘটচিত্র[৪] উত্থাপিত করিতে পারি। এরকম কল্পনার দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের পুনরুদ্বোধন বা পুনরাবৃত্তি[৫] হয় মাত্র। এ কল্পনাকে উদ্বোধনী কল্পনা[৬] বলা যাইতে পারে। যে কল্পনার বলে অন্তঃকরণ পরিণমিত হইয়া বিষয়জ্ঞানের কারণ হয়, তাহাকে উদ্ভাবনী কল্পনা[৭] বলা যায়। এই মৌলিক কল্পনাশক্তি বাস্তবিক বুদ্ধিশক্তি হইতে ভিন্ন নয়। দেখা যাইতেছে, বিষয়জ্ঞানের মূলে কল্পনার খেলাই বর্তমান রহিয়াছে। বিষয় একবার জ্ঞাত হইলে, বিষয়ের অবর্তমানেও, উদ্বোধনী কল্পনার বলে বিষয়ের মানসজ্ঞান হইতে পারে। আর উদ্ভাবনী কল্পনার বলে প্রথম বিষয়জ্ঞানই সম্ভবপর

১। According to Categories
২। Conditioned
৩। Imagination
৪। Image
৫। Reproduction
৬। Reproductive Imagination
৭। Productive Imagination

হয়। উদ্বোধনী কল্পনাকে লৌকিক[১] এবং উদ্ভাবনী কল্পনাকে অলৌকিক[২] বা শুদ্ধ কল্পনা বলা যাইতে পারে।

অলৌকিক কল্পনা দ্বারা অন্তঃকরণ পরিণমিত হয় বলা হইয়াছে। এ কল্পনার কাজ যদৃচ্ছভাবে চলে না। বৌদ্ধিক প্রকারের অনুরূপভাবে কল্পনা অন্তঃকরণকে পরিণমিত করে; এবং তাহার ফলেই, এক অর্থে, কালকে প্রকারপরিচ্ছিন্ন করা হয়। অথবা এও বলা যায় যে প্রকারকে কালাবচ্ছিন্ন[৩] করা হয়। প্রকারের কালাবচ্ছেদকে এখানে বিশেষ অর্থে 'আকার'[৪] বলা যাইতেছে এবং কালাবচ্ছিন্ন হওয়াকেই প্রকারের 'সাকারয়ণ'[৫] বলা হইয়াছে। কালাবচ্ছিন্ন হওয়াতে আমরা প্রকারের সাকাররূপ দেখিতে পাই; তার আগে প্রকারগুলি আমাদের কাছে অব্যক্ত, নিরাকার অবস্থায়ই থাকে। ঔপমিক ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, কালরসে সিক্ত হইয়াই প্রকারের মূর্তরূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

বৌদ্ধিক প্রকার মূলতঃ একীকরণের নিয়ম মাত্র। কি কি রকম বিভিন্নভাবে নিয়মতঃ একীকরণ হইতে পারে, তাহাই বিভিন্ন প্রকারের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে। যখন প্রকারগুলি কালাবচ্ছিন্ন বা সাকারয়িত[৬] হয়, তখনও এই নিয়মের অর্থ তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ তখনও তাহারা নিয়মই থাকে। কালিক পরিচ্ছেদে ঐ সব প্রাকারিক নিয়মগুলি কি দাঁড়ায়, তাহাই কালাবচ্ছিন্ন প্রকারের দ্বারা ব্যক্ত হয়। আমরা দেখিয়াছি, অলৌকিক কল্পনার বলেই আমরা প্রকারের কালিক আকার[৭] পাই এবং তাহার ফলে আমাদের বিষয়জ্ঞান হয়; অর্থাৎ আমরা বিষয় পাইয়া থাকি। সব বিষয়ই প্রকারানুযায়ী কালিক একীকরণের ফলে উৎপন্ন হয়। যে একীকরণের ফলে বিষয় উৎপন্ন হয়, কালই তাহার সাধন। কাল এক হইলেই তাহার দ্বারা একীকরণ হইতে পারে। কালের যে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। সুতরাং হয়ত বলিতে পারা যায়, অলৌকিক কল্পনা শক্তিই কালিক বিষয় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে এক কাল বা একীকরণের সাধনভূত কালকেও উৎপাদন করে।

১। Empirical
২। Transcendental or pure
৩। Determined in time
৪। Schema
৫। Schematism
৬। Schematised
৭। Schemata

এখানে কয়েকটি প্রকারের কালাবচ্ছিন্ন রূপের বা কালিক আকারের[১] কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। পরিমাণের[২] কালিক আকার সংখ্যা[৩]। এখানে সংখ্যা বলিতে সমজাতীয় এককের[৪] ক্রমিক মেলন[৫] বুঝিতে হইবে। পাটীগণিতের ১, ২, ৩ প্রভৃতির অর্থে সংখ্যা শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে পাটীগণিতের অর্থে সংখ্যা শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে না। এখানে সংখ্যা শব্দের দ্বারা এরকম একীকরণ বুঝিতে হইবে। সমজাতীয় এককের ক্রমিক (= এক-এর পর অন্য) যোগে যে একীকরণ বা সংযোজন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকেই সংখ্যা বলা হইতেছে। 'পরিমাণের কালিক আকার সংখ্যা' এর অর্থ এই, যে রকম একীকরণের নাম সংখ্যা দেওয়া হইল, সে রকম একীকরণের ফলেই আমাদের পরিমাণ বোধ হয়। যেখানে এরকম একীকরণ সম্ভবপর নয়, সেখানে পরিমাণ বোধও হয় না। সত্তার আকার (সংবেদন) পূর্ণ[৬] বা বস্তু-গর্ভ কাল। অভাবের আকার শূন্য কাল। অর্থাৎ কখন কোন কিছু আছে বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে, সেই সময় বা কাল আমাদের ইন্দ্রিয় জন্য অনুভবে পূর্ণ হইয়া আছে (অথবা পূর্ণ থাকিতে পারে)। অভাব বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে, সেই সময় ইন্দ্রিয় জন্য কোন অনুভব হইতেছে না। দ্রব্যত্বের আকার কালিক স্থায়িতা[৭]। কিছু সময় ব্যাপিয়া যাহা থাকে না, তাহাকে দ্রব্য বলা যায় না। কার্যকারণভাবের আকার নিয়মতঃ কালিক পৌর্বাপর্য। নিয়মপূর্বক সময়ে যাহা পূর্বে থাকে, তাহাকে কারণ, এবং যাহা পশ্চাতে আসে তাহাকে কার্য বলা যায়। এই রকম সব প্রকারের কালিক আকার আছে, এবং সেই আকারেই আমরা প্রকারকে আমাদের অনুভবলব্ধ জ্ঞানীয় উপাদানে প্রয়োগ করি। স্বরূপতঃ বৌদ্ধিকপ্রকার তর্ক বিচারের নির্বিষয় প্রকারভেদ মাত্র। এই রকম অবস্থায় বাস্তবজ্ঞানের জন্য তাহাদের ব্যবহারই হইতে পারে না। যখন তাহাদিগকে কালিকরূপ দিয়া অনেকটা সাকার করা হয়, তখন তাহারা জ্ঞান ব্যবহারের উপযুক্ত হয়।

১। Schemata
২। Quantity
৩। Number
৪। Homogeneous Units
৫। Successive Synthesis
৬। Filled
৭। Persistence in time

অনেকের মতে এই সাকারয়ণের প্রশ্ন অনেকটা কৃত্রিম। কাণ্ট্ যখন বলিয়াছেন, বিগ্রহ (বা প্রকার) ব্যতীত অনুভব অন্ধ[১], এবং অনুভব ব্যতিরেকে বিগ্রহ বা প্রকারও শূন্যাকার[২], তখন ত বুঝিতে হইবে, প্রকার ও অনুভব একত্র রহিয়াছে। দার্শনিক বিচারের জন্য আমরা তাহাদের পৃথক্ আলোচনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা কখনই পৃথক্ থাকে না। সুতরাং এমতাবস্থায়, বৌদ্ধিকপ্রকার অনুভবে কি করিয়া লাগে, এরকম প্রশ্নই উঠে না, কেননা প্রকার ত লাগিয়াই আছে। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধি ও অনুভবকে এরকম বিযুক্ত করিয়া কাণ্ট্ দেখিয়াছেন বলিয়াই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাস্তবিক বুদ্ধি ও অনুভব এরকম অসম্বদ্ধ নয়। যাহা হউক বুদ্ধিকে একবার পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারিলে, মনে হয়, প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে, যাহা বুদ্ধিতে আছে তাহা অনুভবে লাগে কিনা, এবং লাগিলে কি করিয়া লাগে। কাণ্ট্ সাকারয়ণের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার অন্য কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক, তাহা হইতে আমরা বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলি[৩] আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানে কি করিয়া লাগে, তাহার বেশ ভাল আভাস পাই। আর কাণ্ট্ এই সব মূলসূত্রের আলোচনা যে অধ্যায়ে করিয়াছেন, তাহার উপক্রমণিকাতেই সাকারয়ণের কথা তুলিয়াছেন।

১। Blind
২। Empty
৩। The Principles of Understanding

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৌদ্ধিক মূল সূত্র

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের বিষয়জ্ঞানের মূলে কতকগুলি বৌদ্ধিক প্রকার নিহিত আছে। কাণ্ট্ বলিয়াছেন, তিনি ঐসব প্রকার তার্কিক বিচারের[১] প্রকারভেদ হইতে পাইয়াছেন। ঐসব প্রকারের অর্থ শেষ পর্যন্ত কতকগুলি বৌদ্ধিক একীকরণের নিয়মেই দাঁড়ায়। আর ঐ রকম নিয়মিত একীকরণ ব্যতিরেকে যখন বিষয়ই গঠিত হইতে পারে না, তখন ঐসব প্রকার যে বিষয় জ্ঞানে প্রযুক্ত হইতে পারিবেই, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রকারগুলি বিষয়ে লাগিবেই বোঝা গিয়াছে এবং কি করিয়া বা কি উপায়ে লাগে, তাহার ইঙ্গিত প্রকারের সাকারয়ণে পাওয়া গিয়াছে। এই বিষয়ই কাণ্ট্ মূলস্থত্রের আলোচনায় আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন।

বৌদ্ধিক প্রকার আমরা প্রাকৃত জ্ঞান[২] হইতে পাই না। প্রাকৃত জ্ঞানের মূলেই তাহারা রহিয়াছে। বুদ্ধি নিজের থেকেই সেগুলি পায় এবং তাহাদের প্রয়োগেই প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হয়। বৌদ্ধিক প্রকার যে বিষয়ে লাগিবেই, একথা জানিবার জন্যও বুদ্ধিকে প্রাকৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয় না। বিভিন্ন রকমের বৌদ্ধিক প্রকার কি করিয়া বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহার কতকগুলি মূল সূত্রের বিধান বুদ্ধি আপনা হইতেই করিতে পারে। মূল সূত্রগুলিতে বাস্তবিক কতকগুলি নিয়মেরই বিধান করা হয় এবং এই সব নিয়মের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, কি করিয়া বিভিন্ন বৌদ্ধিক প্রকার প্রাকৃত জ্ঞানে প্রযুক্ত হয় বা লাগিয়া থাকে। মূল সূত্রগুলি নিয়ম বটে, কিন্তু নিয়ম হইলেও সেগুলি বিচার[৩] ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই সব বিচারের জন্য আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয় না বলিয়া তাহাদিগকে পূর্বতোবিচার[৪] বলা যাইতে পারে। আরও দেখা যায়, এই সব বিচারের বিধেয়কে[৫] উদ্দেশ্যের[৬] ভিতর হইতে পাওয়া যায় না।

১। Logical Judgments
২। Experience
৩। Judgments
৪। *A priori* judgments
৫। Predicate
৬। Subject

উদ্দেশ্যের মধ্যে যে কথার আভাস পাওয়া যায় না, অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করিয়া যে কথার উপলব্ধি হয় না, তাহারই বিধান এই সব বিচারে করা হইয়া থাকে। সুতরাং এই সব বিচারকে আমাদের পরিভাষায় যৌগিক বা সাংশ্লেষিক বিচার[১] বলিতে হইবে। কাণ্ট্ যে প্রশ্ন উঠাইয়াছিলেন, যৌগিক পূর্বতোবিচার কি করিয়া সম্ভবপর হয়[২]? তাহার সম্যক উত্তর এইখানেই পাওয়া যায়।

অযৌগিক বা বৈশ্লেষিক বিচারে[৩] বিধেয়কে যখন উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ হইতেই পাওয়া যায়, তখন অন্য কিছুর সাহায্য না নিয়াই, আমরা শুধু তর্কশাস্ত্রীয় তাদাত্ম্য বা অব্যাঘাতের নিয়মের[৪] বলেই এই জাতীয় বিচারের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। কাক যে পক্ষী একথা বুঝিবার জন্য কোন বাহ্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না; কেননা 'পক্ষী'র অর্থ 'কাকে'র অর্থের মধ্যে নিহিত আছে এবং কোন পদার্থই পক্ষী না হইয়া কাক হইতে পারে না। কিন্তু যখন বলি 'এ ফুলটি লাল' তখন একথার সত্যতা বুঝিবার জন্য প্রমাণের আবশ্যক হয়। এখানকার বিধেয় 'লাল'কে উদ্দেশ্য 'এই ফুল'-এর ভিতর হইতে বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। 'এই' বলিতে 'পুরোবর্তী' পদার্থ বুঝায়; 'ফুল' বলিতে এই নামে পরিচিত দ্রব্যবিশেষকে বুঝি। কিন্তু 'পুরোবর্তী' ও 'ফুল' হইলেই লাল হইবে, এরকম কোন নিয়ম নাই। আগের দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি, 'কাক' ও 'পক্ষী' শব্দের অর্থ জানা থাকিলেই আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি 'কাক পক্ষী' এবং এ বিচার যে সত্য সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই হয় না। কিন্তু শুধু 'এই ফুল' ও 'লাল'এর অর্থ জানিলেই আমরা বলিতে পারি না, 'এই ফুল লাল'। এই বিচার বা বিধানকে সত্য কিংবা মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে হইলে, উদ্দেশ্য ও বিধেয় ব্যতীত তৃতীয় কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয়। সেই তৃতীয় পদার্থ প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বলিতে পারি, 'এই ফুলটি লাল'। চোখ দিয়া না দেখিলে শুধু 'এই' এবং 'ফুল' এর কল্পনা হইতে কখনই লালের কল্পনা আমাদের মনে নিশ্চিত বা নিয়মিত ভাবে আসিবে না।

১। Synthetic Judgments
২। How are *a priori* synthetic judgments possible?
৩। Analytic Judgments
৪। The Law of Identity or the Law of non-contradiction

দেখা যাইতেছে, যেখানে বিধেয় উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয় (যথা সাংশ্লেষিক বিচারে), সেখানে উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়কে যুক্ত করিতে হইলে তৃতীয় কিছুর আশ্রয় লইতে হয়। সাধারণতঃ এই ব্যাপারে প্রাকৃত জ্ঞানই[১] আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। দেখিয়া শুনিয়াই আমাদের প্রাকৃত জ্ঞান হয় এবং তাহার জোরেই আমরা যৌগিক বিধান বা বিচার করিতে পারি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক মূল সূত্রগুলি যৌগিক হইলেও তাহারা প্রাকৃত জ্ঞান হইতে উপলব্ধ নয়। এখানে তৃতীয় কোন পদার্থের জোরে আমরা তাহাদের বিধান করিতে পারি। কাণ্ট্ বলেন, এখানে 'প্রাকৃত জ্ঞানের সম্ভবপরতাই'[২] আমাদের শরণীয় তৃতীয় পদার্থ।

প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হইতে হইলে, এই সব মূল সূত্র সত্য না হইয়া পারে না। আমাদের বাস্তব প্রাকৃত জ্ঞানের উপর মূল সূত্রগুলি কিছুতেই নির্ভর করিতেছে না। পক্ষান্তরে মূল সূত্রের উপর প্রাকৃত জ্ঞান নির্ভর করিতেছে। মূল সূত্রগুলি সত্য হইলেই প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু আমরা প্রাকৃত জ্ঞান বলিতে যদি কিছু না বুঝি, এবং বুঝিলেও যদি তাহা সম্ভবপর বলিয়া না মানি, তাহা হইলে সূত্রগুলি সপ্রমাণ করিবার আমাদের অন্য কোন মার্গ নাই। তাহা হইলে এই সূত্রগুলিকে আমাদের না মানিলেও চলিবে। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত জ্ঞান অপলাপ করিবার উপায় নাই। তাহা যখন বর্তমান রহিয়াছে, তখন সম্ভবপর বলিয়াও মানিতে হয়।

প্রাকৃত জ্ঞান মানিলে তাহার হেতুভূত[৩] আরও কয়েকটি পদার্থও মানিতে হয়। অনুভব ব্যতীত প্রাকৃত জ্ঞান হয় না; সুতরাং অনুভবের আকার দেশ ও কালকে প্রাকৃত জ্ঞানের হেতু বলিয়া মানিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে কোন প্রকারের ঐক্য না থাকিলে বিষয়ই হয় না এবং বিষয় না থাকিলে প্রাকৃত জ্ঞানও হইতে পারে না। ঐক্যের জন্য একীকরণ আবশ্যক। বৌদ্ধিক প্রকারগুলিই সেই একীকরণের নিয়ম নির্দেশ করিয়া দেয়, এবং সব একীকরণই মূল সাংবিজ্ঞানিক ঐক্য[৪] বা এক স্বসম্বিৎ[৫]-এর উপর নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাংবিজ্ঞানিক ঐক্য ও

১। Experience
২। Possibility of Experience
৩। Condition
৪। Unity of Apperception
৫। Self-consciousness

যৌক্তিক প্রকারকে প্রাকৃত জ্ঞানের হেতুভূত বলিয়া মানিতে হয়। যৌক্তিক প্রকারে যে সব নিয়ম নির্দেশিত হইয়াছে, তাহাদেরই অনুস্থিত মূর্তরূপ সাকারমণে পাওয়া যায়, এবং মূল সূত্রেই সেগুলি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। মূল সূত্রগুলি প্রকারের অনুরূপ হওয়ায় এগুলিকেও কাণ্ট্ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রকারগুলিকে পরিমাণ, গুণ, সংসর্গ ও অবস্থাভেদে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তদনুসারে মূল সূত্রগুলিকেও যথাক্রমে (১) অনুভবের স্বতঃসিদ্ধ[১] (২) প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ[২], (৩) প্রাকৃত জ্ঞানের উপমান[৩] এবং (৪) প্রাকৃত বিচারের স্বীকার্য[৪]—এই চারি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের সব জাগতিক বিচারের মূলে এগুলি রহিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে মূল সূত্র বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র যে সব প্রাকৃতিক নিয়মের বিধান করিয়া থাকে, সে সব এই মূল সূত্রগুলির জোরেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। এই সব মূল সূত্র মানিলেই অন্যান্য প্রাকৃত নিয়মও মানিতে পারা যায়; কিন্তু এই সব মূল সূত্র না মানিলে কোন প্রাকৃত নিয়মই প্রতিপাদন করিতে পারা যাইবে না। এই মূল সূত্রগুলি কিন্তু অন্য কোন প্রাকৃত নিয়মের জোরে প্রতিপাদিত হয় না। কাণ্ট্ শুধু দার্শনিক চিন্তাদ্বারা, একপ্রকার অলৌকিক মননের[৫] দ্বারা এগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, এই মূল সূত্রগুলি বুঝিবার জন্য শুধু একটি কথা মানিতে হয়; সে কথা এই যে, প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর। এখন দেখা যাউক, প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হইতে হইলে কি কি জিনিস লাগে। প্রথমতঃ অনুভব ব্যতিরেকে কোন প্রাকৃত জ্ঞানই হয় না, এবং অনুভব হইতে হইলে দেশ ও কালের প্রয়োজন। কেননা দেশ ও কাল আমাদের অনুভবেরই আকার; দেশ ও কাল ছাড়িয়া আমাদের কোনই ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব হয় না। প্রাকৃত-জ্ঞানের জন্য আমাদের যে অনুভবের প্রয়োজন, তাহা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব। যেখানেই প্রাকৃত জ্ঞানের কোন কথা উঠে, সেখানেই কিছু না কিছু দেখা শোনার কথা আছে বুঝিতে হইবে। এবং দেখিতে শুনিতে হইলে কোনও দেশে (স্থানে) এবং কালেই তাহা সম্ভবপর হয়। যে পদার্থের দেশ বা

১। Axioms of Intuition
২। Anticipations of Perception
৩। Analogies of Experience
৪। Postulates of Empirical Thought
৫। Transcendental Reflection

কালের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই, তাহার কোন ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব হয় না। দেশ বা কালে থাকা মানেই কিছুটা দেশ বা কাল জুড়িয়া থাকা। সে দেশ বা কাল যতই অল্পপরিসর হউক না কেন, কখনই শূন্যাকার হইতে পারে না। তাহার কিছুটা বিস্তার[১] থাকিবেই থাকিবে। বিস্তারবিহীন দৈশিক বা কালিক পদার্থ হইতে পারে না এবং দৈশিক বা কালিক না হইলে আমাদের অনুভবের বিষয় হয় না। আর অনুভব না হইলে সে সম্বন্ধে প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে না। যে পদার্থের অনুভব হইবে, তাহার যে বিস্তার থাকিবেই, একথা আমাদের যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় না। অনুভবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান আছে, তাহারা বিনা যুক্তিতে আপনা হইতেই একথা বুঝিতে পারে। এরকম কথাকে কাণ্ট্ 'অনুভবের স্বত:সিদ্ধ' বলিয়াছেন। অনুভবের যত স্বতঃসিদ্ধ আছে, তাহাদের মূল সূত্র কাণ্ট্ এই রকমভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন :—অনুভাব্য সব অবভাসেরই বৈস্তারিক মহত্তা আছে।[২] সহজ কথায় বলিতে পারা যায়, অনুভব হইতে গেলেই বিস্তার থাকিবে।[৩]

যে পদার্থের বিস্তার আছে, তাহাকেই নানাভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় বুঝিতে হইবে। যদি ভাগ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে বিস্তার আছে বলিতে পারা যায় না। বিস্তারবান্ পদার্থ মাত্রকেই অবয়ব-অবয়বি[৪]-ভাবে কল্পনা করিতে পারা যায়। প্রত্যেক অংশকে অবয়ব ধরিয়া সমগ্রকে অবয়বি-ভাবে বুঝিতে পারা যায়। এরকম সমগ্রকে জানিতে হইলে অংশের সহিত অংশান্তরের যোগ করা দরকার। অংশের পর অংশ যোগ করিয়াই বিস্তারবান্ সমগ্রের[৫] কল্পনা হইতে পারে। কাণ্টের মতে একবারে হঠাৎ এক বিস্তৃত পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। এক অখণ্ড জ্ঞানে বা অনুভবেই যে পদার্থের বোধ হয় তাহাতে বিস্তাররূপ পরিমাণের বোধ থাকে না। বিস্তার একপ্রকারের মহত্তা[৬]। অবয়বের সঙ্গে অবয়বান্তরের ক্রমিক যোগ[৭] করিয়াই এই মহত্তার বোধ জন্মিতে পারে। ইহা ব্যতীত মহত্তার কোন

১। Extension

২। All ap. earances are in their intuition extensive magnitudes.

৩। All intuitions are extensive magnitudes.

৪। Parts and whole

৫। Extensive whole ৬। Magnitude ৭। Successive addition

অর্থ হয় না। সামান্য এক রেখার বোধ হইতে হইলেও আমাদের এক বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পনায় অংশের পর অংশ যোগ করিয়া যাইতে হয়। এই ক্রমিক মেলনের[১] ফলেই রেখারূপ সমগ্রের বোধ হইতে পারে। এই মেলন বা সংযোজন ব্যতিরেকে এক রেখা বলিয়া জ্ঞানই হইবে না। এই রকম জ্ঞানীয় ক্রমিক সংযোজন যে শুধু দৈশিক পদার্থের বোধেই আবশ্যক হয়, তাহা নহে। চোখ কান বুজিয়া আমরা যে আন্তর ঘটনা প্রবাহের উপলব্ধি (এরকম জ্ঞানও প্রাকৃত জ্ঞান, বাহেন্দ্রিয় না হইলেও ইহাতে অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিয়াছে) করি, তাহাতেও একপ্রকার বিস্তারবোধ রহিয়াছে। সে বিস্তার দৈশিক নয়, কালিক। কালিক বিস্তারবোধেও জ্ঞানীয় ক্রমিক সংযোজন প্রয়োজন। আমরা তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, এই সংযোজন ব্যতিরেকে আমাদের কোন রকমের মহত্তা বোধ হইতে পারে না। কালিক বিস্তারও মহত্তা বিশেষ, এর বোধেও ক্রমিক সংযোজন আবশ্যক। আমরা যাহা কিছু (বাহ্য বা আন্তর) প্রত্যক্ষ করি, তাহা দেশে বা কালেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। দৈশিক বা কালিক বিস্তারবান্ পদার্থেরই প্রত্যক্ষ সম্ভবপর। তাই কাণ্ট্ বলিয়াছেন, প্রত্যেক অবভাসেরই[২] (যাহা কিছু দেখি বা শুনি, তাহা কাণ্টের মতে অবভাসই মাত্র) বৈস্তারিক মহত্তা রহিয়াছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখা গিয়াছে, আমাদের পরিমাণবোধের জন্য পারিভাষিক অর্থে (গণিতের অর্থে নয়) সংখ্যারূপ আকারের[৩] প্রয়োজন। এখন দেখিতেছি প্রত্যেক প্রত্যক্ষের মধ্যেই সেই সংখ্যাকার বিদ্যমান রহিয়াছে, কেননা সংখ্যাকারের মধ্যেও ত সমজাতীয় এককের ক্রমিক সংযোজনই রহিয়াছে। তাহার ফলেই ত আমাদের পরিমাণবোধ জন্মায়। এই জ্ঞানীয় ক্রমিক সংযোজনেই প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি গঠিত হয়। এই সব বিষয় দৈশিক ও কালিক। শুধু যে দৈশিক ও কালিক বিষয়ই জ্ঞানীয় সংযোজনের ফলে গঠিত হয়, তাহা নহে; বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, দেশ ও কাল এই রকম ভাবে গঠিত হয়। দেশ ও কাল মহৎ-পরিমাণ পদার্থ, তাহাদের বিস্তার সুতরাং একপ্রকার মহত্তা (একপ্রকারের, কেননা অন্য প্রকারেরও মহত্তা আছে, যার কথা পরে বলা হইবে) আছে,

১। Successive Synthesis ২। Appearance ৩। The Schema of Number

আর এই মহত্তাবোধ আমাদের কখনই হইত না, যদি ইহার মূলে জ্ঞানীয় সংযোজন বিদ্যমান না থাকিত। যে জ্ঞানের সংযোজনের ফলে দেশ কাল পাওয়া যাইতেছে, তাহা যে লৌকিক বা সাধারণ জ্ঞান নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সে যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম, আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের যাহা কিছু বিষয় হয়, তাহারই বিস্তার থাকে। কাণ্ট্ বলিতেছেন না যে, বিস্তার-বিহীন পদার্থই নাই; তাঁহার বক্তব্য শুধু এই, বিস্তার না থাকিলে কোন পদার্থ প্রত্যক্ষের বা প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয় হইবে না।

প্রত্যক্ষযোগ্য সব বিষয়েরই বিস্তার বা পরিমাণ থাকায় গণিতশাস্ত্র প্রাত্যক্ষিক বিষয়ে প্রযোজ্য হইতে পারে। বিশেষতঃ জ্যামিতি[১] এবং পাটীগণিতের[২] কথা বলিতে পারা যায়। এই দুই শাস্ত্র যে সব বিষয়ের (রেখা, ক্ষেত্র, সংখ্যা ইত্যাদি) বিচার করিয়া থাকে, তাহাদের মূলে যে জ্ঞানীয় সংযোজন রহিয়াছে, প্রাত্যক্ষিক বিষয়ের মূলে সেই সংযোজন রহিয়াছে। সুতরাং গণিতের সাশ্লেষিক বিধান প্রাত্যক্ষিক বিষয়ে সহজেই প্রযুক্ত হইতে পারে। কাণ্টের প্রশ্ন ছিল, সাংশ্লেষিক বিধান কি করিয়া পূর্বতোভাবে সত্য বলিয়া জানা যায়। সে প্রশ্নের আংশিক মীমাংসা এখানে পাওয়া গেল। গণিতের বিধান যে যৌগিক বা সাংশ্লেষিক, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। তাহারা যে প্রাত্যক্ষিক বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা এখন ভাল করিয়া বুঝিলাম। গাণিতিক বিধান সব যে প্রাত্যক্ষিক বিষয় সম্বন্ধে সত্য, সে কথা জানিবার জন্য আমাদের কোন প্রাকৃত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। আমরা দার্শনিক চিন্তন বা অলৌকিক মননের[৩] দ্বারা জানি, যে রকম সংযোজনের ফলে গাণিতিক বিধান সম্ভবপর হয়, সে রকম সংযোজনেই প্রাত্যক্ষিক বিষয় গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়ের প্রত্যক্ষ না করিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, গাণিতিক বিধান তাহাতে প্রযোজ্য হইবে।

প্রথম মূল সূত্রে কাণ্ট্ শুধু এইই বলিলেন যে, প্রত্যেক প্রাত্যক্ষিক বিষয়েরই বৈস্তারিক মহত্তা থাকিবে। আমাদের যে সব পদার্থের অনুভব হয় বা হওয়া সম্ভবপর, তাহাদের দৈশিক বা কালিক বিস্তার থাকেই থাকে। কিন্তু শুধু দৈশিক বা কালিক বিস্তার নিয়া কোন পদার্থই আমাদের প্রত্যক্ষের

১। Geometry ২। Arithmetic ৩। Transcendental Reflection

বিষয় হয় না। শুধু কতখানি খালি (শূন্য) দেশ বা কাল আমরা দর্শনে শ্রবণে বা আন্তর অনুভবে কখনও পাই না। যে দেশ বা কাল আমরা অনুভবে পাই, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর কোন পদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত[১] হইয়াই থাকে; তাহাতে রূপ, রস, স্পর্শ বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়গোচর গুণ থাকেই থাকে। দেশ কাল ত অনুভবের আকার[২] মাত্র। সে আকারের মধ্যে কোন উপাদান[৩] থাকা চাই। সে উপাদান আবার শূন্য দেশ বা কাল হইতে পারে না। শূন্য আকারের কথা আমরা ভাবিতে পারি বটে, কিন্তু তাহা আমাদের অনুভবের বিষয় হয় না। অনুভবের বিষয় হইতে হইলে তাহাকে রূপরসবৎ অনুভবযোগ্য কোন পদার্থের দ্বারা ব্যাপ্ত হইতে হয়।

বাস্তবিক, প্রত্যক্ষ ত কোন বাস্তব পদার্থেরই হইতে পারে; যে পদার্থ নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, ভ্রম হইতে পারে। আর বাস্তবের ত লক্ষণই হইল এই যে তাহা দেখিতে শুনিতে বা স্পর্শ করিতে পারা যাইবে। যে পদার্থ আছে বলিয়া মনে করি, তাহা এখন আমি নাও দেখিতে পারি, কিন্তু তাহা অবশ্যই কোন না কোন ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের বিষয় হইবে। তাহাতে দর্শন বা স্পর্শনযোগ্য কোন গুণ থাকিবেই। যে পদার্থ কোন প্রকার প্রত্যক্ষেরই যোগ্য নয়, সে পদার্থ আছে বলার কোন অর্থ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে পদার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, তার শুধু দৈশিক বা কালিক বিস্তার থাকিলেই চলিবে না, তাহার অনুভবযোগ্য রূপরসাদি কোন না কোন গুণ থাকা চাই। আর এই সব গুণের একটা বিশেষ ধর্ম এই যে তাহাদের মধ্যে সর্বদাই একটা তারতম্য[৪] দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত-পীতাদি রূপ হইলে তাহা উজ্জ্বল হইতেও পারে, ম্লানও হইতে পারে, গাঢ়ও হইতে পারে, ফিকাও হইতে পারে। শব্দ হইলে তাহা উচ্চও হইতে পারে, ক্ষীণও হইতে পারে। এই রকম সব গুণেরই তারতম্য হইতে পারে। এই রকম কথাকেই কাণ্ট্ 'প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ'[৫] বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষের আগেই আমরা বলিতে পারি, প্রত্যক্ষযোগ্য প্রত্যেক গুণের তারতম্য থাকিবে। এক অর্থে সব মূল সূত্রকেই প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ বলা যাইতে পারে; কেননা তাহারা ত প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়েরই গুণধর্মের কথা প্রত্যক্ষের

১। Filled
২। Form
৩। Material
৪। Degree
৫। Anticipation of Perception

আগেই আমাদের বলিয়া দেয়। কিন্তু এখন যে পূর্ববোধের কথা বলা হইল, তাহাকে বিশেষ অর্থে প্রত্যক্ষের পূর্ববোধ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গোচর গুণ বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবই এই পূর্ববোধের বিষয় এবং এই সব বিষয়ে পূর্ববোধ সাধারণতঃ আমরা সম্ভবপরই মনে করি না। কান দিয়া কি শুনিব কিংবা চোখ দিয়া কি দেখিব, তাহা দেখা শোনার আগে বলিতে পারা অসম্ভব। কাণ্ট্ বলেন, যদিও ঠিক কি কি বিষয়[১] দেখা যাইবে বা শোনা যাইবে, তাহা প্রত্যক্ষের আগে বলা যায় না, তথাপি আমরা প্রত্যক্ষের আগেই (পূর্বতোভাবে) বলিতে পারি যে, প্রত্যেক প্রত্যক্ষযোগ বিষয়ের গুণগত মহত্তা[২] বা তারতম্য[৩] থাকিবে।

প্রত্যক্ষের পূর্ববোধের মূল সূত্র কাণ্ট্ এই রকম নির্দেশ করিয়াছেন :- 'সব অবভাসেই অনুভাব্য বাস্তবের গুণগত মহত্তা বা তারতম্য আছে'[৪]। অবভাসের মধ্যে যাহাকে বাস্তব বা 'আছে' মনে করি, তাহা ইন্দ্রিয় জন্য অনুভবের বিষয় হইবেই, অর্থাৎ তাহার রূপরসাদি কোন না কোন গুণ থাকিবেই। আর এই গুণগুলি এই রকম যে সর্বদাই তাহাদের কম বেশী হইতে পারে; সুতরাং তাহাদের একপ্রকারের মহত্তা আছেই। ইহাকেই তাহাদের তারতম্য বলা হইয়াছে। পূর্বসূত্রে বিস্তারগত মহত্তার কথা বলা হইয়াছে, এখানে গুণগত মহত্তার কথা হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ পূর্বে বলা হইয়াছিল, মহত্তার নামই পরিমাণ নয়; এখানে একপ্রকারের (গুণগত[৫]) মহত্তা পাওয়া গেল, যাহাতে পরিমাণ বুঝায় না। পাঁচ সের, পাঁচ হাত বা শুধু পাঁচ বলিতে যে রকম মহত্তা বুঝিতে পারা যায়, গাঢ় রং বা মধ্যম স্বর বলিতে সে রকম মহত্তা বুঝিতে পারা যায় না। রূপ-রসাদির অল্লাধিকতা পরিমাণগত নয়। রূপ-রসাদির অল্লাধিকতাকেই গুণগত মহত্তা বলা হইয়াছে। ইহাই তাহাদের তারতম্য[৬]।

সব প্রাত্যক্ষিক বিষয়েরই গুণগত মহত্তা আছে। কিন্তু এই মহত্তা আমরা কি করিয়া বুঝিতে পারি? বৈস্তারিক মহত্তার বেলায় দেখা গিয়াছে যে, আমরা অবয়বের সঙ্গে অবয়বান্তরকে সংযোজিত করিয়া অবয়বী বা

১। Content ২। Intensive magnitude ৩। Degree

৪। In all appearance, the real which is an object of sensation has intensive magnitude, that is, degree.

৫। Intensive magnitude ৬। Degree

সমগ্রকে বুঝিয়া থাকি। তাহাতেই আমাদের মহত্তাবোধ জন্মে। পাঁচ হাত কোন পদার্থের (যথা রজ্জু) জ্ঞান হইতে হইলে, এক হাতের সঙ্গে আর এক হাত, এরকম পর পর পাঁচ হাত একত্র সংযোজিত করিয়া আমাদের জানিতে হয়। প্রত্যেক অবয়ব বা অংশই বিদ্যমান রহিয়াছে, সমগ্রই জ্ঞানীয় সংযোজনের ফলে গঠিত হয়। গুণগত মহত্তার জ্ঞান সে রকম হইতে পারে না। একটা উচ্চ শব্দের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষীণ শব্দ বর্তমান নাই। অনেকগুলি ক্ষীণ শব্দ সংযোজিত হইয়া উচ্চ শব্দ গঠিত হয় না। তবে উচ্চ শব্দের মহত্তা কি করিয়া বুঝি।

ধরা যাউক একটি শব্দ শোনা গেল। তার চেয়ে ক্ষীণতর শব্দও আমরা কল্পনা করিতে পারি; তার চেয়েও অধিকতর ক্ষীণ শব্দ থাকিবে। শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে মিলাইয়া যায়। অন্যদিকে আমরা এও ভাবিতে পারি যে, নিঃশব্দতার অবস্থা হইতে মৃদু শব্দ আরম্ভ হইয়া ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে হইতে বিশিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছায়। নিঃশব্দতার অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া কত কম বা কত বেশী অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়া সেই বিশিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছা যায়, তাহার কল্পনা দ্বারাই ঐ শব্দের মহত্তা বুঝিতে হয়। এখানে যে শব্দ শোনা গেল (বা অন্য যে অনুভব হইল) তাহাকেই সমগ্র বলিয়া ধরিতে পারা যায় এবং নিঃশব্দতার (শূন্যতার) ও তাহার মধ্যে যতগুলি ক্রমশঃ বর্ধমান শব্দ (বা সেই জাতীয় অনুভব) কল্পনা করিতে পারা যায়, তাহারা যেন সেই সমগ্রের অবয়ব বা অংশ। এই সব অংশ বাস্তবিক দেওয়া[1] নাই। সমগ্রই পাওয়া গিয়াছে বা দেওয়া আছে। বৈস্তারিক মহত্তার বেলায় দেখা গিয়াছে, অংশগুলিই দেওয়া থাকে, এবং সমগ্রকে আমরা বুদ্ধি দ্বারা গঠিত করি[2]। এখানে অর্থাৎ গুণগত মহত্তার বেলায় সমগ্রই দেওয়া থাকে, তাহার অংশ শুধু কল্পনা দ্বারা আমরা পাইতে পারি। এই রকম অংশ অথবা শূন্যাবস্থা হইতে ক্রমবর্ধমান অবস্থা-ভেদের কল্পনা করিতে পারি বলিয়াই কোন বিশিষ্ট অনুভবের মহত্তা বুঝিতে পারি। প্রত্যেক অনুভবেরই মহত্তা আছে, কেননা তদপেক্ষা ক্ষীণতর অনুভবেরও কল্পনা আমরা করিতে পারি। একত্বের সঙ্গে বহুত্বের মিলনেই মহত্তা পাওয়া যায়। এক হইয়াও যে বহু, অথবা বহু হইয়াও যে এক,

১। Given = অর্থাৎ সাক্ষাৎ জ্ঞানে পাওয়া ২। Construct

সেই মহৎ। বৈস্তারিক মহত্তার বেলায় বহুই (অংশ) দেওয়া থাকে, তাহাদের সংযোজনে এককে জ্ঞানে গঠিত করিতে হয়। গুণগত মহত্তার বেলায় একই দেওয়া থাকে, বহুকে কল্পনা দ্বারা পাইতে হয়।

যাহা কিছু অনুভবে পাওয়া যায়, তাহারই মহত্তা আছে; অর্থাৎ তাহার তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা ক্ষীণতর অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারি। যাহার ক্ষুদ্রতম অংশ নাই তাহাকে 'নিরন্তর'[১] বলা যায়। ক্ষুদ্রতম অংশ বলিতে এই বুঝায় যে, সে অংশকে আর ভাগ করিতে পারা যায় না। যদি কোন মহৎ পরিমাণ পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অনবরত ভাগ করিতে পারা যাইবে। ইহাই তাহার নৈরন্তর্য[২]। দেশ কালের নৈরন্তর্যও আমরা এই রকম বুঝি। যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে যে দেশ পাওয়া যায়, সে দেশ যত ছোট হউক না কেন, তাহাকে ভাগ করিতে পারা যায়। দুই মুহূর্তের মধ্যে যতই অল্প সময় থাকুক না কেন, তার চেয়েও অল্প সময়ের কল্পনা আমরা করিতে পারি। এই জন্যই দেশ ও কাল নিরন্তর।

যেখানে গুণগত মহত্তা আছে, সেখানেও এরকম নৈরন্তর্য আছে। আমাদের কোন অনুভব যতই ক্ষীণ হউক না কেন, তার চেয়ে ক্ষীণতর অনুভবের কল্পনাও আমরা করিতে পারি।

এই প্রসঙ্গে কাণ্ট্ বলেন শূন্যদেশ[৩] বা শূন্যকালের[৪] কোন প্রমাণ নাই। অন্ততঃ অনুভবের দ্বারা শূন্য দেশকালের সত্তা প্রমাণিত হইবে না; কেননা শূন্য হইলে তার অনুভবই হইবে না। শূন্য দেশকালের ইন্দ্রিয়গোচর (অনুভবযোগ্য) কোন গুণ থাকিতে পারে না।

কাণ্টের সময় বৈজ্ঞানিকেরা (জড়) বস্তুর গুণগত পার্থক্য তাহার পরিমাণগত পার্থক্যের জন্য হয় বলিয়া মনে করিতেন। দুইটি বস্তু পৃথক্ পরিমাণ বলিতে এইই বুঝায় যে, যদি তাহারা একই দেশে থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিমাণ বস্তু যে রকম সে দেশ ব্যাপিয়া থাকিবে, অল্প পরিমাণ বস্তু সেই রকম সেই দেশকে ব্যাপিয়া থাকিবে না। অর্থাৎ অল্প পরিমাণ বস্তুর বেলায় কোন কোন দেশাংশ শূন্য থাকিয়া যাইবে। ঐ সব বৈজ্ঞানিকের মতে বোঝা যায়, (জড়) বস্তুর শুধু পরিমাণ বা বৈস্তারিক মহত্তাই বাস্তব

১। Continuous
২। Continuity
৩। Empty space
৪। Empty time

বা মুখ্য ধর্ম। তাহা দ্বারাই গুণগত মহত্তার উপপত্তি হয়। কাণ্ট্ বলেন দুই বস্তু একই দেশকে সমানভাবে ব্যাপিয়া থাকিলেও তাহাদের গুণগত পার্থক্য থাকিতে পারে। সুতরাং পরিমাণগত পার্থক্য না থাকিলেও গুণগত পার্থক্য থাকে। অতএব কাণ্টের মতে বৈস্তারিক মহত্তা ও গুণগত মহত্তা দুইই বস্তুর ধর্ম, শুধু বৈস্তারিক মহত্তা নয়।

আমরা যখন বলি, প্রাত্যক্ষিক বিষয়ের বিস্তারগত ও গুণগত মহত্তা থাকিবে, তখন আমাদের প্রাকৃতজ্ঞানের বিষয়ের স্বরূপ অনেকটা নির্ধারিত হয় বটে; কিন্তু ইহাই আমাদের প্রাকৃতজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, প্রাকৃতজ্ঞানে আমাদের দর্শন শ্রবণাদি পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক নিয়মবদ্ধভাবে চলে। দর্শন শ্রবণাদি নিয়াই আমাদের প্রাকৃত জ্ঞান। কিন্তু দর্শন শ্রবণাদির মধ্যে যদি কোন নিয়মবদ্ধতা না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা কোন প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। পক্ষীদর্শনের সঙ্গে উড্ডয়ন দর্শন হইতে পারে; কিন্তু টেবিল দর্শনের সঙ্গে উড্ডয়ন দর্শন সম্ভবপর নয়। এখন যদি টেবিল দেখি, তাহা হইলে টেবিলে আঘাত করিয়া কখনই মৃদঙ্গ ধ্বনি শুনিতে পাইব না, কাঠের শব্দই শোনা যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দর্শন শ্রবণাদির মধ্যে নিয়মবদ্ধতা আছে বলিয়াই তাহাদের দ্বারা প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হয়। নিয়মবদ্ধ না হইলেও দর্শন শ্রবণ সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু তাহাদ্বারা প্রাকৃত জ্ঞান পাওয়া যায় না। পাগলের দর্শন শ্রবণ লোপ পায় না, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন নিয়মবদ্ধতা থাকে না; সেই জন্য পাগলের দর্শন শ্রবণে প্রাকৃত জ্ঞানের উপাদান পাওয়া যায় না। এ রকম অসম্বদ্ধ দর্শন শ্রবণ দ্বারা বাস্তবিক কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না। তাই বলা হইয়াছে আমাদের দর্শন শ্রবণাদি নিয়মবদ্ধভাবে সুসম্বদ্ধ হওয়াতেই প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হয়।

আমাদের দর্শন শ্রবণকে যদি ব্যাপক অর্থে প্রত্যক্ষ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে কাণ্টের তৃতীয় মূল সূত্র এই রকম দাঁড়ায়:—প্রত্যক্ষাবলীর মধ্যে এক অপরিহার্য সম্বন্ধের প্রতীতি দ্বারাই প্রাকৃতজ্ঞান সম্ভবপর হয়[১]। আমাদের দর্শন শ্রবণের মধ্যে এক অপরিহার্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া প্রতীতি হইলেই প্রাকৃত জ্ঞান হয়। যেখানে ধূমদর্শন হয়, সেখানে অবশ্যই অগ্নিদর্শন

১। Experience is possible only through the representation of a necessary connexion of perceptions.

হইবে, এ রকম প্রতীতি হয় বলিয়াই ধূমের জ্ঞানকে প্রাকৃত জ্ঞান বলিতে পারা যায় এবং ধূমকেও বিষয় বলা যাইতে পারে। যে ধূমের সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধ নাই, সে ধূম প্রকৃত ধূমই নয়। যে ধূমদর্শন অগ্নিদর্শনের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সম্বন্ধ নয়, সে ধূমদর্শন প্রাকৃত জ্ঞানের অঙ্গ নয়। আমরা ধূম দেখিলেই যে অগ্নি দেখি, তাহা নয়, কিন্তু ধূম দেখিলে অবশ্যই আমাদের এ রকম প্রতীতি হয় যে, আমি না দেখিলেও অন্য কেহ ধূমস্থানে নিশ্চয়ই অগ্নি দেখিতে পাইবে। 'আমার' 'তোমার' দেখা বা অগ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধ মুখ্য কথা নয়; মুখ্য কথা, কোন অবভাস পূর্বভূত বা পশ্চাদ্ভাবী অন্যান্য অবভাসের সহিত নিয়মিতভাবে সংবদ্ধ না হইয়া প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয়ই হয় না।

মূল সূত্রে প্রত্যক্ষ শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া বলা গিয়াছে। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ বলিতে আমরা বিষয়জ্ঞানই বুঝি, কিন্তু মূল সূত্রের অর্থে প্রত্যক্ষাবলীর সুসম্বদ্ধতাতেই বিষয়জ্ঞান সম্ভবপর হয়; ইহা হইতে এই রকম বোঝা যায় যে, ঐ প্রত্যক্ষ বিষয়জ্ঞান ব্যতীতও হইতে পারে। ঐ প্রত্যক্ষ দ্বারা শুধু দর্শন শ্রবণাদিই বুঝিতে হইবে। তাহাতে জ্ঞানীয় কোন বিষয় থাকে না, এই অর্থ নয়। তবে ঐ বিষয়কে 'প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয়'[১] বা প্রাকৃত বিষয় তখনই বলা যায়, যখন তৎসম্বন্ধীয় দর্শন শ্রবণ নিয়মবদ্ধভাবে সুসম্বদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়। আমাদের বিভিন্ন জ্ঞান নিয়মপূর্বক পরস্পর সুসম্বদ্ধ হইলেই তাহাদের বিষয় প্রাকৃত বিষয় বলিয়া বোঝা যায়। জ্ঞানীয় সুসম্বদ্ধতা বিষয়ের প্রাকৃতত্বের কারণ।

এই মূল সূত্রকে কাণ্ট্ 'প্রাকৃত জ্ঞানের উপমাণের'[২] মূল সূত্র বলিয়াছেন। সব অবভাসই[৩] কালে সম্ভবপর হয়। যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানে ভাসে, তাহা 'এখন' বা 'তখন' কোনকিছুর 'আগে' বা 'পরে' (কালিক) ভাসিয়া থাকে। অবভাসকে, বা যে দর্শন শ্রবণে তাহা ভাসে তাহাকে, নিয়তরূপে সম্বন্ধ করিয়াই অবভাসকে বিষয়ে পরিণত করা হয়। নিয়ত সংবন্ধের অভাবে অবভাস ভাসমাত্র[৪] থাকিয়া যায়, প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয় হয় না। এখন এই নিয়ত সম্বন্ধগুলির কথাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অবভাস ও তৎসম্বন্ধীয় দর্শন শ্রবণ সবই যখন কালিক, তখন তাহাদের মধ্যে যে নিয়ত সম্বন্ধের কথা বলা হইতেছে, তাহাও কালিক সম্বন্ধেরই অনুরূপ হইবে বলিয়া

১। Object of Experience
২। Analogies of Experience
৩। Appearance
৪। Mere appearance

বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ কালের তিন অবস্থা[১] বা ধর্মের কথা বলা হয়। এখানে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কথা হইতেছে না; অন্য তিনটি ধর্মের কথা বলা হইতেছে। সেই ধর্মগুলি এই :—(১) ব্যাপকতা (স্থিতি[২]), (২) ক্রমিকতা[৩] (পৌর্বাপর্য) ও (৩) সহভাব[৪]। যদি কোন বস্তু কালিক হয়, অর্থাৎ কালে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই কিছু সময় ব্যাপিয়া থাকিতে হয়। সে সময় যতই অল্প হউক না কেন, তাহার কিছু না কিছু পরিসর থাকিবেই, এবং সেই সময়ে যে বস্তু থাকিবে, তাহাকে সেই পরিসর ব্যাপিয়াই থাকিতে হইবে। ততটুকু পর্যন্ত সময় একভাবেই রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হয়। কালিক বস্তু এক মুহূর্তও থাকিতে পারে, এক বৎসরও থাকিতে পারে; কিন্তু যত সময়ই হউক না কেন, সেই সময় ব্যাপিয়া কালিক বস্তুটি দাঁড়াইয়া আছে, বা স্থিত আছে, বলিয়া আমরা বুঝিয়া থাকি। সময়ের যে ধর্ম থাকাতে তাহার পরিমাণ বা পরিসর বুঝিতে পারা যায় বা কালিক বস্তু দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাকেই এখানে তাহার ব্যাপকতা[২] বা স্থিতি[২] বলা হইতেছে। (যখনই কোন বস্তু দাঁড়াইয়া আছে মনে করি, বা তাহার কিছুমাত্র স্থায়িত্ব আছে ভাবি, তখনই তাহার উপর কালিক ধর্ম আরোপ করা হয়। কাল ব্যতীত স্থিতির কোন অর্থ হয় না; স্থিতিকে কালিক ধর্মরূপেই বুঝিতে পারা যায়।) সময়ে যাহা থাকে, তাহা কাহারও আগে থাকে কাহারও পরে থাকে। সময়ের যে ধর্মের বলে কালিক পদার্থের পূর্বাপর ভাব হয়। তাহাকেই তাহার ক্রমিকতা[৩] বলা হইতেছে। যে সময়ে এক বস্তু আছে, ঠিক সেই সময়ে অন্যান্য অনেক বস্তুও থাকিতে পারে। ইহাই তাহাদের সাময়িক সমভাব। সহভাব কালিক ধর্মবিশেষ। এই কালিক ধর্মত্রয়ের অনুরূপ তিনটি উপমানের কথা কাণ্ট্‌ বলিয়াছেন। অবভাস কিরূপে তিনপ্রকারের নিয়ত কালিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বিষয়তা লাভ করে, তাহাই এই উপমানগুলির বুঝাইবার বিষয়। এগুলিকে উপমান বলা হইল কেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে কেহ কেহ মনে করেন, সম্বন্ধগত বৌদ্ধিক প্রকারের[৫] সঙ্গে ইহাদের প্রতিপাদ্য নিয়ুক্ত

১। Modes
২। Duration
৩। Succession
৪। Coexistence
৫। Categories of relation

কালিক সম্বন্ধের সাদৃশ্য আছে[১] বলিয়া, অর্থাৎ ঐ সব প্রকারের সহিত এই সব সম্বন্ধ উপমিত হইতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে উপমান[২] বলা হইয়াছে।

প্রথম উপমান

অবভাসের সব পরিবর্তনের মধ্যে দ্রব্য স্থায়ী, তাহার প্রাকৃতিক পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না[৩]।

আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি, যাহাই আমাদের জ্ঞানে ভাসে, তাহাদের সকলের কালিক ধর্ম থাকে। তাহারা একসঙ্গে আসে অথবা একটার পর অপরটা উপস্থিত হয়। এই সহভাব এবং পৌর্বাপর্য কালিক ধর্ম। এই সব ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের এক স্থায়ী দণ্ডায়মান কালের কল্পনায় উপস্থিত হইতে হয়। একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, সময় চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোথা হইতে কোথায় যায়? বাস্তবিক কি সময় যায় বা যাইতে পারে? কোন বস্তু যদি কোথা হইতে কোথাও যায়, তাহা হইলে তাহা এক জায়গা হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্য জায়গায় উপস্থিত হয়। সময়ের পক্ষে তাহা একেবারেই সম্ভবপর নয়। সময় নিজে যাওয়া আসা করে না। যাওয়া আসা ত দূরের কথা,—যাওয়া আসাতে দেশের কল্পনা জড়িত হইয়া আছে,—শুধু পরিবর্তনও সময়ের উপর লাগে না। অবভাসেরই আমরা পরিবর্তন দেখিতে পাই। আমাদের জ্ঞানে যাহা ভাসে, যাহা প্রতীত হয়, তাহাকেই অবভাস বলা হইয়াছে। তাহাতেই পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়; সময় নিজেই পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, একথা বলিতে পারা যায় না। কোন উপাধির আশ্রয় না লইয়া, কালবৃত্তি কোন বাস্তব অবভাসের কথা না ভাবিয়া, কালিক কোন পরিবর্তন বা ভেদ বুঝিতে পারা যায় না। অবভাসের পরিবর্তনাদি ত স্পষ্টই দেখিতে পারা যায়। আগুনের উপর বসান ঠাণ্ডাজল দেখি আস্তে আস্তে গরম হইয়া উঠে। শীতল জল উষ্ণাবস্থায় পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তন কালিক ধর্ম। এই পরিবর্তন সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও ইহাকে বুঝিতে পারা যায় কি করিয়া? অপরিবর্তনশীল কালকে আশ্রয় করিয়া সব কিছুর

১। Analogous　　২। Analogy

৩। In all changes of appearance substance is permanent; its quantum in nature is neither increased nor diminished.

পরিবর্তন বুঝিতে পারা যায়। আসল কথা, স্থায়ী কিছু না হইলে পরিবর্তন হইতে পারে না। যাবতীয় কালিক পদার্থ অস্থায়ী হইলেও কাল নিজে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী দণ্ডায়মান কালকে অবলম্বন করিয়াই জাগতিক সব পরিবর্তন বোধগম্য হয়। কিন্তু শূন্যগর্ভ শুদ্ধ কালকে ত জ্ঞাত বিষয়রূপে আমরা অনুভবে পাই না। অতএব আমাদের অনুভূয়মান অবভাসের মধ্যে এমন কিছু পাইতে হইবে, যাহাকে স্থায়ী কালের প্রতিনিধিরূপে ধরিতে পারা যায় এবং যাহার অপরিবর্তিত সত্তাদ্বারা যাবতীয় অবস্থার পরিবর্তন বোধগম্য হইতে পারে। এ রকম পদার্থকে দ্রব্য[১] বলা হইয়াছে। যাহার দ্বারা পরিবর্তন বোধগম্য হয়, অথচ যাহার নিজের পরিবর্তন হয় না, তাহার নামই দ্রব্য।

উপরে যে জলের দৃষ্টান্ত নেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই, জল স্থায়ী আছে বলিয়াই তাহার ঠাণ্ডা অবস্থা হইতে গরম অবস্থার পরিবর্তনের কথা আমরা বলিতে পারি। শীতল জল চলিয়া গিয়া তাহার স্থানে উষ্ণ জলের আবির্ভাব হইলে, শীতল জলের পরিবর্তন হইল, একথা বলিতে পারা যাইবে না। প্রথম জলের ত ধ্বংসই হইয়া গেল। একই জল বর্তমান আছে বলিয়াই তাহার পরিবর্তনের কথা বলিতে পারা যায়। যে কোন বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনের কথা বলিতে গেলেই বস্তুটি একই আছে বলিয়া ভাবিয়া নিতে হয়। এক বস্তুর জায়গায় যদি অন্য বস্তু আসে, তখন সেই বস্তুর পরিবর্তন হইল, বলিতে পারা যায় না। এক বস্তুর নাশ ও অপর বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, এই মাত্র বলিতে পারা যায়। যদি বলি তাহাদ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা জগতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বা জগৎকে স্থায়ী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরিবর্তন বুঝিতে হইলে এক স্থায়ী পদার্থের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। যে স্থায়ী তাহারই পরিবর্তন হইতে পারে।

কিন্তু কথাটা কি রকম হইল? স্থায়ী মানে ত যাহার পরিবর্তন হয় না। সুতরাং যদি বলি, স্থায়ী পদার্থেরই পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে ত এইই বলা হইল যে, যে পদার্থের পরিবর্তন হয় না, তাহারই পরিবর্তন হয়। একথার মধ্যে ত স্পষ্ট স্ববিরোধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁ, এরূপ কথায়

১। Substance

বিরোধাভাস রহিয়াছে বটে, কিন্তু কথাটার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিলে দৃশ্যমান বিরোধের নিরাস হইবে। আমরা ত দেখিয়াছি, স্থায়ী না হইলে পদার্থের পরিবর্তন হইতে পারে না। কিন্তু স্থায়ী থাকা ও পরিবর্তিত হওয়া যখন বিরুদ্ধ কথা, তখন বুঝিতে হইবে, যে ভাবে পদার্থ স্থায়ী বা এক থাকে, সে ভাবে তাহার পরিবর্তন বা ভেদ হয় না। বস্তুর সত্তাতে কোন পরিবর্তন হয় না; বস্তুটি আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু তার অবস্থার ভেদ হইয়াছে; আগে যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই। একই ব্যক্তি এক সময়ে থাকে তরুণ, অন্য সময়ে হয় বৃদ্ধ। একই ফল এক সময়ে থাকে কাঁচা, অন্য সময়ে হয় পাকা। কিন্তু এই অবস্থাভেদের মধ্যে আমরা বস্তুভেদ কল্পনা করি না। বস্তুর যে ভাবের মধ্যে কোন ব্যত্যয় ঘটে না, সে ভাবেই বস্তু দ্রব্য। দ্রব্য স্থায়ী ও পরিবর্তনরহিত; দ্রব্যের পরিবর্তন হয় না বলিয়া হ্রাসবৃদ্ধিও হইতে পারে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে তাহার পরিমাণ সব সময় একই থাকে।

এমন কথা বলা হইতেছে না যে বাস্তবিক দ্রব্য বলিয়া স্বগতসত্তাক[১] স্বতন্ত্র কোন চিরস্থায়ী বস্তু আছে। বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইতেছে না। সবই অবভাস[২] লইয়া কথা। এবং অবভাসের মধ্যেই স্থায়ী বলিয়া কিছু আমাদের বুদ্ধিকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা না হইলে অবভাসেরই বিষয়রূপে উপলব্ধি হইতে পারে না। আমাদের সব উপলব্ধি শুধু সময়েই সম্ভবপর হয়; আমাদের শুধু কালিক পদার্থেরই অনুভব হইতে পারে। তার অর্থ, আমরা যে সব পদার্থ অনুভব করিয়া থাকি বা করিতে পারি, তাহার কালিক ধর্ম থাকিবেই থাকিবে। সে সব পদার্থের কতকগুলি আমরা এক সঙ্গে অনুভব করিতে পারি; বেশীর ভাগই পর পর অনুভব করি। এই পৌর্বাপর্য এবং সহভাব যে কালিক ধর্ম, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। স্থিতিশীল[৩] পদার্থেরর ভিত্তির উপরই এই সব ধর্ম ভাসিতে পারে। কিছুই যদি স্থায়ী না থাকে, তবে এক সঙ্গেই বা কি, আর পর পরই বা কি, কিছুরই অর্থ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, স্থায়ী কোন পদার্থ গ্রহণ না করিলে, আমাদের কালিক অনুভবই সম্ভবপর হয় না, এবং আমাদের সব অনুভবই যে কালিক, তাহা বার বার বলা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, আমাদের অনুভব এবং তাহার ফলে

১। Thing in itself ২। Appearance ৩। Permanent

প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হইতে হইলে স্থায়ী পদার্থ অত্যন্ত আবশ্যক। এই স্থায়ী পদার্থকেই দ্রব্য বলা হইতেছে।

দ্রব্যকে এক অর্থে নিত্য বলিয়াই ধরিতে পারা যায়। তাহার বিনাশ বা উৎপত্তি হইতে পারে না। দ্রব্যকে ত আমরা সময়েরই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছি। নূতন দ্রব্যের উৎপত্তির অর্থ এক অভিনবকালের উৎপত্তি বলিয়াই ধরিতে পারা যায়। কিন্তু এই রকম নানা কালের কল্পনা যুক্তিসহ নহে। কালকে আমরা এক বলিয়াই জানি। কালের একত্ব আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের ভিত্তিস্থানীয়। কাল এক হওয়াতে তাহার একত্ববাধক নব নব দ্রব্যের উৎপত্তি মানিতে পারা যায় না। তবে কি বুঝিব সৃষ্টি বলিয়া কিছু হয় নাই? হইয়া থাকিতে পারে। ভগবান সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু সৃষ্টি করিলে তিনি ত স্বগতসত্তাক বাস্তব পদার্থই[১] সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ঐ রকম পদার্থের উৎপত্তি বিনাশের কথা আমরা কিছু জানি না। এখানে আমরা অবভাসের কথা বলিতেছি। এ রাজ্যে হঠাৎ সৃষ্টির কথা মানিতে পারা যায় না। দ্রব্যস্বরূপ বৌদ্ধিক প্রকার অবভাসেই প্রযোজ্য, স্বগতসত্তাক স্বতন্ত্র বস্তুতে নয়। আবভাসিক জগতে স্থায়ী দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই সব পরিবর্তন সম্ভবপর হয়। এখানে নানা পরিবর্তন সর্বদাই ঘটিতেছে, কিন্তু এসব পরিবর্তন আমরা অধিষ্ঠানভূত দ্রব্যের অবস্থা ভেদরূপেই বুঝিয়া থাকি, বিভিন্ন দ্রব্যের আবির্ভাব তিরোভাবরূপে নয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল অবভাস বা দৃশ্যজগতের কল্পনাতেই স্থায়ী দ্রব্যের কল্পনা অন্তর্নিহিত আছে। স্থায়ীর বুকেই অস্থায়ীর স্থান, তাহা না হইলে সে দাঁড়াইতেই পারে না। এই স্থায়ী দ্রব্যের কল্পনা ব্যতিরেকে আমাদের প্রাকৃত জ্ঞান অসম্ভব হইয়া উঠিত।

দ্বিতীয় উপমান

যাবতীয় পরিবর্তন কার্যকারণ সম্বন্ধের নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে[২]। অথবা যাহা কিছু ঘটে, অর্থাৎ হইতে আরম্ভ করে, তাহা অন্য কিছুর উপর এমনভাবে নির্ভর করে যে নিয়মপূর্বক তাহার পরেই ইহা আসিয়া থাকে[৩]।

১। Things in themselves.

২। All changes take place in conformity with the law of the connexion of cause and effect.

৩। Everything that happens, i. e., begins to be or presupposes something upon which it follows according to a rule.

কাণ্ট্ এখানে কার্যকারণ সম্বন্ধের মূলসূত্রই প্রতিপাদন করিতেছেন। কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে হিউম্ যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কাণ্ট্ তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিউমের মতে কার্যকারণভাবরূপ কোন অনিবার্য[১] নিয়ত সম্বন্ধ আমরা পাই না। তাঁহার মতে সব জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ানুভব হইতে আসে। এরকম অনুভবে আমরা শুধু এই দেখিতে পাই যে, এক ঘটনার পর আরেক ঘটনা ঘটে, অথবা এক পদার্থের পর অন্য পদার্থ আসে। কিন্তু প্রথমটা যে দ্বিতীয়টাকে উৎপন্ন করে, সে কথা আমরা ইন্দ্রিয়ানুভব হইতে জানিতে পারি না। পূর্ববর্তী ঘটনার উপর যে পরবর্তী ঘটনা নিয়মতঃ ও অনিবার্যরূপে নির্ভর করিতেছে, সে কথা কোন অনুভব হইতেই পাওয়া যায় না। অনুভবে শুধু পূর্বাপরভাব পাওয়া যায়। বারংবার একই পৌর্বাপর্য দেখিয়া দেখিয়া অভ্যাসের বশে তাহাকে নিয়ত ও অনিবার্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। ক—খ'কে বার বার একত্র (পরপর) দেখায়, আমাদের মনের মাঝে তাদের বিষয়ে এমন গাঢ় সম্বন্ধ বাঁধিয়া যায় যে, ক'কে দেখিলে খ'এর আশা বা আশঙ্কা আমরা না করিয়া পারি না। এই মানস সম্বন্ধকে আমরা কার্যকারণরূপে বাস্তব বলিয়া ভাবিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে তাহা অমূলক। হিউমের মতে আমাদের ইন্দ্রিয়জন্য বা প্রাকৃত অনুভব[২] হইতেই সব কিছু পাইতে হয়; সুতরাং কার্যকারণ কল্পনাকেও অনুভব হইতে পাওয়া উচিত। কিন্তু অনুভবের মধ্যে যখন নিয়তত্ব বা অনিবার্যত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন যে কার্যকারণ সম্বন্ধকে নিয়ত ও অনিবার্য বলিয়া মনে করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক। কাণ্ট্ বলেন, কার্যকারণকল্পনা আমরা প্রাকৃত অনুভব হইতে আহরণ করি না। কার্যকারণকল্পনার উপরেই প্রাকৃত অনুভব নির্ভর করে। কার্যকারণভাব না থাকিলে প্রাকৃত অনুভবই অর্থহীন হইয়া যাইত। কার্যকারণবোধ প্রাকৃত অনুভবের দ্বারা 'জন্য' নয়; বরং কার্যকারণবোধকে প্রাকৃত অনুভবের জনক[৪] বলা যাইতে পারে। কাণ্টের মতে, হিউম্ কার্যকারণবোধকে প্রাকৃত অনুভবের 'জন্য' মনে করিয়া যে সব দোষের ভাগী করিয়াছেন, কার্যকারণবোধ বাস্তবিক পক্ষে প্রাকৃত অনুভবের

১। Necessary
২। Experience
৩। Product
৪। Ground

জনক হওয়াতে ঐ সব দোষ তাহাতে লাগিতে পারে না। হিউমের কথার সারমর্ম এই যে, কার্যকারণ বলিতে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা আমরা বুঝিয়া থাকি, বাস্তব (প্রাকৃত) জগতে সে রকম কিছু নাই। সুতরাং আমাদের ঐ রকম কার্যকারণবোধ ভ্রমাত্মক। কাণ্ট্ বলেন, কার্যকারণবোধ ব্যতিরেকে প্রাকৃত জ্ঞানই সম্ভবপর নয়; আর প্রাকৃত জ্ঞানকে যখন মানিতেছি,—কেহই প্রাকৃত জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অস্বীকার করেন না—তখন তাহার মূলভূত কার্যকারণবোধকে ভ্রমাত্মক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমাদের প্রাকৃত অনুভবের দ্বারা যে কার্যকারণবোধ সিদ্ধ হইতে পারে না, এ বিষয়ে কাণ্ট্ ও হিউমের একমত। কাণ্ট্ বলেন, কার্যকারণভাবরূপ নিয়ত সম্বন্ধ আমাদের প্রাকৃত অনুভবের যোগ্য বিষয়ই নয়। নিয়তত্ব বা অবশ্যম্ভবত্ব[১] প্রাকৃত অনুভব দ্বারা কখনই লভ্য নয়; ইহা আমাদের বুদ্ধিরই দান। ইহার ফলেই যখন প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর হয়, তখন প্রাকৃত জ্ঞানকে মানিয়া ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। ইহাতেই তাহার প্রামাণ্য। কার্যকারণ সম্বন্ধকে আমাদের প্রামাণিক বলিয় মানিতে হয়; কেননা কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যতিরেকে আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানই[২] সম্ভবপর হয় না। প্রাকৃত জ্ঞানের মূলে কার্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ বিদ্যমান আছে, তাহাই এখন বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রাকৃত জ্ঞানের প্রধান কথা, বিষয়বোধ তাহাতে হওয়া চাই। বিষয়বোধ না থাকিলে প্রাকৃত জ্ঞানই হয় না। বিষয়বোধের অর্থ শুধু এই নয় যে, আমাদের জ্ঞানে কিছু না কিছু ভাসিবে। জ্ঞানে ত কিছু ভাসিবেই; কিন্তু যাহা ভাসিবে, তাহাকে বিষয় হইতে হইবে। বিষয় হওয়ার অর্থ এই যে, তাহার এক নির্দিষ্ট স্বরূপ থাকিবে, যাহা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিবে না। যে পদার্থ আমরা ইচ্ছা করিলে চতুষ্কোণও দেখিতে পারি, গোলাকারও দেখিতে পারি, সে পদার্থ বিষয়ই নয়।

প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই বহুতা রহিয়াছে[৩] অথবা প্রত্যেক বিষয়ই সাবয়ব বলিতে পারা যায়। বিভিন্ন অবয়বের জ্ঞান আমাদের পক্ষে পর পর হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু সব সময়ে বিভিন্ন অবয়ব যে বস্তুতেও পর পর অবস্থায় আছে, তাহা নহে। আমরা যখন একটি বাড়ী দেখি, তখন তাহার

১। Necessity ২। Experience ৩। Manifold

ছাদ দেখিয়া ভিত দেখিতে পারি, কিংবা এক পাশ দেখার পর অন্য পাশ দেখিতে পারি। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, বাড়ীতে ছাদের পর ভিত কিংবা এক পাশের পর অন্য পাশ আছে। বাস্তবে বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য নাই; সব অবয়বই একসঙ্গে আছে যখন আমরা নদীবক্ষে স্রোতে ভাসমান কোন নৌকার গতি লক্ষ্য করি, তখন প্রথমে নৌকাকে একস্থানে দেখি, পরে অন্যস্থানে দেখি। কিন্তু এখানে আমরা যে নৌকার দুই অবস্থান পর পর দেখিলাম, তাহা একসঙ্গে আছে বা থাকিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি বাস্তবেও প্রথম অবস্থানের পর দ্বিতীয় অবস্থান হইয়াছে, দুই অবস্থান একসঙ্গে নাই, এবং দ্বিতীয় অবস্থানের পর প্রথম অবস্থান হয় নাই। বাড়ীর বেলা ও নৌকার বেলা উভয়ত্রই আমরা যাহা দেখিলাম, তাহা পর পর দেখিলাম, অথচ একের বেলা (বাড়ীতে) ভাবি বাস্তবে বা বিষয়ে কোন পূর্বাপর ভাব নাই, অন্যের বেলা (নৌকার গতিতে) মনে করি, বাস্তবে (বিষয়েও) পূর্বাপর ভাব রহিয়াছে। ইহার কারণ কি?

কোন বাড়ী দেখিতে গিয়া আমরা ছাদ দেখিবার পর ভিত দেখিতে পারি বটে, কিন্তু এমন কোন নিয়ম নাই যে ছাদের পরই ভিত দেখিতে হইবে। ভিত দেখিয়াও ছাদ দেখিতে পারি। যে ক্রমে বাড়ীর বিভিন্ন ভাগ দেখিলাম, অনায়াসে সে ক্রমের বিপর্যয় করা যাইতে পারে। ছাদ দেখিয়া ভিত দেখা যায়, ভিত দেখিয়াও ছাদ দেখা যায়। এখানে পৌর্বাপর্যের কোন নিয়ম নাই। নিয়মতঃ যদি ছাদের পর ভিত দেখিতে হইত, তাহা হইলে বাস্তবে ও বিষয়েও পৌর্বাপর্য আছে বলিয়া ভাবিতে পারা যাইত। তাহা যখন নয়, তখন এখানে বাস্তবিক কোন পৌর্বাপর্য আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু নৌকার বেলা অন্যরকম। নদীর উপরিভাগে নৌকা দেখার পরই নৌকাকে নদীর নিম্নভাগে দেখিতে পারা যায়। নদীর নিম্নভাগে নৌকাকে প্রথমে দেখিয়া পরে নদীর উপরিভাগে নৌকাকে দেখিতে পারা যায় না। এখানে পৌর্বাপর্যের নিয়ম রহিয়াছে। এই নিয়মের জোরেই এখানে পূর্বাপরভাব বিষয়গত বলিয়া মনে করি। এই পূর্বাপরভাবের নিয়মকেই কার্যকারণভাব বলা হয়। ক—খ যখন কার্যকারণভাবে সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ ক যখন খ-এর কারণ হয়, তখন ক-এর পরই খ আসিতে বা ঘটিতে পারে, অন্যথা নয়। বিষয়গত এই কার্যকারণভাব

আছে বলিয়াই আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের কোন মূল্য বা অর্থ আছে। অগ্নি সংযোগে যদি কখন বস্তু উষ্ণ এবং কখন শীতল হইয়া যাইত, ভোজনের পর যদি কখন ক্ষুধাশান্তি, কখন ক্ষুধাবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে প্রাকৃতজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সম্ভবপরই হইত না। বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণের নিয়ম বর্তমান আছে বলিয়া বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা আমাদের সম্ভবপর হইয়াছে।

আমরা জানি সময়ের মধ্যে পূর্বাপর ভাব রহিয়াছে। পূর্ববর্তী মুহূর্তের পরই পরবর্তী মুহূর্ত আসিতে পারে। সময় ত অনবরত চলিয়াছেই। কিন্তু পূর্ববর্তী মুহূর্ত না গেলে পরবর্তী মুহূর্ত আসিতে পারে না। কিন্তু শুধু সময়কে ত আমরা পৃথক্‌ভাবে বিষয়রূপে অনুভবে পাই না। পূর্বাপর ঘটনার জ্ঞানেই সময়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। অবভাসের পরিবর্তনকেই ঘটনা বলিতেছি। এই অবভাসের মধ্য দিয়াই সময় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। আকাশমার্গে সূর্যের গতি দ্বারা (অথবা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতি দ্বারা) আমরা সময়ের গতি বুঝিতে পারি। শুদ্ধ কালকে কোথাও পাই না, অথচ কাল আমাদের সব অনুভবেই, সুতরাং সব অবভাসেই, বর্তমান আছে। সব অবভাসেই কাল বর্তমান থাকায়, সব অবভাসই কালিক ধর্মাক্রান্ত না হইয়া পারে না। পূর্ববর্তী মুহূর্ত না আসিলে পরবর্তী মুহূর্ত আসিতে পারে না, এবং পূর্ববর্তী মুহূর্ত চলিয়া গেলে পরবর্তী মুহূর্ত না আসিয়া পারে না, ইহা কালের এক বিশেষ নিয়ম বা ধর্ম। এই নিয়ম বা ধর্ম অবভাসেও না ফুটিয়া পারে না; কেননা কালের আকারেই ত অবভাস আমাদের জ্ঞানে উপস্থিত হয়। কালের মধ্যে যে অনিবার্য পূর্বাপরভাব রহিয়াছে, তাহাই অবভাসের মধ্যে কার্যকারণভাবরূপে প্রকাশ পায়। কালের মধ্যে যে নির্দিষ্ট ক্রম[১] রহিয়াছে, কার্যকারণভাব তাহারই রূপান্তর। অবভাসের পূর্বাপরভাবও বাস্তবিক কার্যকারণভাবের দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। স্বতন্ত্রভাবে শুদ্ধ কালের জ্ঞান সম্ভবপর হইলে, বিভিন্ন ঘটনাকে পূর্বাপর কালের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পূর্বাপর বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতাম। স্বতন্ত্রভাবে পূর্বাপর কাল ত আমরা পাই না, তাই ঘটনাবলীর মধ্যে পৌর্বাপর্য নিরূপণ করিতে হইলে আমাদিগকে কার্যকারণ সম্বন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে যাহার

১। Fixed order

কারণ, সে তাহার পূর্বে (কালে) এবং যে যাহার কার্য, সে তাহার পরে (কালে) থাকে। এতদ্ব্যতীত ঘটনাবলীর মধ্যে পৌর্বাপর্য নির্ণয়ের আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নাই।

কার্যকারণ সম্বন্ধ কালিক সম্বন্ধ বিশেষ। যাহা নিয়তই পূর্বে থাকে, তাহা কারণ; যাহা নিয়তই পরে আসে, তাহা কার্য। বিশ্বের বর্তমান অবস্থা বিশ্বের পরবর্তী অবস্থার কারণ; বর্তমান অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার ফলেই উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং পূর্ববর্তী অবস্থার কার্য। কিন্তু এই অবস্থা-বলীর মধ্যে কোথাও ছেদ বা ফাঁক নাই। দুই অবস্থার মধ্যে সর্বদাই এক তৃতীয় অবস্থা পাইতে পারি। ইহা অবস্থাবলীর নৈরন্তর্য বা অবিরলতারই[১] ফল। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় লাফ দিয়া যাওয়া যায় না, মধ্যবর্তী অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। আর দুই অবস্থার মধ্যে এক তৃতীয় অবস্থা পাওয়া যায় না, এমন কখনও হয় না। কালের বেলাও তাই। অনাদি অনন্ত কালধারা অবিরলভাবে চলিয়াছে। কালসন্তান[২] এমন ঘনভাবে[৩] সমাবিষ্ট যে, যে-কোন দুই সন্তানীর[৪] মধ্যে এক তৃতীয় সন্তানী সর্বদাই পাওয়া যায়। কালের ক্ষুদ্রতম খণ্ড বলিয়া কিছু নাই। যত অল্পই সময় নেওয়া হউক না কেন, তাহাকেও ভাগ করিতে পারা যায়। ইহাই কালের অবিরলতা বা নৈরন্তর্যের অর্থ। কালস্রোত ও জাগতিক ঘটনাস্রোত অবিরল ধারায় প্রবাহিত হওয়ায় কোথাও কোন ছেদ বা ফাঁক পাওয়া যায় না, এবং এক ঘটনা হইতে অন্য ঘটনায় লাফ দিয়া পৌছিতে হয় না। এই জন্য কোন কারণই তাহার কার্য হঠাৎ উৎপাদন করে না। কারণ ব্যাপার অবিরলভাবে কিছু সময় চলিতে থাকে, এবং তাহার ফলেই কার্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন করিতে হইলে, যত কমই হউক না কেন, কিছু না কিছু সময় লাগিবেই।[৫]

তৃতীয় উপমান

যে সব দ্রব্য এককালে থাকে, তাহাদের মধ্যে পুরামাত্রায় 'সামাজিকতা' (অন্যোন্যনির্ভরতা) বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্তমান রহিয়াছে[৫]।

১। Continuity

২। Series

৩। Compact

৪। Member

৫। All substances so far as they are co-existent stand in thoroughgoing community, that is, in mutual interaction.

আমরা দ্বিতীয় উপমানের বিচারে দেখিয়াছি, বস্তুগত পৌর্বাপর্য বুঝিতে হইলে কার্যকারণ সম্বন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা সব সময়ই এক জিনিসের পর অন্য জিনিস দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাই বলিয়া সব জিনিস বাস্তবিক পর পর আছে বলিয়া মনে করি না। বস্তুগত্যা কোন কোন জিনিস পর পর থাকে, আবার কোন কোন জিনিস একসঙ্গেও থাকে। জ্ঞানগত পৌর্বাপর্যের দ্বারা বস্তুগত পৌর্বাপর্য নিরূপিত হয় না। কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা বাস্তবিক পৌর্বাপর্য বুঝিতে পারা যায়। বস্তুগত পৌর্বাপর্যের কখনও বিপর্যয় হয় না। কার্যকারণ সম্বন্ধেরও এই নিয়ম। যাহা কারণ, তাহা সর্বদাই কার্যের আগে থাকে, কখনই পরে নয়। যে পৌর্বাপর্য শুধু আমাদের জ্ঞানে আছে, বস্তুতে নাই, তাহার অনায়াসে বিপর্যয় হইতে পারে। ঘরের ছাদ দেখিয়া আমরা ভিত দেখিতে পারি; এখানে যে পৌর্বাপর্য আছে, তাহার সহজেই বিপর্যয় হইতে পারে; আমরা অনায়াসেই ভিত দেখিয়া ছাদ দেখিতে পারি। অতএব দেখা যাইতেছে, যেখানে বস্তুগত পৌর্বাপর্য[১] নাই, কিন্তু সহভাব[২] রহিয়াছে, সেখানে আমরা যাহা খুসী আগে বা পরে দেখিতে বা জানিতে পারি। যখন দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে আমরা যাহাকে খুসী আগে দেখিয়া অন্যকে বা অন্যদিগকে পরে দেখিতে পারি, তখন বুঝিতে হইবে, তাহারা একসঙ্গে বা এক সময়ে আছে, ভিন্ন সময়ে নয়। বাস্তবিক পৌর্বাপর্য বা কার্যকারণ সম্বন্ধের বেলায় এক বিষয়ের (কারণ) দ্বারাই বিষয়ান্তর (কার্য) নিয়ন্ত্রিত[৩] হইয়া থাকে; এই নিয়ন্ত্রণ শুধু একদিক হইতে হয় বলিয়া কারণের পরই কার্য আসিতে পারে, কেননা কার্য কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কারণ কার্যের দ্বারা নয়। কিন্তু যেখানে বাস্তবিক পৌর্বাপর্য নাই অর্থাৎ সহভাব আছে, সেখানে এরকম ঐকদেশিক[৪] নিয়ন্ত্রণ থাকিতে পারে না। সেখানে সকলেই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

কথাটা একটু দুর্বোধ্য হইল। যেখানে কয়েকটি বিষয় একই সঙ্গে থাকে, সেখানে বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নাই; কেননা কার্যকারণ সম্বন্ধ বলিতে নিয়মিত পৌর্বাপর্য বুঝায়। কার্যকারণ সম্বন্ধ না থাকাতে অবশ্য বলিতে পারা যায় না যে একের দ্বারা অন্য নিয়ন্ত্রিত

১। Succession
২। Co-existence
৩। Determined
৪। Onesided

হইয়াছে। কিন্তু একের দ্বারা অন্য নিয়ন্ত্রিত হইল না বলিয়া কি বুঝিতে হইবে তাহারা পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে? কাণ্ট্ বলেন, হাঁ; কেননা ঐরকম নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই বিষয়ান্তরসম্পর্কিত কালিক অবস্থান[১] নিরূপিত হইতে পারে না। আগেই বলা হইয়াছে, শুদ্ধ কালের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সাক্ষাৎভাবে কালের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতাম, দুই বস্তু একই সময়ে আছে, না ভিন্ন সময়ে আছে। তাহা যখন হয় না, তখন এক বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ক্রিয়া দ্বারাই তাহাদের কালিক অবস্থান নির্ধারণ করিতে হয়। এই ক্রিয়া যদি শুধু একদিক হইতেই হয় (যেমন কারণের ক্রিয়া কার্যের উপর হইয়া থাকে), তাহা হইলে বাস্তবিক কালিক সম্বন্ধকে পৌর্বাপর্য বলিয়া বুঝি। আর এই ক্রিয়া যদি পারস্পরিক[২] হয়, তাহা হইলে বাস্তব কালিক সম্বন্ধকে সহভাব বলিয়া বুঝি। যদি বল, দুইটি বিষয়ের মধ্যে ঐকদেশিক বা পারস্পরিক কোন নিয়ন্ত্রণই নাই, তাহা হইলে এই বলা হয় যে, তাহাদের মধ্যে পৌর্বাপর্যও নাই, সহভাবও নাই। ইহার অর্থ এই হয় যে, তাহারা এককালে নাই; কিন্তু বহুকালের কল্পনাই আমরা করিতে পারি না।

আমরা যখন বলি দুই বা ততোধিক বস্তু একসঙ্গে আছে, তখন তাহারা শুধু আছে, এই কথা বলা হয় না; কিছু বেশী বলা হয়। সেই বেশীটুকু হইয়াছে তাহাদের একসঙ্গে থাকা। একসঙ্গে থাকার অর্থ এই যে, যে সময়ে একটি বস্তু আছে, সেই সময়ে অন্য বস্তুটিও আছে। একের সময়ই অন্যেরও সময়। এই এক সময় যখন স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না, তখন তাহা বুঝিবার জন্য বস্তুগুলির মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা মানিতে হয়। পরস্পরের দ্বারা তাহারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে কোনটাই অন্যটার পরে বলিতে পারা যায় না। এই রকম অন্যোন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়াতে একের সময়কে অপর সকলের সময় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানে যে বিষয় বিষয়ের মধ্যে সহভাব বিদ্যমান আছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি, তাহাদের মধ্যে অনেক বিষয়কেই একসঙ্গে আছে বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই

১। Temporal position ২। Reciprocal

বিষয়গত সহভাব শুধু ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। ইহার জন্য এক বৌদ্ধিক মূলসূত্রের প্রয়োজন,—তাহাকে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা সামাজিকতার (অন্যোন্যনির্ভরতার) মূলসূত্র[১] বলা হইয়াছে। বিষয়গত পৌর্বাপর্য যেমন কার্যকারণের মূলসূত্রের[২] দ্বারা নিরূপিত হয়, এই মূলসূত্রের দ্বারা তেমনি বিষয়গত সহভাব নির্ধারিত হয়।

আমরা বিশ্বকে দেশে[৩] একসঙ্গে বর্তমান আছে বলিয়া মনে করি। বিশ্বের দৈশিক সত্তা হইতে এইই বোঝা যায় যে তাহার সবভাগ এক সময়েই আছে; কেননা দেশের কল্পনা হইতেই ত এই বোঝা যায় যে তাহার সব ভাগ বা অংশই একসঙ্গে বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং যে বস্তু দেশে থাকে, তাহার বিভিন্ন অবয়ব বা ভাগের মধ্যে কালিক সহভাব রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। আর সহভাব বুঝিতে হইলে যদি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হয়, বিশ্বের প্রত্যেক অংশই তদিতর সব অংশের সহিত এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পুরা-মাত্রায় সুসম্বন্ধ হইয়া আছে। অতএব বুঝিতে হইবে, বিশ্বের কোন ভাগই অন্যান্য ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। (এখানে যে রকম কালিক সম্বন্ধের কথা বলা হইতেছে; ক্রিয়াই তাহার প্রাণ; পৌর্বাপর্য বা সহভাব শুধু বুদ্ধিগম্য[৪] স্থিতিপর[৫] সম্বন্ধ বলিয়া ধরা হইতেছে না, সক্রিয়[৬] বাস্তব[৭] সম্বন্ধ বলিয়া মনে করা হইতেছে।)

প্রাকৃত বিচারের স্বীকার্য

আমাদের জ্ঞানে যে সব বৌদ্ধিক প্রকার লাগিয়া থাকে, তাহাদের সবগুলির কাজ এক নহে। আমরা দেখিয়াছি কাণ্ট্ পরিমাণ, গুণ, সংসর্গ ও অবস্থাভেদে যাবতীয় প্রকারকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম দুই শ্রেণীর (পরিমাণ ও গুণ) প্রকার আমাদের জ্ঞেয় বিষয় কিরূপে গঠিত, তাহারই নির্দেশ করিয়া দেয়। তৃতীয় শ্রেণীর (সংসর্গ) প্রকার আমাদের জ্ঞানীয় বিষয় পরস্পরের সহিত কিরূপভাবে সম্বদ্ধ হয়, তাহাই দেখাইয়া দেয়। চতুর্থ শ্রেণীর (অবস্থা) প্রকার কিন্তু বিষয়ের নিজের সম্বন্ধে তেমন কিছু বলে

১। The Principle of Reciprocity or Community
২। The Principle of Causality.
৩। Space
৪। Intelligible
৫। Static
৬। Dynamic
৭। Actual, concrete

না। এই শ্রেণীর প্রকারের দ্বারা আমরা বিষয় কিরূপে গঠিত, অর্থাৎ বিষয়ের উপাদান কিরূপ, কিংবা পরস্পরের মধ্যে তাহারা কিরূপে সম্বন্ধ হয়, তাহার কিছুই বুঝি না। আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে তাহারা (বিষয়) কিরূপে সম্বন্ধ হয়, তাহাই এই শ্রেণীর প্রকারের দ্বারা ব্যক্ত হয়। বিষয়কে সম্ভবপর[১] বাস্তব[২] বা অবশ্যম্ভব[৩] বলিয়া ভাবিলে বিষয়ের কল্পনার মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। চতুর্ভুজ মানুষ সম্ভবপর বলিয়া ভাবিতে গেলে যে রকম মানুষের কথা আমাকে ভাবিতে হয়, এতাদৃশ মানুষ বাস্তব বা অবশ্যম্ভব বলিয়া ভাবিতে গেলেও ঠিক সেই রকম মানুষের কথাই আমাকে ভাবিতে হয়। বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। শুধু আমাদের বুদ্ধির বা জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধের মধ্যে পার্থক্য হয়। শুধু সম্ভবপর বলিয়া ভাবিতে গেলে বিষয়কে যে রকম ভাবে জানি, বাস্তব বলিয়া ভাবিতে গেলে ঠিক সেই রকম ভাবে জানি না।

অবস্থা[৪] বাচক প্রকারের অনুরূপ যে সব মূলসূত্র কাণ্ট্ নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি হইতে আমরা শুধু এই জানিতে পারি যে কি কি অবস্থায় বিষয়কে সম্ভবপর, বাস্তব বা অবশ্যম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারা যায়। এইসব মূলসূত্রকে কাণ্ট্ 'প্রাকৃত বিচারের স্বীকার্য'[৫] এই আখ্যা দিয়াছেন। স্বীকার্যের অর্থ এই নয় যে, স্বতঃসিদ্ধের মত এগুলিকে প্রমাণ ব্যতিরেকেই সাক্ষাৎভাবে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। এখানে সত্যাসত্য বা প্রমাণাপ্রমাণের কোন কথাই নাই। আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানে সম্ভবপর, বাস্তব ও অবশ্যম্ভব বলিতে আমরা কি বুঝি, অথবা কি রকম ক্ষেত্রে আমরা প্রাকৃত বিচারে (আমাদের অনুভবের দিক্ হইতে বিচার করিয়া) এই সব বিগ্রহের[৬] প্রয়োগ করিয়া থাকি, তাহাই এই সব মূলসূত্র হইতে জানিতে পারি।

প্রথম স্বীকার্য

যাহাতে প্রাকৃত জ্ঞানের আকারিক সামগ্রী বর্তমান আছে, তাহাকেই সম্ভবপর বলা যায়[৭]।

১। Possible ২। Actual ৩। Necessary ৪। Modality
৫। Postulates of Empirical Thought ৬। Concept
৭। That which agrees in intuition and concepts with formal conditions of experience is possible.

প্রাকৃত জ্ঞান বিষয় ব্যতীত হয় না। বিষয় শুধু অনুভবেই পাইতে পারা যায়। অনুভব দৈশিক ও কালিক আকারেই সম্ভবপর হয়, কেননা দেশ ও কাল আমাদের অনুভবের আকার। অনুভবে যাহা পাওয়া গেল, তাহাকে বৌদ্ধিক প্রকারের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিলেই তাহার প্রাকৃত জ্ঞান হয়। আনুভবিক আকার[১] ও বৌদ্ধিক প্রকার[২] ব্যতীত প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর নয়। এগুলিকে প্রাকৃত জ্ঞানের আকারিক সামগ্রী বলা হইয়াছে। যে পদার্থ দেশকালে থাকিতে পারে এবং যাহা বৌদ্ধিক প্রকারের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহাকে সম্ভবপর বলা যায় বা সম্ভবপর বলিয়া ভাবিতে পারা যায়।

কাহারও কাহারও মতে, যাহার মধ্যে স্ববিরোধ[৩] নাই, তাহাই সম্ভবপর; অর্থাৎ যাহা ভাবিতে পারা যায়, তাহাই সম্ভবপর। কিন্তু এ রকম কথা প্রাকৃত বিচারের কথা নয়। আমরা জানি, স্ববিরোধ না থাকিলেও অনেক জিনিস দেশে বা কালে সম্ভবপর নয়; সেগুলিকে আমরা সম্ভবপর বলিনা। 'দুই সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ দেশ' আমরা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিনা; ইহার কারণ এই নয় যে, ইহাতে স্ববিরোধ আছে; কেননা বাস্তবিক ইহাতে স্ববিরোধ নাই। কিন্তু যে দৈশিক আকারে অনুভব বা প্রত্যক্ষ হইতে পারে, সে আকার দিতে পারা যায় না বলিয়াই 'দুই সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ দেশ' সম্ভবপর নয়। মোটকথা যাহাতে দৈশিক ও কালিক আকার লাগিতে পারে এবং বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হইতে পারে তাহাকেই সম্ভবপর বলা যায়।

দ্বিতীয় স্বীকার্য

প্রাকৃত জ্ঞানের ঔপাদানিক সামগ্রীর বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের সহিত যাহা সংসৃষ্ট, তাহাই বাস্তব[৪]।

যাহা কিছু সম্ভবপর, তাহাই বাস্তবে থাকে। চতুর্ভুজ মানুষ বা আমার বাড়ীতে দ্বিতল প্রাসাদ কোনটাই অসম্ভব নয়। চতুর্ভুজ মানুষের

১। Forms of Intuition ২। Categories of Understanding

৩। Self-contradiction

৪। That which is bound up with the material conditions of experience, that is, with sensation, is actual.

দেশে কালে থাকিতে কোন বাধা হইতে পারেনা। যৌক্তিক প্রকার তাহার উপর লাগিবেনা এমন নয়। তথাপি চতুর্ভুজ মানুষ বাস্তব নয়, কেননা এরকম মানুষকে কেহ কখনও দেখে নাই, সে কাহারও ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের বিষয় নয়। আমার বাড়ীতে দ্বিতল প্রাসাদের অবস্থাও এইরূপ; সম্ভবপর হইলেও বাস্তব নয়। বুদ্ধির দ্বারা এগুলির কল্পনা করিতে পারা গেলেও এগুলি প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। তাহাকেই আছে (বাস্তব) বলিব, যাহার প্রত্যক্ষ হয় বা হইতে পারে।

বাস্তব হইতে হইলে ঠিক যে প্রত্যক্ষের বিষয়ই হইতে হইবে এমন নয়। বাস্তবের জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ হয়, এবং ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ গোচর বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ, তাহাকেও বাস্তব বলি। উপরের উপমানের বিচারে যে সব সম্বন্ধের (দ্রব্য-গুণ, কার্যকারণ ইত্যাদি) কথা বলা হইয়াছে, সে সব সম্বন্ধের দ্বারা কোন পদার্থ যদি প্রত্যক্ষ গোচর কোন বস্তুর সঙ্গে সংসৃষ্ট থাকে তাহা হইলে সেই পদার্থ নিজে প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও তাহাকে বাস্তব বলা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাস্তব হইতে হইলে, হয় নিজে প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়া চাই, তাহা না হইলে অন্তত: প্রত্যক্ষ গোচর বিষয়ের সঙ্গে কার্যকারণাদিভাবে সংসৃষ্ট হওয়া চাই। যার প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যে প্রাত্যক্ষিক কোন বিষয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ নয়, সে পদার্থ আছে বলিতে পারা যায় না।

প্রত্যক্ষের বিষয় বলিতে, যে বস্তুর বাস্তবিক প্রত্যক্ষ হইতেছে, এমন বস্তু না বুঝিলেও চলিবে। আমাদের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার জন্য আমরা মানুষ মাত্রেই অনেক সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পাই না; তাহার অর্থ এই নয় যে ঐসব বস্তু নাই। যদিও আমাদের বর্তমানাবস্থায় ঐসব বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তথাপি প্রত্যক্ষের বিষয় হইবার যোগ্যতা তাহাদের আছে। আমাদের দৃষ্টিশক্তি যদি প্রখর হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দেখা যাইত।

কাণ্ট্ এই স্বীকার্যে ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব মানিয়া লইতেছেন। ইহা জ্ঞানবাদের[১] বিরুদ্ধ কথা। জ্ঞানবাদীদের মতে আমি আছি, এবং

১। Idealism (subjective)

আমার জ্ঞান আছে। কিন্তু আমার জ্ঞানের বাহিরে ঘরবাড়ী বা গাছ পাহাড় প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ আছে বলিয়া স্বীকার করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। জ্ঞানবাদীদের কথা মানিলে কাণ্টের কথা মানিতে পারা যায় না। সেইজন্য কাণ্ট্ স্বীয় মত সমর্থনের জন্য এই প্রসঙ্গে জ্ঞানবাদের খণ্ডন[১] করিয়াছেন। তাঁহার খণ্ডনের যুক্তি এইরূপ:—বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান হয় না, অর্থাৎ বাহ্যবস্তু আছে না জানিলে আমি যে আছি একথাও জানা যায় না। আমি আছি একথা যখন জ্ঞানবাদী জানেন বলিয়া মানেন তখন তাঁহাকে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব মানিতে হয়।

আমাদের আমিকে বাহ্যানুভবে পাই না। আমি আন্তর অনুভবের[২] বিষয়। আন্তর অনুভবের আকার কাল, অর্থাৎ কালিকাকারেই আন্তর অনুভব হইতে পারে। কাল ত প্রবহমান, কখনই দাঁড়াইয়া নাই। কোন পদার্থের কালিকাকারে অনুভব হওয়ার অর্থ, সে পদার্থের চলদ্ রূপে বা পরিবর্তনশীল রূপে অনুভব হওয়া। আমাদের আমির অনুভবও ঠিক এই রকমেই হয়। আন্তর অনুভবে দণ্ডায়মান বা স্থিতিশীল কোন পদার্থ মোটেই পাওয়া যায় না। আমাদের অবস্থার পর অবস্থান্তর অনবরত চলিতেছেই। কিন্তু 'আমি'র এই চলদ্ বা পরিবর্তমান রূপের জ্ঞান হইতে হইলে স্থায়ী কিছুর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। একমাত্র স্থায়ীর সঙ্গে তুলনাতেই পরিবর্তনশীল চলন্ত পদার্থের পরিবর্তমান বা চলদ্ রূপ ধরা পড়িতে পারে। সুতরাং চলদ্ রূপে আমিকে আন্তরানুভবে পাইতে হইলে অচলৎ বা স্থায়ী কোন পদার্থের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। (এখানে বলাই বাহুল্য যে আন্তরানুভবের আকারই যখন কাল এবং 'আমি'কে আন্তরানুভবেই পাইতে হয়, তখন অচলদ্রূপে আমিকে পাওয়া সম্ভবপর নয়।) এই স্থায়ী পদার্থ আন্তরানুভবে পাওয়া যায় না; কেননা আন্তরানুভবের আকার যখন কাল, তখন আন্তরানুভবে যাহা কিছু আসিবে, তাহাই কালিক বা চলদ্ রূপেই আসিবে। আমাদের অনুভব আন্তর কিংবা বাহ্যই হইতে পারে, তৃতীয় প্রকার হয় না। স্থায়ী পদার্থের জ্ঞান যখন অত্যাবশ্যক, এবং তাহা যখন আন্তরানুভব হইতে পাওয়া যায় না, তখন বুঝিতে হইবে বাহ্যানুভব হইতেই আমাদের সেই জ্ঞান হয়। এটা শুধু যুক্তির কথা নয়; বাস্তবিক অনুভব পরীক্ষা করিয়াও একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। দণ্ডায়মান

১। Refutation of Idealism ২। Inner intuition

যা স্থিতিশীল ঘরবাড়ী, গাছপালা আমরা বাহ্যানুভবেই পাই। কোন দণ্ডায়মান মানসিক অবস্থা আন্তরানুভবে পাওয়া যায় না। কাণ্টের বক্তব্য এই যে, একমাত্র বাহ্যানুভবেই দণ্ডায়মান স্থিতিশীল পদার্থের জ্ঞান হয়; এবং এই স্থিতিশীল পদার্থের সঙ্গে তুলনার দ্বারাই আন্তরানুভব লব্ধ 'আমি'র চলদ্রূপের জ্ঞান আমাদের হইয়া থাকে, 'আমি'র অনুভব যখন একমাত্র চলদ্রূপেই হইয়া থাকে, এবং ইহার উপলব্ধির জন্য যখন বাহ্যানুভবের প্রয়োজন, তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়, 'আমি'র জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য পদার্থেরও জ্ঞান হইয়া থাকে। বাহ্য পদার্থের জ্ঞান না হইলে 'আমি'র জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং 'আমি'কে স্বীকার করিয়া বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করা অসঙ্গত।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ধরা গেল, আত্মজ্ঞানের জন্য বাহ্যপদার্থের জ্ঞান আবশ্যক; কিন্তু সে জ্ঞান ত ভ্রমাত্মক হইতে পারে, এবং তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কি করিয়া বলিতে পারা যায় যে বাহ্যপদার্থ বলিয়া কিছু আছে? একথার উত্তরে কাণ্ট্ বলিবেন, আমাদের কোন বাহ্যজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইলেও সে জ্ঞানে যে প্রতীতি (যথা সর্পাদি) হইবে, তাহার মূলে ত প্রাত্যক্ষিক অনুভব থাকিবে। বাস্তবিক সর্প একবার দেখিলেই তাহার ভ্রম হইতে পারে। সুতরাং ভ্রমের মূলে প্রাত্যক্ষিক বাহ্যজ্ঞান মানিতে হয়। বাহ্যানুভব বলিয়া কিছু নাই, সবই মানসিক কল্পনা (ভ্রম) একথা কাণ্ট্ মানিবেন না। তিনি একথা বলিতেছেন না যে বাহ্যজ্ঞান মাত্রই প্রমাত্মক। তিনি শুধু বলিতেছেন, বাহ্যানুভব ব্যতিরেকে আন্তরানুভব সম্ভবপর হয় না। একথা অনেকেই মানিতে আপত্তি করিবেন না। বাহ্যানুভব হয় বলিয়া আন্তরানুভব হয়; যদি মূলে কোন বাহ্যানুভব না থাকিত, কিছুই যদি দেখিতে শুনিতে না পাইতাম বা পারিতাম, তাহা হইলে কোন আন্তরানুভব হইত না।

তৃতীয় স্বীকার্য

যাহা কিছু বাস্তবের সঙ্গে প্রাকৃত জ্ঞানের সার্বত্রিক নিয়মানুসারে সম্বদ্ধ, তাহাকেই অবশ্যম্ভব বলা যায়[১]।

১। That which in its connection with the actual is determined in accordance with universal conditions of experience is (that is, exists as) necessary.

এখানে জ্ঞানরাজ্যের অবশ্যম্ভবতার কথা বলা হইতেছে না; বাস্তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সত্তা কখনও অবশ্যম্ভব বলা যায়, তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে। শুধু বিচারের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু কখন কিরূপে বাস্তবে আছে বা থাকিবে, তাহার নিরূপণ হয় না। শুধু কল্পনার বা বিগ্রহের[১] দ্বারা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের[২] বাস্তবিক অবশ্যম্ভবতা কখনই নিরূপিত হইতে পারে না। তারজন্য প্রাকৃত অনুভব[৩] একান্ত আবশ্যক। যে বস্তু আমরা প্রাকৃত অনুভবে পাই, তাহার সহিত যদি অন্য কোন বস্তু অপরিহার্যভাবে সম্বদ্ধ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তুকে (প্রথম বস্তুর সম্পর্কে) অবশ্যম্ভব বলা যাইতে পারে। ক'কে যদি আমরা খ'এর কারণ বলিয়া জানি এবং যদি ক'কে আমরা প্রাকৃত অনুভবে পাই, তাহা হইলে খ'কেও অবশ্যম্ভব বলিতে পারি; কেননা কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। যাহা হইতে কার্য উৎপন্ন হইলেও পারে, না হইলেও পারে, তাহাকে কারণই বলা যায় না। যেখানে কার্যকারণভাব আছে বলিয়া জানা যায় এবং কারণকে (প্রাকৃত) অনুভবে পাওয়া যায়, সেখানে কার্যকে অবশ্যম্ভব বলা যায়। যেখানে প্রাকৃত অনুভব সম্ভবপর, সেখানেই অবশ্যম্ভবতার অর্থ হয়।

কান্টের মতে দ্রব্যের অবস্থার[৪] উৎপত্তি বিনাশ হয়, দ্রব্যের নিজের হয় না। সেইজন্য অবশ্যম্ভবতার কল্পনাও দ্রব্যের উপর লাগে না, তাহার অবস্থার উপরই শুধু লাগিতে পারে।

এই দীর্ঘ আলোচনায় যে সব বৌদ্ধিক প্রকার ও বৌদ্ধিক মূল সূত্রের কথা বলা হইল, এগুলির আবিষ্কার, যথার্থ অর্থ নিরূপণ ও উপপাদনই কান্টীয় দর্শনের প্রধান কাজ। কান্ট্ দেখাইয়াছেন, এগুলি প্রাকৃত অনুভব হইতে পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে এগুলি না হইলে প্রাকৃত বা লৌকিক জ্ঞানই সম্ভবপর হয় না। বুদ্ধি আপনা হইতেই এগুলিকে দিয়া প্রাকৃত জ্ঞান ও প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয় সম্ভবপর করে। এইসব প্রকার ও মূলসূত্র বুদ্ধি হইতে পাওয়া গেলেও শুধু এগুলির দ্বারাই কোন বাস্তব জ্ঞান লাভ হয় না। অনুভবের সহযোগেই তাহারা বাস্তব বিষয়

১। Concept
২। Sensible object
৩। Experience
৪। State

জ্ঞানের কারণীভূত হয়। একথা কাণ্ট বার বার বলিয়াছেন যে শুধু বুদ্ধির দ্বারা কোন বাস্তব জ্ঞান লাভ করা যায় না। শুধু তাহাই নহে; অনুভবের সাহায্য ব্যতিরেকে বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্রাবলীর অর্থই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় না। বৌদ্ধিক প্রকার ও মূল সূত্র ঠিক অনুভব হইতে না পাইলেও, অনুভবগম্য বিষয়েই তাহারা প্রযোজ্য। অনুভবগম্য বিষয় সম্বন্ধেই তাহাদের সাহায্যে পূর্বতোজ্ঞান সম্ভবপর হয়। অনুভবের বাহিরে তাহাদের কোন প্রামাণ্য উপযোগিতা নাই।

কাণ্ট প্রথমে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, কি করিয়া যৌগিক পূর্বতোজ্ঞান সম্ভবপর হয়, তাহার ভাববাচক[১] উত্তর এইখানেই শেষ হইল বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধিক প্রকার ব্যতিরেকে প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর নয় বলিয়া এগুলির দ্বারা অনুভবের আগেই অনুভবগম্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিতে পারি ও জানিতে পারি। যাহা জানি তাহা শুধু অবভাস[২] বলিয়াই এরকম জ্ঞান সম্ভবপর। যাহা শুধু জ্ঞানীয় অবভাস, অর্থাৎ জ্ঞানে ভাসিয়াই যাহা আত্মলাভ করে, তাহার সম্বন্ধেই অনুভবের আগে জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে বৌদ্ধিক প্রকার বা মূলসূত্র তাহাতে লাগিবেই লাগিবে। কেননা, আমাদের মানব জ্ঞানের রীতিই এইরূপ। তাহা ছাড়া আমাদের জ্ঞান হইতে পারে না, আমাদের জ্ঞানে কিছু ভাসিতে পারে না। আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের বিষয় অবভাস বলিয়াই তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বতোজ্ঞান হইতে পারে। জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বগতসত্তাক[৩] স্বতন্ত্র বস্তু সম্বন্ধে অনুভবের আগে কিছু জানিতে পারা অসম্ভব। যাহার সত্তা তাহার নিজের মাঝেই পর্যবসিত, আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে যাহার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, তাহার সম্বন্ধে, শুধু আমাদের জ্ঞান ব্যাপারের রীতিনীতি পরীক্ষা করিয়া, অনুভবের আগে যথার্থ কিছু বলিতে পারিব, এমন আশা করিতে পারা যায় না। অবভাসের সম্বন্ধে কিন্তু অন্য কথা। আমাদের জ্ঞানীয় নিয়মে আবদ্ধ হইয়া তাহা ভাসিয়া থাকে; দর্শনের শক্তি ও ভঙ্গীর উপরই দৃশ্যের স্বরূপ অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের জ্ঞানশক্তির পরীক্ষা দ্বারাই অবভাসমান দৃশ্যপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে

১। Positive
২। Appearance
৩। Things in themselves

অনেক কথা বলিতে পারা যায়। এখন আশা করা যায় বুঝিতে পারা গেল, কাহার সম্বন্ধে কি প্রকার পূর্বতোজ্ঞান হইতে পারে।

যাহা কিছু আমরা বুদ্ধি ও অনুভবের দ্বারা জানি, তাহাই যদি অবভাস হয়, তাহা হইলে ত অবভাসের মূলে জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বগতসত্তাক স্বতন্ত্র বস্তু কিছু মানিতে হয়। তাহা না হইলে কাহার অবভাস? আমাদের জ্ঞানের বাহিরে বাস্তবিক কিছু না থাকিলে, শুধু আমাদের জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বিষয় গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই জ্ঞান বাহ্য স্বগতসত্তাক বস্তু কি রকম পদার্থ তাহার কিছু আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

স্বগতসত্তাক বস্তু[1]

আমরা যদি কোন দূরবর্তী বস্তু সম্বন্ধে বলি যে ইহা খুব ছোট দেখাইতেছে, তখন আমরা মনে করি বস্তুটি বাস্তবিক ছোট নহে। এই রকম বাস্তবিক স্বরূপ ও দৃশ্যমান রূপের মধ্যে আমরা অনেক সময়ই ভেদ নির্দেশ করিয়া থাকি। কাণ্ট্ যখন বলেন, আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানে যাহা কিছু পাই, তাহা অবভাস মাত্র, তখন এই দৃশ্যমান রূপের কথাই বলা হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের জ্ঞানে যাহা কিছু ভাসে, তাহা আমাদের জ্ঞানীয় কাঠামে আবদ্ধ হইয়াই আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়। বিষয়কে সর্বদা আমাদের জ্ঞানীয় রূপের পরিধানে পাই বলিয়া তাহার বাস্তব বা নগ্নরূপ কখনই দৃষ্ট হয় না। বিষয়ের রূপ সব সময়ই জ্ঞানসাপেক্ষ। রঙীন চশমার ভিতর দিয়া দেখা রং যেমন বস্তুর বাস্তব রং হয় না, তেমনি দেশকালরূপ আনুভবিক আকারের দ্বারা ও দ্রব্যগুণাদিরূপ বৌদ্ধিক প্রকারের সাহায্যে বিষয়ের যে রূপ আমরা উপলব্ধি করি, সে রূপ বস্তুর বাস্তব রূপ নয়। জ্ঞানে বস্তুর দৃশ্যমান রূপই পাওয়া যায়। যখনই বস্তুর দৃশ্যমান রূপের কথা বলা হয়, তখন স্বভাবতঃই বস্তুর স্বগত বা বাস্তব রূপের কথা আমাদের মনে না উঠিয়া পারে না। অবভাসের কল্পনাতেই বস্তুর বাস্তব সত্তার কল্পনা যেন গৃহীত বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারা যায়। বিষয়ের যে রূপ আমরা জানি, তাহা যদি জ্ঞানসাপেক্ষ রূপ হয়, তাহা হইলে বিষয়ের স্বগত রূপ বলিয়াও কিছু আছে, একথা অবশ্যই মানিতে হয়। জ্ঞানে আমরা বিষয়ের যে রকম সত্তা পাই, তাহাকে যদি জ্ঞানগত আবভাসিক সত্তা বলা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতিরূপ বিষয়ের স্বগত বাস্তব সত্তার কথা আমরা না ভাবিয়া পারি না। কিন্তু আমরা যাহাকিছু জানি, তাহাই যখন অবভাস বা জ্ঞানীয় বিষয়, তখন জ্ঞানবাহ্য স্বগতসত্তাক বস্তু বলিয়া কিছু আছে, একথার প্রমাণ কি?

১। Thing in itself

এই স্বগতসত্তাক বস্তু লইয়া কাণ্টের ভাষ্যকারদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। এই বিষয়ে ভাষ্যকারদিগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। একদল জ্ঞানবাদের[১] অনুকূলে কাণ্টীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, অন্যদল বস্তুবাদের[২] অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কাণ্টের জ্ঞানবাদী ভাষ্যকারেরা বলেন, জ্ঞানীয় বিষয়ই একমাত্র বিষয়; জ্ঞানবাহ্য স্বগতসত্তাক স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বাস্তবিক কিছু আছে, ইহা কাণ্টের মত নহে। কাণ্ট্ যেখানে স্বগতসত্তাক বস্তুর কথা বলিয়াছেন, সেখানে বৌদ্ধিক প্রকল্পনা[৩] হিসাবেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; স্বগতসত্তাক বস্তু বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই। কাণ্ট্‌ভক্ত ফিক্টে যেন একসময় বলিয়াছিলেন, কাণ্ট্ যদি স্বগতসত্তাক বস্তু বলিয়া বাস্তবিক কিছু আছে মনে করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কাণ্টের প্রধান গ্রন্থ 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার'[৪] প্রতিভাপ্রসূত নহে, অর্থাৎ সজ্ঞানে রচিত হয় নাই, আকস্মিকভাবে লিখিত হইয়া গিয়াছে। মোটকথা, কাণ্টের জ্ঞানবাদী শিষ্যেরা স্বগতসত্তাক স্বতন্ত্র বস্তুকে উড়াইয়া দিয়া কাণ্টীয় দর্শনকে জ্ঞানবাদেই পর্যবসিত করেন। প্রতিপক্ষী বস্তুবাদী ভাষ্যকারেরা বলেন, স্বগতসত্তাক বস্তু বলিয়া যে বাস্তবিক কিছু আছে, এবিষয়ে কাণ্টের কোন সন্দেহই ছিল না। স্বগতসত্তাক বস্তু না মানিলে কাণ্টের অনেক কথারই কোন অর্থ হয় না। দুই দলেই বিচক্ষণ পণ্ডিত ও দার্শনিকের অভাব নাই। কাহাদের কথা ঠিক, তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়াস এখানে করা যাইবে না। কাণ্টের পুস্তকের এক বিশিষ্ট অধ্যায়ে তাঁহার নিজের কথা হইতে এ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তবে হয়ত এখানে স্বীকার করা উচিত, বস্তুবাদী ভাষ্যকারদের মতের সঙ্গেই লেখকের অধিক আন্তরিক সহানুভূতি।

বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্র অনুভব হইতে না পাইলেও অনুভবলব্ধ বিষয়েই তাহাদের প্রয়োগ হইতে পারে। যে পদার্থের অনুভব হয় না বা হইতে পারে না, তাহাতে বৌদ্ধিক প্রকারের প্রয়োগ হইতে পারে না,

১। Idealism
২। Realism
৩। Idea
৪। Critique of Pure Reason

শুধু ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থেই কেন বৌদ্ধিক প্রকার লাগে, এবং অন্যত্র লাগে না, তাহার কারণ সহজে বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধিক প্রকারের স্বরূপ বিবেচনা করিলে জানা যায়, এগুলি একীকরণ বা মেলনের প্রকার ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাদের অনুভবলব্ধ বহুতাকে যে যে বিশিষ্ট উপায়ে বা প্রকারে আমরা একীকৃত বা মিলিত করিয়া থাকি, সেই উপায় বা প্রকারগুলিকে বৌদ্ধিক প্রকার বলা হইয়াছে। এগুলি এক জাতীয় বিগ্রহ[১] সন্দেহ নাই; কিন্তু আসলে একীকরণের উপায় বা প্রকার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু একীকরণের কথা কখন উঠিতে পারে? যখন কোন প্রকারের বহু আমাদের উপলব্ধ হয়, তখনই তাহার একীকরণের কথা উঠে। এই ক্ষণেই বলা হইয়াছে, অনুভবলব্ধ বহুতাকে একীকৃত করাই বৌদ্ধিক প্রকারের কাজ; এই বহুতা যখন ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবেই উপলব্ধ হয়, তখন স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, আমাদের অনুভবের বাহিরে বৌদ্ধিক প্রকারের কোন উপযোগিতা নাই। (আমাদের অনুভব যে সব সময় ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব, একথা অনেক বার বলা হইয়াছে।) যাহার অনুভব হয় বা হইতে পারে, তাহাতেই বৌদ্ধিক প্রকারের প্রয়োগ, উপযোগ[২] বা ব্যবহার হইতে পারে; অন্যত্র নয়। এই অর্থেই কাণ্ট্ বলিয়াছেন, বৌদ্ধিক প্রকারের কোন অপ্রাকৃত উপযোগ বা ব্যবহার[৩] নাই।

কিন্তু যদিও প্রকারের কোন অপ্রাকৃত উপযোগ নাই, তথাপি তাহাদের অপ্রাকৃত কোন অর্থই[৪] নাই, একথা বলিতে পারা যায় না। আমাদের অনুভবলব্ধ বহুতাকে প্রকারগুলি একীকৃত করে বটে এবং তাহাতেই তাহাদের উপযোগিতা; কিন্তু তাহাদের অর্থের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহা দ্বারা বলা যাইতে পারে যে তাহাদের অন্যত্র প্রয়োগ হইতে পারে না। কার্যতঃ শুধু অনুভবের রাজ্যেই তাহাদের প্রয়োগ সম্ভবপর; কিন্তু অনুভবের সহিত তাহাদের সংশ্রবের কথা তাহাদের অর্থের মধ্যে সমাবিষ্ট নয়। বৌদ্ধিক প্রকার শুধু বুদ্ধিরই ব্যাপার; অনুভবের বার্তা তাহাদের অর্থে পাওয়া যায় না। যদি এমন হইত,

১। Concept
২। Use
৩। Transcendental use
৪। Transcendental significance

অনুভব ব্যতিরেকেও আমরা বহুতার উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাতেও বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হইতে পারিত। তাই কাণ্ট্ বলিয়াছেন, প্রকারের অপ্রাকৃত ব্যবহার বা উপযোগ না থাকিলেও তাহাদের অপ্রাকৃত অর্থ রহিয়াছে।

প্রকারের অপ্রাকৃত অর্থের কথা ভাবিতে গেলে এমন বিষয়ের কথা ভাবিতে হয়, যাহা আমাদের অনুভবের গোচর না হইয়াও বুদ্ধি গোচর হইতে পারে। যখন আমরা মনে করি, প্রকারের অপ্রাকৃত অর্থ আছে, তখন মনে করি, যদি এমন সব বিষয় থাকিত, যাহা অনুভবের বিষয় না হইয়াও আমাদের চিন্তার বা বুদ্ধির বিষয় হইতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের উপর প্রকারের প্রয়োগ হইতে পারিত। কিন্তু যাহা আমাদের অনুভবের বিষয় নয়, এমন পদার্থের কথা কি আমরা বাস্তবিক ভাবিতে পারি? কাণ্টের মতে ঐ রকম বুদ্ধিমাত্রগম্য অননুভাব্য বিষয়ের কথা আমরা যে শুধু ভাবিতে পারি তাহা নহে, না ভাবিয়াই পারি না। সমস্ত দৃশ্য জগৎই ত কাণ্টের মতে অবভাস মাত্র। দৃশ্য যাহা কিছু তাহাই যখন অবভাস, তখন অদৃশ্য বাস্তব কিছু থাকিবেই থাকিবে, যাহার দৃশ্যরূপ বা ভাস আমরা দেখিতে পাইতেছি। মূলে কিছুই নাই, শুধু ভাস রহিয়াছে, এমন কথা ভাবিতে পারা যায় না। দৃশ্যগুলিকে অবভাস বলিয়া ভাবিতে গেলেই তাহার মূলভূত অদৃশ্য বাস্তব কিছুর কথা ভাবিতে হয়, যাহার অবভাস রূপে দৃশ্যের কল্পনা সম্ভবপর হইতে পারে। কাণ্ট্ এইস্থলে দুইটি গ্রীক শব্দ ফেনোমেনন[১] ও নউমেনন[২] ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা ভাসিয়াছে (ভান), তাহাকে ফেনোমেনন বলা যায়, এবং যাহা বোঝা গিয়াছে বা বুদ্ধিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে নউমেনন বলা যায়। ইন্দ্রিয়গোচর অবভাস এবং বুদ্ধিগোচর বাস্তবতত্ত্বরূপে আমরা ফেনোমেনন ও নউমেননের কল্পনা করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই দৃশ্য অবভাসের মূলভূত অদৃশ্য, বুদ্ধিমাত্রগম্য বাস্তবতত্ত্বে বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হইলে, আগে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয় এই বুদ্ধিমাত্রগম্য অদৃশ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কিরূপ কল্পনা করিয়া থাকি বা করিতে পারি। বলিলাম বটে, এই অদৃশ্যতত্ত্ব দৃশ্য অবভাসের মূলে আছে, কিন্তু তাহার স্বরূপ

১। Phenomenon ২। Noumenon

সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট কোন ধারণাই করিতে পারি না। আমরা যে সব বৌদ্ধিক প্রকারের সাহায্যে চিন্তা করিয়া থাকি, সেগুলি ত দৃশ্য অবভাসেই লাগিয়া থাকে। অবভাসের মূলভূত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রধানতঃ এইই বলিতে পারা যায় যে, তাহা অদৃশ্য ও অব্যক্ত। কিন্তু এ কল্পনা ত একেবারে অভাবাত্মক[১]। এই অদৃশ্য তত্ত্বের ভাবাত্মক[২] রূপ যে কি, তাহা আমরা জানি না। এই মৌলিক তত্ত্বকে ভাবাত্মকরূপে ভাবিতে গেলে বৌদ্ধিক অনুভবের[৩] বিষয়রূপে ভাবিতে পারা যায়। আমাদের যদি বৌদ্ধিক অনুভবের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে দৃশ্য অবভাসের ভাবাত্মক জ্ঞান যেমন আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবের দ্বারা পাই, তাহার মূলভূত অদৃশ্য তত্ত্বের ভাবাত্মক জ্ঞান তেমনি বৌদ্ধিক অনুভবের দ্বারা পাইতাম। কিন্তু আমাদের যখন বৌদ্ধিক অনুভব বলিয়া কিছু নাই, শুধু বুদ্ধি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে কোন বাস্তব পদার্থের জ্ঞান যখন আমাদের হয় না, তখন মৌলিক বাস্তব তত্ত্বের ভাবাত্মক জ্ঞানও আমাদের হইতে পারে না, এবং সে তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন অনুভব না থাকাতেই তাহার উপর কোন বৌদ্ধিক প্রকারেরও প্রয়োগ করিতে পারি না। সুতরাং এক হিসাবে দৃশ্যের মূল অদৃশ্য তত্ত্ব আমাদের কাছে সর্বদা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় হইয়া আছে এবং থাকিবে।

কিন্তু তাই বলিয়া দৃশ্যের মূলভূত তত্ত্বকে যে অদৃশ্য ও অব্যক্ত বলিয়া অভাবাত্মকরূপে ভাবিয়া থাকি, আমাদের সে ধারণা একেবারে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজন বলা যায় না। কাণ্টীয় বিশেষ অর্থে এই ধারণাকে জ্ঞান বলিতে পারা যাইবে না সত্য; কেননা ইহাতে অনুভবলব্ধ কোন উপাদান সমাবিষ্ট নয়। কিন্তু তথাপি এই ধারণাতে কোন বাস্তব পদার্থের বিগ্রহই[৪] বর্তমান নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, এই ধারণাতে (অননুভাব্য বাস্তবতত্ত্ব) কোন প্রকারের বিরোধ নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থই আছে, এবং যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তাহার কোন অস্তিত্বই নাই, এমন কোন নিয়ম করিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও বস্তু থাকিতে পারে, এ ধারণা আমরা সহজেই করিতে পারি। মৌলিক বাস্তব তত্ত্বের[৫] বিগ্রহে এই কথাই পাওয়া যায়।

১। Negative
২। Positive
৩। Intellectual Intuition
৪। Concept
৫। Noumenon

ইহার কল্পনাই আমাদের মানবীয় জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের অনুভবের সাহায্যে বুদ্ধি দ্বারা আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহাই সব নয়। আমাদের অনুভবের বাহিরেও বাস্তব পদার্থের কথা ভাবিতে পারি বলিয়াই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি একপ্রকার প্রসার লাভ করে। আমরা বুঝি, আমরা যাহা কিছু জানিতেছি, তাহার বাহিরেও অনেক কিছু আছে বা থাকিতে পারে। আমাদের দৃষ্টের অতীত অদৃশ্য অব্যক্ত বাস্তব কিছুর কথা ভাবিতে পারি বলিয়াই আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি যে আমাদের মানবীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানবীয় জ্ঞানের সীমা নির্দেশক[১] হিসাবেও অব্যক্ত তত্ত্বের কল্পনার যথেষ্ট মূল্য আছে।

কিন্তু আমাদের জ্ঞানের বাহিরেও বস্তু আছে বলিয়া ভাবিলেই আমাদের জ্ঞান বাস্তবিক প্রসারলাভ করে না; কেননা জ্ঞানের বাহিরে যাহা আছে বলিয়া ভাবিতেছি, তাহাকে অজ্ঞাত বলিয়াই ভাবিতেছি।

১। Limiting Concept

অষ্টম অধ্যায়

তত্ত্ববিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা

যে সব বস্তু আমরা চোখ কান দিয়া দেখিতে শুনিতে পারি, তাহাদের জ্ঞানের জন্য তত্ত্ববিজ্ঞানের[১] আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। এগুলি আমাদের সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের বিষয়; এবং এই লৌকিক জ্ঞানই সুসঙ্গতভাবে সুসম্বদ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে হয় না। যেখানে আমরা চক্ষু কর্ণের সাহায্যে ভাল জ নিতে পারিনা, সেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা বৈজ্ঞানিক অনুমান বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি লৌকিক বিষয়ের জ্ঞানেও শুধু চক্ষু কর্ণের সাক্ষ্যই যথেষ্ট নয়; নানা বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্র আমাদের প্রাকৃত বা লৌকিক জ্ঞানের মূলে অন্তর্নিহিত আছে। এই সব বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্র ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব হইতে পাওয়া যায় না; বুদ্ধির নিজের থেকে দেওয়া। সেই জন্যই প্রাকৃত জ্ঞানীয় বা বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে পূর্বতোজ্ঞান সম্ভবপর হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা জানি, বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্র অনুভব হইতে না পাইলেও শুধু অনুভবগম্য বিষয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে, অন্যত্র নয়। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্রের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে কিছুই ব িতে পারা যাইবে না; কেননা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে ত প্রকারাদি প্রযুক্তই হইতে পারিবে না।

ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থের জ্ঞান যখন প্রাকৃত অনুভব ও বিজ্ঞানেই পাওয়া যায়, তখন এই রকম পদার্থের জ্ঞানের জন্য তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তত্ত্ববিজ্ঞানের যদি কোন বিষয়বস্তু থাকে, তবে অতীন্দ্রিয় বিষয়ই[২] তাহা। অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞানের জন্যই আমাদিগকে সাধারণ

১। Metaphysics

২। Supersensible objects

ভৌতিক বিজ্ঞান ছাড়িয়া তত্ত্ববিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হয়। আত্মার স্বরূপ কি, ঈশ্বর আছেন কিনা, এই রকম প্রশ্নের উত্তর আমরা তত্ত্ববিজ্ঞান হইতে জানিতে চাই। কাণ্টের সময়ে (এবং তাহার আগে) লোকের বিশ্বাস ছিল, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান আমরা তত্ত্ববিজ্ঞান হইতে পাইতে পারি। এই আশাতেই লোকেরা তত্ত্ববিজ্ঞানের চর্চা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত করিত এবং এখনও করে। অনুভবের সাহায্য ব্যতিরেকেই তত্ত্ববিজ্ঞান এই সব অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া থাকে। তাহা দ্বারা ঐ সব বিষয় সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে পূর্বতোজ্ঞানই ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বতোজ্ঞান কি করিয়া সম্ভবপর, এবং আদৌ সম্ভবপর কিনা, কাণ্টের এই মূল প্রশ্ন তত্ত্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উঠিতে পারে। গণিতে ও পদার্থবিজ্ঞানে পূর্বতোজ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়, কাণ্ট্ তাহা বুঝাইয়াছেন। কাণ্টের বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করিলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, তত্ত্ববিজ্ঞানে পূর্বতোজ্ঞান সম্ভবপরই নয়, এমন কি, এ ক্ষেত্রে বাস্তবিক কোন জ্ঞানই লাভ করা যায় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে জগতের কত অসাধারণ মনীষী যে শাস্ত্রে এত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং নানা তথ্য নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি, সে শাস্ত্রে কোন জ্ঞানলাভই হয় না, এমন শক্ত কথা কাণ্ট্ কেন বলিলেন? কাণ্ট্ দেখিলেন, তত্ত্ববিজ্ঞানে নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সত্ত্বেও এমন কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই, যাহা সব দার্শনিকেরা মানিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আবহমানকাল হইতে বাদবিবাদই চলিয়াছে, তাহার কোন অন্ত নাই, কোন মীমাংসা নাই। হাজার বছর আগে যে সব প্রশ্নের আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু মীমাংসা হয় নাই, সেই সব প্রশ্নের আলোচনা আজও হইতেছে এবং আজও কোন মীমাংসার লক্ষণ পাওয়া যায় না। এক দার্শনিক যে কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করেন, তাহাকেই অন্য দার্শনিক সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন। জ্ঞানরাজ্যের অন্য কোন বিভাগে ত এরকম দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে এক বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার পর অন্য বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। আবহমানকাল হইতে একই বিষয়ের আলোচনা চলে না। আর যখন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সব বিজ্ঞ লোকেরাই মানিয়া থাকেন। ইহাই জ্ঞানের সাধারণ রীতি। এমতাবস্থায় তত্ত্ববিজ্ঞানে আমাদের জ্ঞানের

যে শুধু উন্নতি বা কোন অগ্রগতি দেখিতে পাই না তাহা নহে, তাহাতে মোটেই কোন জ্ঞান হয় কিনা সে বিষয়ে সহজেই সন্দেহ হয়। কিন্তু দার্শনিকদের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান মতদ্বৈধ ও অগ্রগতির একান্ত অভাবই কাণ্টের চক্ষে তত্ত্ববিজ্ঞানের বিজ্ঞান হিসাবে ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নহে। কাণ্টের মতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের রাজ্যেই সম্ভবপর। বৌদ্ধিক প্রকার অনুভবে প্রযুক্ত হইয়াই আমাদের জ্ঞান উৎপাদন করে। জ্ঞান বলিতে কাণ্ট্ এই রকম জ্ঞানই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ই যখন অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সে সব পদার্থ যখন কখনই আমাদের অনুভবের বিষয় হইতে পারে না, তখন ত স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নয়।

কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যদি মানব শক্তির অতীত হয়, তবে এসব বিষয় জানিবার জন্য বুদ্ধিমান পুরুষদের এরকম আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? যুগযুগান্তরের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আজও মানব বুদ্ধিতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য এত ব্যাকুল হইয়া উঠে কেন? কাণ্ট্ বলেন, বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিজ্ঞান অসম্ভব হইলেও তত্ত্ববিজ্ঞানের দিকে প্রবণতা মানব বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম। তত্ত্ববিজ্ঞান যে সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া আসিয়াছে সে সব বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যেমন অসম্ভব, সে সব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্ন উদয় হওয়া তেমনই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। মানব-বুদ্ধির স্বরূপই এই রকম যে তত্ত্ববিজ্ঞানীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত না হইয়াই পারে না।

যে বিষয়ে জ্ঞানই সম্ভবপর নয়, সে বিষয়ে প্রশ্নই বা উঠে কি করিয়া? কাণ্টের মতে এই সব প্রশ্ন একরকম অপ্রাকৃত ভ্রান্তির[১] জন্য উঠিয়া থাকে। কিন্তু সে ভ্রান্তি কি? এবং কেনই বা সে ভ্রান্তি হয়?

মানুষের মনে যে স্বাভাবিক জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসাবৃত্তি বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবে বা সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা চরিতার্থ হয় না বলিয়াই মানুষ অতীন্দ্রিয় পদার্থ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মানুষ স্বভাবতই জানিতে চায়, বুঝিতে চায়। তার জ্ঞান-পিপাসা যদি ভৌতিক বিষয়ের জ্ঞান দ্বারাই তৃপ্ত হইতে পারিত, তাহা

১। Transcendental Illusion

হইলে কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের কল্পনা তার মনে উঠিত না। কিন্তু যাদৃশ বস্তু যে রকম ভাবে আমরা জানিতে ও বুঝিতে চাই, আমরা তাদৃশ বস্তু সে রকম ভাবে আমাদের ভৌতিক জ্ঞানের ভিতর পাইনা। তাই অতীন্দ্রিয়ের কল্পনা স্বতঃই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে এবং তাহাকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমরা দমন করিয়া রাখিতে পারি না। আমরা প্রাকৃত জ্ঞানে যাহা কিছু পাই, তাহাই নানাভাবে তন্ত্রিত[১], পরিচ্ছিন্ন, পরতন্ত্র, ও সসীম। কোন কিছুই সম্পূর্ণভাবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নাই; সবকিছুই অন্য কোন না কোন পদার্থের উপর নির্ভর করে। একটা কিছু জানিতে বা বুঝিতে গেলে শুধু তাহাকে জানিলে চলেনা, সে যাহার উপর নির্ভর করে, যাহার দ্বারা সে পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ, তাহাকেও জানিতে ও বুঝিতে হয়। একটা কিছু জানিতে হইলে অন্য কিছুও জানিতে হয়, কিন্তু সে অন্যের জন্য আবার তৃতীয় অন্যের জ্ঞান আবশ্যক হয়। এই রকম কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াইতে না পারায়, কোন পদার্থই আমরা সম্যক্‌রূপে জানিতে বা বুঝিতে পারিনা।

দৈশিক[২] কোন পদার্থ বুঝিতে গেলে, তাহা যেখানে আছে, সে-দেশ ভাগের বাহিরে যাহা আছে, তাহারও বিবেচনা করিতে হয়। সেই রকম কালিক[৩] কোন-কিছু বুঝিতে গেলে, সেই কালভাগের বাহিরে যাহা আছে, তাহার কথা ভাবিতে হয়। আর এমন দেশভাগ বা কালভাগ কখনই পাওয়া যাইবে না, যাহার বাহিরে কিছু নাই; ইহার সহজ কারণ এই যে দেশ ও কাল অনাদি ও অনন্ত। কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা সাধারণতঃ বিষয়কে বুঝিবার চেষ্টা করি। কোন একটা বস্তু বুঝিতে হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোথা হইতে কি করিয়া ইহা হইল? তার অর্থ, আমরা জানিতে চাই, ইহার কারণ কি? কিন্তু কারণের ত আবার কারণ চাই। কারণ নিজে অকারণ নয়। ক'এর কারণ খ, খ'-এর কারণ গ, এই রকম কার্যকারণপরম্পরা অনাদি ও অনন্ত। কোথাও থামিবার উপায় নাই। তাহার কারণ, আমরা যাহা কিছু ভৌতিক জ্ঞানে পাই তাহাই অন্য কিছুর দ্বারা তন্ত্রিত[৪], পরিচ্ছিন্ন বা নিয়ন্ত্রিত। যে বস্তু

১। Conditioned
২। Spatial
৩। Temporal
৪। Conditioned

পরের উপর নির্ভর করে তাহার সম্যক্ জ্ঞান শুধু তাহার দ্বারাই হয় না ; যাহার উপরে সে নির্ভর করে, যাহার দ্বারা সে তন্ত্রিত, তাহাকেও জানিতে হয়। ভৌতিক জ্ঞানের সব বিষয়ই যখন অন্যকিছুর দ্বারা তন্ত্রিত, তখন দেখা যাইতেছে, সাধারণ লৌকিক জ্ঞানে বা ভৌতিক বিজ্ঞানের জ্ঞানে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। ভৌতিক জ্ঞানে কোন পদার্থেরই চরম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না ; কখনই কোন বিষয়ে আমরা এমন জায়গায় পৌছিতে পারি না যেখানে বলা যায় সব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই। যতক্ষণ তাহা বলিতে না পারা গেল, ততক্ষণ ভাল করিয়া কিছু জানা গিয়াছে, বলিতে পারা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তন্ত্রিতের জ্ঞানের জন্যও অতন্ত্রিত[১] কিছু জানিতে না পারিলে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। যে বস্তু পরের উপর নির্ভর করেনা, যে নিরপেক্ষ, স্বয়ংসিদ্ধ, অতন্ত্রিত, তাহাকে জানিলেই আমাদের জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হইতে পারে, ত হার আগে নয়।

আমাদের ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবে, সাধারণ লৌকিক জ্ঞানে বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ত কোথাও অতন্ত্রিত, স্বয়ংসিদ্ধ, নিরপেক্ষ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। দেশ কাল অনাদি ও অনন্ত ; কার্যকারণ পরম্পরাও অনাদি ও অনন্ত। ইহাদের মধ্যে কোথাও অতন্ত্রিতের স্থান নাই। হইতে পারে আমরা সব খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি বলিয়া নিরপেক্ষ অতন্ত্রিত কিছু পাইনা ; কেননা প্রত্যেক খণ্ডই পূর্ববর্তী বা বহিঃস্থ ভাগের দ্বারা কোন না কোন রূপে তন্ত্রিত। বিশ্বের বা বাস্তব জগতের প্রত্যেক ভাগই যদিও ভাগান্তরের দ্বারা সর্বদাই তন্ত্রিত বা নিয়মিত হইয়া থাকে, তথাপি অখণ্ড সমগ্রকে অতন্ত্রিত বলা যাইতে পারে। এই অখণ্ড সমগ্রকে জ্ঞানে ধরিবার জন্যই মানবাত্মার চিরন্তন প্রয়াস। অতন্ত্রিত সমগ্রের দ্বারাই মানবের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হইতে পারে, অন্যকিছুর দ্বারা নয়। এই অতন্ত্রিতের উপলব্ধিই মানবীয় জ্ঞান ব্যাপারের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য মানুষের হাতে উপযুক্ত কোন সাধনা আছে কি ? মানুষের জ্ঞান শুধু তাহার ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব ও

১। Unconditioned

বৌদ্ধিক প্রকারের সাহায্যেই হইতে পারে। ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবে ত তন্ত্রিত খণ্ডকেই পাওয়া যায়; আর বৌদ্ধিক প্রকারেরও প্রয়োগ শুধু ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের রাজ্যেই সম্ভবপর বলিয়া তাহাদের দ্বারা অতন্ত্রিত অখণ্ডের জ্ঞান হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব ও বৌদ্ধিক প্রকার ব্যতীত মানুষের কাছে জ্ঞানের অন্য কোন সাধন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানবীয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য[১] ও সাধনের[২] মধ্যে এক মৌলিক বিরোধ রহিয়াছে। এই বিরোধের জন্যই মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া জ্ঞান সাধনা করিয়াও জ্ঞানরাজ্যের শেষ পাইতেছে না। অনেক কিছু জানিতেছে বটে, কিন্তু কিছুই নিঃশেষিতরূপে জানিতে পারিতেছে না। অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে, কিন্তু দিন দিন আবার নূতন নূতন প্রশ্ন উঠিতেছে।

যে অতন্ত্রিত নিরপেক্ষকে মানব তাহার যাবতীয় জ্ঞান ব্যাপারে জানিতে চাহিতেছে, কিন্তু কখনই জানিতে পারিতেছে না ও পারিবেও না, সে অতন্ত্রিতের কল্পনা কি শুধু মানবের যাবতীয় জ্ঞান প্রয়াসকে ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত করিবার জন্য মানববুদ্ধিতে সংক্রামিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, না ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে? অনন্তের প্রতি যাহার লক্ষ্য, অনন্তের সন্ধানে যে ঘুরিতেছে সে যদি সান্তকে লইয়া সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে যেমন আমরা তাহার অনন্তের প্রতি আকর্ষণকে তাহার দুর্ভাগ্যের কারণ না বলিয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ মনে করি, তেমনই বর্তমান ক্ষেত্রেও অতন্ত্রিত-বুভুৎসাকে মানব বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারা যায়। অতন্ত্রিত সমগ্রকে মানব জানিতে চায় বলিয়াই মানবের জ্ঞানসাধনা অনন্তকাল অবধি চলিতে থাকিবে। ভুবন-বিজয়ী কোন বীর সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া, অন্যকিছু জয় করিবার নাই বলিয়া দুঃখ করিতে পারেন; কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধকের কাছে এরকম দুঃখের দিন কখনই আসিবে না, সর্বদাই তাঁহার কাছে কিছু না কিছু জানিবার থাকিবেই থাকিবে। শুধু তাহাই নহে। এই অতন্ত্রিত সমগ্রের প্রকল্পনা[৩] দ্বারা মানবের জ্ঞানসাধনা অনুপ্রাণিত হওয়াতেই মানুষ তাহার জ্ঞানরাশিকে নানা নিয়মের দ্বারা সুসঙ্গতভাবে সুসংবদ্ধ

১। End ২। Means ৩। Idea

করিয়া এক অখণ্ড একত্ববোধের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে। এই প্রকল্পনার বলেই আবার তার গবেষণাকে প্রত্যেক বিষয়ে গভীর হইতে গভীরতর করিবার চেষ্টা সর্বদাই করিতেছে। তাহার ফলেই নিত্য নূতন আবিষ্কারও সম্ভবপর হইতেছে।

দেখা যাইতেছে, অতন্ত্রিতের প্রকল্পনা মানববুদ্ধির ব্যাধিস্বরূপ নয়, তাহার জ্ঞান ব্যাপারের পরম সহায়ক। অতন্ত্রিত সমগ্র কিছু আছে বলিয়া ধরিয়া নিয়া আমরা গবেষণা করি বলিয়াই আমাদের জ্ঞান দিন দিন এতদূর অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞানব্যাপারের দিগ্‌দর্শক[১] হিসাবেই অতন্ত্রিতের প্রকল্পনার বিশেষ মূল্য।

এই অতন্ত্রিতের প্রকল্পনা আমরা কোথা হইতে পাই? নিশ্চয়ই আমাদের কোন জ্ঞানশক্তি হইতেই ইহা উদ্ভূত। আমাদের কি কি জ্ঞানশক্তি আছে? আমরা অনুভব শক্তি বা সংবেদন[২] এবং বোধশক্তি বা বুদ্ধির[৩] কথা জানি। কাণ্ট্ নিজেও অনেক জায়গায় বুদ্ধি শব্দকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; এবং সেই অর্থে বুদ্ধি হইতেই অতন্ত্রিতের কল্পনা আসে বলিতে পারা যায়। কিন্তু বুদ্ধির এক বিশেষ অর্থও আছে। সেই বিশেষ অর্থে বুদ্ধি হইতে আমরা দ্রব্যগুণাদি বিগ্রহ[৪] রূপ প্রকারই[৫] পাইয়া থাকি। কিন্তু অতন্ত্রিতের প্রকল্পনা[৬] ঐসব বৌদ্ধিক প্রকারের মত নয়। বৌদ্ধিক প্রকার অনুভবগম্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইলেই আমাদের জ্ঞান সম্ভবপর হয়। বৌদ্ধিক প্রকার পরিধান করিয়া আমাদের অনুভবলব্ধ পদার্থ বিষয়ত্বলাভ করে। সুতরাং প্রকারকে বিষয়েরই অঙ্গীভূত[৭] বলিয়াই ধরিতে পারা যায়। কিন্তু অতন্ত্রিতের প্রকল্পনার প্রয়োগ জ্ঞানের ভিতরে কোথাও হয় না। জ্ঞান কোন দিশায় চলিবে, এই প্রকল্পনা শুধু তাহাই দেখাইয়া দেয়। সুতরাং ইহাকে জ্ঞানের অঙ্গীভূত না বলিয়া জ্ঞানের দিগ্‌দর্শক[৮] মাত্র বলিতে পারা যায়। এই দিগ্‌দর্শক প্রকল্পনার জন্য কাণ্ট্ এক বিশেষ জ্ঞান-শক্তির কল্পনা করিয়াছেন। তাহাকে প্রজ্ঞা[৯] বলা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, আমাদের মোটামুটি তিন প্রকারের জ্ঞানশক্তি রহিয়াছে,

১। Regulative ৪। Concept ৭। Constitutive
২। Sense ৫। Category ৮। Regulative
৩। Understanding ৬। Idea ৯। Reason

সংবেদনা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা। আমাদের জ্ঞানের উপাদান[১] সংবেদনজন্ত অনুভব হইতেই আসে। তাহাকে বৌদ্ধিক প্রকারই বিষয়ের আকার দেয়। বুদ্ধিপ্রসূত প্রকার বিষয়েরই অঙ্গীভূত। কিন্তু প্রজ্ঞাপ্রসূত প্রকল্পনা জ্ঞানের দিগ্‌দর্শক মাত্র।

উপরে যে অপ্রাকৃত ভ্রমের কথা বলা হইয়াছিল, তাহার বীজ এই-খানেই পাওয়া যায়। যে প্রকল্পনা জ্ঞানের দিগ্‌দর্শক মাত্র, তাহাকে যদি প্রকারের মত বিষয়ের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলেই মহা-ভ্রমের সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক আমরা করিও তাহাই। অতন্ত্রিত সমগ্রের প্রকল্পনা দ্বারা আমাদের জ্ঞানব্যাপার চালিত হইলে আমাদের বিষয়জ্ঞান সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় বটে; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, অতন্ত্রিত সমগ্র বলিয়া বাস্তবিক কিছু আছে এবং ঘটপটাদি বিষয়কে আমরা যে রকম জানি, অতন্ত্রিত বস্তুকেও সে রকম জানিতে পারি। কিন্তু কার্যতঃ আমরা অতন্ত্রিতের প্রকল্পনাকে জ্ঞানব্যাপারের দিগ্‌দর্শক মাত্র মনে না করিয়া বাস্তব বস্তুর স্বরূপনির্ধারক হিসাবে ধরিয়া থাকি। ইহাকে কাণ্ট অপ্রাকৃত ভ্রম বলিয়াছেন। এই ভ্রমের বশবর্তী হইয়া আমরা বাস্তবিক অতন্ত্রিত, স্বয়ংসিদ্ধ, নিরপেক্ষ সমগ্র কিছু আছে বলিয়া মনে করি। এই রকম পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলিয়া ভৌতিক বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারাই অতন্ত্রিত অতীন্দ্রিয় পদার্থকে আমরা জানিতে চাই। কাণ্টের মতে আমাদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। অতীন্দ্রিয় কোন পদার্থের জ্ঞান আমাদের কখনই হইতে পারে না। সুতরাং তত্ত্ব-বিজ্ঞানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় অতন্ত্রিতের জ্ঞানলাভ করিতে পারা যাইবে, এরকম আশা নিরর্থক। এই বলিয়া অতন্ত্রিতের প্রকল্পনাকে সর্বদা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নয়; আমাদের জ্ঞানের দিগ্‌দর্শক হিসাবে তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে।

পুরোবর্তী রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করা যে রকম ভ্রম, অতন্ত্রিত পদার্থ বলিয়া কিছু আছে মনে করা সে রকমের ভ্রম নয়। প্রথম কথা, রজ্জু ও সর্প বলিয়া পদার্থ বাস্তবিক দেখিতে পাওয়া যায় এবং দুইই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। কিন্তু অতন্ত্রিত কিছু কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং কখনই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। তথাপি

১। Material

তাহাকে আছে বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় কথা, রজ্জুকে সর্প নয় বলিয়া জানিলে তখন আর রজ্জুকে সর্পবৎ দেখা যায় না। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে যদিও আমরা বুঝি অতন্ত্রিত কিছু নাই, তথাপি তাহাতে আছে বলিয়া মনে না করিয়া পারি না। এই জন্যই এই অপ্রাকৃত ভ্রমকে কাণ্ট্ অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। মানুষ যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, এই ভ্রমকে এড়াইতে পারে না। আমরা যদিও জানি চন্দ্রের আকারে কোন পরিবর্তন হয় নাই, তথাপি উদয়ের সময় চন্দ্রকে যত বড় দেখিয়াছিলাম মাথার উপরে থাকাকালীন তাহাকে তত বড় দেখিনা; তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া দেখি। এরকম ভ্রম যেমন অপরিহার্য, অপ্রাকৃত ভ্রমও আমাদের কাছে সেই রকম অপরিহার্য। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতন্ত্রিত নিরপেক্ষ কিছু আছে মনে করিয়াই তাহার জ্ঞান লাভের জন্য আমরা তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এই অপ্রাকৃত ভ্রম অপরিহার্য বলিয়া তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনাও মানববুদ্ধির কাছে অপরিহার্য। কাণ্ট্ এই রকম ভাবে দেখাইলেন যে, বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিজ্ঞান সম্ভবপর না হইলেও, অর্থাৎ তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা কোন জ্ঞানলাভ করিতে না পারা গেলেও, তত্ত্ববিজ্ঞানের দিকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে।

তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রয়াস এক ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত; এই ভ্রম অপরিহার্য। বিচারের সাহায্যে এই ভ্রম দূরীভূত করিতে না পারা গেলেও ইহার অপকারিতা দূর করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যেই কাণ্ট্ তৎকালীন তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

আমরা অতন্ত্রিত সমগ্রের কথা বলিয়া আসিয়াছি। ক্ষেত্রভেদে এই প্রকল্পনা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বাহ্যজগতে যেমন সবকিছুই অপরের দ্বারা তন্ত্রিত বলিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মানসরাজ্যেও যেসব অবভাস অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের কাছে উপলব্ধ হয়, সে সবই এই রকম ভাবে তন্ত্রিত। মনের কোন অবস্থা বা বৃত্তিই স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র নয়; সব অবস্থাই তৎপূর্ববর্তী অবস্থা দ্বারা তন্ত্রিত বা নিয়মিত। এই তন্ত্রিত যাবতীয় আন্তর অবভাসের মূলে আমরা যে অতন্ত্রিতকে কল্পনা করিয়া থাকি, তাহাকেই বিষয়ী[১] বা আত্মা[২] বলা হয়। অর্থাৎ

১। Subject ২। Soul

আন্তর রাজ্যে অতন্ত্রিতকে আমরা আত্মা বলিয়াই কল্পনা করিয়া থাকি। বাহ্য অবভাসের সমুদয় হিসাবে যে অতন্ত্রিতের কল্পনা হয়, তাহাকে বিশ্ব বলা যায়। সর্বপ্রকারের (আন্তর ও বাহ্য) সত্তার মূল হিসাবে যে অতন্ত্রিতের কল্পনা করি, তাহাকে ঈশ্বর বলা হয়। অতন্ত্রিতের এই তিন প্রকারের কল্পনানুসারে কাণ্টের পূর্বর্তীকালে তত্ত্ববিজ্ঞানের তিন ভাগ করা হইত; যথা—আত্ম-(মনো)-বিজ্ঞান, বিশ্ববিজ্ঞান ও ঈশ্বর-(ধর্ম)-বিজ্ঞান। এই সব শাস্ত্রে অনুভবের আশ্রয় না লইয়া শুধু যুক্তির সাহায্যে বিচার চলিত বলিয়া তাহাদিগকে যথাক্রমে যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান,[১] যৌক্তিক বিশ্ববিজ্ঞান[২] ও যৌক্তিক ধর্মবিজ্ঞান[৩] বলা হইত। এই সব শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল, যুক্তির সাহায্যে আত্মা, বিশ্ব ও ভগবান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান দেওয়া। কাণ্ট্ এই সব শাস্ত্রের বিচারপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ঐ সব বিষয় সম্বন্ধে বাস্তবিক কোন জ্ঞানলাভ করা যায়না।

প্রধানতঃ আত্মার কথাই দেখা যাউক। যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান প্রমাণ করিতে চায়, আত্মা এক দ্রব্য[৪] বিশেষ; তাহার (আত্মার) মধ্যে অন্য কোন কিছুর সংমিশ্রণ নাই, তাই এক অর্থে তাহাকে শুদ্ধ[৫] বলিতে পারা যায়। বিভিন্ন অবস্থায় একই রূপে বর্তমান থাকে বলিয়া (অর্থাৎ আত্মার স্বগত ঐক্য রহিয়াছে বলিয়া) আত্মার ব্যক্তিত্ব[৬] আছে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেকেই সমস্ত জড় পদার্থ হইতে, এমন কি নিজের শরীর হইতেও, নিজকে পৃথক করিতে পারে বা ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, আত্মা অজড়; এবং অজড় বলিয়াই আত্মা অমর।

কাণ্ট্ বলেন, যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্বন্ধীয় সব কথা বস্তুতঃ একটি কথা হইতেই বাহির করিতে চায়; আমাদের সমস্ত প্রাকৃতজ্ঞানের মূলভূত স্বসম্বিৎ[৭] বা 'আমি জানি'[৮] এই এক কথা হইতে আত্মার দ্রব্যত্ব, শুদ্ধত্ব, অমরত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ করিতে চায়। কাণ্ট্ নিজেই এই স্বসম্বিৎ বা আমি-জ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার সঙ্গেই 'আমি জানি' এই কথা বলিতে পারা যায়। আমি-জ্ঞান শুধু সব

১। Rational Psychology
২। Rational Cosmology
৩। Rational Theology
৪। Substance
৫। Simple
৬। Personality
৭। Self-consciousne
৮। I think

জ্ঞানের সঙ্গে থাকিতে পারে এমন নয়; যে জ্ঞানের সঙ্গে থাকিতে পারিবে না, সে জ্ঞান জ্ঞানই হইবে না। সব জ্ঞানই কোন না কোন 'আমি'র জ্ঞানরূপেই সম্ভবপর হয়। যে জ্ঞান কেহই 'আমি জানি' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহা জ্ঞান বলিয়াই সম্ভব হই ব না। যদিও 'আমি-জ্ঞান' ব্যতীত কোন জ্ঞানই সম্ভবপর নয়, এবং আমি-জ্ঞানকে 'আমি জানি' বলিয়াই আমরা ব্যক্ত করি, তথাপি প্রণিধানপূর্বক আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, 'আমি-জ্ঞান' বাস্তবিক কোন জ্ঞানই নয়। 'আমি জানি' দ্বারা আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের একটি অপরিহার্য তর্কসিদ্ধ আকারই[১] নির্দেশিত হয় মাত্র, বাস্তবিক কোন জ্ঞান প্রকাশ পায় না। আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান, সবই 'আমি জানি' এই আকারেই আমাদের আছে আসে বটে, কিন্তু 'আমি জানি' নিজে কোন জ্ঞানই নয়। জ্ঞান হইতে হইলে তাহার মূলে অনুভব থাকা চাই। কিন্তু 'আমি'র কোন অনুভবই (ইন্দ্রিয়জন্য) আমাদের নাই। সুতরাং তথাকথিত 'আমি-জ্ঞান' বা স্বসম্বিৎ কোন জ্ঞানই নয়, জ্ঞানের আকার মাত্র। অতএব ইহা হইতে আমি বলিয়া বাস্তবিক কিছু আছে কি না, এবং থাকিলে তাহার স্বরূপ কি হইবে, এই সব কিছুই জানিতে পারা যায় না। সুতরাং যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেগুলি ভ্রমাত্মক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব ভ্রমকেই কাণ্ট্ যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানের যুক্ত্যাভাস[২] বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই ভ্রমগুলি দেখাইয়া দেওয়াই কাণ্টের বিচারের উদ্দেশ্য।

যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান তার আত্মা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্তে কি করিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাই একটু ভাল করিয়া দেখা যাউক। প্রথমেই জিজ্ঞাস্য আত্মার দ্রব্যত্ব কি করিয়া সিদ্ধ হইল? দ্রব্যত্বের লক্ষণ বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নরূপে দিয়া থাকেন। এখানে এরিস্টোটলের মত অনুসরণ করিয়া যৌক্তিক মনোবিজ্ঞান বলে, যাহাকে কখনই বিধেয়রূপে পাওয়া যায় না, সর্বদা উদ্দেশ্যরূপেই পাওয়া যায়, তাহাই দ্রব্য। এখানে বিধেয়ের অর্থ একটু সঙ্কুচিতভাবে বুঝিতে হইবে। যখন বলি, এই পুরুষটি দণ্ডবান, তখন আমরা মনে করি, দণ্ডই বিধেয় এবং পুরুষটি উদ্দেশ্য। কিন্তু উপরে দ্রব্যত্বের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা মানিতে হইলে, এখানে (বিধেয়) বলিতে

১। Logical form 　 ২। Paralogism

দণ্ডকে বুঝিতে হইবে না, দণ্ডবত্তাকে বুঝিতে হইবে। দণ্ড দ্রব্য হইলেও দণ্ডবত্তা কোন দ্রব্য নয়, পুরুষে বিদ্যমান এক ধর্ম বা গুণ বিশেষ। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, যাহা কিছু বিধেয় হয়, তাহা সব সময়ই দ্রব্যেতর; গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্যবৃত্তি অন্য কোন ধর্ম। 'সে যাইতেছে'— এখানে 'যাওয়া' রূপ ক্রিয়া বিধেয়। এই সব গুণধর্ম নিজে স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইতে পারে না, দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে। দ্রব্যই হয় উদ্দেশ্য এবং এই সব ধর্মগুণ হয় বিধেয়। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আত্মা কোন বাক্যেই বিধেয়[১] রূপে ব্যবহৃত হয় না, এবং হইতে পারে না; সর্বদাই উদ্দেশ্য[২] থাকে। সুতরাং যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানের মতে আত্মা এক দ্রব্য। আত্মাকে দ্রব্য মনে করিয়াই আত্মাকে স্থিতিশীল[৩] বস্তু বলিয়া ভাবা হয়। এখানে কাণ্ট্ বলিতে চান, এরকম সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়; কেননা দ্রব্যত্ব রূপ প্রকার[৪] অনুভবগম্য পদার্থের উপরই প্রযুক্ত হইতে পারে, যেখানে কোন অনুভব নাই, সেখানে দ্রব্যত্ব প্রকারের প্রয়োগ হইতে পারে না, এবং দ্রব্যত্বের আরোপ করিয়া কোন জ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং যদিও আমরা আত্মাকে দ্রব্য বলিয়া ভাবিতে পারি, তথাপি আত্মা বলিয়া কিছু আছে, এবং তাহা একটি দ্রব্যবিশেষ, এরকম কথা বলিবার আমাদের যুক্তিসিদ্ধ কোন অধিকার নাই, কেননা দ্রব্যত্বের ভিত্তিস্বরূপ যে অনুভব, তাহাই এখানে অনুপস্থিত।

মনোবিজ্ঞানের দ্বিতীয় যুক্ত্যাভাসে আত্মার অবিমিশ্রতা[৫] বা শুদ্ধির[৫] কথা বলা হইয়াছে। আত্মা যে এক, দুই বা ততোধিক পদার্থের মিশ্রণ নয়, তাহা আমাদের জ্ঞান, চিন্তা বা মননের[৬] ঐক্য হইতেই বুঝা যায়। ঐক্য ব্যতীত কোন জ্ঞান, মনন বা চিন্তা কখনই সম্ভবপর হয় না। 'আমি বাড়ী যাইব' এই কথা আমরা অনায়াসে জানিতে বা ভাবিতে পারি। কিন্তু যদি 'আমি' এক বোধে থাকে, 'বাড়ী' অন্য বোধে ভাসে, এবং 'যাইব' তৃতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে, 'আমি বাড়ী যাইব' বলিয়া জ্ঞানই হইবে না। যে চিন্তার একাংশ আমি ভাবিলাম, অপরাংশ তোমার মনে উদয় হইল, সে চিন্তা কোন চিন্তাই নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐক্য ব্যতীত আমাদের

১। Predicate
২। Subject
৩। Persistent
৪। The Category of Substantiality
৫। Simplicity
৬। Thought

মনন বা জ্ঞান কখনই সম্ভবপর নয়; মনন যখন সর্বদাই এক, তখন তাহার ভিত্তিভূত যে আত্মা, তাহাও এক।

এখানেও কাণ্ট্ বলেন, আত্মার কথা ভাবিতে গেলে, এক বলিয়াই ভাবিতে হয়; কিন্তু তাই বলিয়া এক আত্মা বস্তু আছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। অনুভব ব্যতিরেকে আমাদের ভাবনা দ্বারা বস্তুসিদ্ধি হয় না। ঐক্য না থাকিলে আমাদের জ্ঞানব্যাপার বা মনন সম্ভব হয় না; সেইজন্য 'ঐক্য'কে আমাদের জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য আকার হিসাবেও মানিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা হইতে বাস্তবে এক অবিমিশ্র বস্তুও রহিয়াছে, একথা বলিতে পারা যায় না।

তৃতীয় যুক্ত্যাভাসে বলা হয়, সব অবস্থায় এক আত্মা আছে কেননা সব সময় ত এক 'আমি'ই পাওয়া যায়। মনোবিজ্ঞানের মতে ইহা আত্মার ব্যক্তিত্বের[১] প্রমাণ। এক্ষেত্রেও কাণ্টের মতে আমরা শুধু জ্ঞানের এক আকার নিয়াই ব্যাপৃত আছি। সেই জ্ঞানীয় আকার ('আমি জানি') হইতে বস্তুস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারা যায় না। প্রত্যেক জ্ঞানের বেলায়ই 'আমি জানি' বলিতে পারা যায়, কেননা 'আমি জানি' সব জ্ঞানেরই অবিচ্ছেদ্য আকার; কিন্তু এই জ্ঞানীয় আকার হইতে কখনই এই বলা চলে না যে এক আমি বস্তু সব অবস্থায় একই ভাবে বাস্তবিক বিদ্যমান আছে।

চতুর্থ যুক্ত্যাভাসে আত্মার অজড়ত্বের কথা পাওয়া যায়। আমরা আমাদের নিজেকে সমস্ত বাহ্যবস্তু পদার্থ হইতে, এমন কি আমাদের শরীর হইতেও ভিন্ন বলিয়া জানি; সমস্ত জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন হওয়াতে, আত্মাকে অজড় (সুতরাং অমর) বলিয়া মানিতে হয়; ইহাই মনোবিজ্ঞানের বক্তব্য। কাণ্ট্ বলেন, শরীরকে অনাত্মা বলিয়া বুঝি বলিয়াই শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য বুঝিতে পারি। আত্মাকে জ্ঞাতা বলিয়া জানিলে, সব জ্ঞেয় হইতে, সুতরাং শরীর হইতেও, আত্মা যে ভিন্ন, তাহা সহজে বলিতে পারা যায়; কেননা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বলিতে এক পদার্থ বুঝায় না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয়, যে জ্ঞেয় হইতে সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ অবস্থায়ও জ্ঞাতা বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু আছে। তেমনি, যদিও আমরা আমাদের নিজকে শরীর হইতে ভিন্ন (ভিন্নার্থক) বলিয়া

১। Personality

বুঝিতে পারি, তথাপি ইহার অর্থ এই হয় না যে আমরা শরীর ছাড়িয়া বিদ্যমান থাকিতে পারি।

কাণ্টের মূল কথা, আমাদের বৌদ্ধিক প্রকার যখন অনুভবগম্য পদার্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে, এবং আমাদের পক্ষে যখন আত্মার কোন অনুভবই সম্ভব নয়, তখন 'আত্মার অস্তিত্ব আছে' কিংবা 'আত্মা দ্রব্য, শুদ্ধ, অজড় বা অমর', এই রকম কোন কথাই আমরা বলিতে পারি না। আমাদের যে আত্মার কোন অনুভব নাই, সেকথা কাণ্ট্ সহজেই প্রমাণ করিতে পারেন। কাণ্টের মতে মানুষের অনুভব শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই হইতে পারে এবং আত্মা যে অতীন্দ্রিয়, তাহা সব আত্মবাদীই স্বীকার করেন। যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানের সমালোচনা দ্বারা কাণ্ট্ এই কথা বলিতে চান না যে মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্বন্ধে যেসব কথা বলিয়াছে, তাহার বিপরীত কথাই সত্য। মনোবিজ্ঞান যখন বলে, আত্মা দ্রব্য, তখন কাণ্ট্ বলেন না যে আত্মা বলিয়া কিছু নাই অথবা আত্মার কথা ভাবিতে গেলে দ্রব্য রূপে আমরা ভাবি না বা আমাদের ভাবা উচিত নয়। অথবা মনোবিজ্ঞান যখন বলে আত্মা শুদ্ধ, অজড় ও অমর, তখন কাণ্ট্ বলেন না যে আত্মা মিশ্র পদার্থ, জড় কিংবা মর। তিনি শুধু বলেন, মনোবিজ্ঞান যাহা বলিয়াছে, তাহা কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেই কোন কথা মিথ্যা হইবে, এমন বলিতে পারা যায় না। সুতরাং আত্মাকে দ্রব্য বা অমর বলিয়া যদিও আমরা বাস্তবিক জানিনা ও জানিতে পারি না, তথাপি প্রকৃতপক্ষে আত্মা দ্রব্য বা অমর নহে, কিংবা আত্মাকে আমরা দ্রব্য বা অমর বলিয়া ভাবি না বা ভাবিতে পারি না বা আমাদর ভাবা উচিত নহে, তাহা নহে। আত্মা সম্বন্ধে এই সব কথা আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবে জানিতে না পারিলেও আমাদের বিশ্বাস করিতে কোন বাধা নাই।

এখন বিশ্বের কথা দেখা যাউক। বিশ্ব বা জগৎ বলিতে বাহ্যবিষয়ের সমষ্টিকেই বুঝিয়া থাকি। আমরা বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যেসব বস্তু দেখিতে শুনিতে বা জানিতে পারি, সেসবই কোন না কোন বস্তুদ্বারা তন্ত্রিত। অতন্ত্রিতের প্রকল্পনা বাহ্যবিষয়ে প্রযুক্ত হইলে যাবতীয় বাহ্যপদার্থের সমষ্টিরূপে সমগ্র জগৎকে পাই। জগতের প্রত্যেক বস্তু অন্য বস্তু দ্বারা নিয়মিত বা তন্ত্রিত হইলেও, সমগ্র জগৎ অন্য কোন বাহ্যবিষয়ের দ্বারা তন্ত্রিত নয়। এই

অতন্দ্রিত পদার্থ এক হিসাবে চোখের সামনেই রহিয়াছে, কেননা জাগতিক সব ঘটনা ত চোখের সামনেই ঘটিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক বিচার করিলে দেখা যায়, মনোরাজ্যের অতন্দ্রিত (আত্মা) যেমন আমাদের জ্ঞানের বাহিরে[১] অর্থাৎ বাস্তবিক আমাদের জ্ঞানে পাওয়া যায় না, বাহ্য অতন্দ্রিতও তেমনি আমাদের অনুভবে বা জ্ঞানে পাওয়া যায় না। জগতের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাবলী আমাদের চোখের সামনে ঘটিলেও, সমগ্র জগৎ আমাদের কোন অনুভব বা জ্ঞানে ভাসে না। জগৎ বলিয়া সমগ্ররূপে আমরা যাহা ভাবি তাহা আমাদের প্রজ্ঞাজন্য প্রকল্পনা[২] মাত্র।

এই প্রকল্পনাকে জ্ঞানযোগ্য বিষয় মনে করিয়া আমাদের বুদ্ধি তৎসম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ কথা বলিতে থাকে। শুধু বিচারের দ্বারা জগৎকে সান্তও বলিতে পারা যায়, অনন্তও বলিতে পারা যায়; সান্ত বলিবার পক্ষে যেমন যুক্তি আছে, অনন্ত বলিবার পক্ষেও তেমনি যুক্তি আছে। বিশ্ব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচার করিতে গিয়া মানব বুদ্ধি এইরূপে স্ববিরোধে জড়িত হইয়া পড়ে। কাণ্ট্ এগুলিকে 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার স্ববিরোধ'[৩] আখ্যা দিয়াছেন। কাণ্ট্ এই রকম চারটি স্ববিরোধ দেখাইয়াছেন, এবং প্রত্যেকটিকে পক্ষ[৪]-প্রতিপক্ষ[৫] বা বাদ[৪]-প্রতিবাদরূপে[৫] ব্যক্ত করিয়াছেন। বাদী স্বমত পোষণের যে রকম যুক্তি দেখাইতে পারে, প্রতিবাদীও নিজের মত সেই রকম যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিতে পারে। শুধু বিচারের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উভয় যুক্তিই অকাট্য বলিয়া মনে হইবে। কাণ্টের মতে তাঁহার দর্শিত পন্থা ছাড়া এই স্ববিরোধ হইতে মানববুদ্ধির মুক্তি পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। প্রথমে বিরোধগুলি কি প্রকার তাহাই দেখা যাউক।

প্রথম বিরোধ

বাদ:—জগৎ সাদি ও সান্ত, অর্থাৎ জগৎ কোন কালে আরম্ভ হইয়াছে এবং কোথাও তার সীমা আছে। জগৎ যদি অনাদি হইত, তাহা হইলে এইক্ষণে পৌঁছিতে অনন্তকাল লাগিয়া যাইত, অর্থাৎ এইক্ষণে পৌঁছিতেই পারা যাইত না। দেশের বেলাও এই রকম যুক্তি প্রযোজ্য। অসীম জগৎ

১। Transcendent
২। Idea of Reason
৩। The Antinomies of Pure Reason
৪। Thesis
৫। Anti-thesis

অসীম দৈশিক ভাগের সংযোজনেই[1] সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু অসীমের সংযোজনে যে সমগ্রের উৎপন্ন হওয়া উচিত, সে সমগ্র কখনই পাওয়া যাইবে না, কেননা অসীম সংযোজন কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব জগৎ অনাদিও নয়, অসীমও নয়।

প্রতিবাদ :—জগৎ অনাদি ও অসীম; অর্থাৎ কোন কালে জগৎ আরম্ভ হয় নাই, এবং দেশেও তাহার কোন সীমা বা অবধি নাই। যদি জগৎ সাদি ও সসীম হয়, তাহা হইলে জগতের আগেও কাল, এবং বাহিরেও দেশ আছে বলিতে হয়। এই পূর্ববর্তী কাল এবং বহিঃস্থ দেশের সম্পর্কেই জগৎকে সাদি ও সসীম বলিতে পার যায়। দেখা যাইতেছে, জগতের সাদিত্ব ও সসীমত্বের জন্য এই বস্তুশূন্য কাল ও দেশের সহিত জগতের সম্বন্ধ অত্যাবশ্যক। কিন্তু যে কালে বা দেশে কিছুই নাই, সে কাল বা দেশের সঙ্গে কি করিয়া, কি সম্বন্ধ সম্ভবপর হইবে? অতএব জগৎ সাদিও নয়, সসীমও নয়।

দ্বিতীয় বিরোধ

বাদ :—জগতের যাবতীয় মিশ্রবস্তু (অবয়বী) অবিমিশ্র, শুদ্ধ বা অবিভাজ্য[2] অংশ (অবয়ব) সমূহের মিলনেই উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ মিশ্রবস্তু ভাগ করিতে করিতে এমন অবিভাজ্য অংশসমূহে পৌছা যায়, যাহাদের আর ভাগ করিতে পারা যায় না। এই নিরংশ নিরবয়ব অণুই জগতের মূল উপাদান। তাহা যদি না হইত, অবিভাজ্য নিরংশ অণু যদি জগতের মূলে না থাকিত, তাহা হইলে সব বস্তুকেই অনবরত ভাগ করিয়াই যাইতে পারা যাইত। এমতাবস্থায় বলিতে হয়, অন্ত্যাবয়ব বলিয়া কিছু নাই, সবই অবয়বী। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাস্তবিক সম্বন্ধী বলিয়া কিছু নাই, সম্বন্ধই আছে। অবয়বের সম্বন্ধেই অবয়বী গঠিত হয়; অন্ত্যাবয়ব না থাকিলে ত আমাদের শূন্যাকারে পৌছিতে হয়। ঠিক আমরা যদিও ভাগ করিতে করিতে শূন্যে না পৌছিতে পারি, তথাপি ভাগক্রিয়া কোথাও থামাইতে না পারিলে, অন্তে কিছুই নাই বলিয়া আমাদের ভাবিতে হয়। শূন্যাকার হইতে, কিংবা সম্বন্ধিহীন সম্বন্ধের দ্বারা, জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে, অবিভাজ্য নিরংশ বস্তুই জগতের অন্তিম উপাদান।

১। Synthesis ২। Simple

প্রতিবাদ :—জগতে অবিভাজ্য নিরংশ[1] কিছু কোথাও নাই। যদি নিরংশ কিছু মানা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, দেশকে ভাগ করিতে আমরা এমন এক দেশভাগে পৌঁছিব, যাহাকে আর ভাগ করা যাইবে না। কিন্তু নিরংশ ভাগ ত কোন এক (যতই ছোট হউক না কেন) দেশ ব্যাপিয়া থাকিবে ; তাহাকে ভাগ করিতে না পারা আর তাহাদ্বারা ব্যাপ্ত দেশকে ভাগ করিতে না পারা একই কথা। কিন্তু আমরা জানি দেশ বা কালের ক্ষুদ্রতম ভাগ বলিয়া কিছু নাই। কোন দেশখণ্ড যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর খণ্ডও হইতে পারিবে ; অর্থাৎ দেশকে অনবরতই ভাগ করিতে পারা যায়। নিরংশ কোন বস্তু মানিলে এই সিদ্ধান্তের (দেশের অনন্ত ভাজ্যতার) বিরুদ্ধে যাইতে হয়। সুতরাং বলিতে হয়, জগতের সব কিছুই সাংশ[2] সব কিছুই ভাগ করিতে পারা যায়।

তৃতীয় বিরোধ

বাদ :—জাগতিক ঘটনাবলীর উপপত্তির জন্য শুধু প্রাকৃতিক কার্যকারণ-ভাব মানিলেই চলিবে না ; স্বতন্ত্র কারণও মানিতে হয়। শুধু প্রাকৃতিক কার্যকারণভাব[3] মানিলে এই বলিতে হয় যে প্রত্যেক অবস্থারই কারণ আছে। এখন যে কার্যাবস্থা দেখিতেছি তাহার কারণস্বরূপ পূর্ববর্তী এক অবস্থা আছে ; কিন্তু সেই অবস্থাও নিষ্কারণ নয় ; তাহারও কারণ আছে ; সেই অবস্থাও তৎপূর্ববর্তী অবস্থা দ্বারা তন্ত্রিত। সুতরাং কারণেরও কারণ খুঁজিতে হয়। এরকম করিয়া ত কারণপরম্পরার কোথাও শেষ হইবে না এবং কোন কার্যেরই যথেষ্ট পর্যাপ্ত কারণ পাওয়া যাইবে না। অতএব কার্য-কারণ নিয়মের খাতিরেই আমাদের এমন এক কারণ আবশ্যক, যাহার আর অন্য কারণ নাই, বা যাহা অন্যের দ্বারা তন্ত্রিত নয়। তাহাকেই স্বতন্ত্রকারণ[4] বলা যাইতেছে।

প্রতিবাদ :—স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া কিছু নাই। যদি স্বতন্ত্র কারণ মানা যায়, তাহা হইলে ইহাই বলা যায় যে, কারণ কিছু দ্বারা প্রণোদিত বা তন্ত্রিত না হইয়াই নিজের কার্য উৎপাদন করে ; অর্থাৎ কারণের কার্যোৎপাদনরূপ কার্যের কোন কারণ নাই। সব কার্যেরই কারণ আছে, ইহাই কার্যকারণ

১। Simple
২। Complex
৩। Natural causality
৪। Free cause

নিয়মের মূলসূত্র। স্বতন্ত্র কারণ মানিলে এই নিয়মের ভঙ্গ হয়; কেননা (স্বতন্ত্র) কারণের কার্যোৎপাদনরূপ কার্যের আর কোন কারণ নাই বলিয়া মানিতে হয়। অতএব উক্ত সার্বত্রিক নিয়মের অনুরোধেই বলিতে হয় যে, স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া কিছু নাই।

চতুর্থ বিরোধ

বাদ :—জগতের অংশরূপে অথবা কারণরূপে এক (অতন্ত্রিত) একান্ত অবশ্যম্ভব সত্তা[১] আছে। দৃশ্য জগৎ কালেই বর্তমান; ইহা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এখনকার অবস্থা পূর্ববর্তী মুহূর্তে ছিল না, এবং পরবর্তী মুহূর্তেও থাকিবে না। বর্তমান অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা দ্বারা নিয়মিত এবং পরবর্তী অবস্থা আবার বর্তমান অবস্থা দ্বারা নিয়মিত। বর্তমান অবস্থার উপপত্তির জন্য পূর্ববর্তী অবস্থা আবশ্যক, কিন্তু পূর্ববর্তী অবস্থা নিজে অন্যের দ্বারা তন্ত্রিত হইলে শুধু তাহার দ্বারাই বর্তমান অবস্থার উপপত্তি হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে জাগতিক ঘটনাবলীর উপপত্তির জন্য এক অতন্ত্রিত সত্তা মানিতে হয়। অতন্ত্রিত বলিয়া ইহাকে একান্ত অবশ্যম্ভব বলা হইয়াছে। যাহা অন্যের দ্বারা তন্ত্রিত, তাহা অন্যের অভাবে থাকিতে পারেনা। কিন্তু যে অতন্ত্রিত, সে স্বয়ংসিদ্ধ, সুতরাং একান্ত অবশ্যম্ভব। পরিবর্তনশীল জাগতিক অবস্থাধারার উপপত্তির জন্য যে অতন্ত্রিতের একান্ত প্রয়োজন, তাহা অবস্থাধারার পূর্বে থাকিলে অবস্থাধারাকে তন্ত্রিত করিতে পারিবে এবং তাহা দ্বারা অবস্থাধারার উপপত্তি হইতে পারিবে। কিন্তু পূর্বে থাকার অর্থ কালে থাকা; এবং যাহা কালে থাকে তাহাকে জগতের অন্তর্গত বলিয়াই বুঝিতে হয়।

প্রতিবাদ :—জগতের বাহিরে বা ভিতরে কারণরূপে কোন অবশ্যম্ভব সত্তা নাই। প্রথমে ধরা যাউক, অতন্ত্রিত অবশ্যম্ভব সত্তা জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। এরকমস্থলে পরিবর্তনশীল অবস্থাধারার প্রথম অবস্থাকে অতন্ত্রিত বলিয়া ভাবিতে পারা যায় এবং তাহা দ্বারাই পরবর্তী সব অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে মনে করিতে হয়; অথবা ইহাও মনে করিতে পারা যায় যে, জগতের প্রত্যেক অবস্থাই অবস্থান্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও অবস্থারাশির সমুদায় অন্য কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অতএব সমুদায়কে অতন্ত্রিত বলিতে পারা যায়; অর্থাৎ প্রত্যেক অবস্থাই

১। A being that is absolutely necessary.

অনিশ্চিত[1] বা অনবশ্যম্ভব হইলেও তাহাদের সমুদায় অবশ্যম্ভব। এই দুই বিকল্পই গ্রাহ্য নহে। প্রথম বিকল্পে বলা হইয়াছে, জগতের এক অবস্থা (প্রথমাবস্থা) কালিক হইলেও অন্য কিছুর দ্বারা তন্ত্রিত নয়। কিন্তু কালিক এই রকম কিছু হইতে পারে না, কেননা যাহা কিছু কালিক, তাহাই তন্ত্রিত, ইহাই নিয়ম। দ্বিতীয় বিকল্পে স্ববিরোধ রহিয়াছে। প্রত্যেক অংশ অনবশ্যম্ভব, অথচ সমুদয় অবশ্যম্ভব, এই রকম হইতে পারে না; কেননা 'প্রত্যেকের' সমষ্টিই ত সমুদায় এবং প্রত্যেক যদি অনবশ্যম্ভব হয়, তাহা হইলে সমুদায়ও অনবশ্যম্ভব না হইয়া পারিবে না।

এখন ধরা যাউক, অতন্ত্রিত অবশ্যম্ভব সত্তা জগতের বাহিরে রহিয়াছে। এই অবশ্যম্ভব সত্তা যখন জাগতিক সব পরিবর্তনের কারণ, তখন তাহাকেই এই পরিবর্তনশীল অবস্থাধারা আরম্ভ করিতে হইবে। কালিক ক্রিয়া দ্বারাই কালিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে, এবং কালিক ক্রিয়া করিতে গিয়া অবশ্যম্ভব সত্তাকেও কালান্তঃপাতী হইতে হইবে। কালান্তঃপাতী হওয়ার অর্থ জগতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। একথা আমাদের অভ্যুপগমের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইল। অতএব দেখা যাইতেছে জগতের বাহিরে বা ভিতরে কোন অবশ্যম্ভব সত্তা নাই। (এই চতুর্থ বিরোধের যে তৃতীয় বিরোধের সঙ্গে অনেকটা সাম্য রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।)

এই সব বিরোধের সমাধান কি করিয়া হয়? মানববুদ্ধি স্ববিরোধ সহিতে পারে না। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের কথাই যদি সমানভাবে যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, এই বিরোধের সমাধান কখনই হইবে না। কাণ্ট্ উভয়পক্ষের যুক্তিতে কোন ভ্রম না দেখাইয়াই বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। কান্টের মতে এইসব বিরোধের মূলে এক মহা ভুল রহিয়াছে। সেই ভুল এই যে আমরা আবভাসিক সত্তাকে বাস্তব সত্তা বলিয়া মনে করিয়াছি। জগতের যাহা কিছু বিষয়, সবই অবভাস[2] মাত্র, স্বগতসত্তাক বস্তু[3] নয়। অবভাসের সমুদায়কেই আমরা জগৎ বলি। এই সমুদায় যদি বাস্তব হইত, তাহা হইলে হয় সান্ত নয় অনন্ত হইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যাউক সমুদায়টি কিরূপ পদার্থ।

১। Contingent ২। Appearance ৩। Things in themselves

আবভাসিক সমুদায়কে জগৎ বলা হইয়াছে। অবভাস ত তাহাকেই বলা যায়, যাহা আমাদের অনুভবে বা জ্ঞানে ভাসে। কিন্তু এই অবভাসের সমুদায়কে কি আমরা কখনও জ্ঞানে বা অনুভবে পাই? আমাদের আবভাসিক জ্ঞান ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে পারে, কিন্তু কোথাও শেষ বা সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং অবভাসের সমুদায়ই আদৌ আত্মলাভ করিতে পারে না। সমুদায়ই যখন পাওয়া যায় না, তখন সমুদায় সান্ত বা অনন্ত, একথার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং প্রথম দুই বিরোধে উভয়পক্ষের কথাই ভ্রমাত্মক বুঝিতে হইবে।

জগৎ বলিতে যদি আমাদের অনুভব যতদূর যায়, তাহাকে বোঝা যায়, তাহা হইলে জগৎকে উপরের বা নীচের দিকে সান্ত বলিতে পারা যায় না, কেননা আমাদের অনুভব ত কোন দিকেই শেষ বা সম্পূর্ণ হইতেছে না। জগৎ উপরের দিকে সান্ত নয়, ইহার অর্থ, বিশালতার দিকে যাইতে যাইতে কখনই জগতের শেষ সীমায় পৌছান যায় না। নীচের দিকেও জগৎ সান্ত নয়, ইহার অর্থ, ক্ষুদ্রতার দিকে যাইতে যাইতেও ক্ষুদ্রতম অংশ আমরা পাই না। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবরূপে[১] জগৎকে অনন্ত বলিতে পারা যায় না, কেননা ঐ রকম অনন্ত কিছু ত আমাদের অনুভব বা জ্ঞানের বিষয়ই হয় না।

শেষের দুই বিরোধের প্রকৃতি কিছু ভিন্ন। বিজ্ঞানের জগতে প্রতিবাদী যে কথা বলিয়াছে, তাহাই খাটে। বিজ্ঞান যে সব বিষয়ে পর্যালোচনা করে তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র কারণ বা অবশ্যম্ভব সত্তা পাওয়া যায় না। আবভাসিক জগতে অতন্ত্রিত স্বতন্ত্র কারণ বা অবশ্যম্ভব সত্তা বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু আবভাসিক সত্তাই যাবতীয় সত্তা নয়। অবভাসের মূলে স্বগতসত্তাক কিছু না মানিলে ত অবভাসের অর্থই বোধগম্য হয় না। সুতরাং জাগতিক অবভাসের মূলে এক বাস্তব পারমার্থিক সত্তার[২] কথা ভাবিতে আমরা বাধ্য হই। বুদ্ধিমাত্রগম্য সেই অতীন্দ্রিয় জগতে এই আবভাসিক জগতের নিয়মই যে খাটিবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। আবভাসিক জগতে স্বাতন্ত্র্য[৩] বা নিরপেক্ষ সত্তা বলিয়া কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতে যে ঐ রকম কিছু নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন কার্যকারণ ভাব বা কেবল পারতন্ত্র্য আবভাসিক

১। Positively ২। Noumenon ৩। Freedom

জগতের নিয়ম হইলেও অর্থাৎ দৃশ্যজগতে যাহা কিছু আছে বা ঘটে, তাহাই অন্য কিছুর কার্য বা অন্যের দ্বারা তন্ত্রিত হইলেও, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে স্বতন্ত্রকারণতাই[১] নিয়ম হইতে পারে। সেখানে অন্যের দ্বারা নিয়মিত বা তন্ত্রিত না হইয়াই কারণ স্বাধীন স্বতন্ত্রভাবে কার্যোৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে। আমাদের আত্মাকে এই রকম পারমার্থিক জগতের অন্তর্বর্তী স্বতন্ত্রকর্তা বা কারণ বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে শেষোক্ত দুই বিরোধে বাদী প্রতিবাদী উভয়ের কথাই সত্য হইতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয় দৃশ্যজগতে প্রতিবাদীর কথাই সত্য; নীতি ও ধর্মজ্ঞানের বিষয় অতীন্দ্রিয় জগতে বাদীর কথা সত্য হইতে পারে। নৈতিক বিচারের দ্বারা যদি আমরা অতীন্দ্রিয় স্বতন্ত্র কিছু মানিতে বাধ্য হই, তবে কোন বৈজ্ঞানিক বিচারের সাহায্যে তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। অবশ্য বৈজ্ঞানিক বিচারের দ্বারা তাহা যে সত্য তাহাও প্রমাণিত করা যাইবে না।

এখন যৌক্তিক ধর্ম-(ঈশ্বর)-বিজ্ঞানের[২] বিষয় সম্বন্ধেই বিচার করা যাউক। তত্ত্ববিজ্ঞানের সব বিষয়ই আমাদের প্রজ্ঞাপ্রসূত প্রকল্পনা[৩] হইতে উদ্ভূত। তত্ত্ববিজ্ঞানের অঙ্গ ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যাবতীয় অবভাসের এক অতন্ত্রিত সমঞ্জস সমুদায়ের কল্পনার উপরই ধর্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাবতীয় জ্ঞান-প্রচেষ্টার মূলেই সমস্ত দৃশ্যপদার্থের মধ্যে এক ঐক্য দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। সমস্ত পদার্থের মধ্যে কোথাও কোন বাস্তব বিরোধ নাই, সব পদার্থই একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—এই ধারণাতেই আমাদের সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানব্যাপার চালিত হইয়া থাকে। ধর্মবিজ্ঞান এই সর্বসমঞ্জস সমুদায় বা তার মূলতত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণেরই প্রয়াসী।

এখানে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে এই অতন্ত্রিত সর্বসমঞ্জস সমুদায়ের প্রকল্পনা আমাদের জ্ঞানব্যাপারের দিগ্‌দর্শন করে মাত্র, বাস্তব কোন বিষয়ের জ্ঞান দেয় না। জ্ঞানের দিগ্‌দর্শন হিসাবে এই প্রকল্পনার মূল্য যথেষ্ট আছে। এই প্রকল্পনার বশে আমাদের গবেষণা পরিচালিত হইলে আমরা অনেককিছু জানিতে পারি; অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার

১। Free Causality ২। Rational Theology ৩। Ideas of Reason

করিতে পারি। কিন্তু ধর্মবিজ্ঞান এই প্রকল্পনাকে আমাদের জ্ঞানের দিগ্‌দর্শক হিসাবে না ধরিয়া, বিষয়ের নির্দেশক বলিয়া ধরিয়া নেয়। অতঃপর এই বিষয়কে আছে মনে করিয়া, তাহাতে ব্যক্তিত্বের আরোপ করতঃ ঈশ্বরাস্তিত্বের কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে কিছুটা কাল্পনিক, সে ধারণা যেন একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তাই ঈশ্বরাস্তিত্বের কয়েকটা যৌক্তিক প্রমাণও ধর্মবিজ্ঞান দিতে চেষ্টা করে। এইসব প্রমাণকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। তিন রকম যুক্তির দ্বারা দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন; প্রথম তাত্ত্বিকযুক্তি[১], দ্বিতীয় জগৎকর্তৃত্বের যুক্তি[২], তৃতীয় রচনাবৈচিত্র্যের বা সোদ্দেশ্য রচনার যুক্তি[৩]।

তাত্ত্বিক যুক্তিটি এই রকম:—ঈশ্বর বলিতে আমরা এক পূর্ণ[৪] ও সত্তম[৫] বস্তু বুঝিয়া থাকি। পূর্ণ বলিতে এই বোঝা যায় যে, তাহাতে কোন অভাব বা দোষ নাই। ঈশ্বরকে সত্তম বলিলে বুঝিতে হয় সব চেয়ে অধিক বা শ্রেষ্ঠ সত্তা ঈশ্বরেই আছে। পূর্ণত্ব বা সবচেয়ে অধিক সত্তা যখন ঈশ্বরের প্রকল্পনাতে পাই, তখন আমাদের বাধ্য হইয়া ভাবিতে হয়, যে ঈশ্বর আছেন; কেননা ঈশ্বরের আর সব গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে সর্বাংশে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। অস্তিত্ব না থাকিলে ঈশ্বরকে সৎ-তম বলা যায় না, কেননা যাহার অস্তিত্ব আছে, সেইত অধিক সত্তাবান্। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরকে যখন পূর্ণ ও সত্তম বলিয়া ভাবি, তখন 'তিনি আছেন' বলিয়াও আমাদের ভাবিতে হয়।

জগৎ-কর্তৃত্বের যুক্তিতে যাহা বলা হয়, তাহার আভাস আমরা বিশ্ববিজ্ঞানের চতুর্থ বিরোধে অনেকটা পাইয়াছি। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে জগৎব্যাপারের কর্তা কেহ আছেন। জগতের যাহা কিছু জানি, তাহাই তন্ত্রিত ও অনবশ্যম্ভব[৬]; ইহার কারণরূপে এক অতন্ত্রিত অবশ্যম্ভব সত্তা আবশ্যক। সেই সত্তাই ঈশ্বর।

১। Ontological Argument
২। Cosmological Argument
৩। Teleological Argument
৪। Perfect
৫। Ens realissimum
৬। Contingent

রচনাকৌশলের বা সোদ্দেশ্য রচনার যুক্তি এইরূপ:—জগতে এমন অনেককিছু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বুদ্ধিপূর্বকারী কর্তা ব্যতিরেকে কখনই সম্ভবপর হইত না। মনুষ্যদেহ কিংবা যে কোন উদ্ভিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিলে সহজেই দেখা যায়, কি অদ্ভুত কৌশলে তাহা রচিত হইয়াছে। প্রত্যেক করণকে তাহার কার্যের উপযোগী করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিশেষ করণ বিশেষ স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এরকম রচনাকে সোদ্দেশ্য[১] রচনা বলা যায়। সামান্য ঘটিকাযন্ত্রের রচনাকৌশল হইতে যেমন বুদ্ধিমান কুশল শিল্পীর অনুমান করা যায়, তেমনই বিশ্বের অনেক পদার্থের (মনুষ্য দেহাদি) অপরূপ রচনাকৌশল হইতে অদ্ভুতবুদ্ধিসম্পন্ন স্রষ্টার অনুমান আমরা করিতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি, এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতিরেকে এই বিশ্বের রচনা সম্ভবপর হইত না।

কাণ্ট্ এইসব যুক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কোনটাই তার বিষয়সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রথমতঃ তাত্ত্বিকযুক্তির কথাই দেখা যাউক। এই যুক্তিতে পূর্ণ সত্তম পদার্থের প্রকল্পনা হইতে তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, বলা হইয়াছে। কাণ্ট্ বলেন, পূর্ণ সত্তমের কল্পনা করিতে গেলে তাহাকে আছে বলিয়াও ভাবিতে হয় বটে, কিন্তু আছে বলিয়া ভাবিলেই যে সে বস্তু থাকিবে, তার কোন প্রমাণ নাই। আমার পকেটে তিনশ' টাকা আছে ভাবিলেই কি তাহাতে তিনশ' টাকা বাস্তবিক থাকিবে? আমাদের ভাবার উপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। তাত্ত্বিক যুক্তির ভিত্তিই ভ্রমাত্মক। তাহাতে এই বলা হইয়াছে যে, যদি পূর্ণ সত্তম বস্তুকে আছে বলিয়া না ভাবি, তাহা হইলে আমাদের পূর্ণ সত্তমের প্রকল্পনাতে অপূর্ণতা বা অল্পতা আসিয়া যাইবে। ইহার অর্থ এই হয়, কোন কিছুকে আছে বলিয়া ভাবিলে তাহার কল্পনাতে কিছু আধিক্য হয়। কাণ্ট্ বলেন, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমরা যখন শুধু তিনশ' টাকার কথা ভাবি, আর যখন তিনশ' টাকা আছে বলিয়া ভাবি, তখন আমাদের ভাবার বিষয়ের (তিনশ' টাকার) মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য বুঝিতে পারি না। শুধু অস্তিত্ববিধানের দ্বারা কোন বস্তুর প্রকল্পনাতে আমরা কোন প্রকারের অতিশয় বা আধিক্য আনিয়া দিতে

১। Purposeful, Teleological

পারি না। আছে বলাতেই যদি বিষয়ের মধ্যে কিছু আধিক্য আসিত, তাহা হইলে কখনই এই রকম কথা বলিতে পারা যাইত না যে, 'এ বিষয়টি আমরা যেমন ভাবিয়াছিলাম, তেমনই আছে'; কেননা 'আছে' বলাতেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আধিক্য আসিয়া যাইত, এবং বিষয়টি যেমন ভাবিয়াছিলাম, তেমন আর থাকিত না। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায়, 'আছে' বলা বা না বলাতে (ভাবাতে) কোন প্রকল্পনাতে কোন প্রকারের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পূর্ণ সত্তমের প্রকল্পনা করিলেই যে তাহাতে কোন প্রকার অল্পতা ঘটিবার আশঙ্কায় তাহাকে (পূর্ণকে) আছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, ইহার বাস্তবিক কোন কারণ নাই; কেননা 'আছে' বলা বা না বলাতে কোন প্রকল্পনারই হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

জগৎকর্তৃত্বের যুক্তিও বিচারসহ নহে। জগতের কর্তা বা কারণরূপে ঈশ্বরকে জানিতে হইলে জগতের বাহিরেও কার্যকারণ সম্বন্ধের আরোপ করিতে হয়।' জগতের কর্তা ঈশ্বর ত জগতের অন্তর্গত নন। কারণরূপে ঈশ্বরকে পাইতে হইলে বলিতে হয় জগতের বাহিরেও কার্যকারণ সম্বন্ধ বর্তমান আছে। কাণ্টের মতে এরকম কথা বলিতে পারা যায় না। তিনি দেখাইয়াছেন, অনুভবগোচর পদার্থেই কার্যকারণ সম্বন্ধ লাগাইতে পারা যায়। জগতের মধ্যেই তাহার প্রামাণ্য সীমাবদ্ধ। যাহার কখনও অনুভব হইতে পারে না, এবং যাহা জগতের বাহিরে, তাহাও যে কারণতা সম্বন্ধে অন্যের সহিত সম্বন্ধ, একথা বলিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। সুতরাং জগতের কারণরূপে ঈশ্বর বলিয়া আমরা কিছু জানিতে পারি না।

জগতের বাহিরে আবার অবশ্যম্ভব কি হইতে পারে? কারণ বিদ্যমান থাকিলেই কার্য অবশ্যম্ভব বলা যায়। কিন্তু যেখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের কোন কথাই নাই, সেখানে অবশ্যম্ভবতার[১] কোন অর্থ নাই।

আর যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, জগতের অনবশ্যম্ভব[২] সবকিছুর মূলভূত এক অবশ্যম্ভব সত্তা আছে, সে সত্তা ও ঈশ্বর যে এক, সে কথা কিরূপে বুঝিব? সুতরাং দেখা যাইতেছে এ যুক্তিকে নির্দোষ বলিয়া মানিলেও তাহা দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। এই যুক্তিকে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণের উপযোগী

১। Necessity ২। Contingent

করিতে হইলে আরও বলিতে হয় যে, তাত্ত্বিকযুক্তিতে যে পূর্ণ সত্তাকে পাওয়া যায় তাহা আর এই যুক্তিলব্ধ অবশ্যম্ভব সত্তা একই পদার্থ। অবশ্যম্ভব-সত্তা বলিয়া কিছু ত আমাদের অনুভবে আসে না। তাহার জন্য আমাদিগকে পূর্বতোবিগ্রহের[১] উপর নির্ভর করতে হয়। আমাদের মানিতে হয় যে পূর্ণ সত্তমের পূর্বতোবোধ আমাদের আছে, এবং একমাত্র এই পূর্ণ সত্তমই এরকম পদার্থ যাহার সত্তা অন্যকিছু হইতে আসে না, যে অন্যের উপর নির্ভর করে না, যে স্বয়ংসিদ্ধ এবং এই অর্থে অবশ্যম্ভব। কিন্তু এই পূর্ণ সত্তমকে অবশ্যম্ভব বলিয়া আমরা ভাবিলেও, বাস্তবিক তাহা আছে কি না, এই প্রশ্ন উঠিলে, তাহার ভাববাচক উত্তরের জন্য আমাদিগকে তাত্ত্বিক যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, জগৎকর্তৃত্বের যুক্তি শেষ বিচারে তাত্ত্বিকযুক্তিতেই পর্যবসিত হয় বা তাত্ত্বিক যুক্তির উপরই নির্ভর করে। আর তাত্ত্বিক যুক্তির অসারতা যখন আগেই প্রমাণিত হইয়াছে, তখন এই যুক্তিকে বিচারসহ বলা যায় না।

রচনাকৌশলের যুক্তিকেও কাণ্ট্ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। সাধারণের মনের উপর এই যুক্তি যে খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে সেই কথা কাণ্ট্ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন এই যুক্তিও তাহার বিষয়সিদ্ধির ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণের) পক্ষে যথেষ্ট নয়। মূলে এই যুক্তিও ঈশ্বরকে জগতের রচয়িতা বা কারণ-রূপেই কল্পনা করিয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই যুক্তি বাস্তবিক জগৎকর্তৃত্বের যুক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র। সেই যুক্তিকে অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইলে এই যুক্তিকেও পরিত্যাগ করিতে হয়। তদুপরি ইহার অন্যান্য দোষও আছে।

প্রথমতঃ এই যুক্তি দ্বারা জগতের স্রষ্টা প্রমাণিত হয় না, এক প্রকারের রচয়িতা বা কারিগর মাত্র প্রমাণিত হয়। লৌহাদি ধাতু দিয়া কোন কারিগর যে রকম ঘড়ি তৈরি করে, কিংবা মৃত্তিকা বা অন্য কোন উপাদান দিয়া মূর্তিকর যেমন কোন সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করে, ঈশ্বরও সেই-রূপ এই সোদ্দেশ্যরচনাময় বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অপার রচনাকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন; এই রকম কল্পনাই এই

১। Apriori concept

যুক্তির মূলে রহিয়াছে। ঘড়িনির্মাতা লৌহাদি ধাতু নিজে সৃষ্টি করে না, বাহির হইতে পায়। মূর্তিকর মৃত্তিকার সৃষ্টি করে না, তথাপি মৃত্তিকার উপর তাহার রচনাকৌশল ব্যক্ত করিতে পারে। রচনা-কৌশলের যুক্তিতে যে ঈশ্বর পাই, সে ঈশ্বর এরকম কারিগর বিশেষ। তিনি জগত্পাদানের স্রষ্টা না হইলেও চলে; আপনা হইতেই বাহিরে যে উপাদান আছে, তাহার দ্বারাই এই জগৎ রচনা করিয়া থাকিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ এই জগৎ রচনাতে যদিও বিধাতার অসাধারণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি তাঁহাকে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ বলা যায় না। খুব বেশী শক্তি ও খুব বেশী জ্ঞান ও বুদ্ধি নিশ্চয়ই জগৎরচনার জন্য আবশ্যক; কিন্তু যাহার খুব বেশী শক্তি আছে, তাহাকে সর্বশক্তিমান্ বা যাহার খুব বেশী জ্ঞান আছে তাহাকে সর্বজ্ঞ বলা যায় না। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান আছে বলিয়া আমরা মনে করি; কিন্তু অত্যধিক ও অনন্ত এক কথা নয়। ফল কথা, ঈশ্বর বলিতে আমরা ঠিক যাহা বুঝি, তাহা রচনাকৌশলের যুক্তিতে সিদ্ধ হয় না।

তবে কি কাণ্ট্ বলিতে চান, ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই? মোটেই নয়। কাণ্ট্ নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শুধু বলিতে চান, কোনপ্রকার বৌদ্ধিকযুক্তির সাহায্যে ঈশ্বর আছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু আছেন বলিয়া না জানিলেই যে তাঁহাকে নাই বলিয়া জানিলাম, একথা বলা যায় না। শুধু তর্কযুক্তি দ্বারা বিচারের সাহায্যে ঈশ্বর আছেন কিংবা নাই বলিয়া সপ্রমাণ করিবার সামর্থ্য মানব বুদ্ধির নাই ইহাই কাণ্টের বক্তব্য।

যৌক্তিক মনো-(আত্ম)-বিজ্ঞান, যৌক্তিক বিশ্ববিজ্ঞান ও যৌক্তিক ধর্ম-(ঈশ্বর)-বিজ্ঞান, যথাক্রমে আত্মা, বিশ্ব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে চায়। কাণ্ট্ দেখাইলেন যে ঐসব বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা আমা-দের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যৌক্তিক মনোবিজ্ঞানাদি তত্ত্ববিজ্ঞানেরই ভাগ। সুতরাং বুঝিতে হইবে, তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানের অর্থে কোন জ্ঞানই লাভ হয় না; বিজ্ঞানরূপে তত্ত্ববিজ্ঞান সম্ভবপরই নহে। অথচ কাণ্ট্ দেখাইয়াছেন যে, তত্ত্ববিজ্ঞানের দিকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা রহিয়াছে। স্বভাবতঃই মানুষ আত্মা, বিশ্ব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে

জানিতে চায়। মানুষের প্রজ্ঞা হইতে অতন্দ্রিতের প্রকল্পনা উঠিয়া থাকে, এবং অতন্দ্রিতকেই মানুষ অন্তরে (আত্মারূপে), বাহিরে (বিশ্বরূপে) ও সর্বত্র (ঈশ্বররূপে) জানিতে চায়। অতন্দ্রিতের প্রকল্পনা মানবীয় প্রজ্ঞার অসুস্থতার লক্ষণ নয়, স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায়ই এই প্রকল্পনা আমাদের মনে ভাসিয়া থাকে। মানুষের জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক অবস্থা হইতে প্রকল্পনার উদ্ভব, তাহা দ্বারা চালিত হইয়া আমরা শুধু ভ্রমেই পতিত হইব, এমন কখন হইতে পারে না। কাণ্ট্ বলেন, এই প্রকল্পনা আমাদের জ্ঞানরাজ্যেও অনেকভাবে সুফলপ্রসূ; ইহার যথাযথ ব্যবহার না করাতেই আমরা নানা ভ্রমে পতিত হই।

আমরা দেখিয়াছি, মানুষের জ্ঞানশক্তি কাণ্ট্ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; তাহাদিগকে সংবেদনা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। সংবেদনশক্তির বলেই আমাদের রূপরসাদির অনুভব হইয়া থাকে। বুদ্ধি হইতে বৌদ্ধিক প্রকার পাইয়া থাকি। সংবেদন হইতে আমরা যাহা পাই, তাহার উপর বৌদ্ধিক প্রকার প্রযুক্ত হইলেই আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। বৌদ্ধিক প্রকারের আর কোন উপযোগ[১] নাই। সংবেদনজন্য অনুভবকে একীকৃত বা সংশ্লেষিত করিয়া বিষয়ে পরিণত করাই বুদ্ধির কাজ। অনুভবের সঙ্গে বুদ্ধির যে সম্বন্ধ, বুদ্ধির সঙ্গে প্রজ্ঞারও সেই সম্বন্ধ। সংবেদন বা অনুভব হইতে যাহা পাই, তাহার একীকরণ যেমন বৌদ্ধিক প্রকারের কাজ, আমাদের বৌদ্ধিক জ্ঞানের একীকরণ বা সমন্বয়ও তেমনি প্রজ্ঞাজন্য প্রকল্পনার কাজ। আমাদের সাধারণ প্রাকৃত জ্ঞান অনুভব ও বুদ্ধির সাহায্যেই হইয়া থাকে। ঘটপটাদি জানিবার জন্য প্রকল্পনার প্রয়োগ করিতে হয় না। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহার সুসম্বদ্ধ সমন্বয় প্রকল্পনার সাহায্যে হইতে পারে। বিশেষতঃ জ্ঞানব্যাপারে বুদ্ধি প্রকল্পনা দ্বারা চালিত ও প্রকল্পনা হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত হইলে আপনার কাজ সমধিক সুচারুরূপে করিতে পারে।

অতন্দ্রিতের প্রকল্পনা প্রজ্ঞা হইতেই আসে, অন্য কোথা হইতে এ ধারণা আমরা লাভ করিতে পারি না। এই অতন্দ্রিতই ক্ষেত্রভেদে আত্মা, বিশ্ব ও

১। Use

ঈশ্বররূপে প্রকল্পিত হইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে আমরা আন্তরানুভব ও বুদ্ধির সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা আত্মার প্রকল্পনা দ্বারা সুসম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারি। আমাদের যাবতীয় মানসিক ঘটনাকে একই আত্মার ব্যাপাররূপে ভাবিলে যেরকম সুসম্বদ্ধভাবে বুঝিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায়ে সেরকম বুঝিতে পারা যায় না। বিশ্বের বেলাও এই রকম। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে নানাবিধ বিজ্ঞানে যাহা জানি, তাহা একই জগৎ সম্বন্ধে জানিতেছি, বলিয়া আমরা মনে করি। এক জগতের প্রকল্পনা দ্বারা আমরা আমাদের যাবতীয় জাগতিক জ্ঞানকে সুসঙ্গতভাবে সুসম্বদ্ধ করিবার চেষ্টা করি, যাবতীয় জ্ঞানের ঐক্য বিধানে প্রয়াস পাই। এক জগৎ বা জাগতিক সমগ্রতা আমাদের কোন জ্ঞানের বিষয় নয়, আমাদের জ্ঞানরাশির ঐক্য-বিধায়ক প্রকল্পনা মাত্র।

সমস্ত বিশ্বকে এক অনন্ত বুদ্ধিমান স্রষ্টার রচনা বলিয়া ভাবিলে আমরা বিশ্বের মাঝে ক্রম, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য যেরকমভাবে বুঝিতে ও খুঁজিতে পারি, অন্য কোন উপায়ে সেরকম পারি না। স্রষ্টার সোদ্দেশ্য রচনার পরিচয় সর্বত্রই পাওয়া যায়, এই ধারণা নিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা অনেককিছু নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে ও জানিতে সমর্থ হই। সব ক্ষেত্রেই বুঝিতে হইবে, প্রজ্ঞাজন্য প্রকল্পনা আমাদের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের ঐক্যবিধায়ক বা সঙ্গতিবিধায়ক; প্রকল্পনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বুদ্ধি আপনার কাজ সমধিক প্রকৃষ্টরূপে করিতে পারে বটে; কিন্তু তাই বলিয়া প্রকল্পনা কোন জ্ঞেয় বিষয়ের নিরূপক হয় না, জ্ঞানেরই শুধু দিগ্‌দর্শক[১] মাত্র। বৌদ্ধিক-প্রকার কিন্তু বিষয়েরই অঙ্গীভূত[২]; বিষয়কেই আমরা দ্রব্যগুণ বা কার্যকারণ-রূপে জানিয়া থাকি। কিন্তু আত্মা, সমগ্র বিশ্ব বা ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু কখনই আমাদের জ্ঞানে বিষয়রূপে ভাসে না। এই সব প্রকল্পনা দ্বারা আমাদের জ্ঞানের আদর্শ[৩] মাত্র নিরূপিত হয়। আমরা জ্ঞানে সর্বদা অতন্ত্রিতকেই খুঁজি; অতন্ত্রিতকে ধরিতে পারা, উপলব্ধি করিতে পারাই মানবীয় জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মানবের জ্ঞানব্যাপার যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে ও চলিবে। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সসীম, সান্ত তন্ত্রিতকেই ধরিতে পারি। অতন্ত্রিত অসীম অনন্ত

১। Regulative ২। Constitutive ৩। Ideal

আমাদের জ্ঞানে কখনই বিষয়রূপে আসে না ও আসিতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের আদর্শ অসীম অতন্ত্রিত হওয়াতে আমাদের জ্ঞানব্যাপার অনন্তকাল চলিতে থাকিবে। আমরা আদর্শের দিকে, সমস্ত জ্ঞানের ঐক্যের দিকে, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি ও আরও হইব বটে, কিন্তু কখনই আদর্শে পৌছিতে পারিব না। এ রকম উচ্চ আদর্শ থাকাতেই মানুষের জ্ঞানচেষ্টা আবহমানকাল সজীব হইয়া থাকিবে।

দেখা যাইতেছে, প্রজ্ঞাজন্য অতন্ত্রিতের প্রকল্পনাকে যখন আমাদের জ্ঞানের আদর্শ ও দিগ্‌দর্শনরূপে আমরা বুঝি, তখন তাহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে ও হইয়া থাকে; কিন্তু যখন তাহাকে জ্ঞেয় বিষয়রূপে ভাবি, তখনই আমরা নানা ভ্রমে পতিত হই। অনন্ত জ্ঞানে সমাধেয় এক বিপুল সমস্যা যেন অতন্ত্রিতের প্রকল্পনাতে মানব বুদ্ধির কাছে অর্পিত হইয়াছে। এই প্রকল্পনাকে আমাদের জ্ঞানীয় কোন প্রশ্নের সমাধানরূপে গ্রহণ করিলেই নানা অনর্থের উৎপত্তি হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে বা সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে যে সব প্রশ্নের উদয় হয়, সে সব প্রশ্নের সমাধান অনুভবগম্য পদার্থের নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারাই করিতে হইবে। অতীন্দ্রিয় অতন্ত্রিতের প্রকল্পনা দ্বারা—সে প্রকল্পনা আত্মারই হউক, বা ঈশ্বরেরই হউক—তাহাদের সমাধান করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র; কেননা যে পদার্থ জানিতে পারা যায় না, তাহা দ্বারা কোন জ্ঞানীয় প্রশ্নের সমাধান হয় না। তবে প্রকল্পনা হইতে আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি উত্তেজনা পাইতে পারে এবং তাহার ফলে আমাদের জ্ঞানও যথেষ্ট প্রসারলাভ করিতে পারে।

নবম অধ্যায়

নীতি বিচার

এযাবৎ শুধু জ্ঞানের বিচারই হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানই মানুষের একমাত্র ধর্ম বা ক্রিয়া নয়। মানুষকে আমরা শুধু জ্ঞাতা বলিয়াই জানি না; মানুষ জড়জগতেরও জীব বটে। প্রাকৃত দেহে আবদ্ধ মানুষ প্রকৃতি হইতেই তাহার জীবনের উপকরণ আহরণ করে। শুধু তাহাই নহে; অন্যান্য দেহধারী মানুষের সঙ্গেও তাহার নিত্য কারবার করিতে হয়। তাহার ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সে অন্যের সুখদুঃখের কারণীভূত হয়; অন্যেরাও তেমনি তাহাদের কাজকর্মের দ্বারা তাহার সুখদুঃখের কারণ হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে বলিয়া পরস্পরের সহিত নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে মিলিত না হইয়া পারে না। এই রকম ক্ষেত্রে মানুষ পরস্পরের প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূল-ভাবে কাজকর্ম করিয়া থাকে। মানুষ মানুষের কাছে শুধু জ্ঞানের বিষয় নয়, রাগদ্বেষের বিষয়ও বটে। পরস্পরকে উদাসীনভাবে শুধু জানিয়াই যাইতেছে, এমন নয়; পরস্পরের প্রতি অনুকূল বা প্রতিকূলভাবে প্রবৃত্তও হইয়া থাকে। মানুষকে উদ্দেশ্য করিয়াই মানুষ অনেক কাজ করিয়া থাকে। এই রকম ক্রিয়াকে তাহার ব্যবহার বলা যাইতে পারে। মানুষ সজ্ঞানে, অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া, পরস্পরের প্রতি যাহা করে, তাহাই তাহার ব্যবহার। অন্ততঃ অধিকাংশ সময় এই ব্যবহার অপরের প্রতিই সম্ভবপর; এবং আমাদের ব্যবহারের ফল অপরকেই ভোগ করিতে হয়। আমাদের ব্যবহারে অন্যেরা আনন্দিত কিংবা দুঃখিত হয়। কিন্তু মানুষ কখন কখনও নিজের উদ্দেশ্যেই কোন কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়। আমার নিজের আরামের জন্য আমি বেড়াইতে যাইতে পারি। এখানে আমার ভ্রমণ-ক্রিয়া অপরের উদ্দেশ্যে সাধিত হয় নাই। আমি আত্মহত্যাও করিতে পারি। আমার এইসব ক্রিয়াকেও ব্যবহার বলা যাইবে। বস্তুতঃ যেসব ক্রিয়া আমরা জানিয়া শুনিয়া বা বুদ্ধিপূর্বক করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের ব্যবহার।

আমাদের লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে যে রকম শুদ্ধপ্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের ব্যবহারেও তেমনি শুদ্ধপ্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া

যায়। শুদ্ধপ্রজ্ঞা[১] বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা কাণ্ট্ তাঁহার প্রথম বিচারগ্রন্থে[২] দেখাইয়াছেন। শুদ্ধপ্রজ্ঞা বলিতে এরকম জ্ঞানীয় তত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তি বুঝিতে হইবে, যাহা, আমাদের লৌকিক বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের সাহায্য না নিয়া, আপনা হইতেই জ্ঞানের প্রকার ও মূলসূত্র নিরূপণ করিয়া দিতে পারে। লৌকিক বা ইন্দ্রিয়জন্য অনুভবের সহিত জড়িত বা মিশ্রিত না হইয়াও যে জ্ঞানশক্তি আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের মূলভূত মূলসূত্রগুলি আপনা হইতেই দিয়া আমাদের জ্ঞানব্যাপার সম্ভবপর করিয়া তুলে, তাহাকে শুদ্ধপ্রজ্ঞা বলা হইয়াছে। কাণ্ট্ প্রথমে যে প্রজ্ঞার বিচার করিয়াছেন, তাহাকে যদিও কেবল 'শুদ্ধপ্রজ্ঞা' বলিয়াছেন, তথাপি তাহার সম্পূর্ণ নাম বলিতে গেলে 'শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা'[৩] বলা উচিত। যে জ্ঞানশক্তি হইতে আমাদের জ্ঞানীয় মূলসূত্রাদি পাই, আমাদের লৌকিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানব্যাপারে যে প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে 'বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা'[৪] বলিতে পারা যায়; আমাদের ব্যবহারে যে প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে 'ব্যবহারিক প্রজ্ঞা'[৫] বলা যাইতে পারে।

আমাদের ব্যবহার যে আমাদের জ্ঞানব্যাপার হইতে ভিন্ন, তাহার আভাস আগেই দেওয়া হইয়াছে। অনুভবে আমরা যাহা পাই, তাহাকে বিষয়রূপে অবগত হওয়াই জ্ঞানের কাজ। যাহা আছে, তাহাই আমরা জানি; কিন্তু অনেক সময় আমরা যাহা নাই, তাহাও পাইতে চাই। যে পদার্থ নাই তাহাকে পাইবার জন্য আমাদিগকে যে রকম ভাবে ব্যাপৃত হইতে হয়, যে পদার্থ আছে তাহাকে শুধু জানিবার জন্য নিশ্চয়ই আমাদিগকে ঠিক সেই রকম ভাবে ব্যাপৃত হইতে হয় না। আমরা বুদ্ধিপূর্বক যাহা কিছু ক্রিয়া করিয়া থাকি, তাহা যে নূতন কিছু পাইবার উদ্দেশ্যে, নূতন কোন বস্তু বা অবস্থা উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে, করিয়া থাকি, তাহা একটু বিচার করিলেই বোঝা যায়। আমরা যখনই বুদ্ধিপূর্বক কিছু করিতে যাই, তখনই দেখিতে পাই যে, প্রথমতঃ আমাদের

১। Pure Reason
২। Critique of Pure Reason
৩। Pure Theoretical Reason
৪। Theoretical Reason
৫। Practical Reason

মনে কোন বস্তু বা অবস্থার কল্পনা জাগে; তাহার পর সে বস্তু বা অবস্থাকে বাস্তবে পরিণত করিবার ইচ্ছায় আমরা কোন বিশিষ্ট ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি[১] কোন বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত[২] হইয়া আমাদিগকে তদুপযোগী ক্রিয়াতে[৩] প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। আমি এখন একখানা বই লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। যে বই লিখিতে চাহিতেছি, তাহা বর্তমানে নাই। এই বই-এর কল্পনা দ্বারাই আমার ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া বর্তমান লিখনকার্যে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

এখানে ইচ্ছা বলিতে 'পুত্র হউক', 'বিত্ত হউক' এই রকম মানসিক কামনা মাত্র বুঝিতে হইবে না। মানুষের মনের এক মৌলিক ধর্ম বা শক্তিকে ইচ্ছাশক্তি বলা হইতেছে। যে শক্তির দ্বারা আমরা কল্পনালব্ধ কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে বা অভিমুখে নানা ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হই, তাহাকেই ইচ্ছাশক্তি বলা হইতেছে। কোন (কাল্পনিক) বিষয়ের প্রতি সক্রিয় অভিমুখীনতা বা মানস প্রবৃত্তির নামই ইচ্ছা। নৈয়ায়িকেরা কৃতি বলিতে যাহা বুঝেন ইচ্ছা বলিতে এখানে তজ্জাতীয় মনোধর্মই[৪] বুঝিতে হইবে।

আমরা সজ্ঞানে যাহা কিছু করি, তাহার মূলেই ইচ্ছা বর্তমান। এই ইচ্ছা যে সব সময় যুক্তিযুক্তভাবে চলে তাহা নহে। পাগলের কখন কি ইচ্ছা হইবে বলা যায় না; তাহার ইচ্ছা কোন নিয়মের অধীন নয়। সে ইচ্ছাকে উচ্ছৃঙ্খল বা অযৌক্তিক[৫] বলা যাইতে পারে। পশ্বাদির ক্রিয়ার মূলে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা অনেকটা এই রকমের। সে ইচ্ছাও কোন যুক্তিযুক্ত[৬] নিয়মের অধীন নয়। পশ্বাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া ও প্রবৃত্তিতে যে কোন নিয়মই পাওয়া যায় না, তাহা নহে। কিন্তু একথা সত্য যে, কোন পশুই কোন নিয়ম ঠিক করিয়া সজ্ঞানে সেই নিয়মের অনুবর্তন করে না। এখানে সেই অর্থেই পশ্বাদির ইচ্ছা যুক্তিযুক্ত বা প্রজ্ঞাতন্ত্র[৬] নয় বলা হইয়াছে।

মানুষ মানুষ হিসাবে যাহা করে, তাহা সে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় করে, ইহাই আশা করা যায়। নিতান্ত যন্ত্রবৎ কিংবা একেবারে কিছু না

১। Will
২। Determined
৩। Action
৪। মন ও আত্মার পার্থক্য এখানে গ্রাহ্য করা হইতেছে না।
৫। Irrational
৬। Rational

জানিয়া না শুনিয়া যাহা করে, তাহাতে তাহার মনুষ্যত্ব ব্যক্ত হয় না। কিন্তু সজ্ঞানে কোন কাজ করিলেও যে ইচ্ছায় সে কাজ করিয়াছে, সে ইচ্ছা কোন কোন নিয়মের অনুবর্তী হইতে পারে, নাও হইতে পারে। এখানে নিয়ম শব্দে মানুষের বুদ্ধিনিরপেক্ষ কোন প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলা হইতেছে না। যে নিয়মকে আমরা সজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারি, এবং আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কাজে যে নিয়মকে প্রতিপালন করিতে পারি, সেই রকম নিয়মের কথাই এখানে বলা হইতেছে। কাণ্টের মতে, যখন আমাদের ইচ্ছা এই রকম কোন নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলে, তখনই তাহাকে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের উপযুক্ত বা যুক্তিযুক্ত বলা যাইতে পারে। এই রকম ইচ্ছাকে প্রজ্ঞাতন্ত্রও বলা যায়, কেননা প্রজ্ঞা হইতেই আমরা নিয়ম পাইতে পারি। এক অর্থে যে শক্তির বলে আমরা নিয়ম গঠন করিতে পারি, তাহাকেই প্রজ্ঞা বলা হয়। যাহা হউক কাণ্টের মতে নিয়মানুবর্তিতাই যুক্তিযুক্ত বা প্রজ্ঞাতন্ত্র ইচ্ছার জ্ঞাপক।

যুক্তিযুক্ত হইতে হইলে যে আমাদের যাবতীয় ইচ্ছাকে একই নিয়মের অধীনে চলিতে হইবে, এমন কথা বলা হইতেছে না। আমাদের কাজ-কর্মে ও ইচ্ছায় আমরা একাধিক নিয়ম পালন করিতে পারি; কোনও না কোন নিয়মের অধীনে চলিলেই আমাদের ইচ্ছার যুক্তিযুক্ততা বজায় থাকিবে। হইতে পারে স্বাস্থ্য বজায় রাখা, সুবিধা পাইলেই অর্থোপার্জন করা এবং নিজে কায়িক ক্লেশ সহ্য করিয়াও পরকে আরাম দেওয়া একই ব্যক্তির ইচ্ছার নিয়ামক। কোন কাজ সে স্বাস্থ্যের ইচ্ছায়, কোন কাজ অর্থের ইচ্ছায় এবং কোন কাজ পরের আরামের জন্য করিতে পারে। এরকম স্থলেও তাহার ইচ্ছাকে যুক্তিযুক্ত বলা যাইবে, কেননা কোনও না কোন নিয়মের দ্বারা তাহার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আমাদের নৈতিক কাজকর্ম বা নৈতিক ইচ্ছা কোন ব্যাপক নিয়ম বা মূলসূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা আবিষ্কার করাই কাণ্টের নীতিবিচারের উদ্দেশ্য।

জ্ঞানবিচারে কাণ্ট্ আমাদের বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতজ্ঞানের মূলে যে সব মূলসূত্র আছে, তাহাই আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই স্থলে শুদ্ধ (বৈজ্ঞানিক) প্রজ্ঞার বিচার এই উদ্দেশ্যেই করিয়াছেন, কেননা শুদ্ধ প্রজ্ঞা হইতেই ঐসব

মূলসূত্র পাওয়া যায়। অনুরূপ কারণেই কাণ্ট্ ব্যবহারিক প্রজ্ঞার বিচার করিয়াছেন, কেননা আমাদের (নৈতিক) ব্যবহারের মূলে যেসব মূলসূত্র আছে, তাহা শুদ্ধ (ব্যবহারিক) প্রজ্ঞা হইতেই পাওয়া যায়।

জ্ঞান বিচারে যেমন কাণ্ট্ প্রাকৃতজ্ঞান[১] ও বিজ্ঞানের[২] অস্তিত্ব ধরিয়াই নিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস করেন নাই, তেমনই বর্তমান ক্ষেত্রেও নৈতিক-ব্যবহার[৩] বা ভালমন্দবোধ[৪] কাণ্টের কাছে অনাস্থার বিষয় নয়। আমাদের ধর্মাধর্মবোধ বা নৈতিকবোধ আছেই; এই বোধের বশবর্তী হইয়াই আমরা নৈতিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই। কাণ্টের প্রশ্ন:—আমাদের নৈতিক ব্যবহারের মূলে যে ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহা কিসের দ্বারা নিয়মিত হয়? কোনও না কোন নিয়ম যে আছেই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কেননা নিয়ম না থাকিলে ত আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধিমান মানুষের উপযুক্ত যুক্তিযুক্ত ইচ্ছাই হইবে না। যাহা শুভ বা ভাল, তাহাই নৈতিক ইচ্ছার বিষয়। আমাদের ইচ্ছা কি রকম নিয়মের অনুবর্তী হইলেই তাহার বিষয় শুভ বা ভাল হইতে পারে, তাহাই আমাদের জানিতে হইবে। শুভ বা ভালর জন্য যে ইচ্ছা তাহাকে যদি শুভেচ্ছা বলা যায়, তাহা হইলে আমরা জানিতে চাই, কিসের দ্বারা নিয়মিত ইচ্ছাকে শুভেচ্ছা বলা যাইতে পারে

একটু আগেই বলা হইয়াছে, কাণ্ট্ আমাদের নৈতিকবোধের অস্তিত্ব ধরিয়া নিয়াছেন। এই নৈতিকবোধ হইতে আমরা কি কি জানিতে পারি দেখা যাউক। নৈতিকবোধ আমাদের নৈতিক বিচারেই[৫] প্রকাশ পায়। এই রকম বিচারে আমরা সাধারণতঃ কি করা উচিত বা কি না করা উচিত, তাহাই বলিয়া থাকি। এই প্রকার বিচারের প্রধান ধর্ম এই যে, ইহাতে যাহা বলা হয়, তাহা সব সময় সর্বত্র সকলের পক্ষে খাটে। সত্য কথা বলা যদি উচিত হয়, তবে তাহা শুধু বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে, বিশেষ ক্ষেত্রেই উচিত নয়, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকলের পক্ষে সব সময়েই উচিত। সুতরাং নৈতিক বিচারকে সার্বত্রিক[৬] বলিয়া আমাদের মানিতে হয়। ইহা এমনভাবে সার্বত্রিক যে, আমাদের নৈতিক বুদ্ধির কাছে তাহা সর্বদা অপরিহার্য[৭] বলিয়াই লাগে। নৈতিক বিচারে কোন কিছু উচিত বলিয়া প্রতিপন্ন

১। Experience
২। Science
৩। Moral Life
৪। Moral consciousness
৫। Moral Judgment
৬। Universal
৭। Necessary

হইলে তাহা আমরা গ্রহণ না করিয়াই পারি না। এ কথার অর্থ এই নয় যে, নৈতিক বিচারে যাহা উচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাই আমরা সব সময় করিয়া থাকি। এইখানেই প্রাকৃতিক নিয়ম ও নৈতিক নিয়মে মহা পার্থক্য। প্রাকৃতিক নিয়মও সার্বত্রিক ও অপরিহার্য; প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা ঘটে বলিয়া স্থির হয়, তাহা কখনই না ঘটিয়া পারে না। কিন্তু নৈতিক নিয়মে যাহা ঘটা উচিত বলিয়া বলা হয়, তাহা যে সব সময় ঘটে তাহা নহে। প্রাকৃতিক নিয়মে জল নীচের দিকে যায়; এ রকম ভাবে সর্বদা জল যাইবেই যাইবে; এই নিয়মের কখনও ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু নৈতিক নিয়মে দরিদ্রকে সাহায্য করা উচিত হইলেও সব সময় যে দরিদ্রকে সকলে সাহায্য করে, তাহা নহে। এমন কি, মানুষের স্বভাব যেমনভাবে গঠিত, তাহাতে কেহই কোন নৈতিক নিয়ম সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণভাবে পালন করিতে পারে না। তবে কেন নৈতিক নিয়মকে সার্বত্রিক ও অপরিহার্য বলা হইয়াছে? তাহার অর্থ এই যে, নৈতিক নিয়মে যাহা করণীয় বলিয়া বলা হয়, তাহা সব সময় করিতে না পারিলেও, তাহার ঔচিত্য আমাদের বুদ্ধির কাছে কখনও অস্বীকৃত হয় না। আমার দুর্বলতা-বশতঃ যাহা উচিত তাহা করিয়া না উঠিতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ আমার নৈতিকবোধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততক্ষণ যাহা উচিত, তাহা উচিত বলিয়াই মানিব। নৈতিক দৃষ্টিতে যাহা উচিত, তাহা কখন উচিত, কখন অনুচিত, এই রকম হয় না।

আমাদের ইচ্ছাকৃত কর্মই উচিত বা অনুচিত হইতে পারে; যে কাজ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তাহাকে উচিত বা অনুচিত বলা যায় না। আমাদের ইচ্ছা যে নিয়মের অধীনে চলিলে তজ্জনিত কর্ম সমুচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, সে নিয়মও অবশ্যই সার্বত্রিক ও অপরিহার্য হইবে। আমাদের ইচ্ছা যে নিয়মের দ্বারা চালিত হইলে তজ্জন্য কর্ম নৈতিকরূপ লাভ করে, তাহাকেই নৈতিক নিয়ম বলা হয়। শুদ্ধ নৈতিক নিয়ম ছাড়া আমাদের কার্য্যের নিয়ামক অন্য প্রকার নিয়মও থাকিতে পারে। সেই রকম নিয়ম হইতে নৈতিক নিয়মের পার্থক্য বুঝিলে ইহার (নৈতিক নিয়মের) স্বরূপ সম্বন্ধে ভাল ধারণা জন্মিতে পারে।

আমরা একান্ত বৈয়ক্তিকভাবে এমন নিয়ম করিতে পারি, যাহা শুধু আমাদের নিজের কাজেই লাগিয়া থাকে। এই নিয়ম আমরা পালিতে

বাধ্য বা অন্যেরাও পালন করিবে এইরূপ ধারণা আমাদের মনে থাকে না। আমি এই রকম নিয়ম করিতে পারি যে, আমার কেহ অপমান বা ক্ষতি করিলে তাহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িব না; অথবা রাত দশটার আগে নিদ্রা যাইব না; অথবা একেবারে নিঃস্ব ব্যক্তিকে টাকা ধার দিব না। এগুলি একেবারে ব্যক্তিগত নিয়ম[১]। এই রকমও নিয়ম হইতে পারে:— 'যৌবনে অর্থ সঞ্চয় করা উচিত, যাহাতে বার্ধক্যে অভাবে না পড়িতে হয়'। এই নিয়মটি বেশ ভাল, এবং আমরা এই নিয়ম মানিয়া চলিতে পারি। কিন্তু ইহাতে নৈতিক নিয়মের স্বরূপ পাওয়া যায় না। এই নিয়ম সকলের পক্ষে যে খাটে তাহা নহে। (নৈতিক নিয়ম সকলের পক্ষেই খাটে।) এমনও ত হইতে পারে যে কোন ব্যক্তি বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছিবার আশা রাখে না, কিংবা বৃদ্ধ হইলেও নিজের বুদ্ধিবলে দিন চালাইয়া নিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, তাহার পক্ষে এই নিয়ম খাটিবে না। এই নিয়মে শুধু এই বলা হইতেছে যে, যদি আমার বার্ধক্য পর্যন্ত জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং তখন অন্য সাহায্য পাইবার বা নিজের বুদ্ধিতে দিন চালাইবার আশা না থাকে, তাহা হইলে যৌবনে আমার অর্থ সঞ্চয় করা উচিত। এই রকম নিয়মকে নৈমিত্তিক বিধি[২] বলা যাইতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত নৈতিক নিয়মে এই রকম 'যদি-তবে'র কথা থাকে না। নৈতিক নিয়ম যাহা করণীয় বলিয়া বলে, তাহা সর্বাবস্থায়ই করণীয় বলিয়া বুঝিতে হয়। সেই রকম নিয়মকেই 'ব্যবহারিক মূলসূত্র'[৩] বলা যাইতে পারে; তাহাকেই 'নিত্যবিধি'[৪] বলা যায়। এরকম নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম হয় না, এবং এ নিয়ম আমাদের কাছে অন্তরাত্মার আদেশরূপে আসিয়া থাকে। 'তোমাকে সত্য কথা বলিতেই হইবে' এই রকমই নৈতিক নিয়মের রূপ। এই নিয়মে বলা হইতেছে না, যদি তুমি স্বর্গে যাইতে চাও বা জগতে উন্নতি করিতে চাও, তাহা হইলে সত্য কথা বলিতে হইবে। কোন অবান্তর নিমিত্তের উল্লেখ না করিয়া একান্ত বিধিমুখেই[৫] নৈতিক নিয়মের দ্বারা আদিষ্ট[৬] হইতেছি, সত্য কথা

১। Subjective Maxims
২। Hypothetical Precepts
৩। Practical Principles
৪। Categorical Imperative
৫। Categorical
৬। Imperative

বলিবে। নৈতিক নিয়মের দ্বারা যাহা বিহিত হয়, তাহাকেই আমরা কর্তব্য[1] বলিয়া মনে করি; এবং নিয়মের প্রতি আমরা এক প্রকারের বাধ্যতা[2] অনুভব করিয়া থাকি। এই নিয়ম বা বিধান না মানিলেও চলিবে এরকম আমরা কখনও মনে করিতে পারি না। আমরা মনে করি, এই নিয়ম পালন করিতে আমরা একান্ত বাধ্য। এই রকম নিয়মের দ্বারা চালিত ইচ্ছায় আমরা যাহা করিব, তাহাই নীতিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অন্যান্য সব রকমের নিয়ম হইতে নৈতিক নিয়মের পার্থক্য বিশেষ করিয়া বোঝা উচিত। ব্যক্তিগত নিয়মও নিয়ম বটে; এই নিয়মের দ্বারাও আমাদের ইচ্ছা পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ এই নিয়ম আমরা সাধারণতঃ যে অভিপ্রায়ে কাজ করিয়া থাকি, সেই অভি-প্রায়ই ব্যক্ত করিয়া থাকে। দুইটি জিনিস এই রকম নিয়মে পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ এই নিয়মের মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নাই; এই নিয়ম মানিতে (নৈতিক হিসাবে) আমি যে বাধ্য তাহা নহে। প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা আমার নিয়ম হইতে পারে; কিন্তু এই নিয়ম যে আমাকে পালন করিতে হইবে, এবং পালন না করিলে নৈতিক দৃষ্টিতে খারাপ লোক বলিয়া বিবেচিত হইব, তাহা নহে। দ্বিতীয়তঃ এই নিয়ম যে সকলের উপরই খাটিবে তাহা নহে। আমি আমার বৈয়ক্তিক কাজ কর্মে যে নিয়ম মানিয়া চলি, অন্যকেও সে নিয়মে চলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু এই দুইটি জিনিসই নৈতিক নিয়মের পক্ষে অত্যাবশ্যক। নৈতিক নিয়মের ভিতর আমরা যে আদেশ পাই, সে আদেশ পালন করিতে প্রত্যেক নীতিমান স্ত্রীপুরুষই বাধ্য। নৈতিক নিয়মের মধ্যে বাধ্যবাধকতার ভাব রহিয়াছে, এবং সকলের বেলায়ই সেই নিয়ম প্রযোজ্য।

ইহাই যদি নৈতিক নিয়মের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আমরা সে নিয়ম কোথা হইতে পাইতে পারি এবং কিসের কথাই বা সে নিয়মে থাকিতে পারে? আমরা দেখিয়াছি, নৈতিক নিয়ম সকলের উপর লাগে, অর্থাৎ নৈতিক নিয়ম সার্বত্রিক। এবং কাণ্টের মতে কোন

১। Duty ২। Obligation

সার্বত্রিক[১] নিয়মই প্রাকৃত অনুভব[২] হইতে লাভ করা যায় না। যাহা সাধারণত: ঘটিয়া থাকে, তাহা প্রাকৃত অনুভব হইতে জানা যাইতে পারে। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, ততদূর কোন বিশেষ নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই, এইটুকু মাত্র আমরা প্রাকৃত অনুভব হইতে বলিতে পারি; কিন্তু সর্বত্র ও সব সময়ই সেই নিয়ম খাটিবে, কদাপি ও কুত্রাপি তাহার ব্যত্যয় হইবে না, এমন কথা আমরা প্রাকৃত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কখনই বলিতে পারি না। নৈতিক নিয়ম যখন অবশ্য-গ্রাহ্য ও সার্বত্রিক, তখন একথা সিদ্ধ হইল যে সে নিয়ম আমরা প্রাকৃত অনুভব হইতে পাইতে পারি না। তাহা হইলে বলিতে হয়, এই নিয়ম আমরা শুদ্ধপ্রজ্ঞা হইতে পাই। নৈতিক নিয়ম শুদ্ধপ্রজ্ঞারই নিয়ম বুঝিতে হইবে।

নিয়মের ত কোন বিষয়বস্তু চাই; শূন্যাকারের মধ্যে কোন নিয়ম হয় না। নিয়মের মধ্যে কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিবেই থাকিবে। আরও আমরা জানি, এখানে এরকম নিয়মের কথা বলা হইতেছে, যাহা দ্বারা আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, নৈতিক নিয়মের দ্বারা যখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন নিয়মোল্লিখিত বিষয়বস্তু[৩] আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয়, না অন্য কিছু? যখন আমরা কোন নৈতিক কাজ করিয়া থাকি, তখন কোনও বিষয় লাভের জন্য সে রকম কাজে প্রবৃত্ত হই, না কোন বস্তু লাভের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই আমরা নৈতিক কাজে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি? কাণ্ট্ বলেন, নিয়মোল্লিখিত বিষয় যদি আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয়, তাহা হইলে ঐ নিয়ম নৈতিক নিয়মই হইবে না। কোন বিষয় (বস্তু) কি করিয়া আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হইতে পারে? ঐ বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলে যদি আমাদের সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হইতে পারে, অর্থাৎ ঐ বিষয়লাভের ইচ্ছায় আমরা কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি। এতদ্ব্যতীত অন্য কি প্রকারে কোন বিষয় আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হইতে পারে, তাহা বোঝা যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, কোন বিষয় যদি আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয়, তবে সেই বিষয় জন্য সুখের আশাই বাস্তবিক

১। Universal ২। Experience ৩। Matter, Content

আমাদের প্রবৃত্তির প্রয়োজক। এই রকম নিয়ম কি নৈতিক নিয়ম হইতে পারে? প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে এই নিয়ম, যাহাদের সুখ দুঃখ বোধ আছে, তাহাদের উপরই খাটিবে। যাহার সুখদুঃখবোধ নাই, তাহার ইচ্ছার নিয়মন এই নিয়মের দ্বারা হইতে পারে না, কেননা সুখের আশাতেই লোকের বাহ্য বিষয়ের জন্য প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং যাহার সুখবোধ নাই, তাহার বাহ্য বিষয়ের জন্য প্রবৃত্তি হইবে না। মানুষ মাত্রেরই অবশ্য সুখদুঃখবোধ আছে। কিন্তু নৈতিক নিয়ম শুধু মানুষের উপরই লাগে, তাহা নহে। দেবতারা নৈতিক নিয়মে বাধ্য নন, আমরা তাহা মনে করি না। সু-কু, ন্যায়-অন্যায় প্রজ্ঞাবান্ সমস্ত জীবের কাছেই সমান। সুতরাং নৈতিক নিয়ম প্রজ্ঞাবান[১] সত্তা মাত্রের উপরই লাগিবে। এই হিসাবে নৈতিক নিয়ম একেবারে সার্বভৌম। কিন্তু যাহার প্রজ্ঞা আছে, তাহারই যে সুখদুঃখবোধ থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। সুখদুঃখবোধ আমাদের এক বিশিষ্ট সংবেদনশক্তির[২] উপর নির্ভর করে। বাহ্য বিষয় আমাদের সহিত অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবে সংসৃষ্ট হইতে পারে বলিয়াই আমাদের সুখদুঃখবোধ হয়। ইহার মূলে আমাদের সংবেদন শক্তি বা ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ বিদ্যমান। বুদ্ধিমাত্রকায় (বা চিন্মাত্রকায়) জীবের ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ না থাকাতে সংবেদনশক্তি থাকার কথা নয়। অতএব তাহাদের সুখদুঃখবোধ থাকিবে না। সুখদুঃখবোধ না থাকাতে বিষয়ের দ্বারা তাহাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। সুতরাং ঐ রকম নিয়ম (যে নিয়মের বিষয়বস্তুই আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক) তাহাদের উপর লাগিবে না। অতএব সেই রকম নিয়মকে নৈতিক নিয়ম বলা যাইতে পারে না; নৈতিক নিয়ম সকলের উপরই প্রযুক্ত হওয়া চাই, আর আমরা দেখিলাম, যে নিয়মে বিষয়ের কথাই মুখ্য, যাহাতে সুখদুঃখের কথা আছে, সে নিয়ম সকলের উপর লাগিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সুখের জন্য যখন আমরা কোন কাজ করিয়া থাকি, তখন সে কাজকে নৈতিক কাজ বলা যায় না। আমাদের সুখলাভের সব চেষ্টার মূলেই আত্মপ্রীতি[৩] রহিয়াছে। এর রকম স্বার্থপরতার আত্মপ্রীতি আর নীতিমত্তা একেবারে বিরুদ্ধ পদার্থ। আমরা আত্মসুখের জন্য যাহা করি, তাহার যে নৈতিক মূল্য কিছুই নাই, সে কথা অতি সাধারণ লোকও বুঝে। বিষয় যখন

১। Rational ২। Sensibility ৩। Self-love

আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার মূলে আমাদের সুখলিপ্সাই রহিয়াছে। সুখলিপ্সা আত্মপ্রীতি হইতে আসে, আর স্বার্থান্বেষী আত্মপ্রীতি হইতে যাহা করা হয়, তাহাকে কখনও নৈতিক কাজ বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ কোন বিষয়ের সংস্পর্শে আমরা সুখ পাইব, তাহা কখনই আমরা শুধু বিষয়ের কল্পনা হইতেই বলিতে পারি না। কোন বিষয় সুখ দিবে, কি দুঃখ দিবে, তাহা শুধু বিষয়ের বাস্তব অনুভব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং কোন নিয়ম যদি বিষয়োল্লেখের দ্বারাই আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার মূলে আমাদের প্রাকৃত অনুভব রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রাকৃত অনুভব হইতেই এই রকম নিয়ম সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়াছি, প্রাকৃত অনুভব হইতে কোন নৈতিক নিয়ম সিদ্ধ হইতে পারে না। শুদ্ধ প্রজ্ঞা হইতে আমরা নৈতিক নিয়ম পাইয়া থাকি। অতএব বুঝিতে হইবে, নৈতিক নিয়ম বিষয়োল্লেখের দ্বারা আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয় না।

বিষয়ের দ্বারা যদি ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? কোন নিয়মের বিষয়বস্তু বাদ দিলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? কাণ্ট্ বলেন বিষয় বাদ দিলে নিয়মের আকার[১] মাত্র অবশিষ্ট থাকে, আর বিষয়ের দ্বারা নিয়ম যখন আমাদের ইচ্ছা নিয়ামক হয় না, তখন বুঝিতে হইবে শুধু আকারের দ্বারাই নৈতিক নিয়ম আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ কাণ্টের মতে কোন বিষয়ের জন্য আমরা নৈতিক কাজ করি না, আমাদের নৈতিক কর্মের প্রবৃত্তি কোন বিষয়ের কল্পনা হইতে আসে না; নৈতিক নিয়ম নৈতিক নিয়ম বলিয়াই তদনুযায়ী কর্মে আমরা প্রবৃত্ত হই। নৈতিক নিয়মের আকারই এই রকম যে, সেই আকারের ফলেই আমরা ঐ নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হই। আমরা দেখিয়াছি নৈতিক নিয়ম 'নিত্যবিধি'[২] রূপেই আমাদের কাছে আসে। প্রত্যেক নৈতিক কার্যের বেলায় 'তোমার করা উচিত' বলিয়া অন্তরাত্মার নিকট হইতে আমরা অসংকুচিত আদেশ পাই। এই আদেশের মধ্যে 'যদি-তবে'র কোন স্থান নাই। এই বিধিরূপ নিয়মকে বিধি বলিয়াই আমাদের মানিতে হইবে। প্রাকৃত জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যেমন 'আমি জানি'[৩]-রূপ আকার বর্তমান আছে, তেমনি প্রত্যেক নৈতিক ব্যবহারের

১। Form ২। Categorical Imperative ৩। I think

ক্ষেত্রেও 'তোমার উচিত'১-রূপ আকার নিহিত আছে। নৈতিক নিয়মের এই আকার মানিয়াই আমরা যাহা করি, তাহাই নীতিশুদ্ধ; কিন্তু অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রকার বিষয় লাভের (ভোগের) আশায় যদি কোন কার্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সে কাজ বাহ্যতঃ যতই নীতিশাস্ত্রানুমোদিত হউক না কেন, তাহার নৈতিক মূল্য কিছু নাই। নৈতিক কোন কাজ ভাল কি মন্দ বুঝিতে হইলে, কি রকম ইচ্ছায় সে কাজ করা হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হয়। কোন রকমের বিষয়বাসনায় যদি কোন কাজ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে কাজের ফল যতই সুখদায়ক বা জনহিতকর হউক না কেন, তাহার নৈতিক মূল্য কিছুই নাই। কিন্তু যদি নৈতিক নিয়মের আকারের দ্বারাই আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়মিত হওয়াতে—অর্থাৎ শুধু উচিত বলিয়াই কোন কাজ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে কাজের দৃষ্টফল কিছু না থাকিলেও তাহার নৈতিক মূল্য যথেষ্ট আছে। মোট কথা, কোন কাজ নৈতিক হিসাবে ভাল কি মন্দ, তাহা কাজের ফলাফল দেখিয়া নিরূপিত হইবে না। আমরা কি রকম ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া সে কাজ করিয়াছি, তাহাই দেখিতে হইবে। যদি নৈতিক নিয়মের আকারের দ্বারাই আমাদের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ইচ্ছা প্রযুক্ত কাজই নীতিশুদ্ধ, নৈতিক দৃষ্টিতে ভাল, বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে কাণ্ট্ সুখবাদীদের মতের বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। ইহারা বলেন যে কাজে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই ভাল; অথবা, যে কাজের পরিণাম সুখাবহ, তাহাই সাধু। কাণ্ট্ বলেন, এরকম অবস্থায় নৈতিক নিয়মই সম্ভবপর হইবে না। সুখ দুঃখ দিয়া যদি ভাল মন্দ বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে নীতিমান হওয়া এবং সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করা একই কথা হইয়া উঠে। কিন্তু সুখলিপ্সা স্বার্থপর আত্মপ্রীতি হইতেই উৎপন্ন হয়; এরকম আত্মপ্রীতি আর নীতিসত্তা যে এক জিনিস নয়, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। সুখই যদি ভালর লক্ষণ হয়, তাহা হইলে নৈতিক নিয়মকে বলিতে হয়, 'সুখলাভ কর'। এরকম কথা কি সার্বত্রিক ভাবে বলিতে পারা যায়? বিভিন্ন লোক বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন বিষয়ে সুখলাভ করে। আমার কাছে যাহা সুখকর, তাহাই তোমার কাছে দুঃখকর হইতে পারে। সুতরাং

১। You ought

আমার কাছে যাহা নীতিসঙ্গত, তোমার কাছে তাহাই নীতিবিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে। এরকম অবস্থায় নীতির কোন অর্থই থাকে না। যাহা নৈতিক দৃষ্টিতে ভাল, তাহা সকলের কাছে সব সময়ই ভাল হইবে।

ধরিয়া লওয়া গেল, এমন কতকগুলি অবস্থা বা কাজ আছে, যাহা সকলের কাছেই সুখকর; নৈতিক নিয়ম সেগুলির কথা বলিতে পারে। কিন্তু এরকম নিয়ম সাধারণভাবে খাটিলেও, তাহার ব্যতিক্রম বা অপবাদের[১] কথা সহজেই আমরা ভাবিতে পারি। সর্বসাধারণের যাহাতে সুখ হয়, ব্যক্তি বিশেষের তাহাতে সুখ নাও হইতে পারে; কিন্তু নৈতিক নিয়ম ত বাস্তবিক এই রকম যে তাহার অপবাদ কখনই হয় না। সুখের উদ্দেশ্যে এরকম সার্বত্রিক নিয়ম করিতে পারা যায় না।

আরো কিছু বিচার করিলে দেখা যায় যে, 'সুখ লাভ কর' এরকম নৈতিক নিয়ম একেবারে অসম্ভব। নৈতিক নিয়ম ত এরকম কথা বলিবে, যাহা প্রত্যেক মানুষই করিতে পারে। কিন্তু সুখলাভ করা কি সকলের পক্ষে সম্ভবপর? সুখ প্রথমতঃ অনেক পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে; সেগুলি আমার আয়ত্তাধীন নাও হইতে পারে; সেই রকম স্থলে আমাকে 'সুখ লাভ কর' এই আদেশ দেওয়াই অনর্থক। সুখলাভ করিয়া যদি নীতিমান হইতে হয়, তাহা হইলে বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই নীতিমান হওয়া অসম্ভব। কান্টের মতে সকলেই নীতিমান হইতে পারে; কেননা তাঁহার মতে নিজের ইচ্ছাকে নৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিলেই নীতিমান হওয়া যায়। শুদ্ধ প্রজ্ঞা হইতে নৈতিক নিয়ম পাওয়া যায়; ইচ্ছাও আমাদের নিজের মাঝেই আছে; এখানে বাহ্য কিছুর উপর আমাদের নির্ভর করিতে হয় না। সুতরাং নীতিমান হওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। কান্ট্ বলিতেছেন না, আমরা সকলেই বাস্তবিক নীতিমান; তিনি বলিতেছেন, সকলের পক্ষে নৈতিক নিয়মে আপন ইচ্ছাকে নিয়মিত করা সম্ভবপর। তাই সকলের প্রতিই নৈতিক নিয়মের আদেশ চলিতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে যখন সুখলাভ করা সম্ভবপর নয়, (ইচ্ছা করিয়াই আমরা সুখী হইতে পারি না), তখন সুখলাভের আদেশ সার্বত্রিক ভাবে দিতে পারা যায় না। সুতরাং ঐ আদেশ নৈতিক নিয়মের আদেশই নয়।

তাহা ছাড়া, সুখলাভের আদেশই অস্বাভাবিক ও হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে

১। Exception

হয়। সুখলাভের দিকে সকলেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। সকলেই যখন আপনা হইতে সুখলাভ করিতে চাহিতেছে, তখন এর জন্য আবার নৈতিক আদেশ পাইতে হইবে কেন? আমরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে নৈতিক নিয়ম পালন করি না বলিয়া আমাদের উপর নৈতিক নিয়মের আদেশ চলিতে পারে। কিন্তু সুখলাভের আদেশ সর্বথা নিরর্থক।

এই রকম নানা যুক্তি দিয়া কাণ্ট্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নৈতিক ভাল মন্দ সুখ দুঃখের বিচার দ্বারা (আমাদের কাজের সুখজনক বা দুঃখজনক ফল দ্বারা) ঠিক করা যায় না। একমাত্র সার্বভৌম নৈতিক নিয়মের (অর্থাৎ নিত্য বিধির) বশবর্তী হইয়া আমাদের ইচ্ছা যে কাজে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে সে কাজই ভাল। কাজের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ইচ্ছা যদি শুদ্ধ নৈতিক নিয়মানুবর্তী হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য কাজও সাধু বলিতে হইবে।

আমরা নৈতিক নিয়মের কথা বলিয়া আসিতেছি। মুখ্য নৈতিক নিয়ম বলিতে সার্বভৌম নিত্যবিধি[১]কেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই বিধি কি? আমরা শুধু জানি এ বিধি সকলের বেলায়ই খাটে; ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেই এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য। সকলেই যে এই নিয়ম পালন করে, তাহা নহে; তবে যে যতটা পালন করিতে পারে, সে নীতিমার্গে ততটা উন্নত। কিন্তু এ বিধি আমাদিগকে কি করিতে বলিতেছে? আমরা দেখিয়াছি, বিষয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই আমাদিগকে নৈতিক নিয়ম মানিতে হয় বা পালন করিতে হয়। সুতরাং কোন বিষয়ের নির্দেশ নিত্যবিধি হইতে পাওয়া যায় না। আমরা যাহাই করি না কেন, দেখিতে হয়, যে নিয়মে কোন কাজ করি, সে নিয়মকে সার্বত্রিক নিয়মে পরিণত করা যায় কি না। আমি যে রকম কাজ করিতে যাইতেছি, সে রকম কাজ করাই যদি সার্বভৌম নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কোন বিরোধের সৃষ্টি হয় কিনা ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমি এখন যাহা করিতেছি, জগতের সকল লোকেই সে রকম কাজ করুক, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা কিনা দেখিতে হইবে। যদি বুঝি আমার বর্তমান কাজের নিয়মকে সার্বভৌম নিয়ম করিতে কোন বাধা নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমার কাজ নৈতিক নিয়মানুযায়ী হইতেছে। আর যদি দেখি আমি যে রকম কাজ করিতেছি, জগতের সব লোকেই সে

১। **Categorical Imperative**

রকম কাজ করুক, এরকম আন্তরিক ইচ্ছা আমি করিতে পারিতেছি না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমার কাজ নৈতিক নিয়মানুমোদিত নহে।

নিত্যবিধিই[১] কান্টীয় নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব। ইহাকে এক প্রকার অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিলেও চলে। ইহার প্রাকৃত রূপ, উপরে নৈতিক নিয়মের যে বিবৃতি দেওয়া হইল, তাহাতেই পাওয়া যায়। নিত্যবিধি যেন বলিতেছে, 'এরকম-ভাবে কাজ কর, যেন তোমার কাজের নিয়ম জগতের সার্বত্রিক নিয়ম হইতে পারে'; অথবা 'যে নিয়ম সার্বত্রিক হউক বলিয়া তুমি ইচ্ছা করিতে পার, সে নিয়মানুসারেই কাজ করিবে'। আমরা যখন কোন মিথ্যা কথা বলিতে যাই, তখন আমরা নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিতে পারি না যে মিথ্যাবাদই জগতের নিয়ম হইয়া যাউক। মিথ্যাবাদই জগতের সার্বত্রিক নিয়ম হইলে মানুষের সামাজিক ব্যবহারই বন্ধ হইয়া যাইবে। যখন কোন আর্তজন আমার সাহায্য ভিক্ষা করে, এবং আমি উদাসীনভাবেই চলিয়া যাই, তখনও আমি আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করিতে পারি না যে সকলেই সকলের প্রতি উদাসীন হউক। কেন না আমিও দুরবস্থায় পড়িতে পারি; আমি তখন অপরের ভালবাসা ও সাহায্যের প্রত্যাশী হই; আমি যখন অপরের সহানুভূতির প্রত্যাশী, তখন সার্বত্রিক ঔদাসীন্য কখনই আমার আন্তরিক ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছা নৈতিক নিয়মানুবর্তী হইয়া চলিতেছে কিনা, তাহা এই রকম ভাবেই ঠিক করিতে হয়। আমাদের ইচ্ছা যে নিয়মে চালিত হইতেছে, সে নিয়মের যদি উপরোক্তভাবে সার্বভৌম নিয়ম হইবার যোগ্যতা থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, আমাদের ইচ্ছা নীতিমার্গে চলিতেছে।

আগেই বলা হইয়াছে, আমাদের নীতিমত্তা, আমরা কি রকম ইচ্ছায় কাজ করি, তাহার উপর নির্ভর করে; কাজে কি রকম সাফল্যলাভ করি, তাহার উপর নয়। আমরা কতদূর নীতিমান বা ভাল, তাহা আমাদের ইচ্ছার বা আন্তর প্রবৃত্তির শুদ্ধতা দ্বারাই নির্ণীত হইবে; বাহ্য কোন কাজ বা তাদৃশ কাজের ফলাফলের দ্বারা নয়।

জাগতিক সুখসুবিধার আশা না করিয়াও আমাদের ইচ্ছা যে এ রকম নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা চালিত হইতে পারে, ইহাতেই আমাদের

১। Categorical Imperative

মনুষ্যত্ব। জগতে যেসব প্রাকৃত ঘটনা ঘটে, তাহা অলঙ্ঘনীয় নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে ঔচিত্য অনৌচিত্যের কোন প্রশ্ন উঠে না। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে; নদীর জল নীচের দিকে বহিয়া যায়, পাতা না নড়িয়া পারে না, নদীর জলও না বহিয়া পারে না। তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কিছুই নির্ভর করে না; মূলে তাহাদের ইচ্ছাই নাই। পশু-পক্ষীর ইচ্ছা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের কার্যাবলীও প্রাকৃত নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও কামের প্রেরণায় তাহাদের ইচ্ছা নিয়মিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার কর্তব্যবোধে তাহারা কিছু করিয়া থাকে বলিয়া আমরা জানি না। তাই গাছপালা বা পশুপক্ষী নৈতিক বিচারের বিষয় হয় না। ইহারা সবই প্রাকৃত নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। একমাত্র মানুষই ক্ষুধাতৃষ্ণা কামনার প্রাকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও নৈতিক নিয়মের বশবর্তী হইতে পারে। অসাড় জড় পদার্থের মত বা বিবেকহীন পশু পক্ষীর মত সাধারণ প্রাকৃত নিয়মে আবদ্ধ না থাকিয়া মানুষ তাহার ইচ্ছাকে নৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়াই মানুষের মহত্ব, ইহাতেই জড় পদার্থ বা পশুপক্ষী হইতে মানুষের একটা পার্থক্য। মনুষ্যজীবনের মূল্য ও অর্থ, মানুষের প্রকৃত মহত্ব, নৈতিক নিয়ম পালনের উপরই নির্ভর করে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর নহে। মানুষের সুখদুঃখ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়; ঘটনাচক্রে কেহ কেহ সুখী হইতে পারে, দুঃখীও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে তাহাকে ভাল বা মন্দ বলা চলে না। সংসারে নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া, নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াও, যদি কেহ তাহার ইচ্ছাকে নৈতিক নিয়মে চালিত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সাংসারিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাহাকে মহান না বলিয়া পারা যায় না।

নৈতিক নিয়মানুগামী ইচ্ছাকে 'শুভেচ্ছা'[১] বলা যায়। মানুষের মহত্ব অন্তিম দৃষ্টিতে এই শুভেচ্ছার উপরই নির্ভর করে। জগতের অন্য সবকিছু সম্বন্ধে ভাল কি না, কেন ভাল, এই রকম প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু শুভেচ্ছা সম্বন্ধে এই রকম প্রশ্নই উঠে না। যদি নিরবচ্ছিন্ন ও অসংকীর্ণভাবে ভাল বলিয়া কিছু থাকে, তবে শুভেচ্ছাই তাহা। শুভেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মানুষ যাহা করে, তাহাকেই নৈতিক বিচারে ভাল বলা যায়। যে কর্মের পশ্চাতে

১। Good will

অভেচ্ছা নাই, সে কর্মের পরিণাম সর্বথা সুখাবহ হইলেও নৈতিক দৃষ্টিতে সে কর্মের কোন মূল্য নাই।

মানুষ স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্রভাবে যাহা করে, তাহাতেই তাহার নৈতিকতা প্রকাশ পায়। অনিচ্ছায় বা পরবশ হইয়া কিছু করিলে তাহার কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। নিজের ইচ্ছায় গরীবের সাহায্যের জন্য যদি এক পয়সাও দেই, তবে তাহারও মূল্য আছে; কিন্তু ঐ কাজের জন্য রাজার ভয়ে যদি হাজার টাকাও দান করি, তবে তাহার কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। সমস্ত নৈতিক কর্মের ও নৈতিকবোধের মূলে স্বাতন্ত্র্যের স্থান। আমাদের স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই, অর্থাৎ কোন প্রকারের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করিতে পারি বলিয়াই, আমাদের ক্রিয়াকর্ম নীতিশুদ্ধ বা নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে। বুঝিতে হইবে, ব্যবহারিক প্রজ্ঞার[১] স্বাতন্ত্র্যের[২] উপরই আমাদের নীতিমত্তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে একটু পরে আরো আলোচনা করা যাইবে। এখানে এই কথা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নৈতিক ব্যাপারে কাণ্টের বিচার প্রণালীতেই এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায়, অন্য মতে রক্ষা পায় না; কাণ্ট্ বলেন, নৈতিক ইচ্ছাতে আমরা আমাদের ব্যবহারিক প্রজ্ঞার দেওয়া নিয়মই পালন করিয়া থাকি। এই নিয়ম নিজের আত্মা হইতেই পাই, বাহির হইতে আমাদের উপর চাপান হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা বলেন, সুখকর বিষয় লাভের জন্যই নৈতিক কর্ম করা হইয়া থাকে, (অর্থাৎ যাহা সুখজনক তাহাই নীতি শুদ্ধ); কিংবা ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজই নীতিসঙ্গত, অথবা পূর্ণতা[৩] লাভই নৈতিক কর্মের লক্ষ্য, তাঁহাদের মতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হয় না; আমাদিগকে পরতন্ত্র[৪] হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের প্রজ্ঞার দেওয়া নিয়মের পরিবর্তে অন্য কিছু যদি আমাদের ইচ্ছার নিয়ামক হয়, তাহা হইলে আমাদের স্বাতন্ত্র্য বিষয় লাভই নৈতিক কর্মের উদ্দেশ্য, তখন ত সুখজনক বাহ্য বিষয়কেই আমাদের ইচ্ছার নিয়ন্তা করিয়া তোলা হয়। ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী কাজই যদি ভাল হয়, তবে প্রশ্ন উঠে, এ রকম অবস্থায় আমাদের ইচ্ছা কিরূপে

১। Practical Reason
২। Autonomy
৩। Perfection
৪। Heteronomous

নিয়ন্ত্রিত হয়? আমরা ভগবানের ইচ্ছা পালন করিতে যাইব কেন? উত্তরে এইত বলিতে পারা যায় যে, ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলে চলিলে আমাদের শাস্তি বা দুঃখ পাইতে হইবে, অনুকূলে চলিলে পুরস্কার বা সুখ পাইব। এমতাবস্থায় ত আমাদের পারতন্ত্র্য স্পষ্টই বোঝা যায়। যদি বলা হয় যে, ভগবানের ইচ্ছা ভাল বলিয়াই আমাদের মানা উচিত, তাহা হইলে যে প্রশ্ন মানবীয় ইচ্ছা সম্বন্ধে উঠিয়াছিল, তাহাকেই, সমাধান না করিয়া, সরাইয়া (ভগবৎ ইচ্ছা সম্বন্ধে) রাখা হইল মাত্র; ইচ্ছার ভালত্ব কিসে? পূর্ণতালাভের জন্য যদি নৈতিক কর্ম করিতে বলা হয়, তাহা হইলে প্রথমে প্রকৃত পূর্ণতার স্বরূপ কি বা কিসে পূর্ণতা পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে হয়। তাহা না বুঝিয়া পূর্ণতালাভের চেষ্টা বা নৈতিক কর্ম আমরা কি করিয়া করিতে পারিব? এই সব মত ধীরভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমাদের নৈতিক ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যের বিসর্জন দিতে হয়; কেননা সব মতেই নৈতিকতার মূল বীজ আমাদের নিজের মধ্যে ইচ্ছাতে বা প্রজ্ঞাতে, না রাখিয়া অন্যত্র রাখা হইয়াছে। সে 'অন্য'কে সুখই বল, ভগবদিচ্ছাই বল বা পূর্ণতাই বল, তাহার 'পর'ত্ব থাকিয়াই যায়। এগুলি যে আমাদের নিজ নয়, প্রজ্ঞা বা আত্মা নয়, তাহা ত তাহাদের নামেই ব্যক্ত হইতেছে। নৈতিক ব্যাপারে আমাদের ব্যবহারিক প্রজ্ঞাকে যদি এগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাকে পরতন্ত্র[১] হইতে হয়।

কাণ্টের মতে আমাদের নীতিমত্তায় আমাদের স্বাতন্ত্র্যই ব্যক্ত হয়। স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত নৈতিকতার কোন অর্থই থাকে না। এই স্বাতন্ত্র্য[২] বলিতে যদৃচ্ছাচার বুঝিতে হইবে না। স্বাতন্ত্র্য বলিতে এক দিকে যেমন বন্ধনরাহিত্য বোঝা যায়, অন্য দিকে তেমনি স্বনিয়মন[৩]ও বুঝিতে হয়। আমরা যখন স্বতন্ত্র, তখন বাহ্য কোন কিছুর উপর আমরা নির্ভর করি না বটে, কিন্তু বাহ্য কিছুর অধীন না হইলেও আমাদের প্রজ্ঞাদত্ত নিয়মের অধীনে আমাদিগকে চলিতে হয়। আমরা নিজের দ্বারাই (স্ব) নিয়মিত (তন্ত্র)। একদিকে বাহ্য কোন বস্তুর কাছে আমাদের অধীনতার অভাব, অপর দিকে আমরা আমাদের প্রজ্ঞাদত্ত নিয়মের বা প্রজ্ঞার অধীন। আমরা যখন উচিত অনুচিত বোধে চালিত হইয়া থাকি, তখন বাস্তবিক বাহ্য কোন শক্তির কাছে আমরা মস্তক অবনত করি না,

১। Heteronomous ২। Autonomy ৩। Self-determination

আমাদের প্রজ্ঞাস্বরূপ অন্তরাত্মার বাণীই শুনি মাত্র। তাহাতেই আমাদের মহত্ত্ব, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

বাস্তবিক মানুষের মহত্ত্ব কিসে? কেহ যদি খুব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইয়াও নীতিমান না হয়, তাহা হইলে তাহাকে হীনই বলিতে হয়; সে যেন প্রকৃত মনুষ্য নামের অধিকারীই নয়। ধর্মাধর্মবোধ আছে বলিয়াই মানুষ প্রাকৃত নিয়মের একান্ত বশবর্তী নিতান্ত জড় পদার্থের মত বা পশুপক্ষীর মত নয়। ভালমন্দের একমাত্র নির্ণায়ক যে নৈতিক নিয়ম, তাহা মানুষ তাহার নিজ প্রজ্ঞা বা অন্তরাত্মা হইতে পায় বলিয়াই তাহার এত মহত্ত্ব। শুদ্ধ নৈতিক নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলাতে, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে শুদ্ধ নৈতিক নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত করাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব[১]। এই মনুষ্যত্বের জন্যই মানুষের মহত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সব সময় (এবং কোন সময়েই সম্পূর্ণরূপে) নৈতিক নিয়ম মানিয়া চলে না। কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই নৈতিক নিয়ম পালনের শক্তি ও সম্ভাবনা বর্ত্তমান আছে। এই মনুষ্যত্বকেই আমরা সর্বদা নিজের মাঝে ও পরের মাঝে শ্রদ্ধা না করিয়া পারি না।

মনুষ্যত্বের জন্য মানুষের মহত্ত্ব, একথা এই মাত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু মহত্ত্ব বলিতে এখানে বাস্তবিক কি বুঝিতে হইবে, কি রকম পদার্থের মহত্ত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি? যে পদার্থকে আমরা অন্য কোন কাজের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকি, অন্যের জন্যই যার প্রয়োজন, তার নিজের কোন মূল্য নাই; তার কোন মহত্ত্ব আছে বলা যায় না। যে অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধনমাত্র নয়, যে নিজেই সাধ্য, যাহাকে তার নিজের জন্যই আমরা চাহিয়া থাকি, লাভ করিতে চাই, তাহারই প্রকৃত মূল্য আছে, মহত্ত্ব আছে বলা যায়; তাহাকে পরমার্থ বলা যাইতে পারে। নীতিমত্তাকেই আমাদের মনুষ্যত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে নীতিমান হইতে চাই, তাহা কিসের উদ্দেশ্যে? এখানে আমাদের বাহ্য কোন উদ্দেশ্য নাই। নীতিমত্তাতেই নীতিমত্তার সার্থকতা। নীতিমান হওয়া আর আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে নৈতিক নিয়মে চালিত করা একই কথা। আমাদের মনুষ্যত্ব নৈতিক নিয়মানুগামী ইচ্ছাতেই আত্মপ্রকাশ করে। যে পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা জাগতিক প্রাকৃত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নৈতিক

১। **Personality**

নিয়মে চালিত হয়, সেই পরিমাণেই আমাদের মনুষ্যত্ব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নীতিসত্তা ও মনুষ্যত্ব একই কথা। এই মনুষ্যত্বই পরম পুরুষার্থ। মনুষ্যত্ব নিজের জন্যই সাধ্য, তাহাকে 'স্বতঃ সাধ্য'[১] বলা যাইতে পারে। এই মনুষ্যত্বকেই আমাদের নিজের মাঝে ও প্রত্যেক মানুষের মাঝে শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করিতে হয়। একথা স্বীকার করার অর্থই সব মানুষকে স্বতঃ সাধ্য[২] বলিয়া মানা। কোন মানুষকেই তাহা হইলে শুধু সাধন রূপে বা যন্ত্র রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না। ইহা হইতে নিত্যবিধির এও একরূপ পাওয়া যায়:—'এমন ভাবে কাজ করিবে, যাহাতে তোমার নিজের ও প্রত্যেক মানুষের মনুষ্যত্বকে সাধ্যরূপেই[৩] মানা হয়, কখনই শুধু সাধন[৪] রূপে ব্যবহার করা না হয়। আমরা যখন মানুষের সঙ্গে কোন ব্যবহার করি, তখন দেখিতে হইবে, আমরা অপরকে শুধু আমাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেবল মাত্র সাধন হিসাবে ব্যবহার করিতেছি কিনা; তাহা যদি করি, তাহা হইলে আমাদের কাজ নৈতিক হিসাবে গর্হিত। প্রত্যেক মানুষের মাঝেই যে সব মহত্ত্বের বীজ স্বতঃসাধ্য মনুষ্যত্ব রহিয়াছে, তাহা কাজে কর্মে না মানিলে বস্তুতঃ নৈতিক নিয়মই লঙ্ঘন করা হয়। মনুষ্য মাত্রের আত্মার প্রতিই আমাদের শ্রদ্ধাবান হওয়া আবশ্যক।

আমরা বলিয়াছি, নৈতিক নিয়ম আমরা শুদ্ধপ্রজ্ঞা হইতে পাই। সুতরাং এক অর্থে নৈতিক নিয়ম আমাদের আত্মারই নিয়ম। তাহাই যদি হয়, তবে নৈতিক নিয়ম সম্পূর্ণভাবে পালন করা আমাদের পক্ষে এত কঠিন ব্যাপার কেন? তাহার কারণ এই যে, আমাদের সমস্ত সত্তা শুদ্ধপ্রজ্ঞাতেই পর্যবসিত নয়। প্রজ্ঞা ছাড়াও অন্য কিছু আমাদের মাঝে আছে। আমরা শুধু প্রজ্ঞামাত্রশরীর হইলে প্রজ্ঞার নিয়ম মানিয়া চলা আমাদের পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও আছে। দেহ বলিয়া যদি বাস্তব কিছু না মানা যায়, অবভাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তবুও সংবেদন শক্তি বলিয়া একটা কিছু মানিতে হয়, যাহার ফলে আমরা বাহ্য বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকি, আমাদের সুখ দুঃখ বোধ হয়। বাহ্য বিষয় আমাদের উপর অনুকূল প্রতিকূল ক্রিয়া করে বলিয়া তাহাদের

১। End in itself
২। Ends in themselves
৩। End
৪। Means

প্রতি আমাদের নানাবিধ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি[১] হইয়া থাকে। আমাদের মাঝে যেমন শুদ্ধপ্রজ্ঞা আছে, তেমনি আবার নানা বিষয়মুখী প্রবৃত্তিও রহিয়াছে। এই সব প্রবৃত্তি প্রাকৃত নিয়মানুসারে চালিত হইয়া থাকে, এবং তাহারা যে সব সময় নৈতিক নিয়মানুসারে চলে, তাহা নহে। অনেক সময়েই আমাদের প্রবৃত্তি নৈতিক নিয়মের বিপরীত দিকে চলে বলিয়াই নৈতিকবোধ তীব্রভাবে আমাদের মনে জাগিয়া থাকে। স্বভাবতঃই আমাদের প্রবৃত্তি-নিচয় নীতিপথগামী নয় বলিয়াই তাহাদিগকে নৈতিক নিয়মের দ্বারা সংযত করিতে হয়। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সুখলিপ্সাতেই চালিত হইয়া থাকে; এবং তাহাদ্বারা আমাদের আত্মপ্রীতিই[২] প্রকাশ পায়। যতক্ষণ না নৈতিকবোধ স্পষ্টভাবে জাগ্রত হয়, ততক্ষণ আমরা প্রায় নিজেকে নিয়াই বেশ সন্তুষ্ট থাকি। ইহাকে আত্মতৃপ্তি[৩] বলা যাইতে পারে। ইহা এক প্রকার আত্মাভিমান[৪]। যখন নৈতিকবোধ জাগ্রত হয় এবং আমরা নৈতিক নিয়ম সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন আমাদের আত্মপ্রীতি সংযত হইয়া আসে, কিন্তু আত্মতৃপ্তি ও আত্মাভিমান একেবারেই চলিয়া যাওয়ার কথা। নৈতিক নিয়মের আদর্শ যখন আমাদের মানস চক্ষের সামনে ভাসে, তখন আমরা কত যে নীচে পড়িয়া আছি, আমাদের ভিতরে যে গৌরব করিবার কিছু নাই, তাহা বুঝিতে পারি; তখন আর আমরা আমাদের নিজেকে নিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি না, আত্মাভিমানের মোহ ঘুচিয়া যায়। যে নৈতিক নিয়ম আমাদের আত্মাভিমান দূর করিয়া দেয়, তাহার প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধা[৫] না হইয়া পারে না। এই শ্রদ্ধাই আমাদের নৈতিক চরিত্রের মূল।

আগে বলা হইয়াছে, নৈতিক নিয়মের দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-গুলিকে সংযত করিতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি সংযত হইলেই নীতিমান হওয়া যায় না। আমাদের প্রবৃত্তি সংযত হইয়াছে বলিলে এই বুঝায় যে আমরা নৈতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কিছু করিতে প্রবৃত্ত হই না, কিন্তু তথাপি যাহা কিছু করি, তাহা প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়াই করিতে পারি। এমতাবস্থায় আমাদের কৃত কাজ নৈতিক নিয়মানুযায়ী হইলেও তাহার কোন নৈতিক মূল্য আছে বলা যায় না। যে কাজ আমরা প্রবৃত্তির প্রেরণায় করিলাম তাহার আবার নৈতিক মূল্য

১। Inclination ৩। Self-conceit
২। Self-love ৪। Self-complacency ৫। Respect

কি ? প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্রব না রাখিয়া শুধু নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ অর্থাৎ শুধু কর্তব্য বলিয়াই যাহা করা হয়, তাহারই নৈতিক মূল্য আছে। কর্তব্যবুদ্ধি ও প্রবৃত্তি বিজাতীয় পদার্থ। একমাত্র কর্তব্যবুদ্ধিতে যাহা করা হয়, তাহাকে নৈতিক কাজ বলা যাইতে পারে; প্রবৃত্তির প্রেরণায় যাহা করা হয়, তাহার কোন নৈতিক মূল্য নাই। কোন ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা থাকায় বা সহানুভূতি হওয়ায় যদি তাহাকে অর্থ সাহায্য করা হয়, তাহা হইলে সে কাজকে পরম নীতিমানের কাজ মনে করিয়া গৌরব বোধ করিতে পারা যায় না। কোন কাজের নৈতিকতা নির্ণয়ের সময় সাবধানে দেখিতে হইবে, কি রকম মনোভাব লইয়া সে কাজ করা হইয়াছে। কোন প্রকার প্রবৃত্তির বশে, ভীতি, প্রীতি বা সহানুভূতির প্রেরণায়, যদি কিছু করা হয়, তাহা হইলে সে কাজ নৈতিক নয়। একমাত্র নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যাহা করা হয়, তাহাকে নৈতিক কাজ বলা যায়। কর্তব্যবুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে এরকম বিচ্ছেদ রাখাতে কাণ্টের নৈতিক মতকে অনেকে অত্যন্ত কৃচ্ছ্র[1] বলিয়া দোষ[2] দিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছেন, কর্তব্য করিতে গেলেই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে করিতে হইবে। কাণ্ট্ কিন্তু ঠিক একথা বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন, নৈতিক কাজ শুধু কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই করিতে হইবে, প্রবৃত্তি-দ্বারা নয়। ইহার অর্থ এই নয় যে, আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি সব সময় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। প্রবৃত্তি অনুকূল কি প্রতিকূল, সে দিকে কর্তব্যবুদ্ধি লক্ষ্য করিবে না; প্রবৃত্তি-নিরপেক্ষ কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা আমরা নৈতিক কাজে চালিত হইব, ইহাই কাণ্টীয় শিক্ষা। কিন্তু ইহাদ্বারা ইহা বোঝা যায় না যে আমাদের প্রবৃত্তি কখনই কর্তব্যবুদ্ধির অনুকূল হইবে না। তবে একথা সত্য যখন আমরা প্রবৃত্তির প্রতিকূলে কর্তব্য করিয়া থাকি, তখনই আমাদের কাজের নৈতিকতা অতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যখন আমাদের প্রবৃত্তি কর্তব্যবুদ্ধির অনুকূল হয়, তখন আমরা যাহা করি, তাহা ঠিক কর্তব্যবুদ্ধিতে করিলাম, কি প্রবৃত্তির জন্য করিলাম, তাহা নিঃসংশয়ে বোঝা কঠিন। প্রবৃত্তির দ্বারা করিলেও ভাল কাজের যে কোন মূল্যই নাই, সে কথা কাণ্ট্ বলেন নাই। প্রবৃত্তিবশতঃ করিলেও ভাল কাজের মূল্য সব সময়ই আছে; তবে তাহার নৈতিক মূল্য নাই।

১। Rigorism

আমাদের সব প্রবৃত্তির মুলোচ্ছেদ করাই নৈতিক নিয়মের উদ্দেশ্য নয়। শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায়ই যাহাতে আমাদের ব্যবহার নিয়মিত না হয়, তাহাই নৈতিক জীবনের শিক্ষা। প্রবৃত্তির বশে আমরা যখন চলিয়া থাকি, তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্য মোটেই থাকে না। এই প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়াই নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু নৈতিক জীবনও কি বন্ধনময় নয়? নীতির বন্ধনও ত কঠিন বন্ধন। কাণ্ট্ বলিবেন, নৈতিক জীবনে নিয়মন আছে বটে, কিন্তু বন্ধন নাই। বন্ধনে পারতন্ত্র্য বোঝা যায়; কিন্তু নৈতিক নিয়ম আমারই অন্তরাত্মার নিয়ম হওয়াতে সে নিয়ম আমার কাছে বন্ধন নয়। বাস্তবিকপক্ষে শুদ্ধপ্রজ্ঞার বা আত্মার নিয়মে নিয়মিত হওয়া বা 'স্বনিয়মের'[১] নামই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য বা মুক্তি লাভ করাই আমাদের নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। যখন আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় চলিয়া থাকি, তখন প্রাকৃত নিয়মের বন্ধনেই থাকি। এই বন্ধনের উপরে উঠিয়া, আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য বা মনুষ্যত্ব[২] লাভ করাই নৈতিক জীবনের আদর্শ।

নৈতিক জীবন ত নৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত জীবনকেই বলা হয়। নৈতিক নিয়ম বিচার করিলে 'নিত্যবিধি'[৩]তেই দাঁড়ায়। এই বিধি শুদ্ধপ্রজ্ঞার বা আমাদের অন্তরাত্মারই বিধি। কিন্তু আমি যদি শুদ্ধপ্রজ্ঞামাত্র হইতাম, তাহা হইলে এই বিধির কোন অর্থ থাকিত না। যাহা আমার স্বভাবেরই নিয়ম, তাহা আমার কাছে বিধিরূপে বা আদেশরূপে আসিতে পারে না। আমি বাস্তবিক প্রজ্ঞামাত্রই নই, আমি সংসারেরও জীব বটে। তাহা হইলেই বা নৈতিক নিয়ম কি করিয়া খাটে? জগতে ত কার্যকারণের অচ্ছেদ্য বন্ধনই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে নৈতিক নিয়মকে কার্যকরী করার অর্থ কার্যকারণ সম্বন্ধকে বাতিল করিয়া দেওয়া। আমার প্রজ্ঞা যখন নৈতিক নিয়মে আমাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, তখন তাহার অন্য কোন কারণই থাকিবে না; স্বতন্ত্রভাবেই আমার প্রজ্ঞা আমার ইচ্ছা বা কাজকর্মের নিয়ামক হইবে। স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত নৈতিক নিয়ম সম্ভবপর নয়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য ও কার্যকারণ বন্ধন একত্র থাকিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমি যদি শুদ্ধ-প্রজ্ঞামাত্র হই, তাহা হইলেও নৈতিক নিয়ম থাকিতে পারে না; যদি

১। Self-determination ২। Personality ৩। Categorical Imperative

জাগতিক জীবমাত্র হই, তাহা হইলেও নৈতিক নিয়ম চলে না। তাই কাণ্ট্ বলেন, মানুষ উভয় জগতেরই অধিবাসী। শুদ্ধপ্রজ্ঞা হিসাবে পারমার্থিক জগতে[১] তাহার স্থান। সেখানে স্বাতন্ত্র্যই নিয়ম। পক্ষান্তরে সংবেদনশীল দেহেন্দ্রিয় নিয়া সে আবভাসিক[২] জগতে বাস করিতেছে। এখানে অচ্ছেদ্য কার্যকারণ সম্বন্ধই নিয়ম। আমারই দুই রূপ, এক পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক, আরেক আবভাসিক বা জাগতিক। পারমার্থিক জগতে আমি মুক্ত, স্বতন্ত্র; আবভাসিক জগতে আমি বদ্ধ। পারমার্থিক-আমির নিকট হইতেই নৈতিক বিধি আবভাসিক-আমি পায়। জাগতিক বন্ধন সব ছিন্ন করিয়া পারমার্থিক স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য।

বাস্তবিক আমাদের আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক স্বরূপের কথা আমরা প্রকৃতপক্ষে জানি না। স্বাতন্ত্র্য আমাদের পারমার্থিক ধর্ম; কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে কোথাও পাই না। আমাদের পারমার্থিক স্বাতন্ত্র্য আছে, একথার একমাত্র ভিত্তি নৈতিক বোধ। আমাদের পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক স্বরূপ জানিবার আর কোন লৌকিক মার্গ নাই। আমাদের যে ভালমন্দবোধ বা ধর্মাধর্মবোধ আছে, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা শুধু এই দৃশ্য বা আবভাসিক জগতের জীব নই; আমাদের পারমার্থিক সত্তাও আছে। অদৃশ্য পারমার্থিক জগতেরই বাণী নৈতিক বিধিরূপে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক সত্তা সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে। নৈতিকবোধই আমাদের আধ্যাত্মিকতার একমাত্র নিদর্শন ও প্রমাণ। আমাদের নিজেকে আমরা বাস্তবিক স্বতন্ত্র বলিয়া জানি না। কিন্তু যেহেতু স্বাতন্ত্র্য ব্যতিরেকে নৈতিকবোধের কোন অর্থই হয় না, তাই আমরা পারমার্থিক স্বাতন্ত্র্য মানিতে বাধ্য হই।

কাণ্ট্ বলিয়াছেন পারমার্থিক বস্তু[৩] কখনই জানা যায় না। এখানে যখন আমাদের পারমার্থিক স্বরূপের কথা বলা হইতেছে, তখন কি কাণ্টের ঐ মত অমান্য করা হইতেছে না? না। কাণ্টের কথার অর্থ, পারমার্থিক বস্তু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান[৪] সম্ভবপর নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কিছু

১। Noumenal world
২। Phenomenal world
৩। Noumenon
৪। Theoretical knowledge

ভাবিতে পারি না, বা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহা নহে। কান্টের মতে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থেরই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভবপর; পারমার্থিক বস্তু যখন ইন্দ্রিয়গম্য নয়, তখন তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই করিতে পারিব না এমন নহে। আমাদের পারমার্থিক স্বাতন্ত্র্য কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়। ইহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানীয় কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না সত্য; কিন্তু আমাদের নৈতিক জীবনের উপপত্তির জন্ম ইহা না মানিলেও আমাদের চলে না। এই হিসাবে ইহার মূল্য আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে।

দশম অধ্যায়

রস বিচার

প্রকৃতি বা দৃশ্যজগৎ বুদ্ধিরই রাজ্য; বুদ্ধি দ্বারাই জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতীন্দ্রিয় পরমার্থিক জগতে বুদ্ধির প্রবেশ নাই; বুদ্ধির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু ব্যবহারিক প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা পারমার্থিক জগতের কথাও বলিতে পারি। আমরা জানি দৃশ্যজগৎ কার্যকারণবন্ধনের নিয়মে চলিলেও অতীন্দ্রিয় জগতে স্বাতন্ত্র্যই নিয়ম। আমাদের যেন দুই পৃথক্ রাজ্য বা জগৎ নিয়া কারবার। দৃশ্য প্রাকৃত জগৎ বুদ্ধির রাজ্য, অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক জগৎ প্রজ্ঞার রাজ্য। এক জগৎ বুদ্ধিদত্ত প্রাকৃত নিয়মে চলে; অন্য জগতে প্রজ্ঞালব্ধ নৈতিক নিয়মেরই আধিপত্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দুইটি পৃথক্ জগৎ হইলেও, যখন দৃশ্যজগতের ঘটনাবলী বা আমাদের জাগতিক ব্যবহার নৈতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিবার বিধান আমরা করি, তখন দুই জগতের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ আমরা কতকটা অস্বীকার না করিয়া পারি না। আমরা তখন না ভাবিয়া পারি না যে, দৃশ্যজগতেও নৈতিক নিয়ম খাটিতে পারে; সুতরাং দৃশ্যজগৎ ও পারমার্থিক জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং যোগ রহিয়াছে। যখন আমাদের জাগতিক কার্যাবলী নৈতিক নিয়মেই চালিত করিবার বিধি বা আদেশ আমাদের অন্তরাত্মা হইতে পাই, তখন বুঝিতে হইবে দৃশ্যজগতের উপর পারমার্থিক জগতের আধিপত্য রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আমরা দুইটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন জগতের কথা না ভাবিয়া, তাহাদের মধ্যে যে ঐক্য ও সমন্বয় আছে, তাহাই ভাবিতে বাধ্য হই। এই সমন্বয় ও ঐক্যের কথা কাণ্টের রস বিচারে আরো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে হইয়া থাকে, নৈতিক জ্ঞান প্রজ্ঞার সাহায্যে হয়। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাঝখানে কাণ্ট্ এক তৃতীয় শক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাকে বিচারশক্তি[১] বলা যায়। আমরা এতক্ষণ বিচারকে

১। The Power of Judgment

বুদ্ধির কাজ বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছি, বুদ্ধির দ্বারা আমরা বিচারই করি। কাণ্ট্ এখানে বিচারশক্তি বলিয়া এক স্বতন্ত্র শক্তির কথা বলিতেছেন। এই বিচারশক্তির মাধ্যমেই তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে যোগস্থাপন করিয়াছেন, এই শক্তির আলোচনাতেই, প্রাকৃত জগৎ ও পারমার্থিক (নৈতিক) জগতের মধ্যে যে ঐক্য ও সমন্বয় হইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট আভাস দিয়াছেন।

জ্ঞান, সুখ ও ইচ্ছা কাণ্টের মতে আত্মার তিনটি মৌলিক ধর্ম। আজকাল মনোবিজ্ঞানেও মানসিক সব ব্যাপারকে এই রকম তিন ভাগে[১] বিভক্ত করা হয়। এর অনুরূপ কাণ্ট্ তিন শক্তির কল্পনা করিয়াছেন, যথা—বুদ্ধি, বিচার ও প্রজ্ঞা। বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, ইহা সহজেই বোঝা যায়। প্রজ্ঞাদ্বারা ইচ্ছাশক্তি (নৈতিক ব্যাপারে) নিয়মিত হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সুখের সহিত বিচারের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। এখন তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

বিচার বলিতে এক্ষেত্রে কাণ্ট্ ঠিক ঠিক কি বুঝিতেছেন, তাহাই আমাদের প্রথমে বুঝিতে হইবে। কাণ্ট্ জ্ঞান বিচারের সময়ও ('শুদ্ধপ্রজ্ঞার বিচার' গ্রন্থে) একবার এই বিচার শক্তির কথা বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছেন, এই বিচার শক্তির বলে আমরা কোন পদার্থ কোন নিয়মের মধ্যে পড়ে কি না তাহা বুঝিতে পারি। নিয়ম আমরা বুদ্ধি শক্তি হইতে পাই; কিন্তু কোন বস্তু সেই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কি না, সে কথা বুদ্ধি বলিয়া দিতে পারে না। তার জন্যও যদি বুদ্ধি নিয়ম করিয়া দেয়, তাহা হইলেও কোন্ ক্ষেত্রে ঠিক সেই নিয়ম খাটিবে, তাহা বুঝিবার জন্য আমাদের নিজ নিজ বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। কেহ তাহা শিখাইয়া দিতে পারে না। যাহার বিচার শক্তির অভাব, সে কোথায় কোন্ নিয়ম খাটে, তাহা ভাল বুঝিতে পারে না। কোনরূপ শিক্ষার দ্বারাই এই বিচারশক্তির অভাব পরিপূরণ করিতে পারা যায় না। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, গণিতাদি দুরূহশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিও সাধারণ বিষয়ে বা লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। কাণ্টের কথায় বলিতে হয়, এ রকম লোকের বুদ্ধি যথেষ্ট থাকিলেও, বিচারশক্তি তেমন ভাল নয়।

১। Thinking, Feeling, Willing

আমরা ধরিয়া নিতে পারি, বিশেষকে সামান্যের বা নিয়মের অধীনে আনাই বিচারশক্তির কাজ। কিন্তু নিয়ম যে সব সময় আগে জানা থাকে, তাহা নহে। নিয়ম আমাদের আগেও জানা থাকিতে পারে; আবার নিয়ম আমাদের খুঁজিয়া বা গবেষণা দ্বারাও বাহির করিতে হইতে পারে। নিয়ম যদি আমাদের আগে জানা থাকে, তাহা হইলে যে বিচারের দ্বারা তাহাকে ক্ষেত্রবিশেষে পরিচ্ছিন্ন করি বা লাগে বলিয়া বুঝিতে পারি, সে বিচারকে কাণ্ট্ পরিচ্ছেদক[১] বিচার বলিয়াছেন। আমাদের বৌদ্ধিক মূলসূত্রগত নিয়মের পরিচ্ছেদে এই রকম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। কার্যকারণ নিয়মের কথা আমরা আগেই জানি। পরিচ্ছেদক বিচারের সাহায্যে অনুভব-গোচর ক্ষেত্রবিশেষে তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকি। এখানেও ক্ষেত্র বিশেষকে নিয়মের অধীনে আনা হইল; কিন্তু এই নিয়মের জন্য আমাদের কোন গবেষনা করিতে হয় না। আমাদের প্রাকৃত জ্ঞান শুধু বৌদ্ধিক নিয়মাবলীর দ্বারাই হইয়া যায় না। ঐসব নিয়ম ব্যাতিরেকে প্রাকৃত জ্ঞান সম্ভবপর নয় বটে; কিন্তু ঐসব নিয়ম জানিলেই প্রকৃতিকে সম্যক্ জানা হইল, তাহা নহে। ঐসব নিয়মের দ্বারা সামান্য ভাবে, অতিব্যাপক ও সাধারণ ভাবে, প্রকৃতিকে জানা যায় মাত্র। প্রাকৃত পদার্থের বৈশিষ্ট্য ঐসব বৌদ্ধিক সাধারণ নিয়মের দ্বারা ব্যক্ত হয় না। আমরা জানি, কার্যকারণ নিয়ম সর্বত্রই খাটে। কিন্তু নিয়মই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে। সেই বিশেষ বিশেষ রূপ সাধারণ নিয়ম হইতে পাওয়া যায় না। তাহার জন্য বিশেষ বিচার ও গবেষণার দরকার। জাগতিক সব নিয়মই বৌদ্ধিক নিয়মানুযায়ী হইলেও, বৌদ্ধিক নিয়ম হইতে কিংবা শুধু বুদ্ধি হইতে তাহাদের উপলব্ধি হয় না। বৌদ্ধিক নিয়ম ব্যতীত যেমন প্রাকৃত জ্ঞানই সম্ভবপর নয়, এইসব বিশেষ নিয়ম সেই রকম নয়; তাহারা অন্য প্রকার হইলেও কিছু অসম্ভব হইত না। সুতরাং বৌদ্ধিক নিয়মকে যদি আবশ্যিক[২] বলিতে হয়, তাহা হইলে এগুলিকে বৈকল্পিক[৩] বলিতে পারা যায়, কেননা এই সব বিশেষ নিয়মের মধ্যে কোন রকমের অনিবার্যতা নাই; তাহারা অন্যপ্রকারও হইতে পারিত বলিয়া আমরা সহজে ভাবিতে পারি। স্বরূপতঃ তাহারা বৈকল্পিক হইলেও আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানের জন্য তাহারা অত্যাবশ্যক; কেননা প্রাকৃত

১। Determinant   ২। Necessary   ৩। Contingent.

ঘটনাসমূহ এই সব বিশেষ নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এবং এই বিশেষ নিয়ম না জানিতে পারিলে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞানই হয় না। এই সব নিয়ম বুদ্ধি হইতেই পাওয়া যায় না, আগেই বলা হইয়াছে। এরকম স্থলে বিশেষ নিয়াই আমাদের আরম্ভ করিতে হয় এবং বিশেষেরই নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা বিচারবলে তদুপযোগী নিয়মের আবিষ্কার করিতে হয়। এরকম ক্ষেত্রের বিচারকেই কাণ্ট্ বৈমর্শিক[১] বিচার বলিয়াছেন। যেখানে নিয়মকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিশেষকে নিয়মাধীন করিতে হয়, সেখানকার বিচারই বৈমর্শিক বিচার। (পরিচ্ছেদক বিচারের বেলায় নিয়ম আগেই জানা থাকে।) সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রেই এই বৈমর্শিক বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়; কেননা বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে সব নিয়মের কথা পাওয়া যায়, সেগুলি বৌদ্ধিক নিয়মানুযায়ী হইলেও, শুধু বুদ্ধি হইতে সেগুলিকে পাওয়া যায় না, গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিতে হয়।

বর্তমান ক্ষেত্রে কাণ্ট্ বিচার বলিতে এবম্বিধ বৈমর্শিক বিচারকেই বিশেষ করিয়া বুঝিতেছেন। এর মূলতত্ত্ব[২] কি, তাহাই এখন দেখিতে হইবে। আমরা জানিতে চাই, কিসের দ্বারা চালিত হইয়া বৈমর্শিক বিচার প্রাকৃতিক নিয়মান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, এবং এরকম নিয়ম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। কাণ্ট্ মনে করেন, এরকম প্রবৃত্তির মূলে যে ধারণা রহিয়াছে, সে ধারণা অর্থবত্তার[৩] ধারণা। এখানে অর্থ বলিতে উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। যার জন্য কিছু করা হয়, বা যার জন্য কিছু আছে, তাহাই তার অর্থ। রাম শব্দের অর্থ যেমন দশরথের পুত্র, কিংবা গো শব্দের অর্থ যে রকম গলকম্বলবান পশু সে রকম অর্থের কথা বলা হইতেছে না। ভোজনার্থে যখন খাদ্য সংগ্রহের কিংবা পুত্রার্থে দারপরিগ্রহের কথা বলা হয়, তখন যে রকম অর্থের কথা বুঝি সে রকম অর্থের কথাই এখানে বলা হইতেছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে যখন পুরুষার্থ বলা হয়, তখন এই বুঝি না যে, পুরুষ কথার মানেই ধর্ম, অর্থ ইত্যাদি। তখন বুঝি এগুলি মানবের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। কাণ্ট্ বলিতে চান যে, প্রকৃতিরও এরকম অর্থ[৪] আছে মনে করিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেই আমরা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কারে সমর্থ হই। প্রকৃতির

১। Reflective
২। Principle
৩। Purposiveness
৪। Purpose

মধ্যে এক পদার্থের সহিত অন্ত পদার্থের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে যখন কোন নিয়মের অধীনে আনিতে পারি, তখনই প্রকৃতিকে বুঝিলাম বলিয়া মনে হয়। যেখানে কোন নিয়ম নাই, সবই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেখানে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রকৃত অর্থে ঐ রকম বিশৃঙ্খলাবস্থ পদার্থ বুদ্ধির বিষয়ই হয় না, তাহা বুঝিয়াছি, বা বুঝিতে পারি বলিয়া বলিতে পারি না। নিয়মানুবর্তিতা ও বোধগম্যতা প্রায় একই কথা। নিয়মান্বেষী বৈজ্ঞানিক বিবিদিষার মূলে যেন এই ধারণাই রহিয়াছে যে আমাদের বুঝিবার উপযোগী করিয়াই, আমাদের বুদ্ধিগম্যতার[১] উদ্দেশ্যেই, কোন বুদ্ধিপূর্বকারী স্রষ্টা এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। প্রকৃতিকে আমরা বুঝি, ইহাই যেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য; আমাদের বুদ্ধিগম্যতাই যেন প্রকৃতির অর্থ। কাণ্ট্ বলিতেছেন যে, বাস্তবিক কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা জগৎকে এ রকমভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিংবা প্রকৃতির এ রকম বাস্তবিক কোন অর্থ আছে। তিনি শুধু বলিতেছেন, এ রকম অর্থ আছে মনে করিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে আমাদের গবেষণা ফলবতী হয়, জিজ্ঞাসাও চরিতার্থ হয়। জাগতিক অর্থবত্তা আমাদের মানসিক ধারণা মাত্র। তবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া গবেষণা করিলে আমাদের গবেষণা ফলবতী হয় বলিয়া এই ধারণাকে আমাদের জ্ঞান লাভের সহায়ক বলিতে পারা যায়।

জগতের অর্থ আছে, এই ধারণায় গবেষণার ফলে যখন আমাদের ধারণানুরূপ নিয়মাদি আবিষ্কারে সমর্থ হই, তখন আমাদের মনে একপ্রকারের নির্মল আনন্দ উদিত হয়। আমরা ভাবিয়া থাকি, প্রকৃতি ও আমাদের জ্ঞানশক্তির মধ্যে একপ্রকারের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, প্রকৃতি যেন আমাদের জ্ঞানশক্তির অনুরূপেই[২] রচিত হইয়াছে। এই ধারণা হইতেই আমাদের মনে আনন্দ হইয়া থাকে।

এই আনন্দ সম্পূর্ণ মানসিক; বিষয়ের সহিত ইহার উপাদানগত কোন সংস্রব নাই। মানসিক হইলেই যে বিষয়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না, তাহা নহে। আমাদের সংবেদনা[৩]ও মানসিক বটে, কিন্তু বিষয়ের সঙ্গে তাহার নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেননা বিষয়ের রূপ সংবেদনাতেই পাই; বিষয়টি শাদা কিংবা লাল, শক্ত কিংবা নরম, কটু কিংবা তিক্ত, সংবেদনা

১। Intelligibility ২। Adapted ৩। Sensation

হইতেই জানিতে পারি। সুখ কিংবা দুঃখ সংবেদনার মতই অনুভব বিশেষ হইলেও, দেখিতে পাওয়া যায়, কোন বস্তু দর্শনে আমাদের যে সুখ বা দুঃখ হয়, তাহা দ্বারা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান লাভই হয় না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা আমরা বস্তুগত কোন ধর্মই জানি না। যখন কোন সুন্দর বস্তু দেখি এবং সুন্দর বলিয়া বুঝি, তখন আমাদের আনন্দ না হইয়া পারে না। এই আনন্দে বিষয়ের কোন স্বরূপ ব্যক্ত হয় না। কি হইতে এই আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই এখানে জিজ্ঞাস্য। অনেকে মনে করিতে পারেন, সৌন্দর্য বস্তুর ধর্ম, এবং সৌন্দর্য হইতেই আনন্দ উৎপন্ন হয়। কাণ্টের মত তাহা নহে। যে বস্তু দর্শনে মনে এক বিশিষ্ট প্রকারের আনন্দ হয়, তাহাকেই সুন্দর বলা হয়। ইহা ব্যতীত সৌন্দর্যের অন্য অর্থ নাই। সুতরাং আনন্দানুভব হইলেই সৌন্দর্যবোধ হইতে পারে। এই আনন্দ কিসে হয়, তাহাই জানিতে চাহিতেছি। কাণ্টের মতে, প্রত্যক্ষ বা কল্পনায় কোন কোন বস্তু উপলব্ধির বেলায় আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানশক্তি অতি সমঞ্জসভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে। জ্ঞানশক্তির সমঞ্জস ক্রিয়া[১] বা ক্রিয়াগত সামঞ্জস্য হইতে আমাদের মনে এক বিশিষ্ট প্রকারের আনন্দের উদ্ভব হইয়া থাকে।

কাণ্টের মতে কল্পনাও একপ্রকার জ্ঞানশক্তি; কল্পনা ব্যতীত কোন জ্ঞান হয় না। বুদ্ধি ত জ্ঞানশক্তি বটেই। কল্পনাতে যখন কোন বিষয় মানস-চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করি, তখন যদি সেই বিষয় সর্বথা বুদ্ধিরও অনুকূল বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখনই আমাদের এক বিশেষ আনন্দ হইয়া থাকে। এ রকম স্থলে কল্পনালব্ধ বিষয়কেই সুন্দর বলা যায়। যে শক্তির বলে কোন বস্তুকে সুন্দর বলিয়া মনে করা হয় বা ভাবা যায়, তাহাকে রসবোধ[২] বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যে বৈমর্শিক বিচার করিয়া থাকি, তাহার মূলে প্রাকৃতিক অর্থবত্তার[৩] ধারণা রহিয়াছে। আমরা মনে করি, আমাদের জ্ঞান শক্তির সহিত প্রকৃতির এক প্রকারের সঙ্গতি বা আনুরূপ্য[৪] রহিয়াছে। যখন বাস্তবিক এই রকম আনুরূপ্য বা সামঞ্জস্য প্রতিভাত হয়, তখনই আমাদের মনে এক বিশিষ্ট প্রকারের আনন্দের অনুভব হয়। এই আনন্দজনক বিষয়কেই সুন্দর

১। Harmonious activity
২। Taste
৩। Nature Teleology
৪। Adaptation

বলা হয়। সৌন্দর্যবোধ আমাদের রসবোধেরই পরিচায়ক। দেখা যাইতেছে আনুরূপ্য, সামঞ্জস্য, বৈমর্শিক বিচারের মূলে যেই রকম আছে, সৌন্দর্যবোধের মূলেও সেই রকম আছে। বস্তুতঃ কাণ্টের মতে আমাদের রসবোধ বৈমর্শিক বিচারশক্তির এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তি মাত্র। তাই তিনি রসের আলোচনা বিচারশক্তির আলোচনারই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এখানে আমরা কাণ্টের রসবিচার[১] সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া জানিতে চাহিতেছি।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে জিনিস দেখিতে (প্রত্যক্ষে বা কল্পনায়) আমাদের ভাল লাগে, তাহাকেই সুন্দর বলি। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে জ্ঞানীয় বিচার[২] হইতে রসবিচার একেবারে ভিন্ন রকমের। জ্ঞানীয় বিচারে আমরা বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে জানিয়া থাকি, বিষয়গত ধর্মেরই জ্ঞান আমাদের হয়; কিন্তু রসবিচারে বিষয়টি আমাদের কি রকম লাগে তাহাই প্রকাশ করি। বিষয়গত গুণধর্মের কথা কিছুই বলি না, শুধু তার কল্পনা বা প্রত্যক্ষের দ্বারা আমাদের আনন্দ হয়, না দুঃখ হয়, তাহাই ব্যক্ত করিয়া থাকি।

যে বস্তু দেখিয়া আনন্দ হয়, তাহাকেই সুন্দর বলা হয়, অন্যথা নয়। কিন্তু এই আনন্দের কিছু বিশেষত্ব আছে। সন্দেশ খাইতে, এমন কি দেখিয়াও, আমাদের আনন্দ হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া সন্দেশকে সুন্দর বলা যায় না। এরকম স্থলে যে আনন্দ হয়; তাহা কখনই নিষ্কাম[৩] হয় না। সন্দেশ খাইবার যার একেবারেই ইচ্ছা নাই, সন্দেশের প্রতি যার একান্ত বিতৃষ্ণা রহিয়াছে, তার সন্দেশ দেখিয়া আনন্দ হয় না। সন্দেশ খাইতে যে আনন্দ হয়, তাহাও রসনেন্দ্রিয়ের উত্তেজনার ফলেই হইয়া থাকে। রসের আনন্দ বা সৌন্দর্যবোধের আনন্দ কায়িক উত্তেজনার ফলে হয় না। আমাদের জ্ঞান শক্তির সমঞ্জস ক্রিয়ার ফলে তাহা হইয়া থাকে, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে, রসের আনন্দ সম্পূর্ণ নিষ্কাম হওয়া আবশ্যক। যে পদার্থ শুধু কায়িক ভাবেই আমাদের কাছে প্রীতিকর,[৪] তাহাতে যে আমাদের আনন্দ হয়, সে আনন্দে সর্বদাই কামনা[৫] জড়িত থাকে। সে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু ভোগ করিবার বা দখল করিবার বাসনা আমাদের মনে উদ্রেক না হইয়া যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, সে আনন্দ রসের আনন্দ নয়,

১। Judgment of Taste
২। Judgment of knowledge
৩। Disinterested
৪। Agreeable, pleasant
৫। Interest

এবং সেই আনন্দদায়ক বস্তুকেও সুন্দর বলা যায় না। নৈতিক দৃষ্টিতে যাহা শুভ,[১] যাহা ভাল,[২] তাহাতে যে আনন্দ হয়, তাহাও একেবারে নিষ্কাম নয়। যাহা ভাল, তাহার কল্পনাতেই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিনা, তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার কামনা স্বতঃই আমাদের মনে জাগে। সে কামনা বিশুদ্ধ হইলেও তাহার কামনাত্ব অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং নৈতিক দৃষ্টিতে যাহা বাঞ্ছনীয়, তাহা আনন্দদায়ক হইলেও সে আনন্দ নিষ্কাম না হওয়াতে, যাহা শুধু ভাল, তাহাকে সুন্দর বলা যায় না। আসল কথা, যে বস্তু হইতে আমরা রসের আনন্দ পাই, তাহার কল্পনাতে বা ভাবনাতেই আমরা তুষ্ট হইয়া থাকি। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মনে অন্য কোন বাসনা জড়িত থাকে, তাহাকে ভোগ করিবার বা বাস্তবে পরিণত করিবার কামনা যদি আমাদের মনে জাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে আনন্দ রসের আনন্দ নয়, এবং সেই আনন্দদায়ক বস্তুও সুন্দরপদবাচ্য নয়। কায়িক ভাবে যাহা সুখকর[৩] কিংবা নৈতিক দৃষ্টিতে যাহা ভাল,[২] তাহার কল্পনা হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহার পর্যবসান আপনাতেই (আনন্দেতেই) হয় না। তাহার ফলে আরো কিছু করিতে আমরা স্বতঃই চাহিয়া থাকি; সুখকর বস্তুকে ভোগ করিতে চাই, ভালকে সত্যে পরিণত করিতে চাই, তাহাদের কল্পনাজন্য আনন্দেই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত থাকিতে পারিনা। সৌন্দর্যবোধের বা রসের যে আনন্দ সে আনন্দের পর্যবসান আপনাতে হয়। সে আনন্দের দ্বারাই আমরা তুষ্ট হইয়া থাকি, তাহার পরে সেই আনন্দদায়ক বিষয় সম্বন্ধে অন্য কিছু করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই আমাদের মনে জাগে না। যদি জাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের সেই রসবোধ শুদ্ধ নয়।

সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি, সে আনন্দ যখন আমাদের কায়িক সংবেদনা বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, কামনার উপর নির্ভর করে না, তখন আমরা ভাবিতে বাধ্য হই যে, সকলেই এই আনন্দ অনুভব করিবে। এই কথার অর্থ এই, যাহা সুন্দর, তাহা শুধু আমার কাছেই সুন্দর নয়, সকলের কাছেই সুন্দর। মনে রাখিতে হইবে, সৌন্দর্যবোধ এক বিশিষ্টপ্রকার আনন্দবোধেরই কার্য; কিন্তু সেই আনন্দ কোন ব্যক্তিগত

১। Good ২। Pleasant ৩। Good

বিশেষত্বের দ্বারা নিয়মিত না হওয়াতে, তাহাকে সার্বত্রিক[১] বলিয়া মনে করি। সেই জন্যই রসবিচারকে সার্বত্রিক জ্ঞানীয় বিচারের[২] মত একই রকম কথায় ব্যক্ত করি; তাহাতে মনে হয় যেন, সৌন্দর্য একপ্রকারের বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম, তাহা কিন্তু ভুল।

সব বিষয় সম্বন্ধেই সাধারণভাবে যে রকম (সামান্য[৩]) জ্ঞানীয় বিচার হইতে পারে, সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে রকম বিচার হয় না; অর্থাৎ সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমরা সামান্য[৩] বিধান করিতে পারি না। আমরা বলিতে পারি, সব পর্বতই পাষাণময়, সব কাকই কাল, কিংবা জার্মানেরা বুদ্ধিমান্; কিন্তু সৌন্দর্য সম্বন্ধে এরকম সামান্য বিচার চলে না। কোন রসবস্তু[৪] সাধারণ বা সামান্যস্বরূপে আমাদের কাছে আসে না। কল্পনায় বা প্রত্যক্ষে উপস্থাপিত ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকেই আমরা সুন্দর বা অসুন্দর বলিয়া নির্ধারণ করি। ব্যক্তি হিসাবেই রসের বিচার হইয়া থাকে; জাতি বা শ্রেণী হিসাবে হয় না। রসবিচারের বিষয়বস্তু সব সময়ই কোন না কোন ব্যক্তি[৫]। আমরা যখন বলি 'সব গোলাপই সুন্দর', তখন সাধারণভাবে ধরিলে, ইহা কোন জ্ঞানীয় বিচার হইতে ভিন্নরূপ নয়; কিন্তু রস বিচাররূপে বুঝিতে হইলে, বুঝিতে হইবে এই বিচার কতকগুলি বিচারের সমষ্টি মাত্র। সেই সব বিচারের প্রত্যেকটিই ব্যক্তি সম্বন্ধে। এই (ক) গোলাপ সুন্দর, এই (খ) গোলাপ সুন্দর, এই (গ) গোলাপ সুন্দর, এই রকম অনেকগুলি বিচারকে 'সব গোলাপ সুন্দর' বলিয়া ব্যক্ত করি মাত্র।

আমরা বলিয়াছি, জ্ঞানশক্তির সমঞ্জস ক্রিয়ার ফলে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহাই রসবিচারের ভিত্তি। জ্ঞানশক্তির এই সমঞ্জস ক্রিয়া কিরূপ এবং তাহা দ্বারা আনন্দ কি করিয়া হয়, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। জ্ঞানশক্তি বলিতে এখানে কল্পনা ও বুদ্ধিই বুঝিতে হইবে। কল্পনা দ্বারাই প্রাত্যক্ষিক উপাদান আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, এবং বুদ্ধি দ্বারা সেগুলি বিশেষ বিশেষ প্রকারে একীভূত হইয়া জ্ঞানীয় বিষয়ে পরিণত হয়। জ্ঞানে যখন বিষয় উপলব্ধি করি, তখন কল্পনার যে ক্রিয়া হয়, তাহা বুদ্ধির নিয়মানুযায়ীই হইয়া থাকে, এবং বৌদ্ধিক প্রকারই বিষয়ের অঙ্গীভূত হইয়া

১। Universal ২। Judgments of Knowledge or Logical Judgment
৩। Universal ৪। Aesthetic object ৫। Individual

আমাদের জ্ঞানে ভাসে। বিষয় জানিতে হইলে কল্পনাকে কার্যকারণাদি বৌদ্ধিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যাহা তাহা যে কোন প্রকারে কল্পনা করিয়া জ্ঞানের বিষয় পাওয়া যায় না। জ্ঞানের ব্যাপারে অবাধ কল্পনা চলে না। যে কয়টি বৌদ্ধিক প্রকার ও মূলসূত্র আছে, সেগুলি অনুসারেই কল্পনাকে চলিতে হয়। জ্ঞানে আমাদের কল্পনা সর্বথা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন আমাদের কল্পনা অবাধে চলিতে পারে, কোন বৌদ্ধিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, অথচ বুদ্ধির প্রতিকূলে চলে না, তাহার আনুকূল্যই করে, তখন তাহাদের মধ্যে, বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে, যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তাহাই রসবোধের মূল। বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে যে সামঞ্জস্য ঘটে, তাহা যে আমরা জ্ঞানে পাইয়া থাকি বা বুঝি, তাহা নহে। আমরা কল্পনাশক্তির ও বুদ্ধিশক্তির একপ্রকারের উদ্দীপনা মাত্র অনুভব করি; তাহারা অবাধে[১] ও অনির্দিষ্টভাবে,[২] কিন্তু সামঞ্জস্যের সহিত, ক্রিয়া করিতেছে, এইটুকুমাত্র বুঝিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানীয় বিষয়বোধেও বুদ্ধি ও কল্পনার ক্রিয়া হইয়া থাকে, এবং তখনও তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে, কিন্তু তখন তাহাদের ক্রিয়া অবাধে চলে না। কল্পনাকে বুদ্ধির নিয়মন মানিয়া চলিতে হয়, এবং বুদ্ধিক্রিয়ার ফলে এক নির্দিষ্ট প্রকারের বিষয়বোধ জন্মে। কিন্তু রসবোধে সে রকম কোন নির্দিষ্ট প্রকারের বিষয় পাওয়া যায় না। আমরা রসবস্তুকে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু সৌন্দর্য বিষয়ের কোন নির্দিষ্ট প্রকারই নয়। আমাদের জ্ঞানশক্তি যখন অবাধে ও অনির্দিষ্টভাবে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সহিত ক্রিয়া করিতে থাকে, তখন আমাদের মনে যে এক বিশিষ্ট প্রকারের প্রীতিকর অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহাকে রসাত্মক আনন্দ বলা হইয়াছে।

সকল মানুষের জ্ঞানশক্তি যখন একরূপ, তখন সেই শক্তির একরূপ ক্রিয়ার সহগামী অনুভবও একরূপ হয়। সেই জন্যই আমাদের রসবোধ পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করিতে পারি। একই বস্তুকে সকলেই সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, অন্ততঃ সৌন্দর্যবিষয়ে পরস্পরের বোধগম্য আলোচনা চলিতে পারে। আমাদের রসবোধ যদি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হইত, ব্যক্তিবিশেষের অসাধারণ ক্ষমতার উপর যদি নির্ভর করিত, তাহা হইলে রসবিষয়ে আমাদের

১। Free ২। Indefinite

মনোভাব পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করিতে পারিতাম না। আমরা যখন কোন বস্তুকে সুন্দর বা অসুন্দর বলি, তখন আমরা এই মনে করি না যে, সে বস্তু শুধু আমাদের ব্যক্তিগত রুচির অনুকূল বা প্রতিকূল। আমরা মনে করি, যে বস্তুকে আমরা সুন্দর বলিতেছি, সকলেই তাহাকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিবে। যদি দেখান হয় যে, অনেকেই তাহাকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা হইলে আমরা বলিব, তাহাদের স্বীকার করা উচিত। এই ঔচিত্যের[১] অর্থ নৈতিক ঔচিত্যের মত নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভবতাও ইহাতে নাই। আমরা যেমন নৈতিক নিয়ম পালন করিতে বাধ্য কিংবা কোন জড় বস্তু যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম পালন না করিয়াই পারে না, সেই রকম বাধ্য হইয়া কোন বস্তুকে সুন্দর বা অসুন্দর বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে, এমন নহে। কোন বস্তুকে যখন সুন্দর বলিয়া মনে করি, তখন তাহা সকলের কাছেই সুন্দর বলিয়া লাগিবে ইহাই আমাদের ধারণা। সৌন্দর্য বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গত ধর্ম না হইলেও, আমরা যে রসবিচারের জন্য একপ্রকারের অবশ্যম্ভবতা ও সার্বত্রিকতার দাবী করিতে পারি, তাহার অর্থ এই যে, আমাদের রসবিষয়ে একপ্রকার সাধারণ বোধ[২] রহিয়াছে, যাহাতে সকলের পক্ষে এরকম সদৃশবিচার সম্ভবপর হয়। ইহার মূল অর্থ এই যে, সব মানুষেরই জ্ঞানশক্তি এক প্রকারের, এবং তজ্জনিত অনুভূতিও এক রকম না হইয়া পারে না।

কিন্তু জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াদ্বারা এক বিশিষ্ট প্রকারের অনুভূতি কি করিয়া জন্মায়? মনে রাখিতে হইবে রসাত্মক আনন্দের অনুভূতি রূপ স্পর্শ বা গন্ধের অনুভূতির মত নয়। জড় বা ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের দ্বারা এই সব অনুভূতি উৎপন্ন হয়। রসাত্মক আনন্দ জ্ঞানীয় কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়, বৈষয়িক কারণের দ্বারা নয়। আমাদের জ্ঞানশক্তি যখন অনাবদ্ধ[৩] (মুক্ত) ও সমঞ্জসভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, তখন সেই অবাধ সমঞ্জস ক্রিয়ার ফলে স্বতঃই আমাদের আনন্দ হইয়া থাকে। কি করিয়া এ আনন্দ হয়, কাণ্ট্ এক দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মনে আছে, ব্যবহারিক প্রজ্ঞার ক্রিয়ার ফলে নৈতিক নিয়মের প্রতি আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়; শ্রদ্ধাও ত অনুভূতি বিশেষ; সেইরকম জ্ঞানশক্তির সামঞ্জস্যময়

১। Ought ২। Common ৩। Free

ক্রিয়ার ফলে রসাত্মক আনন্দের উদ্ভব হইয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে এই, নৈতিক ব্যাপারে অনুভব (বিশুদ্ধ) কামনার জনক; নৈতিক নিয়মের প্রতি যখন শ্রদ্ধা জন্মে, তখন যাহা নৈতিক দৃষ্টিতে ভাল, তাহা বাস্তবে পরিণত হউক, এই রকম কামনা আমরা আন্তরিকভাবে না করিয়া পারি না। কিন্তু রসব্যাপারে আমাদের অনুভব (আনন্দ) সম্পূর্ণ নিষ্কাম। রসবস্তুর অনুধ্যানেই[১] আমরা তৃপ্ত হইয়া থাকি। মনে রাখিতে হইবে, এই রসাত্মক আনন্দ কায়িক উত্তেজনা বা বৈষয়িক কামনা প্রসূত নহে। জ্ঞানশক্তির এক বিশিষ্ট প্রকারের ক্রিয়াতেই এই আনন্দের উদ্ভব হয়।

কাণ্টের সময়ে রসবিচারে সুন্দর বলিতে কি বুঝায়, তাহার যেমন আলোচনা হইত তেমনি সুমহান্[২] বলিতে কি বোঝা উচিত তাহারও আলোচনা হইত। আমরাও এখন সুমহান্ বলিতে কি রকম পদার্থ বুঝায়, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, আমরা কি রকম বস্তুতে সুমহত্তার[৩] আরোপ করিয়া থাকি। উত্তুঙ্গ পর্বত, বিশাল সমুদ্র, উত্তালতরঙ্গময় জলরাশি বা প্রকাণ্ড বেগময় জলপ্রপাতকে আমরা সুমহান্ আখ্যা দিয়া থাকি। যেখানে অসীম শক্তি বা অসীম বিশালতার পরিচয় পাই, তাহাকেই সুমহান্ বলি। পরিমাণ[৪] (বিশালতা, বিস্তার) ও শক্তিভেদে[৫] সুমহান্‌কে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহাদিগকে যথাক্রমে পারিমাণিক[৬] ও শাক্তিক[৭] বলা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আমরা উত্তুঙ্গ গিরিমালায়, বিশাল সমুদ্রে বা আকাশে পাই; দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত বেগময় অতিকায় জলপ্রপাতে বা উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রে পাওয়া যায়।

আমরা সৌন্দর্যের বিচারে দেখিয়াছি, সৌন্দর্য বস্তুগত কোন ধর্মই নয়; তথাপি বস্তুর সঙ্গে সৌন্দর্যের বিশেষ কোন সংস্রব আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সুমহত্তা, কাণ্টের মতে, বস্তুতে একেবারেই নাই। বাস্তবিক জাগতিক কোন পদার্থই সুমহান্ হইতে পারে না। বাহ্যবস্তু, আমাদের সুমহান্ বোধের উপলক্ষ মাত্র। কোন কোন পদার্থের দর্শনে আমাদের মনে সুমহানের ধারণা জাগিয়া উঠে, এইমাত্র বলিতে পারা যায়; কিন্তু

১। Contemplation
২। Sublime
৩। Sublimity
৪। Magnitude
৫। Power
৬। Mathematical
৭। Dynamical

সেই সেই পদার্থই যে সুমহান্ তাহা মোটেই নয়। আমরা আগে বলিয়াছি, যেখানে অসীম শক্তি বা বিশালতার পরিচয় পাই, তাহাকে সুমহান্ বলি; কিন্তু কোন বাস্তব পদার্থেই অসীম শক্তি বা অসীম বিশালতা থাকিতে পারে না। বস্তুগত শক্তি বা বিশালতা যতই বেশী হউক না কেন, সর্বদাই সসীম হইবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, সুমহত্ত্বার ধারণা আমরা বস্তু হইতে পাই না, আমাদের মন হইতেই উদ্বুদ্ধ হয়। তাহা কি করিয়া সম্ভবপর হয়?

আমরা সৌন্দর্যের আলোচনায় দেখিয়াছি, যে বস্তু উপলব্ধি করিতে গিয়া আমাদের বুদ্ধিশক্তি ও কল্পনাশক্তি সমঞ্জস ভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাকেই আমরা সুন্দর বলি। কল্পনা ও বুদ্ধির সামঞ্জস্যময় ক্রিয়ার উপরই সৌন্দর্যবোধ নির্ভর করে। যে ক্ষেত্রে আমাদের মনে সুমহানের বোধ জাগিয়া উঠে, সে ক্ষেত্রে কিন্তু ঐরকম সামঞ্জস্যময় কোন ক্রিয়ার লক্ষণই পাওয়া যায় না। বাস্তবিক সে ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য না থাকিয়া, বরং বিরোধই থাকে, সে বিরোধ বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে নয়, কল্পনা ও প্রজ্ঞার মধ্যে। আমরা যখন দেখি, আমাদের পুরঃস্থিত কোন বস্তুর সম্যক্ বা সমগ্র ভাবে কল্পনা করিতে গিয়া আর পারিয়া উঠিতেছি না, তখন আমরা সাময়িক-ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ি ও স্তব্ধ হইয়া থাকি। কিন্তু এই স্তব্ধ ভাব স্থায়ী হইতে পারে না। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন পুরোবর্তী পদার্থকে কল্পনা দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি না, তখন এই ব্যর্থতার আঘাতেই যেন আমাদের প্রজ্ঞাশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার স্বকীয় প্রকল্পনা সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তোলে। সমগ্র, স্বতন্ত্র, অসীমের প্রকল্পনা আমরা প্রজ্ঞা হইতেই পাই। যখন আর কোন ধারণা দ্বারা সম্যক বা সমগ্র ভাবে পুরোবর্তী বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারা গেল না, আমাদের কল্পনাশক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়িল, তখন আমাদের মনে অসীমের ধারণা জাগিয়া উঠে। তখন দেখি, যে অতন্ত্রিত সমগ্রের প্রকল্পনা প্রজ্ঞা হইতে পাই, তাহাকে কল্পনাতে রূপ দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। এইখানেই হইল কল্পনা ও প্রজ্ঞার মধ্যে বিরোধ। আমরা প্রজ্ঞা হইতে যাহা পাই, কল্পনাতে তাহার রূপ দেওয়া যায় না; অর্থাৎ তাহার কল্পনাই করিতে পারা যায় না।

একথা ত আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি, যাহা অসীম, তাহার কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু একথা বুদ্ধি দ্বারা বোঝা এক জিনিস, আর অনুভবে উপলব্ধি করা অন্য জিনিস। আমাদের কল্পনাশক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা

করিয়াও যখন অসীমকে রূপ বা আকার দিতে পারে না, তখনই বাস্তবিক অসীমের অকল্পনীয় স্বরূপের আনুভবিক উপলব্ধি হয়। ইহা হইতেই সুমহান্ বোধ জন্মে।

সমস্ত রসব্যাপারই অনুভবের জিনিস। আমাদের কল্পনাশক্তি যখন অসীমকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়, তখনই অসীমের কল্পনাতীত স্বরূপের অনুভব হয়। জ্ঞানে, বিশেষতঃ বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানে, ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব সর্বদা বর্তমান থাকে। রসবোধ যে অনুভবের প্রয়োজন, সে অনুভব ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব নয়; সে অনুভবকে শুদ্ধ বা আধ্যাত্মিক বলিতে পারা যায়। জ্ঞানশক্তির ক্রিয়ার ফলে এই অনুভব হয়। এই অনুভবের মূলে কল্পনাশক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান। কল্পনা ব্যতিরেকে রসবোধ জন্মে না। সৌন্দর্যের বেলায় কল্পনাশক্তি সাফল্যের সহিত বুদ্ধ্যনুযায়ী ক্রিয়া করিতে থাকে; বুদ্ধিতে ও কল্পনাতে কোন বিরোধবৈষম্য থাকে না। সুমহত্ত্বার বেলায় কল্পনা প্রজ্ঞার অনুসরণ করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রজ্ঞাজন্য অতীন্দ্রিয় অসীমের কাল্পনিক রূপ দিতে গিয়া বিফলকাম কল্পনা আমাদিগকে অসীমের কল্পনাতীত স্বরূপ সম্বন্ধেই সচেতন করিয়া তোলে। ইহাই সুমহত্ত্বাবোধের প্রাণ। সহজ কথায় যে বস্তুর কল্পনাজন্য অনুভবে আমাদের মনে অসীমের বোধ জাগে তাহাকে আমরা সুমহান্ বলি।

প্রথমতঃ বাহ্যবস্তুর বিশালতায় বা ভীষণতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। এমন কি আমাদের ক্ষুদ্র কায়িক সত্তা লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠে। সমুদ্রবক্ষে ভীষণ ঝড়ের ভিতরে এরকম ভাব খুবই স্বাভাবিক। এরকম অবস্থায় সুমহত্ত্বার বোধ আমাদের জন্মে না। এই প্রাথমিক অভিভবের অবস্থা কাটিয়া গেলে আমাদের প্রজ্ঞাদত্ত মাপকাঠিতে বিচার করিতে গিয়া যখন দেখি, বাহ্যপদার্থ আপাতদৃষ্টিতে যতই বিশাল বা মহান্ হউক না কেন, আমাদের অন্তর্নিহিত অসীমের তুলনায়, অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, তখনই বাস্তবিক সুমহানের বোধ জন্মে। যখন বাহ্যপদার্থের বিশালতায় বা ভীষণতায় অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন বাহ্য প্রকৃতির কাছে আমাদের জড় সত্তার ক্ষুদ্রতাই উপলব্ধি করি। পরক্ষণেই যখন অভিভবের অবস্থা কাটিয়া গিয়া প্রজ্ঞার বিচারে, অসীমের তুলনায়, বাহ্যপদার্থকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয় তখন আমাদের অজড় প্রকৃতির মহীয়ানভাব উপলব্ধি করিয়া থাকি। ইহার নামই সুমহানের বোধ। ইহাও একপ্রকারের রসবোধ বটে; কিন্তু সৌন্দর্যবোধে

যে রকম আনন্দ রহিয়াছে, ইহাতে সে রকম আনন্দ আছে, বলা যায় না। স্থমহান্ বোধে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাবই বেশী আসে। নৃত্যগীতাদির মত স্থমহান্ কল্পনারাজ্যের সহজ লীলা বা খেলার বিষয় নয়। ইহা অতি গুরু-গম্ভীর বিষয়। তাই যেখানে আমাদের স্থমহান বোধ হয়, সেখানে কোন প্রকারের চাকচিক্য লালিত্য বা লাবণ্যের আশা করি না।

কল্পনা দ্বারা যে বস্তুকে আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না, তাহাকে স্থমহান্ বলা হয়। এ কথার অর্থ কি? আমাদের কল্পনাশক্তি ত অনেকটা নিরঙ্কুশ, আমরা যাহা খুসী কল্পনা করিতে পারি; অতি বৃহৎ হইতে বৃহত্তরের কল্পনা করিতে আমাদের বাধে না। তবে কোথায় আমাদের কল্পনাশক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়ে? জ্ঞান ব্যাপারে কল্পনা সর্বদাই সফলকাম; যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা কল্পনাও করিতে পারা যায়। এ ক্ষেত্রে কল্পনা বৌদ্ধিক প্রকারানুযায়ীই ক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবেই জানিয়া থাকি, কখনই অখণ্ড সমগ্রকে জানি না। যাহা কিছু জানি, তাহার আগে ও পরে বাহিরে ও ভিতরে, অনেক কিছু অজানা থাকে। সমগ্রভাবে জানিবার প্রেরণা প্রজ্ঞা হইতে আসে, আর প্রজ্ঞাজন্য প্রকল্পনার সাহায্যেই সমগ্রকে জানিতে পারা যায়। প্রজ্ঞানুযায়ী কল্পনা করিতে গিয়াই আমাদের কল্পনাশক্তি পরাভূত হইয়া পড়ে। চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত পদার্থ যখন অতি বিশাল, অতি উচ্চ বা অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়, তখনই আমাদের তাহাকে সমগ্রভাবে জানিবার প্রবৃত্তি হয়। সমগ্রভাবে জানার অর্থ প্রজ্ঞাজন্য প্রকল্পনার সাহায্যে জানা। কিন্তু তদনুযায়ী কল্পনা করিতে গিয়া আমাদের কল্পনাশক্তি সম্পূর্ণ বিফল হইয়া পড়ে। আমাদের প্রাজ্ঞানিক ধারণাকে[১] চরিতার্থ করিতে পারে, এমন কিছুর কল্পনাই আমরা করিতে পারি না। আমাদের চোখের সামনে যাহা ভাসিতেছে, তাহার কল্পনা করিতে পারি না, এমন নহে; অথবা কোন সুবৃহৎ পদার্থ হইতে বৃহত্তর পদার্থের কল্পনা করিতে পারি না, তাহাও নহে। কিন্তু অবাধ কল্পনাদ্বারাও আমাদের প্রাজ্ঞানিক ধারণাকে চরিতার্থ করিতে পারি না, অসীমের অতীন্দ্রিয় কল্পনাকে রূপ দিতে পারি না। এইখানেই আমাদের কল্পনাশক্তির ব্যর্থতা। জাগতিক যে কোন পদার্থের কল্পনা আমরা করিতে পারি; সুতরাং আমাদের কল্পনাশক্তি একপ্রকার অপরিসীম বলিলেও

১। Idea of Reason

চলে। কিন্তু এই কল্পনাশক্তিও যখন আমাদের অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয়ভাবের দৃশ্যরূপ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়া পড়ে, তখন আমরা যাবতীয় বাহ্য দৃশ্যের তুচ্ছত্ব এবং আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয়ভাবের সুমহত্তা উপলব্ধি না করিয়া পারি না। বাস্তবিক দৃশ্য কোন বিষয়ই সুমহান্ নয়, আধ্যাত্মিকভাবই সুমহান্। কিন্তু যে দৃশ্যের সম্মুখে আমাদের সুমহত্তার বোধ জন্মিয়া থাকে, তাহাকেও ঔপচারিক অর্থে সুমহান্ বলা হয়।

প্রজ্ঞা যাহা চায়, কল্পনা তাহা দিতে পারে না। কল্পনা চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়া পড়ে; ইহা হইতেই সুমহানের বোধ জন্মে। এই যে প্রজ্ঞার দাবী মানিয়া লইয়া কল্পনা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়া পড়ে, ইহা হইতে কাণ্ট্ আরেকটি গূঢ় তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রজ্ঞা কি নিয়া আসে? প্রজ্ঞা অতীন্দ্রিয় অসীমের ভাব নিয়া আসে। আর কল্পনা কি করিতে চেষ্টা করে? সেই অতীন্দ্রিয় অসীমের ভাবকে দৃশ্যরূপ দিতে চেষ্টা করে। কল্পনা ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু কার্যতঃ দৃশ্যকে যে অতীন্দ্রিয় ভাবানুসারে নিয়ন্ত্রিত বা পরিণমিত করিতে হইবে, এই দাবীই মানিয়া লওয়া হইল। (স্মরণ রাখিতে হইবে, দৃশ্য বলিতে কোন স্বতন্ত্র পারমার্থিক বস্তু বুঝায় না; দৃশ্য অবভাস মাত্র, আমাদের কল্পনানুসারে তাহার রূপান্তর হইতে পারে ও হইয়া থাকে।) ইহা হইতে এই বোঝা যায় যে, (আধ্যাত্মিক ব্যাপারে) আমাদের প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞালব্ধ ভাবেরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। তাহা যদি না হইবে, তবে কল্পনা প্রজ্ঞানুযায়ী চেষ্টাই করিতে যাইবে কেন? কল্পনাকে এক অর্থে দৃশ্যের জননী বলিলেও চলে। দৃশ্যকে অতীন্দ্রিয় ভাবের রূপ দিতে গিয়া কল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু এই ব্যর্থ চেষ্টা হইতে আমরা এই আভাসই পাই যে, দৃশ্যজগৎ অতীন্দ্রিয় ভাবের বাহন হইতে পারে, এবং সে রকম বাহন হওয়াতেই তাহার সার্থকতা। কাণ্টের নৈতিক শিক্ষার মূলমন্ত্রও তাই। অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করাই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। প্রত্যেক নীতিমান ব্যক্তি দৃশ্যের বিদ্যমান রূপের প্রাধান্য না মানিয়া তাহাকে অতীন্দ্রিয় আদর্শানুসারে পরিণমিত করিতে চান। আমাদের অন্তর্নিহিত (প্রজ্ঞালব্ধ) অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত ভাবকে দৃশ্যজগতে ফুটাইয়া তুলিবার অনবরত চেষ্টাই নৈতিক জীবনের অর্থ। সুতরাং কাণ্ট্ বলিতে চান যে প্রকৃত রসবোধ ও নৈতিক জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন, যাহার রসবোধ বেশী, তাহার নৈতিক জীবন অনেকটা শিথিল হইয়া থাকে। কাণ্টের

মত তাহা নহে। তিনি মনে করেন, রসবোধ, বিশেষতঃ সুমহানের বোধ, আমাদের নৈতিক জীবনের পরম সহায়ক। রসবোধের পরিণতি বা পর্যবসান নৈতিক জীবনে হইতে পারে বলিয়াই কাণ্ট্ রসবোধের বা রসচর্চার এতটা মূল্য দিয়াছেন। আমাদের বুঝিতে হইবে, রসবোধ এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার। সৌন্দর্যবোধে আমরা এক প্রকার আনন্দ বা সন্তোষের পরিচয় পাই। সে সন্তোষ বিষয়নিরপেক্ষ। বাহ্য কোন জড় পদার্থের জড় স্বরূপের উপর সে আনন্দ নির্ভর করে না। বিষয়ের প্রভাবের বা পীড়নের উপর উঠিতে পারাই আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। আমরা যে পরিমাণে বিষয়ের দাস, সেই পরিমাণে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক স্বরূপ সম্বন্ধে সংজ্ঞাহীন। রসবোধের ভিতর দিয়াই আমরা বিষয়কে উপেক্ষা করিতে শিখি এবং নৈতিক জীবনেই ইহার পরিণতি হয়। যাহার শুদ্ধ রসবোধ আছে, তাহার আত্মা একেবারে মলিন হইতে পারে না। যাহার নৈতিক জীবন যত উচ্চ, তাহার রসবোধও তেমনি স্পষ্ট ও শুদ্ধ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমাদের প্রকৃত রসবোধ জন্মাইতে বা বাড়াইতে হইলে আমাদের নৈতিকভাব পোষণ ও অনুশীলন দরকার।

একাদশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক অর্থবত্তা

কাণ্ট্ যে গ্রন্থে[১] রসবিচার করিয়াছেন, সে গ্রন্থেই প্রাকৃতিক বা জাগতিক অর্থবত্তারও বিচার করিয়াছেন। রসবিচার বলিতে শিল্পকলার বিচারই বুঝায়। শিল্পকলার বিচার করিতে করিতে জাগতিক[২] অর্থবত্তার বিচার কিরূপে উঠিল, এ রকম প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিতে পারে। কেননা রস-বিচার ও জগতের কোন্ অর্থ আছে কি না, অর্থাৎ জগতের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে কি না—এই বিচারের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে পারি না। শিল্পকলার মাঝেও যে একরকমের অর্থবত্তা আছে, তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। জগতের মাঝে যে অর্থ-বত্তার কথা কাণ্ট্ বিচার করিয়াছেন, সে অর্থবত্তা প্রথমতঃ প্রাণিজগতে বা জীবজন্তুর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। রসবস্তু বা শিল্পকলার ও জীবজন্তুর মধ্যে যে একটা গভীর সাদৃশ্য আছে, তাহা কাণ্টের আগে অন্য মনীষীরাও লক্ষ্য করিয়াছেন। এই অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের ফলেই কাণ্ট রসবিচার করিতে করিতে প্রাণিবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মহামতি গয়টে শিল্পকলার একজন অতি শ্রেষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তিনি প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও গবেষণা করিয়াছেন। কাণ্টের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই তিনি প্রথম বুঝিলেন, কি করিয়া তাঁহার মত রসের উপাসকও প্রাণিতত্ত্বে আকৃষ্ট হইতে পারে। সে যাহাই হউক, জগতে কি রকম অর্থবত্তা বা উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই এখন আমরা জানিতে চাই।

রসবস্তুতে যে অর্থবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অনেকটা আমাদের মনোগত[৩]। আমাদের বোধ বা কল্পনাশক্তির অনুরূপ বলিয়া রসবস্তুকে আমরা অর্থবান মনে করি। আমাদের বুদ্ধি বা মনের অনুরূপ হওয়াই যেন রসবস্তুর অর্থ বা উদ্দেশ্য। এই অর্থবত্তা বুদ্ধিনিরপেক্ষভাবে বোঝা যাইতেছে না। কিন্তু

১। Critique of Judgment
২। Natural Teleology or Teleology in the world
৩। Subjective

সব সময় বস্তুর অর্থ বা উদ্দেশ্য বুদ্ধিগতই হইবে এমন নয়; বিষয়গতও হইতে পারে। এক বিষয়ের জন্য বা উদ্দেশ্যে অন্য বিষয় উৎপন্ন হইতে পারে। সে রকম স্থলে এক বিষয়ের দ্বারাই অন্য বিষয়ের অর্থবত্তা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই রকম বিষয়গত[১] অর্থবত্তার মধ্যেও প্রকারভেদ থাকিতে পারে। বাণ্টিক সমুদ্রের জল সরিয়া যাওয়াতে অনেক জায়গা ব্যাপিয়া বালুকাস্তর পড়িয়া ছিল এবং ঐ বালুকাময় ভূমিতে এক রকমের সরল গাছ জন্মিয়া ছিল। ঐ রকম সরল গাছ বালুকাময় স্থান ব্যতীত ভাল জন্মিতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে বলিতে পারা যায়, সরল গাছ জন্মিবার জন্যই যেন বালুকাস্তর পড়িয়া ছিল, এবং ঐ রকম বালুকাস্তর পড়িবার জন্যই সমুদ্র সরিয়া গিয়াছিল; অর্থাৎ বালুকাস্তরের উদ্দেশ্যেই সমুদ্র সরিয়া গিয়াছিল এবং সরল গাছের উদ্দেশ্যেই বালুকাস্তর পড়িয়া ছিল। এমনও বলিতে পারা যায় যে, তৃণভোজী পশুর জন্যই ঘাস জন্মিয়া থাকে, আবার মাংসাশী পশুর জন্যই তৃণভোজী পশুর সৃষ্টি। এই সব স্থলে এক বিষয়ের অর্থ, সার্থকতা বা উদ্দেশ্য অন্য বিষয়ে পাওয়া যাইতেছে। সমুদ্র সরিয়া যাইবার অর্থ বা উদ্দেশ্য বালুকাস্তরে পাওয়া যায়, আর বালুকাস্তরের সার্থকতা সরলবৃক্ষ উৎপাদনে। এখানে উদ্দেশ্য বা অর্থবত্তা বিষয়গত হইলেও বাহ্য,[২] আভ্যন্তরীণ নয়। প্রত্যেকটির অর্থ বা উদ্দেশ্য তাহার বাহিরে পাওয়া যাইতেছে, তাহার ভিতরে নয়। ঘাসের উদ্দেশ্য গরু-ছাগলে, গরু-ছাগলের উদ্দেশ্য বাঘ-সিংহে। এই সব উদ্দেশ্য বা অর্থবত্তা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক[৩] একেবারে নিরপেক্ষ[৪] বা অন্তিম[৫] নয়। উপরের দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কোন কিছুরই অর্থবত্তা তার নিজের মাঝে নাই। ঘাস বলিয়া ঘাসের কোন সার্থকতা বা অর্থবত্তা নাই; ছাগলের কথা ভাবিলেই ঘাসের অর্থ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ঘাসের অর্থবত্তা আপেক্ষিক। কিন্তু ছাগলেরই কি নিজস্ব অর্থবত্তা আছে? তাও নাই। বাঘের ভোজনেই ছাগের সার্থকতা। কিন্তু এই রকম আপেক্ষিক অর্থবত্তা কতদূর টানিয়া নিতে পারা যাইবে? শেষে যদি কোন কিছুর নিজস্ব, নিরপেক্ষ অর্থবত্তা না থাকে, তাহা হইলে এই আপেক্ষিক অর্থবত্তার কোন সঙ্গতিই হয় না। কাণ্ট্ যখন প্রাকৃতিক বা জাগতিক অর্থবত্তার কথা বিচার করিতেছেন, তখন এই রকম বাহ্য এবং

১। Objective
২। External
৩। Relative
৪। Absolute
৫। Final

আপেক্ষিক অর্থবত্তার কথা তিনি ভাবিতেছেন না। আভ্যন্তরীণ, নিজস্ব, নিরপেক্ষ অর্থবত্তার কথাই তিনি ভাবিতেছেন। জগতে এমন কিছু আছে কি, যার অর্থ বা উদ্দেশ্য তার নিজের মাঝেই পাওয়া যায়?

কিন্তু কোন কিছুর এরকম উদ্দেশ্য বা অর্থের কথাই বা উঠে কিরূপে? প্রত্যেক বস্তুই ত যেমন আছে, তেমনই আছে; তার আবার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, উদ্দেশ্য বা অর্থের কথা না ভাবিলে অনেক জিনিসই আমরা বুঝিতে পারি না। উদাহরণার্থ সাধারণ ঘড়ির কথা ভাবিয়া দেখিতে পারি। সময় দেখার উদ্দেশ্য যদি কাহারও না থাকিত, তাহা হইলে কেহই এরকম একটি যন্ত্র তৈরী করিত না। ঘড়ির মধ্যে যে কাঁটা চাকা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া আছে, সময় দেখা রূপ উদ্দেশ্যই তাহার কারণ। এই উদ্দেশ্যের কথা না ভাবিয়া আমরা বাস্তবিক ঘড়িকে বুঝিতে পারি না। কাণ্ট্ বলেন, জগতে এমন অনেক বস্তু আছে, যাহাদের গঠন কোন উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা যায় না। প্রাণিজগতেই ইহা প্রকৃষ্টভাবে দেখিতে পারা যায়। বৃক্ষাদি প্রাণিশরীর (প্রাণ আছে বলিয়া বৃক্ষকেও প্রাণী বলা যাইতেছে) পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তাহার রচনায় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। কোন উদ্দেশ্য কল্পনা না করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান বুঝিতে পারা কঠিন।

যখন কোন কার্য[১] যান্ত্রিক কার্যকারণনিয়মে[২] উৎপন্ন হয় না, তখনই আমাদের উদ্দেশ্যের কল্পনা করিতে হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে, যান্ত্রিক কার্যকারণের নিয়মের দ্বারা সব কিছু বুঝিতে যাওয়াই মানবীয় বুদ্ধির[৩] ধর্ম। যখন এই নিয়মে কিছু বোঝা গেল না, তখন বুঝিতে হইবে বুদ্ধি দ্বারাই বোঝা হইল না। বুঝিবার চেষ্টা ত আমরা ছাড়িতে পারি না; বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে না পারিয়া আমরা প্রজ্ঞার[৪] দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করি। ব্যবহারিক[৫] ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাকে ইচ্ছাশক্তি রূপে[৬] পাওয়া যায়। এক অর্থে ইচ্ছা ব্যবহারিক প্রজ্ঞারই নামান্তর। ইচ্ছার কল্পনা দ্বারা কিছু বুঝিতে হইলে ইষ্টেরও কল্পনা করিতে হয়। যাহা আমাদের ইষ্ট তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই ইষ্ট বা উদ্দেশ্যের কল্পনা হইতেই ইচ্ছার প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। যদি আমাদের কোন

১। Product, Effect
২। Mechanical causality
৩। Understanding
৪। Reason
৫। Practical
৬। Will

প্রকারের ইষ্ট বোধ বা উদ্দেশ্যের ধারণা না থাকে, তাহা হইলে আমরা কি ইচ্ছা করিব? উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ইচ্ছাশক্তি পঙ্গু হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে না পারিয়া যখন আমরা প্রজ্ঞা দ্বারা কিছু বুঝিতে যাই, তখন তাহা উদ্দেশ্যপূর্বক গঠিত, নির্মিত বা (সাধারণভাবে) করা হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

যেখানে উদ্দেশ্যের কল্পনা করা হয়, সেখানে আমরা কিরকম লক্ষণ দেখিতে পাই? মানুষ উদ্দেশ্যপূর্বক যাহা করে তাহা হইতেই উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টির লক্ষণ অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা উদ্দেশ্যপূর্বক যখন কিছু করিতে সমর্থ হই, তখন আমাদের কৃত বস্তুদ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এরকম স্থলে উদ্দেশ্যকে আমাদের কৃত বস্তুর ফল বা কার্যরূপে পাই। একদিকে উদ্দেশ্য যেমন কৃত বস্তুর ফল বা কার্য, অন্য দিকে তেমন উদ্দেশ্যকে ঐ বস্তুর কারণও বলিতে পারা যায়; কেননা উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই ত বস্তু উৎপন্ন হইল, উদ্দেশ্য না থাকিলে বস্তু হইত না। এখানে দেখা যাইতেছে, যাহা কার্য, তাহাই কারণ। এই কথাই সাধারণ ভাবে এই রকম বলিতে পারা যায়, সেই প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেই উদ্দেশ্য নিহিত আছে, যাহা নিজেই নিজের কারণ এবং নিজেই নিজের কার্য[১]। একই বস্তু কি করিয়া কার্য ও কারণ দুইই হইতে পারে, সাধারণ বিচারে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কার্য ও কারণ সাধারণতঃ এক হয় না; নিজেই নিজের কারণ বা কার্য হওয়া ত সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না। তবে এ কথা কি করিয়া বুঝিতে হইবে? প্রথমে মনে রাখিতে হইবে, প্রাকৃতিক অর্থবত্তার[২] কথা প্রাণিজগতের, বিশেষতঃ প্রাণি-শরীরের[৩] সম্পর্কেই উঠিয়া থাকে। এই রকম শরীরের গঠন শুধু যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। প্রাণিদেহের জন্য সাধারণ ভাবে শরীর শব্দই ব্যবহার করা যাউক। শরীরের কি কি বিশেষত্ব আছে, তাহাই এখন দেখিতে হইবে। শরীর একটি সাবয়ব সমুদায়[৪] বিশেষ। যে কোন যান্ত্রিক সমুদায়[৫] হইতে ইহার অনেক পার্থক্য আছে। যেখানে কোন উদ্দেশ্য থাকে না, নিতান্ত যান্ত্রিক ভাবে যে সমুদায় গঠিত হয়, সেখানে অবয়ব বা অংশেরই প্রাধান্য; অবয়ব বা অংশকেই সমুদায়ের কারণ বলিতে পারা যায়, অবয়ব

১। Self-caused
২। Natural End
৩। Living organism
৪। Whole
৫। Mechanical Whole

হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। সমুদায় অবয়বের কারণ নয়, কেননা অবয়বের আগে ত সমুদায় নাই; এবং সমুদায় ছাড়াও অবয়ব অনায়াসে থাকিতে পারে। শারীর সমুদায়ে[১] কিন্তু এরকম নয়। এখানে অবয়ব যেমন সমুদায়ের কারণ, সমুদায়ও তেমনি অবয়বের কারণ বটে।

উদাহরণার্থ বৃক্ষশরীর ধরা যাউক। বৃক্ষশরীর এক সমুদায় বিশেষ; ডালপালা, শিকড়, পাতা প্রভৃতি তার অবয়ব বা অংশ। এইসব অবয়ব সমুদায়ের কারণ বটে; কেননা এইসব অবয়ব নিয়াই সমুদায় গঠিত, এবং তাহাদের ছাড়া সমুদায়ের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সমুদায়ও এখানে অবয়বগুলির কারণ, কেননা সমুদায়ে আছে বলিয়াই অবয়বগুলি তাহাদের নিজের স্বরূপ পাইয়াছে। বৃক্ষশরীরের বাহিরে শিকড় বা পাতার কোন অস্তিত্ব নাই, পাতা ও শিকড় রূপে তাহারা অন্যত্র থাকিতে পারে না। তাহাদের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া এবং এক কথায়, তাহাদের অস্তিত্ব সমুদায়ের দ্বারাই নিয়মিত হয়। সমুদায়ও তেমনি অবয়বের উপর নির্ভর করে। মানুষ-নির্মিত যন্ত্রাদিতেও এরকম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক ঘড়িতেই চাকা, কাঁটা প্রভৃতি অনেকগুলি অংশ থাকে। এই সব অংশ মিলিয়াই ঘড়িরূপ সমুদায় গঠিত হয়। ঘড়ির স্বরূপ ও সত্তা এই সব অবয়বের উপর নির্ভর করে। সুতরাং অবয়বগুলি সমুদায়ের কারণ। কিন্তু প্রত্যেক অংশের স্বরূপও বিশিষ্ট ক্রিয়া সমুদায়ের উপরই নির্ভর করে। বিশেষ বিশেষ ঘড়িতে বিশেষ বিশেষ রকম চাকা ও কাঁটা থাকে, এবং যে রকম ঘড়ি, তদনুরূপ কাঁটা ও চাকা হইয়া থাকে। সুতরাং এরকম সমুদায়ও অবয়ব বা অংশের কারণ।

এ পর্যন্ত যদিও মানুষনির্মিত যন্ত্র ও উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে সাম্য রহিয়াছে দেখা যায়, তথাপি যে প্রাকৃত সৃষ্টিতে উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলিয়া মনে করি, তাহার ও মানুষনির্মিত যন্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। আগেই বলা হইয়াছে, প্রাকৃত সৃষ্টিতে যে বস্তু নিজে নিজের কারণ, তাহার মূলেই উদ্দেশ্য রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রাণিশরীরেই এইরকম ব্যাপার স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। নিজেই নিজের কার্য বা কারণ হওয়ার অর্থ নিজ থেকেই নিজে উৎপন্ন হওয়া। এই রকম স্বোৎপাদন[২] জাতি, ব্যক্তি ও অবয়ব বিষয়েই খাটে বলিয়া দেখা যায়। মানুষ নির্মিত কোন যন্ত্রের পক্ষেই

১। Organic whole ২। Self-generation

ইহা সম্ভবপর নয়। এক চাকা হইতে অন্য চাকা বা এক ঘড়ি হইতে অন্য ঘড়ি কখনই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমগাছ হইতে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃত নিয়মে আমগাছই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন এক বিশিষ্ট আমগাছ হইতে সেই আমগাছই জন্মায় না বটে, কিন্তু জনক আমগাছ এবং জন্য আমগাছ জাতি হিসাবে (আমগাছরূপে) এক। যে কোন প্রাণিশরীর হইতে সেই জাতীয় প্রাণিশরীরই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাতি হিসাবে স্বোৎপাদন ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতেও পারা যায়। ব্যক্তি হিসাবেও একথা খাটে। আমরা সাধারণ ভাষায় যাহাকে বলি 'আমগাছ বাড়িতেছে' তাহাকেই বিচার করিয়া দেখিলে বলা উচিত, 'আমগাছ হইতে আমগাছ উৎপন্ন হইতেছে'। প্রাণিশরীরের বর্ধন এক প্রকারের স্বোৎপাদন। কোন প্রাণিশরীর যখন বাড়ে, তখন বাহির হইতে কোন জিনিস আলগাভাবে সেই শরীরে লাগাইয়া দেওয়া হয় না। সেই প্রাণিশরীরই নিজে উপযুক্ত খাদ্য আহরণ করিয়া নিজ শরীর উপাদানে পরিণত করে। ইহা এক প্রকার স্বোৎপাদন ছাড়া আর কি? এইত গেল জাতি ও ব্যক্তির স্বোৎপাদনের কথা। অবয়বের বেলায়ও দেখা যায় সে কথা খাটে। ডালপালা পাতা প্রভৃতি নিজেদের নিজেরাই উৎপন্ন করে এমনও কল্পনা করা যাইতে পারে। আমগাছের ছোট ডাল জামগাছের গায়ে রোপিত হইলে সে ডাল জামের ডাল রূপে বাড়ে না, আমের ডাল রূপেই বাড়িতে থাকে। তার বৃদ্ধি যদি জামগাছের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে সেও জামের ডাল হইয়া যাইত। তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, তার বৃদ্ধি নিজাধীন; অর্থাৎ নিজকেই নিজে উৎপন্ন করে। আমরা যে কোন গাছের প্রত্যেক অবয়বকেই এই রকম ভাবে ভাবিতে পারি যে, তাহা ঐ গাছের উপর যেন রোপিত হইয়া আপনা আপনিই বাড়িতেছে। ইহা অবশ্য সত্য যে ডালপালা পাতা বৃক্ষের দ্বারাই পালিত ও পুষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু সেইরকমভাবে ইহাও সত্য যে, ডালপালা পাতাদ্বারা বৃক্ষও পালিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। ডালপালা পাতা বার বার কাটিয়া ফেলিয়া দিলে বৃক্ষই শেষে মরিয়া যায়। আসল কথা, অবয়ব যেমন অবয়বীর উপর নির্ভর করে, অবয়বীও তেমনি অবয়বের উপর নির্ভর করে।

দেখা যায়, যাহা কারণ তাহাই কার্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই রকম পারস্পরিক কার্যকারণ ভাব, বা অন্যোন্যনির্ভরতা, আমাদের বুদ্ধিতে গ্রহণ-যোগ্য নয়। আমাদের বুদ্ধি যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়মে জাগতিক ঘটনাসমূহ

বুঝিয়া থাকে। আমাদের বুদ্ধিগম্য কার্যকারণ ধারা এক মুখেই বলিয়া থাকে। কারণের পর কার্য, তার পরে তার কার্য এই রকম ভাবে আমরা কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকি। এই একমুখীন কার্যকারণ স্রোত, যেন প্রত্যাবর্তিত হইয়া যাহা কার্য তাহাকেই কারণ করিয়া তুলিবে, এমন কথা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ দেখিতেছি, যেখানে জীবন রহিয়াছে, স্বোৎপাদন রহিয়াছে, সেখানেই যাহা কার্য তাহাই কারণ হইয়া যাইতেছে। ইহা আমাদের বুদ্ধির কাছে এক দুর্বোধ্য রহস্য। আমরা সব কিছু খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝি, অগ্র-পশ্চাৎ, পর পর বলিয়া বুঝি। ইহাই মানবীয় তার্কিক বুদ্ধির[১] বুঝিবার পদ্ধতি। আমাদের বুদ্ধি যেন একরকম বানান করিয়াই সব পড়ে বা বুঝে; এক নজরে শব্দ বা বাক্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। যদি মানবীয় বুদ্ধি এই রকম তর্কানুগ না হইয়া আনুভবিক[২] হইত, অর্থাৎ সব কিছু খণ্ড খণ্ড করিয়া, অগ্র-পশ্চাৎ, পর পর না বুঝিয়া, অখণ্ড ভাবে সমগ্রকে, যেন এক দৃষ্টিতেই, বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে পারস্পরিক কার্যকারণ ভাব হয়ত বুঝিতে পারা যাইত। কিন্তু মানবীয় বুদ্ধি আনুভবিক না হওয়াতে এরকম পারস্পরিক কার্যকারণ ভাব আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। তাই এরকম স্থলে, মানুষ বুদ্ধিপূর্বক বিশেষ উদ্দেশ্যে যাহা করে, তাহা উপমার আশ্রয় লইতে হয়।

মানুষের ইচ্ছাজন্য সব কাজেই এরকম উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধরা যাউক, কোন লোক একখানি ঘর তৈরী করিতে চাহিতেছে। এরকম ক্ষেত্রে ঘরের ধারণা তার মনে সর্বপ্রথমে থাকা চাই; এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে নানাবিধ বস্তু সংগ্রহ করিয়া, সেগুলির যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তার উদ্দেশ্যানুরূপ বস্তু গড়িয়া তুলে। ঘরের দরজা জানলা, দেওয়াল ছাদ প্রভৃতি অঙ্গ সম্পূর্ণ ঘরের ধারণা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ঘরের ধারণা থাকাতেই তদনুরূপ ছাদ দেওয়াল জানালা দরজা প্রভৃতি করা হইয়াছে। ধারণারূপে আমাদের মনে বিরাজমান সম্পূর্ণ ঘর এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জনক। আবার এইসব অবয়ব মিলিত হইয়াই ঘর উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে ঘরই ছিল সাধ্য (উদ্দেশ্য), জানালা, দরজা প্রভৃতি সাধন (উপায়); আবার এক অর্থে ঘরই সাধন, এবং জানালা দরজাই সাধ্য; কেননা ঘরের ধারণা থাকাতেই ত

১। Discursive Uuderstanding ২। Intuitive

তদনুরূপ জানালা দরজা করা হইয়াছে। এই উপমার সাহায্যেই আমরা জাগতিক শরীর সৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি। নানাজাতীয় শরীর সৃষ্টি করাই যেন প্রকৃতির উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যানুসারেই এইসব সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি।

উপরে দেখান হইয়াছে, এক শরীর হইতে তজ্জাতীয় অন্য শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে জাতি সংরক্ষণই যেন শরীরের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য মানুষের ঘর তৈরী করার উদ্দেশ্যের মত বাহ্য উদ্দেশ্য নয়। এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ; শরীরের অন্তর্নিহিত ধর্মবিশেষ বলিলেও চলে। শারীর সৃষ্টি বুঝিতে হইলে, উদ্দেশ্যের কল্পনা করিতে হয় বটে, কিন্তু একথা বলিলে ভুল হইবে যে প্রকৃতির বাস্তবিক কোন উদ্দেশ্য আছে। আগেই বলা হইয়াছে, মানুষের উদ্দেশ্যযুক্ত রচনার উপমার সাহায্যে আমরা শারীর সৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। মনে রাখিতে হইবে, ইহা উপমা ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যেমন কোন কিছুর ধারণা করিয়া, সেই ধারণানুযায়ী বস্তু ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টা করিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকে, প্রকৃতি সে রকম কিছু করে, একথা বলিবার আমাদের কোন প্রমাণ নাই। ফল কথা, মানুষের উদ্দেশ্য বলিতে উদ্দেশ্য কথার যে রকম অর্থ বুঝি, সেই অর্থে প্রকৃতির বাস্তবিক কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা বলা চলে না। কোন কোন প্রাকৃতিক সৃষ্টি বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা প্রকৃতিতে উদ্দেশ্যের আরোপ করি বা করিতে বাধ্য হই মাত্র।

যান্ত্রিক কার্যকারণের নিয়মেই জগতের সব কিছু ঘটিতেছে, ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই এই নিয়মের দ্বারা প্রাণিজগতের, শারীর সৃষ্টির, বা যাহাতে জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সন্তোষজনক উপপত্তি হয় না। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে, প্রাণিজগতে আসিয়া যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়ম ছাড়িয়া দিতে হইবে? বাস্তবিক কিন্তু তাহা পারা যায় না। সবকিছুই কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা বুঝিতে যাওয়াই আমাদের বুদ্ধির ধর্ম। কার্যকারণ নিয়ম বৌদ্ধিক মূলসূত্রেই গ্রথিত আছে। সুতরাং প্রাণিজগতেও যতদূর আমরা যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা বুঝিতে পারি, ততদূরই বাস্তবিক বুঝিলাম বলিয়া মনে হয়। এই নিয়মের সাহায্যে বুঝিতে পারিলেই বাস্তবিক আমাদের জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত হয়।

সব কিছুই কার্যকারণের নিয়মে বুঝিতে পারাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদর্শ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে একথাও সত্য যে শুধু

কার্যকারণের নিয়মের সাহায্যে আমরা অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারি না, শুধু কার্যকারণের নিয়মের দ্বারা যে তাহারা ঘটিয়াছে, একথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহা হইতে এখানে এক বিরোধের[১] উৎপত্তি হয়।

বাদ:—জাগতিক সব ঘটনাই যান্ত্রিক কার্যকারণের নিয়মের দ্বারা বুঝিতে হইবে; ইহার কোথাও ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতিবাদ:—যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়ম প্রাণিজগতে খাটে না; সেখানে কিছু বুঝিতে হইলে এই নিয়ম ছাড়িয়া দিয়া উদ্দেশ্যকারণের[২] আশ্রয় লইতে হয়। অর্থাৎ বিষয়গত অর্থবত্তার কল্পনা করিতে হয়।

এই বিরোধের সমাধানের জন্য আমাদের বুঝিতে হইবে যে উদ্দেশ্য-কারণের দৃষ্টিতে কিছু বুঝিতে গিয়া যান্ত্রিক দৃষ্টি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে না। যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়মের পরিপূরকরূপে উদ্দেশ্যকারণের কল্পনা করিতে হইবে। সর্বত্রই, এমন কি প্রাণিজগতেও, সব কিছুই যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়মের দ্বারাই বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যেখানে এই নিয়মের দ্বারা কিছু বুঝিতে পারা যাইবে না, সেখানে অগত্যা উদ্দেশ্য কারণের কল্পনা করিতে হইবে। এই কথাই কান্ট্ অন্য ভাষায় এই রকম ব্যক্ত করিয়াছেন, যান্ত্রিক কার্যকারণভাব প্রাকৃত জ্ঞানে যেমন বিষয়গত[৩] বলিয়া ভাবা যায়, উদ্দেশ্যকারণতা সেরূপ বিষয়গত নয়। উদ্দেশ্যকারণের কল্পনাকে শুধু আমাদের জ্ঞানের দিগ্দর্শক[৪] অথবা আবিষ্কারের সহায়ক[৫] হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে প্রাকৃত ঘটনাবলী বাস্তবিক বুঝিতে হইলে আমাদের বৌদ্ধিক মূলসূত্রানুসারেই বুঝিতে হইবে; আর যান্ত্রিক কার্যকারণ-ভাব যেমন আমাদের বৌদ্ধিক মূলসূত্রের অন্তর্ভূক্ত, উদ্দেশ্যকারণের কল্পনাকে সেই রকম বৌদ্ধিক মূলসূত্রের মধ্যে ধরিতে পারা যায় না। কিছু বুঝিতে হইলে আমরা যান্ত্রিক কার্যকারণের নিয়মেই বুঝিয়া থাকি। যেখানে সে রকম বুঝিতে পারি না, যে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা অনুভব করি, সে ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যকারণের কল্পনা করিয়া থাকি।

প্রাণিজগতের ঘটনাবলী এরকমের যে উদ্দেশ্যকারণের সাহায্য ব্যতিরেকে সেগুলি আমরা বোধগম্যই করিতে পারি না। ইহার অর্থ এই নয় যে,

১। Antinomy
২। Final cause
৩। Constitutive
৪। Regulative
৫। Heuristic

যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়মে সেগুলির উপপত্তি হওয়াই অসম্ভব। শারীর সৃষ্ট্যাদির উপপত্তিও কার্যকারণ নিয়মে অসম্ভব নয়; কিন্তু অসম্ভব না হইলেও, কি করিয়া সম্ভবপর তাহা আমাদের ধারণাতীত। কাণ্ট্ ত বলেন নিউটনের মত বৈজ্ঞানিকও শুধু যান্ত্রিক কার্যকারণের নিয়মের দ্বারা, উদ্দেশ্যকারণের কল্পনা না করিয়া সামান্য তৃণপল্লবেরও উপপত্তি দিতে পারিবেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য-কারণের কল্পনা করিতেই হয়।

কিন্তু শুধু দায়ে ঠেকিয়াই, আমাদের অজ্ঞতার ফলে, উদ্দেশ্যকারণের কল্পনা করিতে হয়, ইহা দ্বারা আর কোন উপকারই হয় না, তাহা নহে। উদ্দেশ্যকারণের কল্পনা হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেখানে আমরা উদ্দেশ্যর পরিচয় পাই—এবং প্রাণিজগতের যে কোন স্থলে এই পরিচয়ের অভাব হয় না—সেখানেই বিস্ময় অনুভব করিয়া থাকি। তাহার ফলে আমাদের মনে একপ্রকার উদ্দীপনা আসিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যখন গবেষণায় প্রবৃত্ত হই, তখন সাধারণতঃ আমাদের গবেষণা ফলবতী হয়, আমরা অনেক নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিতে সমর্থ হই। শারীরবিজ্ঞান[১] ও জীববিজ্ঞানে[২] এরকম অনেক সময় ঘটিয়াছে। কোন অবয়বের কি উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিতে গিয়া কি করিয়া সে অবয়বের উদ্ভব হইল, আমাদের বুঝিতে হয়। উদ্দেশ্যকারণের সিদ্ধির জন্য সমর্থকারণের[৩] আশ্রয় লইতে হয়। তাহার ফলে আমরা অনেক নূতন কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারি। বিজ্ঞানে এগুলির মূল্য কম নয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রাণিজগতের গবেষণায় যান্ত্রিক কার্যকারণভাব[৪] ও উদ্দেশ্যযুক্ত কারণতার মধ্যে[৫] বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে দেখা যাইবে, উভয় ধারণা দ্বারাই আমাদের জ্ঞানের সাহায্য হইয়া থাকে। ইহা হইতে বোঝা যায়, প্রাণিজগতের ঘটনাবলীর উপপত্তির জন্য কাণ্ট্ ডেকার্টীয় যন্ত্রবাদ[৬] বা লাইবনিট্সীয় প্রাণবাদ[৭] কোনটাই একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। তাহাদের মাঝামাঝি পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

১। Physiology
২। Zoology
৩। Efficient cause
৪। Mechanical causality
৫। Teleology
৬। Mechanism
৭। Vitalism

শুধু প্রাণিজগতের বিষয় ভাবিলেই যে আমাদের মনে উদ্দেশ্যকারণের কল্পনা জাগিয়া উঠে, তাহা নহে। আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানে যে বিশ্বকে পাই, সেই সমগ্র বিশ্বের বিষয় চিন্তা করিলেও আমাদের মনে স্বতঃই এই ধারণা উপস্থিত হয় যে, বিশ্বের মূলে কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত ব্যাপার কি রকম পরিপাটীর সহিত চলিয়াছে! বিশ্বের প্রত্যেক ভাগ ভাগান্তরের সহিত কি রকম সুসম্বদ্ধ হইয়া আছে! বিশ্বের সর্বত্র দৃশ্যমান সুসম্বদ্ধতা, সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলার কথা ভাবিলে আমাদের চিত্ত বিস্ময়ে আপ্লুত হয়, এবং আমরা না ভাবিয়া পারি না যে বিশ্বের প্রত্যেক অংশ বা অবয়বই সমগ্রের ধারণা[১] হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। তাহা না হইলে এই বিশাল বিশ্বে কি প্রকারে এ রকম সুশৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে পারে, তাহার কোন ধারণাই করিতে পারি না।

আমরা অবশ্য জানি, প্রাকৃতজ্ঞানের মূলে বৌদ্ধিক নিয়ম রহিয়াছে; এই সব পূর্বতোজ্ঞেয় বৌদ্ধিক নিয়ম ব্যতিরেকে, যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি, তাহাই সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এই নিয়মগুলি ত খুব সাধারণ[২] ও অত্যন্ত ব্যাপক। এই সব নিয়মের জন্য প্রকৃতির পর্যালোচনা করিতে হয় না। আমাদের বুদ্ধির স্বরূপ হইতেই এগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতি ত শুধু এই সব সাধারণ নিয়মেই চলে না, তার মাঝে শত শত বিশেষ নিয়ম বর্তমান রহিয়াছে। প্রাকৃতিক ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে এই সব বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায়; এগুলি কিছুতেই শুধু বুদ্ধি হইতে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাকৃত ঘটনাবলী যে এইসব বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা বুদ্ধির দৃষ্টিতে আকস্মিক[৩] বলিয়াই লাগে। ঠিক ঠিক এইসব প্রাকৃতিক নিয়ম না থাকিলেই চলিত না এমন নহে।

আমরা জানি, আমাদের প্রাকৃতজ্ঞানের বিষয়, অবভাস, বৌদ্ধিক বা জ্ঞানীয় নিয়মে গঠিত বলিয়াই আমাদের প্রাকৃতজ্ঞান সম্ভবপর হয়। কি করিয়া আমাদের সংবেদনার আদিম নিঃশৃঙ্খল উপাদান আমাদের আনুভবিক ও বৌদ্ধিক নিয়মের অনুবর্তী হইল, তাহাই এক আশ্চর্যের বিষয়। আমাদের বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতে যে আমরা নানাবিধ নিয়ম পাই, এবং এইসব নিয়ম মিশিয়া যে শেষে এক সুসম্বদ্ধ বিশ্বের কল্পনা আমাদের মনে আনিয়া দেয়,

১। Idea ২। General ৩। Accidental

এই সমস্তই আমাদের বুদ্ধির দৃষ্টিতে এক রকম আকস্মিক বলিতে হয়। প্রাকৃতজ্ঞানের মূলভূত বৌদ্ধিক নিয়ম যেমন অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য, প্রত্যক্ষলব্ধ বৈজ্ঞানিক বিশেষ নিয়ম, বা এইসব বিশেষ নিয়মের দ্বারা নিয়ামিত সুসম্বদ্ধ বিশ্বের কল্পনা, সে রকম অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য নয়। কিন্তু বিশ্বের এই বিচিত্র রচনা একেবারে আকস্মিক বলিয়া ভাবিতে পারি না। আকস্মিক ভাবে এই রকম সার্বত্রিক নিয়মবদ্ধতা কিরূপে সম্ভবপর হইল, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। তাই এই সমস্তের মূলে এক ব্যাপক পরিকল্পনা[১] রহিয়াছে বলিয়া আমরা ভাবিতে বাধ্য হই। আমরা মনে করি সৃষ্টির আগে সমগ্রের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং সেই ধারণা হইতেই বিশ্বের সব কিছু যথাযথভাবে রচিত হইয়াছে। ধারণা বুদ্ধিমৎসত্ত্বের পক্ষেই সম্ভবপর হয়। জ্ঞানের ধারণা হইতে পারে। সুতরাং এক অপার বুদ্ধিসম্পন্ন সর্বজ্ঞ বিশ্বস্রষ্টার কথা না ভাবিয়া আমরা পারি না। যে বিশ্বাত্মীয় বুদ্ধি হইতে জগৎ প্রসূত হইয়াছে, সে বুদ্ধি কখনই মানবীয় বুদ্ধির মত হইতে পারে না। আমাদের বুদ্ধি বাস্তব কিছুই সৃজন করিতে পারে না; অনুভবে যাহা পাওয়া যায়, যাহা আগেই আছে, তাহার ধারণা করিতে পারে মাত্র। বস্তু থাকিলেই (অনুভব ব্যতিরেকে) আমাদের বুদ্ধিতে আসে না; আর আমাদের বুদ্ধিতে কিছু থাকিলেই অর্থাৎ ধারণা করিতে পারিলেই তাহা বাস্তবে পরিণত হয় না। যে বুদ্ধির সৃজনী[২] শক্তি আছে, তাহার বেলায় এরকম হইতে পারে। সে বুদ্ধির কাছে বস্তুর অস্তিত্ব ও বোধ দুই ভিন্ন পদার্থ নয়। বিশ্বাত্মার সৃজনী বুদ্ধিতে বস্তুকে বোঝা আর বস্তুর থাকা একই কথা। সুতরাং জগৎকে বিশ্বাত্মার চিন্তা প্রসূত বলিলেও চলে। জাগতিক বস্তুসমূহ ঐশী চিন্তারই মূর্ত রূপ।

আমাদের চিন্তা প্রবাহ যখন এই ধারায় চলে, তখন আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ইহাদ্বারা কোন বস্তুসিদ্ধি হইতেছে না। অপার বুদ্ধিমান জগৎস্রষ্টার কল্পনা না করিয়া বিশ্বের রচনাবৈচিত্র্য বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহা হইতে ইহা প্রমাণ হয় না যে বাস্তবিক জগতের স্রষ্টা কেহ আছে। কোন বিশেষ কল্পনা না করিয়া কিছু বুঝিতে না পারা বুদ্ধির স্বভাব হইতে পারে; তাহা হইতে কল্পিত পদার্থের সত্তা সিদ্ধ হয় না। এক সমগ্র বিশ্ব যেমন জ্ঞানের বিষয় নয়, প্রকল্পনা[৩] মাত্র, সেই রকম এই বিশ্বের কারণরূপে অপার

১। Plan ২। Creative ৩। Idea of Reason

বুদ্ধিমৎসত্ত্বের ধারণাও প্রকল্পনা মাত্র। ইহাদ্বারা বাস্তবিক কোন পদার্থের জ্ঞান হইল বলা যায় না। এই কথা মনে রাখিয়া বিশ্বস্রষ্টার কল্পনা করিলে কাণ্টের মতে দোষের কিছু হয় না। এরকম কল্পনা না করিয়া যে আমরা পারি না, সে কথাই বরং তিনি দেখাইয়াছেন।

এরকম বুদ্ধিযুক্ত জগৎকারণের কল্পনা দ্বারা যান্ত্রিক কারণতা ও উদ্দেশ্য কারণতার সমন্বয় করিতে পারা যায়। আমাদের কাছে এই দুই রকম কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং একের সঙ্গে অপরের বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্বক হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লইলে আমরা সহজেই ভাবিতে পারি, যান্ত্রিক কারণ পরম্পরা ভগবতুদ্দেশ্যের অনুরূপই সৃষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ উদ্দেশ্যকারণের দ্বারা যাহা ঘটিবার, তাহাই যান্ত্রিক কারণে ঘটিয়া থাকে। দুই কারণের প্রবৃত্তি ভিন্নমুখীন নহে। বাস্তবিক তাহাদের একই কার্য।

বিশ্বের মাঝে যদি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া মনে করা হয়, বিশ্বের কোন অর্থ আছে বলিয়া যদি ভাবি, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য বা অর্থ কি হইতে পারে? অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ বহ্বয়ব প্রকৃতি শরীরের সৃজন ও সংরক্ষণই সে উদ্দেশ্য হইতে পারে না; ইহাতে কোন রকম সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা বুঝি না। মানুষ রূপ প্রাকৃত জীব সৃষ্টিও বিশ্বের উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অন্যান্য জীবাপেক্ষা মানুষের প্রতি বিশ্বের বা প্রকৃতির ত কোন পক্ষপাত দেখি না। অন্যান্য জীবের মত মানুষের জীবন মরণে, সুখদুঃখে প্রকৃতি সমানভাবে উদাসীন। বিশ্বের যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তাহা শুভেচ্ছাময় নৈতিক জীবনেই পাওয়া যায়। শুভেচ্ছা বা নীতিমত্তার আর কি অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, তাহা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না। শুভেচ্ছাময় নৈতিক জীবনই অন্তিম উদ্দেশ্য হইতে পারে; ইহাই একমাত্র পরম পুরুষার্থ। প্রাকৃত জীবনের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া একমাত্র নিয়মের বশবর্তী স্বাতন্ত্র্যময় আধ্যাত্মিক জীবন সম্ভবপর করাই বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্য বা অর্থ।

দ্বাদশ অধ্যায়

যে জ্ঞানী, সে-ই প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক, এবং যে জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া যায়, সে জ্ঞান[1] লাভ করাই দর্শন-চর্চার উদ্দেশ্য। শুধু বিদ্বান বা পণ্ডিত হইলেই দার্শনিক হওয়া যায় না। যে শুধু বিদ্বান্, তাহাকে জ্ঞানী বলা যায় না; অবিদ্বান্‌ও জ্ঞানী হইতে পারে। ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিকের কাছেও আমরা একরমের জ্ঞান পাইতে পারি; কিন্তু সে জ্ঞান দ্বারাই কেহ জ্ঞানী বলিয়া সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয় না। যিনি জ্ঞানী, তাঁর বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক জ্ঞান না থাকিলেও তিনি যেন এক বিশিষ্ট প্রকারের জ্ঞানের অধিকারী। ঐরকম জ্ঞান প্রদান করিতে পারে বলিয়াই লোকেরা দর্শনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু স্কুল কলেজে আমরা যে রকম দর্শন চর্চা করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা আমরা জ্ঞানী হইয়া উঠি, একথা মোটেই বলা যায় না। কলেজে যে রকম দর্শন আমরা পড়িয়া থাকি, তাহাতে কতকগুলি বিশিষ্ট প্রশ্নের যুক্তিমূলক আলোচনা পাই মাত্র। এই জন্য দর্শন সম্বন্ধে দুইটি ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। এক ধারণার বশবর্তী হইয়া আমরা দার্শনিককে জ্ঞানী বলিয়া মনে করি, অন্য ধারণাতে দার্শনিক এক প্রকারের বিদ্বান্ বা পণ্ডিত মাত্র। এই রকমে দুই অর্থেই দর্শন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমটিকে ব্যাপক, এবং দ্বিতীয়টিকে সংকীর্ণ অর্থ বলিতে পারা যায়। কান্ট্‌ও দর্শনের এই দুই ধারণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সংকীর্ণ বা পাঠশালীয়[2] অর্থে দর্শন শুধু কতকগুলি বিশিষ্ট প্রশ্নের যুক্তিমূলক বিচার মাত্র। ব্যাপক বা সাধারণ অর্থে, দর্শন এমন জ্ঞান দিয়া থাকে, যাহাদ্বারা লোক জ্ঞানী হইতে পারে। দর্শনের এই ব্যাপক বা সাধারণ অর্থের জন্যই লোকের কাছে ইহার বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া লাগে এবং লোকেরা ইহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে। আর সংকীর্ণ অর্থেও যদি দর্শনের কোন মূল্য থাকে, তবে সে মূল্য দর্শনের ব্যাপক অর্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতেই আসে।

আমরা বলিলাম, দর্শনের (ব্যাপক অর্থে) দ্বারা লোকেরা জ্ঞানী হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী কাহাকে বলি? জ্ঞান যাহার আছে, সে-ই জ্ঞানী। কিন্তু

১। Wisdom　　২। Academic

এখানে জ্ঞান মানে কি? নিশ্চয়ই ঘটপটাদির জ্ঞান নয়। সে জ্ঞান সকলেরই আছে, এবং সকলেই জ্ঞানী নয়। জলাণুতে কি কি পরমাণু আছে, কিংবা আকবরের জন্ম কোন সালে হইয়াছিল এসব কথা জ্ঞানী ব্যক্তি না জানিতে পারেন। তথাপি তিনি জ্ঞানী; এরকম জ্ঞান না থাকিলেও জীবনে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? বাস্তবিক শ্রেয় কি?—এই সব কথা জানার সঙ্গে কোন ভৌতিক পদার্থ বা ঘটনা জানার কোন তুলনা হয় না। এই সব অন্তিম প্রশ্নের জ্ঞানের দ্বারা আমরা জীবনকে সার্থক করিতে পারি। সেই জন্য যিনি অন্যান্য জাগতিক বিষয়ে অজ্ঞ হইয়াও এই সব পারমার্থিক কথা বলিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা জ্ঞানী বলিয়া থাকি এবং তাঁহার চরণে আমাদের মস্তক ভক্তিতে অবনত হয়। এই রকম ভাবে যিনি জ্ঞানী, তিনিই যথার্থ দার্শনিক। যিনি শুধু যুক্তিবিশারদ, কথার কাটাকাটিতে যিনি সিদ্ধহস্ত, তিনিই যে বড় দার্শনিক, তাহা নহে। জ্ঞানী, দার্শনিক অন্যান্য বিদ্বান পণ্ডিতদের মত যে শুধু একজন বিশেষজ্ঞ, তাহা নহে। তিনি প্রকৃত পক্ষে মানব জাতির শিক্ষাদাতা। কেননা মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, মানবের প্রকৃত শ্রেয়ঃ কোথায়, এই সব কথা তিনিই জানেন। বলা বাহুল্য, এই রকম দার্শনিক খুবই বিরল। কিন্তু দার্শনিকের আদর্শ যে এই রকম, বা এই রকম হওয়া উচিত, সে বিষয়ে অনেকেরই দুই মত হইবে না।

মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, মানবের প্রকৃত শ্রেয়ঃ কোথায়, এইসব কথা সাধারণতঃ আমরা ধর্ম হইতেই শিখিয়া থাকি। যে ধর্ম এইসব বিষয়ে কিছু বলিতে পারে না, সে ধর্ম সভ্য মানবের উপযোগীই নয়। সুতরাং দর্শন যখন এইসব গূঢ় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকে, তখন ধর্মের সঙ্গে না মিশিয়া পারে না।

দর্শনের দ্বারা মানবীয় শ্রেয়ঃ বা মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহা কোন প্রাকৃত বিষয়জ্ঞানের মত সম্ভবপর হইতে পারে না। শুদ্ধ (বৈজ্ঞানিক) প্রজ্ঞার[১] বিচার করিয়া কাণ্ট্ বিষয়জ্ঞানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও বলা যায়। জীবনের শ্রেয়ঃ বা লক্ষ্য সম্বন্ধে এরকম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভবপর নহে। ব্যবহারিক প্রজ্ঞার[২] দ্বারাই এরকম জ্ঞান সম্ভবপর হয়। এ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক[৩] নয় বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারা যায়

১। Pure Reason (Theoretical)

২। Practical Reason

৩। Theoretical

না। বাস্তবিক ত কাণ্ট্ ব্যবহারিক প্রজ্ঞারই প্রাধান্য[1] স্বীকার করিয়াছেন। যে শক্তির বলে আমরা জীবনের লক্ষ্য বা প্রকৃত শ্রেয়ঃ কি জানিতে পারি, সে শক্তির মূল্য আমাদের কাছে, মানুষের কাছে, শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানশক্তির চেয়ে নিশ্চয় বেশী।

মানুষের কর্তব্য কি, শ্রেয়ঃ কি, এইসব কথা যদি ব্যবহারিক প্রজ্ঞার বিচারেই জানা গেল, তাহা হইলে ধর্মের কথা আদৌ কি করিয়া উঠে? কাণ্টের সময়ে অনেকে মনে করিতেন, এবং এখনও অনেকে মনে করেন যে, ধর্ম হইতেই মানুষের কর্তব্যের কথা, নীতির কথা, আমরা জানিতে পারি। ধর্মই নীতির[2] ভিত্তি। ধর্মজ্ঞান ব্যতিরেকে নীতি স্বতন্ত্র ভাবে দাঁড়াইতে পারে না। কাণ্ট্ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেন। তাঁহার মতে নীতিই ধর্মের ভিত্তি। ধর্ম ব্যতিরেকেও নীতি দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু নীতি ছাড়িয়া ধর্ম দাঁড়াইতে পারে না। নীতিমত্তাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু, নীতির সহায় রূপেই ধর্মের মূল্য, স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই। একেবারে নিরপেক্ষ ও ঐকান্তিকভাবে শ্রেয়ঃ বলিতে আমরা নীতিকেই বুঝিয়া থাকি। যাহার দ্বারা যেই পরিমাণে আমাদের নীতিমত্তার সাহায্য হয়, তাহার সেই পরিমাণে মূল্য আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কি ভাল, কি মন্দ, জীবনের প্রকৃত শ্রেয়ঃ কি, আমাদের কর্তব্য কি, এইসব কথা জানিবার বা বুঝিবার জন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা হইতেই আমরা এইসব কথা স্পষ্ট রূপে জানিতে পারি। কিন্তু তথাপি কাণ্ট্ মনে করেন, নীতিমার্গে চলিতে গেলে আমরা ধর্মে উপনীত না হইয়া পারি না।

আমাদের কর্তব্য কি, তাহা না হয় নীতি হইতে জানিলাম; কিন্তু কর্তব্য করিয়া আমাদের লাভ কি? কেনই বা সে কর্তব্য করিতে যাইব? কাণ্ট্ অবশ্য বলেন, ইহলোকে বা পরলোকে কোন লাভের আশায় আমাদের কর্তব্য করা উচিত নয়। কর্তব্য করিয়া যাওয়াই আমাদের কাজ। কেবল কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই আমাদের কর্তব্য করা উচিত। কেনই বা কর্তব্য করিব, কিংবা কর্তব্য পালন করিলে আমাদের লাভালাভ কি হইবে, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয় নয়। তথাপি আমরা এমন ভাবে গঠিত যে, আমাদের নৈতিক জীবনের অন্তিম পরিণামের কথা আমাদের মনে না উঠিয়া পারে না। আমাদের মধ্যে যে রকম সুখদুঃখবোধ রহিয়াছে, তাহাতে, যে

১। Primacy ২। Morality

নীতিমার্গে চলিয়া থাকে, সে সুখী হইবে, একথা আমরা না ভাবিয়া পারি না। সুখী হইবার জন্য যে লোক নীতিমার্গে চলে কিংবা সুখলাভই আমাদের নৈতিকতার লক্ষ্য, সে কথা বলা হইতেছে না। সাধু লোকের সুখী হওয়াই ন্যায়সঙ্গত এই কথাই আমাদের মনে জাগিয়া থাকে। কিন্তু সাধুতা বা নীতিমত্তার সঙ্গে সুখের কি সম্বন্ধ? নীতিমত্তার সঙ্গে সুখের এমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, যাহাতে কেহ নীতিমান হইলেই সুখী হইবে, একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। জগতে অনেক সাধু লোককে আমরা দুঃখে কষ্টে কাল কাটাইতে দেখিয়া থাকি। কিন্তু নীতিমান হইয়াও কেহ সর্বদা দুঃখেই থাকিবে, একথা ভাবিতেও আমাদের ন্যায়বুদ্ধিতে আঘাত লাগে। যখন নীতির সঙ্গে সুখের কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিতে পাই না, অথচ, কেহ নীতিমান হইয়াও সুখী হইবে না, একথাও ভাবিতে পারি না, তখন আমরা এই আন্তর-বাহ্য নিখিল বিশ্বের একজন ন্যায়বান বিধাতার কথা ভাবিতে বাধ্য হই। কেননা এরকম একজন ন্যায়বান চরম নিয়ন্তা থাকিলেই তাঁহার নৈতিক অনুশাসনে প্রত্যেক নীতিমান ব্যক্তি তাহার যোগ্যতানুসারে সুখলাভে সমর্থ হইবে। স্বরূপতঃ নীতির সঙ্গে সুখের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, ন্যায়বান বিধাতা সুখবোধযুক্ত জীবের জন্য সে সম্বন্ধ ঘটাইতে পারিবেন।

এইরূপ বিশ্বনিয়ন্তা বা ঈশ্বরের ধারণা হইতে আমাদের নৈতিক জীবনেও প্রভূত সাহায্য হইয়া থাকে। শুধু নীতির রাজ্যে থাকিয়া আমরা যাহাকে কেবল কর্তব্য বলিয়াই জানি, ধর্মরাজ্যে গিয়া তাহাকেই ভগবানের আদেশ বলিয়া মানিয়া থাকি, এবং নৈতিক নিয়মকে ভগবানের নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করি। এই জগতে নানা বাধা, বিপত্তি ও প্রলোভনের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে হয়; প্রতি পদেই আমাদের নীতিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি আমরা জানি আমাদের সব কাজকর্ম, ধ্যানধারণার সাক্ষী ও বিচারক রূপে সর্বজ্ঞ ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা সহজে নীতির পথ হইতে বিচ্যুত হই না। নীতির নিয়ম যে ভগবানেরই নিয়ম, এবং সেই নিয়মের প্রতিপালনেই যে আমাদের প্রকৃত শ্রেয়োলাভ হয়, সেকথা প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তিই মনে করিয়া থাকেন। এই রকম ধর্মবুদ্ধির সাহায্যে আমাদের নৈতিক বুদ্ধিও দৃঢ়তা লাভ করে। আমরা রক্ত-মাংসের জীব; শুদ্ধ প্রজ্ঞার বাণীতেই আমরা সর্বদা চালিত হই না; ইন্দ্রিয়সুখের লালসায়, কায়িক ক্লেশের ভয়ে আমরা অনেক কিছু করিয়া থাকি। তাই

আমাদের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্য নৈতিক জীবনে আমরা ধর্মের সাহায্য না নিয়া পারি না। তবে একথার অর্থ এই নয় যে, আমাদের নৈতিক জীবন ধর্মবুদ্ধির উপরই প্রতিষ্ঠিত অথবা নৈতিক নিয়ম ধর্মানুমোদিত হওয়া উচিত। ধর্মবুদ্ধি নৈতিক জীবনের সহায়ক মাত্র, নৈতিক জীবনের মূল নয়। নৈতিক নিয়মের বিশুদ্ধতা ধর্মের দ্বারা পরীক্ষিত হয় না; পক্ষান্তরে ধর্মের বিশুদ্ধতা নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার উপর নির্ভর করে।

আমরা ত শুধু আত্মাই নহি, দেহধারী জীবও বটে। অন্য কিছুর আশা আকাঙ্খা, না করিয়া, নৈতিক নিয়ম নৈতিক বলিয়াই পালন করিয়া যাইব, ইহাই আমাদের প্রতি ব্যবহারিক প্রজ্ঞার আদেশ। এই নিয়ম যথাসাধ্য পালন করিয়া যাইতে পারি বটে, কিন্তু ইহার পর্যবসান কোথায়? কিছুদিন পরে ত এই দেহও পাত হইয়া যাইবে। তাহার পরে? পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আমাদের বাস্তবিক কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না, তাহা কাণ্ট্ ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক অর্থে জ্ঞান সম্ভবপর না হইলেও আমরা বিশ্বাস ত করিতে পারি। জ্ঞানের অভাবে আমাদিগকে বিশ্বাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুর পরে আমাদের অস্তিত্ব থাকে কি না, কিংবা ভগবান আছেন কি না, ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এইসব বিষয় সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসও পোষণ করিব না, তাহা হইতে পারে না। জগতের কর্তা, বিধাতা বা নিয়ন্তা সম্বন্ধে, দেহপাতের পর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিয়া থাকে; এবং এইসব প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা কিছু না কিছু না ভাবিয়াই পারি না। আর জ্ঞানলাভ যখন সম্ভবপর নয়, তখন কোন না কোন বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করি। প্রমাণ ব্যতিরেকেও কিছু সত্য বলিয়া মনে করার নামই ত বিশ্বাস। যেখানে জ্ঞান অসম্ভব, অথচ প্রশ্ন অনিবার্য, সেখানে বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

প্রমাণ না থাকিলেই যে কোন কথা মিথ্যা হইবে, তাহা নহে। যেখানে আমি কোন কিছুকে সত্য বলিয়া মনে করি, সেখানে যদি আমার সত্যবুদ্ধি (সত্য বলিয়া বোঝা) প্রমাণজন্য হয়, তাহা হইলে ঐ সত্যবুদ্ধিকে জ্ঞান বলিতে পারা যায়; আর প্রমাণের অভাবে সেই সত্যবুদ্ধিই বিশ্বাস। বিশ্বাসের মূলে বিষয়গত কোন প্রমাণ নাই, আছে আমাদের জ্ঞানগত একপ্রকারের প্রবণতা ও প্রবৃত্তি। আমাদের মনের ঝোঁক যদি কোন বিশেষ দিকে থাকে,

কোন কিছু যদি আমাদের ভাল লাগে, বা বিশেষ করিয়া আমাদের অনুকূল হয়, তাহা হইলে সে দিকে বা সে বিষয়ে সহজেই আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যে বিশ্বাস আমাদের মানসিক (অনু) রাগ ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, তাহা আমাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নষ্ট বা শিথিল হইয়া যায়। বিশ্বাস ছাড়া ধর্মই হয় না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস যদি শুধু আমাদের মানসিক রাগ ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা শিথিল হইয়া যাইতে পারে। এজাতীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি খুবই দুর্বল বলিতে হয়। কিন্তু যে সব ধর্মবিশ্বাস আমাদের নৈতিক অনুভবের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যে সব ধর্মবিশ্বাস নৈতিক বোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেগুলির ভিত্তি দৃঢ়তর বুঝিতে হইবে। নৈতিকবোধ মানবীয় প্রজ্ঞার সহজ (স্বভাবগত) ধর্ম। নৈতিক অনুভবেই আমাদের মনুষ্যত্ব। মানুষ হইয়া কেহই একেবারে নীতিবোধ বিবর্জিত হইতে পারে না। এই বোধের সঙ্গে যে সব ধর্মবিশ্বাস ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট, সেগুলি একদিকে যেমন স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপর দিকে সে-গুলিকে অযৌক্তিকও বলা যায় না; কেননা সেগুলি মানবীয় বুদ্ধির স্বভাব হইতেই উঠিয়াছে। যখন সেগুলি আমাদের বুদ্ধি বা যুক্তির সঙ্গে কোন প্রকারের বিরোধিতা না করে, তখন তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গতই বলিতে হয়। এইসব ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ কি, তাহারা কি বলিতে চায়, এবং কতদূর তাহারা অপরিহার্য, এইসব কথাই দার্শনিক ধর্মবিচারে আলোচ্য।

জগতে যে সব ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে যে শুধু যুক্তিসঙ্গত বা নীতিসঙ্গত ধর্মবিশ্বাসই আছে তাহা নহে। এরকম ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অনেক অলৌকিক কথাও তাহাদের মধ্যে আছে। এইসব ধর্মমত কি করিয়া লোক সমাজে প্রচারিত বা প্রচলিত হইল, তাহার আলোচনা দর্শনের বিষয় নয়। তবে সে সব ধর্মমত কতদূর যুক্তিসঙ্গত ও নীতির সহায়ক তাহার আলোচনা দর্শনশাস্ত্রে করা যাইতে পারে।

কাণ্টের মতে আমাদের নৈতিকবোধের ফলে অতীন্দ্রিয় তাত্ত্বিক বিষয়[১] সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি ধারণা না করিয়া পারি না। ঐসব ধারণাকে অবশ্য সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু মিথ্যা বলিয়াও নির্ণয় করা যায় না। মানুষের জীবনে যখন ব্যবহারিক প্রজ্ঞারই প্রাধান্য,

১। Metaphysical Objects

তখন এগুলিকে সহজেই বিশ্বাস করিতে বা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। এই বিশ্বাসের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই যেন কাণ্ট্ অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। সে যাহাই হউক, আমাদের নৈতিক বোধের ফলে অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে যেসব ধারণা আমরা না করিয়া পারি না, সেগুলিকে কাণ্ট্ ব্যবহারিক প্রজ্ঞার স্বীকার্য[১] বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এইসব ধারণার বলে নৈতিক নিয়ম আমাদের বুদ্ধির কাছে অনেকটা সহজগ্রাহ্য হয়। নৈতিক নিয়ম অবশ্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না, কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসিদ্ধ; কিন্তু এই বিশুদ্ধ নৈতিক নিয়ম আমাদের মত দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাকৃতজীবের উপর খাটাইতে হইলে, আরো কতকগুলি ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঐসব ধারণার সাহায্যে আমরা নৈতিক নিয়ম অপেক্ষাকৃত সহজভাবে বুঝিতে পারি।

কাণ্ট্ তৎকালীন ধর্মসম্বন্ধীয় বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এতাদৃশ তিনটি ধারণার উল্লেখ করিয়াছেন; ঈশ্বর, স্বাতন্ত্র্য ও অমরত্ব[২]। এগুলি তখনকার তত্ত্ববিজ্ঞানের সাধারণ আলোচ্য বিষয় ছিল। এগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। স্বাতন্ত্র্য যে শুধু আমাদের নৈতিক বোধের ভিত্তি তাহা নহে; সমস্ত আধ্যাত্মিক বিচারের মূল এক হিসাবে স্বাতন্ত্র্যের কল্পনাতে পাওয়া যায়।

আমরা ইতিপূর্বে স্বাতন্ত্র্যের কথা দুই রকমে পাইয়াছি। প্রথমতঃ বিষয়ের বা ইন্দ্রিয়ের অনধীন হইয়া শুদ্ধপ্রজ্ঞালব্ধ নৈতিক নিয়মে চলাই এক রকমের স্বাতন্ত্র্য। ইহা এক প্রকারের নৈতিক আদর্শ বটে, প্রত্যেক মানুষেরই আয়াসসাধ্য। দ্বিতীয় রকমের স্বাতন্ত্র্য আমাদের নৈতিক বোধেরই অপ্রাকৃত কারণরূপে পাই। নৈতিক বোধ আমাদের কাছে প্রধানতঃ নির্বাধ ও নির্বিকল্প[৩] আদেশ[৪] রূপেই আসে। আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য থাকিলেই এই রকম নির্বাধ আদেশ সম্ভবপর হয়। আমাদের যখন নৈতিক বোধ রহিয়াছে, এবং তার জন্য যখন এরকম স্বাতন্ত্র্য দরকার, তখন স্বাতন্ত্র্যও বাস্তবিক আছে বলিয়াই আমাদের মানিতে হয়।

১। Postulates of Practical Reason

২। God. Freedom and Immortality

৩। Categorical

৪। Imperative

কিন্তু বাস্তবিক স্বাতন্ত্র্য কি করিয়া সম্ভবপর তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। আমরা প্রাকৃত জীব ও প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন। আমাদের দৈহিক বা মানসিক কোন বৃত্তি বা ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিতে পারে না। আমাদের পক্ষে এই রকম নিয়মানুগত্য ও স্বাতন্ত্র্য দুইই কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? বলা হয় বটে, আমরা পারমার্থিক রূপে স্বাধীন এবং আবভাসিকরূপে নিয়মাধীন; কিন্তু ইহার দ্বারা বিশেষ কোন সমাধান হয় না। আমাদের অব্যক্ত কূটস্থ পারমার্থিক রূপ যাহাই হউক না কেন, আমাদের প্রত্যেক ইচ্ছা-বৃত্তিই তৎপূর্ববর্তী অবস্থা দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে; এবং অতীতের উপর যখন আমাদের বাস্তবিক কোন হাত নাই, তখন আমাদের ইচ্ছাবৃত্তি আমাদের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়মিত হইতে পারে না। সুতরাং "স্বতন্ত্রভাবেই ইচ্ছা করিতেছি", বলিয়া আমাদের যে বোধ হয়, সে বোধকে ভ্রমাত্মকই বলিতে হয়।

কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধ যদি ভ্রমাত্মক হয়, তবে আমাদের প্রত্যেক কাজের জন্য যে আমাদের দায়িত্ববোধ আছে, তাহার কি ব্যবস্থা হইতে পারে? আমরা যখন অন্যায় কিছু করি, তখন বিবেকের কাছে আমরা দোষী বলিয়াই সাব্যস্ত হই। অন্যায় কাজের জন্য আমরা নিজেই দায়ী বলিয়া মনে করি। অন্যায় কাজ ত অসদিচ্ছা হইতেই হয়; এবং আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির উপর যদি আমাদের হাত না থাকে, তাহা হইলে আমাদের কাজের জন্য আমরা কি করিয়া দায়ী হইতে পারি? এই দায়িত্ববোধও ভ্রমাত্মক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। স্বাতন্ত্র্যবোধও ভ্রমাত্মক, দায়িত্ববোধও ভ্রমাত্মক, সবই ভ্রমাত্মক এই রকম বলা চলে না।

এই দায়িত্ববোধের উপপত্তির জন্য কাণ্ট্ বলেন, অপ্রাকৃত বাস্তব স্বরূপ[১] আমরা বাস্তবিকই স্বাধীন। আমাদের সেই অবস্থায় যান্ত্রিক কার্যকারণনিয়ম আমাদের উপর লাগে না। কিন্তু আমাদের আবভাসিক স্বরূপে[২] আমরা সর্বদা যান্ত্রিক কার্যকারণ নিয়মের অধীন; আবভাসিক জগতে স্বাতন্ত্র্যের কোন স্থান নাই। কিন্তু এই আবভাসিক প্রাকৃত রূপই আমাদের একমাত্র রূপ নয়; এতদ্ব্যতিরিক্ত আমাদের পারমার্থিক অপ্রাকৃত রূপও আছে। আমাদের পারমার্থিক বাস্তব রূপে আমরা প্রকৃতই

১। As things-in-themselves ২। As appearances

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। পারমার্থিক রূপে আমরা জাগতিক কার্যকারণনিয়মের বাহিরে। আমাদের পারমার্থিক স্বাতন্ত্র্য এই নিয়মের দ্বারা খণ্ডিত বা বাধিত হইতে পারে না। কাল ত আবভাসিক জগতের এক আকার মাত্র। পারমার্থিক জগতে কালের কোন স্থান বা অর্থ নাই। সেখানে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং সেই অবস্থায় অতীতের দ্বারা বর্তমান নিয়মিত হইতেছে, এ কথা বলা চলে না। সেই কালাতীত অবস্থাতে আমরা আমাদের যে স্বরূপ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার ফলেই আবভাসিক জগতে আমাদের ইচ্ছাদি অপরিহার্য-রূপে চলিতেছে। আমাদের আবভাসিক নিয়মানুগত্য বা পরাধীনতার মূলে আমাদের পারমার্থিক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রহিয়াছে। অপ্রাকৃত পারমার্থিক অবস্থায় আমরা যে স্বরূপ বরণ করিয়াছি, তাহাই আমাদের আবভাসিক প্রকৃতিতে প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের অদৃষ্টের সৃষ্টি আমরাই করিয়াছি। আমরা এখন যেরকম আছি, এবং যাহা করিতেছি, তাহার জন্য আমরাই দায়ী, কেননা আমাদের যে স্বভাবের ফলে ইচ্ছাদি ব্যাপার চলিতেছে সে স্বভাব আমরা নিজেই (অপ্রাকৃত অবস্থায়) বরণ করিয়া লইয়াছি। হইতে পারে, কোন একটি লোক ভবিষ্যতে কি করিবে, কি না করিবে, তাহা আমরা নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তার কাজের নৈতিক দায়িত্ব সে অস্বীকার করিতে পারে না; কেন না যে স্বভাবের গুণে সে ঐ কাজ করিবে, সে স্বভাব সে স্বাধীন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে।

আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, লোকেরা শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পিতামাতার স্বভাবগত দোষে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এবং সেই জন্য তাহাদের দুষ্কর্ম যেন ততটা দোষের নয় বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক কিন্তু এইসব কারণ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের নৈতিক দোষ ক্ষালিত হইতে পারে না; কেননা তাহাদের যদি স্বভাব অন্য রকম হইত, তাহা হইলে তাহাদের চরিত্রের উপর এইসব কারণেরও এরকম প্রভাব পড়িত না। তাহাদের দুষ্কর্মের মূল বাস্তবিক তাহাদের স্বভাবেই খুঁজিতে হয় এবং এই স্বভাবের জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী।

কিন্তু একথার এই অর্থ নয় যে, জন্মের আগে আমরা আমাদের স্বভাব গড়িয়া রাখিয়াছি। পারমার্থিক অবস্থাতে আগে পরের কোন

কথা উঠে না, কারণ সে অবস্থাতে কালিক কোন কল্পনাই প্রযোজ্য নয়। আমাদের আবভাসিক অবস্থার মূলে পারমার্থিক অবস্থা রহিয়াছে, একথা বলিতে পারা যায় বটে; কিন্তু পারমার্থিক অবস্থা আবভাসিক অবস্থার আগে, সে কথা বলিতে পারা যায় না। সমান্তরালভাবে[১] আবভাসিক অবস্থার প্রতিরূপ পারমার্থিক অবস্থা রহিয়াছে; আগে পরে নয়।

কাহারও স্বভাব মন্দ হইলে মন্দই থাকিয়া যাইতে হইবে, এমন কথা নয়। পারমার্থিকভাবে স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে এবং তাহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আমূল নৈতিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। ইহাকে নৈতিক পুনর্জন্ম বলিলেও চলে। কাণ্টের মতে এরকম জিনিস অসম্ভব নয়।

আত্মার অমরত্বের স্বীকার্যও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক নিয়ম আমরা সর্বথা পালন করিতে বাধ্য। নৈতিক নিয়মের কাছে আমাদের কোন ওজর আপত্তি খাটে না; নৈতিক আদেশ নির্বিকল্প ও নির্বাধ, ইহাতে বিকল্পের কোন কথা নাই, 'যদি—তবে'র কোন স্থান নাই। যদি নৈতিক নিয়ম সর্বথা পালন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ত (নৈতিক) পূর্ণতা বা পবিত্রতা[২] লাভ করিতে পারিতাম। যাঁহার জীবনে কাজকর্মে বা ইচ্ছায় কখনও নৈতিক নিয়মের ব্যভিচার হয় না, তিনিই পবিত্র। এরকম পবিত্রতা শুধু ভগবানেরই আছে। দেহধারী মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। তথাপি পবিত্রতাই আমাদের আদর্শ। দেহধারী মানব শুধু প্রজ্ঞা দ্বারাই চালিত হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয় বা সংবেদনাশক্তি দ্বারাও পরিচালিত হয়। তাহার ফলে সর্বথা নৈতিক নিয়মানুগ হইয়া চলা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কেননা মানুষেরা ইন্দ্রিয়ের তাড়না এড়াইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের টান ও প্রজ্ঞার চালন এক দিকে নয়।য কিন্তু যে আদর্শ বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়া জানি, তাহার অনুসরণে আমাদের স্বতঃই শিথিলযত্ন হইয়া পড়িবার কথা। কিন্তু কিছুতেই আমরা আমাদের নৈতিক চেতনাকে জলাঞ্জলি দিতে পারি না। ইহা হইতেই আমাদের মনে হয় যে এই জগতেই আমাদের অস্তিত্ব শেষ হইবার নয়। এই জগতে বা এক জীবনে যে নৈতিক পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যাইবে না, তাহা ত স্পষ্টই

১ Parallel ২। Holiness

বুঝিতে পারা যায়। এই পূর্ণতা লাভের আদেশ যখন আমাদের উপর রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে এই অনন্ত আদর্শ আমাদিগকে অনন্তকালে ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে হইবে। নৈতিক আদেশ শুদ্ধ প্রজ্ঞার স্বরূপ হইতেই আসে; এক জন্মে যখন সে আদেশ সর্বাংশে প্রতিপালনের সামর্থ্য আমাদের নাই, তখন বুঝিতে হইবে, জন্মজন্মান্তরে সে আদর্শ প্রতিপালনের সামর্থ্য আমাদের অর্জন করিতে হইবে।

তবে কি বুঝিতে হইবে, কাণ্ট্ জন্মান্তর মানিতেছেন? কাণ্টের মত জন্মান্তরবাদের অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন স্তরের জীব বাস করে বলিয়া তিনি ভাবিতেন, এবং যে গ্রহ সূর্য হইতে অধিকতর দূরে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের জীব বাস করে বলিয়া মনে করিতেন। পৃথিবীতে আমাদের সাধু বা অসাধু জীবনের ফলে এইসব লোকে আমাদের বাস হইতে পারে।

কাণ্টের নীতিশিক্ষার একটি বিশেষ মূলসূত্র এই যে, কোন রকম সুখলাভ বা দুঃখপরিহারের আশায় আমাদের নৈতিক জীবন যাপন করা বা নৈতিক নিয়ম পালন করা উচিত নয়। নীতিকে নীতি বলিয়াই আমাদের পালন করিতে হইবে, অন্য কোন লাভালাভের জন্য নয়। ইহলোকে বা পরলোকে কোন প্রকার লাভের আশায় নৈতিক জীবন যাপন করিলে নৈতিক জীবনের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না। কিন্তু কাণ্ট্ স্বীকার করেন যে, মনুষ্য মাত্রেরই সুখদুঃখবোধ রহিয়াছে। সংবেদনাশক্তি[১] যুক্ত জীবের পক্ষে সুখদুঃখবোধ অপরিহার্য। সুতরাং মানুষের পক্ষে সুখবোধ ও সুখলিপ্সা শুধু যে স্বাভাবিক তাহা নহে, অপরিহার্যও বটে। এমতাবস্থায় আমরা সুখের আশা না করিয়া পারি না।

আমরা সুখের আশা না করিয়া নৈতিক আচরণ করিব বটে, কিন্তু নীতির সঙ্গে সুখের কোন বিরোধ নাই। নৈতিক আচরণ করিলে সুখ পাইব না, এমন হইতে পারে না। বরং নৈতিক কর্মানুসারে সুখ লাভ করিব, ইহাই ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুখ ত সকলেই চায়; কিন্তু সুখ চাওয়া এক কথা আর সুখের উপযুক্ত হওয়া অন্য কথা। নীতিমার্গে চলিলেই আমরা সুখ লাভের বাস্তবিক যোগ্যতা লাভ করি। আমাদের

১। **Sensibility**

জীবন সুখার্হ তখনই হয়, যখন তাহা নৈতিক নিয়মানুসারে চলে। নীতিমানের পক্ষে সুখী হওয়াই আমরা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করি। একথা আগেও বলা হইয়াছে। কিন্তু নীতির সঙ্গে সুখের এমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, যাহার ফলে নীতির সঙ্গে সঙ্গে সুখই পাওয়া যাইবে বলা যাইতে পারে। নীতিমার্গে থাকিয়াও অনেককে অসুখী হইতে দেখা যায়। সুতরাং নীতিকে সুখযুক্ত করিতে হইলে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অনন্তশক্তি নীতিমান ও প্রজ্ঞাবান নিয়ন্তার অনুশাসনে চলিয়াছে বলিয়া ভাবিতে হয়। এই বিশ্ব-নিয়ন্তাকেই আমরা ঈশ্বরাখ্যা দিয়া থাকি। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বও ব্যবহারিক প্রজ্ঞার একটি স্বীকার্য বটে।

আমরা যে পরিমাণে নীতিমান, সেই পরিমাণে আমাদের সুখী হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক সময়েই জীবনে নীতির সঙ্গে সুখের অনুপাতের সমতা দেখা যায় না। সেই সমতা রক্ষার জন্য এই জীবনের পরেও অন্য জীবনের কথা ভাবিতে হয়। অসাধুকে সুখে এবং সাধু ব্যক্তিকে দুঃখে জীবন কাটাইতে দেখিয়া আমাদের ন্যায়বুদ্ধি যখন পীড়িত হয়, তখন আমরা না ভাবিয়া পারি না যে জন্মান্তরে এই অন্যায়ের নিরাস হইবে। এইরকমভাবে অমরত্বের স্বীকার্যও এই সঙ্গে জড়িত।

এখানে যাহা বলা হইল, তাহাতে বাস্তবিক 'ঈশ্বর আছেন' কিংবা 'আত্মা অমর' এই সব কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে সপ্রমাণ হয় না। কিন্তু ইহার দ্বারা যে আমাদের একান্ত অনপলপ্য নৈতিকবোধ সঙ্গতি লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধর্মবিজ্ঞানে[১] ঈশ্বরাদির প্রমাণের কথাই থাকে। যে ধর্মবিজ্ঞান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে নৈতিক ধর্মবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এ রকম ধর্মবিজ্ঞানই কাণ্ট্ আমাদিগকে দিয়াছেন। সাধারণ ধর্মবিজ্ঞান হইতে নৈতিক ধর্মবিজ্ঞানের মহা প্রভেদ এই যে, সাধারণ ধর্মবিজ্ঞানে ঈশ্বরাদির অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া হইয়া থাকে, নৈতিক ধর্ম-বিজ্ঞানে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া হয় না। এখানে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার স্বীকার্যরূপে যাহা পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করিয়াই ধর্মবিশ্বাস গড়িতে হয়। এরকম ধর্মবিশ্বাস ও সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও

১। Theology

অনেক পার্থক্য আছে। ধর্মবিজ্ঞানে সাধারণতঃ কোন বিশিষ্ট ধর্মের মতবাদের[১] বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিবার চেষ্টা করা হয়, এবং ঐ সব মতবাদে বিশ্বাসই আমাদের এক ধার্মিক[২] কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। নৈতিক ধর্মবিশ্বাস এরকমের নয়। এই মতে বিশ্বাস কখনো কর্তব্যের মধ্যে আসিতে পারে না। যাহা আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ, তাহাই কর্তব্য হইতে পারে। আমরা যখন ইচ্ছামত বিশ্বাস করিতে পারি না, তখন বিশ্বাস কখনই কর্তব্য হইতে পারে না। নৈতিক নিয়ম বা শুদ্ধ প্রজ্ঞা যাহা বলে, তাহাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য। এখানে নৈতিক ধর্মবিজ্ঞান আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। নৈতিক নিয়মকে ভগবানের আদেশ মনে করিয়া তৎপ্রতিপালনে আমরা যত্নশীল হইতে পারি। নীতিমার্গে দৃঢ়ভাবে চলিবার পক্ষে ভগবদস্তিত্ব, (আত্মার) অমরত্ব, প্রভৃতি বিষয়ক নীত্যনুমোদিত ধার্মিক মতবাদ আমাদের বিশেষ সহায়ক, কেননা এইসব কল্পনা দ্বারাই আমরা আমাদের নৈতিক বোধের সঙ্গতি সম্পাদন করিয়া থাকি। এইসব কল্পনার মধ্যে যে কোন রকম স্ববিরোধ নাই এবং এগুলি সত্য বলিয়া প্রমাণিত না হইলেও যে সত্য হইতে পারে, তাহা দার্শনিক বিচার হইতে বোঝা গিয়াছে।

আত্মার অমরত্বে ও ভগবদস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারি এবং এই বিশ্বাসে কোন রকমের শৈথিল্য নাও থাকিতে পারে। কিন্তু তথাপি জ্ঞানের দৃষ্টিতে, বাস্তবিক ভগবান আছেনই কিংবা আত্মা অমর, একথা বলিতে পারা যায় না। বুঝিতে হইবে, স্বাতন্ত্র্য, ঈশ্বর, অমরত্ব—এগুলি প্রকল্পনা[৩] মাত্র। এই সব প্রকল্পনা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অব্যক্ত তত্ত্বের প্রতীক[৪] মাত্র। এই সব প্রতীকের দ্বারা অন্তিম তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞান দূরীভূত হইবে না সত্য, কিন্তু তাহারা আমাদের বিশ্বাসের অবলম্বন হইয়া, মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপারে, অর্থাৎ নৈতিক আদেশ প্রতিপালন বা নৈতিক জীবনযাপন বিষয়ে, আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। নীতিমত্তাই যদি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বা চরম লক্ষ্য হয়, নীতির সাধনাই যদি মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা হয়, তাহা হইলে এই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক, সাধনার পরিপোষক, এইসব ধর্মবিশ্বাসের মূল্য বা দান কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

১। Dogma ২। Religious ৩। Ideas ৪। Symbols

প্রকৃত ধর্ম বলিতে কাণ্ট্ নৈতিক ধর্মই বুঝেন। নৈতিক দৃষ্টিতে আমাদের যাহা কর্তব্য, তাহাকেই ভগবানের আদেশ মনে করিয়া জীবনে পরিপালন করার নামই ধার্মিক আচরণ। নৈতিক বিধি বা শুদ্ধপ্রজ্ঞার বাণীকে ভগবদ্‌বাণী বলিয়া গ্রহণ করাই প্রজ্ঞাবাদীর ধর্ম। এই ধর্ম একই হইতে পারে। শুদ্ধ-প্রজ্ঞা বিভিন্ন লোকের অন্তরে বিভিন্ন বিধি প্রকট করিতে পারে না। শুদ্ধ-প্রজ্ঞার স্বরূপ এক হওয়াতে তন্মূলক ধর্মও এক হইতে বাধ্য।

কিন্তু বাস্তবিক ত জগতে বিভিন্ন মতের নানারকমের ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। সব ধর্মের সারমর্ম যদিও ব্যবহারিক প্রজ্ঞার নিয়মেই অর্থাৎ নৈতিক বিধিতেই প্রকটিত, তথাপি এই সব প্রচলিত ধর্মে অনেক অবান্তর কথাও থাকে। অনেক পৌরাণিক বা অলৌকিক ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে এই সব ধর্ম জড়িত। কোন বিশেষ সময়ে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের কাছে বা কোন বিশেষ গ্রন্থে ভগবানেরই বাণী প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বলা হয়। এই সব ধর্ম যাহারা মানে, তাহারা আমাদের নৈতিক বোধের সঙ্গতির জন্য যে সব ধর্মবিশ্বাস আবশ্যক, সে সব ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত আরো অনেক প্রকার ধর্মবিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খ্রীষ্টধর্মের কথা লওয়া যাইতে পারে। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করে যে আদমের পতনের সঙ্গে পরবর্তী কালের সব মানবই পাপগ্রস্ত হইয়াছে, যীশু ভগবানের পুত্র ও আমাদের ত্রানকর্তা। আত্মার অমরত্বের কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা যেমন নৈতিক বোধ হইতেই একরকম পাওয়া যায়, এইসব ধর্মবিশ্বাসের নৈতিক বোধের সঙ্গে সেরকম স্পষ্ট কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি নীতিমূলক ধর্মবিশ্বাসের মূল্য যেমন আমাদের নৈতিক জীবনের সহায়ক হিসাবেই বুঝিতে হয়, সেই রকম এইসব ধর্মবিশ্বাসের যদি কোন নৈতিক অর্থ বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই তাহাদের কোন মূল্য আছে বুঝিতে হইবে, তাহা না হইলে কোন মূল্যই নাই। কোন বাহ্য পদার্থে, কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে বা পুস্তকাদিতে ভগবদিচ্ছার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া এক প্রকারের পৌত্তলিকতা মাত্র। ইহাতে ধর্মের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা পায় না। ধর্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার হইলে সে ধর্মের বাণী মানুষের অন্তরাত্মা হইতেই আসিবে। আমাদের শুদ্ধ প্রজ্ঞার নির্দেশেই ভগবদ্‌বাণী আমাদের কাছে প্রকটিত হয়। ধর্মভাবের এতদপেক্ষা মহত্তর প্রকাশ কাণ্ট্ জানেনও না, মানেনও না।

নৈতিক তথ্যই অল্পাধিক পরিমাণে, প্রচলিত নানা ধর্মের বিভিন্ন মতবাদে ও অলৌকিক কাহিনীতে জড়িত আছে। এই নৈতিক ধর্মভাব যে ধর্মমতে সমধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই ধর্মমতকেই উচ্চশ্রেণীর বলিয়া মানিতে হয়। কাণ্ট্ অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না, খ্রীষ্টধর্মই ভাল করিয়া জানিতেন। সেই ধর্মকেই নৈতিক ধর্ম বলিয়া শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্মের নানা মতবাদ অক্ষরে অক্ষরে মানিতেন, একথা বলা যায় না। ঐসব মতবাদকে নৈতিক তথ্যের রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, নানা ধার্মিক মতবাদের আবেষ্টনে যে সব নৈতিক তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে, সেগুলির উদ্ঘাটনই ধর্মসম্বন্ধীয় দার্শনিক বিচারের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি তাহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মানুষের প্রকৃতিতে অনর্থের, দুর্নীতির বা পাপের বীজ কি করিয়া আসিল, ইহাই ধর্মসম্বন্ধীয় নৈতিক বিচারের মুখ্য প্রশ্ন। আমরা যে আমাদের নিজের সুখের বা সুখান্বেষী স্বার্থের স্থান নৈতিক বিধির উপরে দিয়া থাকি অর্থাৎ অন্তরাত্মার নৈতিক আদেশ উপেক্ষা করিয়া নিজের সুখান্বেষণে ব্যাপৃত হই, তাহাতেই আমাদের পাপাসক্তি ব্যক্ত হয়। এই যে মন্দের প্রতি আমাদের ঝোঁক, বা পাপের প্রতি আসক্তি, ইহা বাস্তবিক আমরা বুঝিতে পারি না। ভালমন্দ, পুণ্যপাপ মূলতঃ আমাদের আন্তরিক ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে যখন আমাদের স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই মানিতে হয়, তখন আমাদের কুপ্রবৃত্তির জন্য আমরা যে শুধু দায়ী তাহা নহে, আমাদের স্বভাবই অনর্থপ্রবণ বলিয়া বুঝিতে হয়, অনর্থ বা পাপের বীজ প্রথম হইতে আমাদের স্বভাবেই রহিয়াছে। ইহাকে 'মৌলিক অনর্থ'[১] বলা যায়। মানুষের স্বভাবগত অনর্থপ্রবণতাকেই বাইবেলে সয়তান ও আদমের গল্পের রূপকে প্রকাশ করা হইয়াছে। যে সয়তান প্রথমে স্বর্গীয় দূত ছিল, সে-ই জগতে পাপ আনিয়া মানুষকে বিপথগামী করিয়াছে, ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, আমরা পাপের মূল, আদি বা আরম্ভ বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করিতে পারি না, এইটুকু মাত্র। যখন আমরা কোন অসৎ ইচ্ছা করিয়া থাকি, তখন আমরা আদমের অধঃপতনের পুনরাবৃত্তি করি মাত্র।

কাণ্টীয় কল্পনাতে মানুষের স্বভাবগত অনর্থপ্রবণতাকে সয়তান বলা যাইতে পারে। তাহা দ্বারাই আমাদের ইচ্ছা বিপথে চলিয়া থাকে। শুধু

১। Radical Evil

এই অর্থেই বলা যাইতে পারে যে, আমরা আদমের পাপে পাপগ্রস্ত হইয়াছি। ইহার অর্থ কখনই এই নয় যে, আদমের পাপ উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

সয়তানের দ্বারা মানুষ বিপথে চালিত হয়, এই কথার অর্থ এই যে, মনুষ্য-স্বভাবের ভিত্তি কখনই পাপময় নয়, এবং পতন হইলেও মানুষের উত্থানের বা ভাল হইবার আশা সব সময়ই থাকে। পতন সত্ত্বেও আমাকে উঠিতে হইবে, ভাল হইতে হইবে, এই রকম প্রেরণা আমাদের অন্তরাত্মায় পাইয়া থাকি।

কোন রকম ক্রমিক পরিবর্তনে যে মানুষ ভাল হইয়া উঠে তাহা নহে। ভাল হইবার জন্য, ধর্মপথে যাইবার জন্য, হঠাৎ আমাদের ভাবনা চিন্তার আমূল পরিবর্তন, একপ্রকারের আধ্যাত্মিক বিপ্লব, আবশ্যক। ইহাকে নৈতিক পুনর্জীবনও বলা যায়। এই পরিবর্তন কি করিয়া হয়, তাহা লৌকিক দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই ইহাকে ভগবৎ করুণা[১] জন্য বলা হয়।

অধর্মের সঙ্গে, পাপের সঙ্গে, কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাওয়াই আমাদের নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ধর্মের জয় হইবে, পাপ ক্ষালিত হইয়া যাইবে, কুপ্রবৃত্তি ধ্বংস হইবে, জীবন পুণ্যময় ও পবিত্র হইয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের নৈতিক সাধনার লক্ষ্য। 'তোমার স্বর্গস্থ পিতা যেমন পবিত্র তুমিও তেমনি পবিত্র হও' এইত খ্রীষ্টধর্মের আদেশ। কিন্তু পূর্ণতা বা পবিত্রতা মানুষের জীবনে লৌকিক জগতে লাভ করিতে পারা যায় না। ইহাকে শুধু সমস্ত মানবজাতির আদর্শরূপেই বুঝিতে পারা যায়। এই আদর্শকে ধার্মিক কল্পনাতে মূর্তিমান অবস্থায় ভাবিতে গিয়া ভগবানের প্রিয়কারী ভগবৎপুত্র রূপে ভাবা হইয়া থাকে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানবতার কল্পনাই খ্রীষ্টের কল্পনাতে পাই এবং খ্রীষ্টসম্বন্ধীয় বাইবেলের যাবতীয় উক্তি এই অর্থেই বুঝিতে হইবে। খ্রীষ্টকে নৈতিক আদর্শরূপেই বুঝিতে হইবে। এ আদর্শ আমরা কোন লৌকিক জ্ঞানে পাই না, অলৌকিক ভাবেই আমাদের কাছে আসে বলিয়াই বলা হয়, খ্রীষ্ট স্বর্গ হইতে আমাদের কাছে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! ধর্মের নীতির অপরাজেয় শক্তিতে বিশ্বাসের নামই খ্রীষ্টে বিশ্বাস। ভগবৎপ্রতিম পূর্ণতার আদর্শ আমাদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করিয়া আমাদের সে আদর্শ জীবনে যথাসম্ভব প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে অনু-প্রাণিত করে বলিয়াই এই বিশ্বাসের মূল্য আছে। নৈতিক আদর্শরূপে না

১। Grace

বুঝিয়া রক্তমাংসের দেহধারী জীবরূপে বুঝিলে খ্রীষ্টের কল্পনা দ্বারা বিশেষ কোন লাভ (ধর্মজীবনে, নৈতিক জীবনে) হইতে পারে না। এমনও যদি ভাবি, স্বয়ং ভগবানই খ্রীষ্টদেহে মূর্তিমান হইয়াছিলেন, তাহা হইলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, তিনি প্রত্যেক মানবের মধ্যেই সেই রকম ভাবে ব্যক্ত হইলেন না কেন? অর্থাৎ সব মানুষকেই সেইরকম ভাবে আপনার সহিত এক করিয়া নিলেন না কেন? খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিবার জন্য যাহাকে প্রজ্ঞার সাক্ষ্য ছাড়া অদ্ভুত ঘটনাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহার ঐরূপ মনোভাবের দ্বারা নৈতিক অবিশ্বাসই প্রবর্তিত হয়। আমাদের চিত্তের নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হইলে, খ্রীষ্ট বলিতে যে নৈতিক আদর্শ বুঝায়, তাহাতে স্বতঃই প্রত্যয় হওয়া উচিত। তাহাতে বিশ্বাস করিবার জন্য কোন বাহ্যিক ঘটনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না।

আসল কথা, কাণ্টের মতে নৈতিক জীবনই শ্রেষ্ঠ ধর্মজীবন। আমাদের যেসব ধর্মবিশ্বাস বা মতবাদ নৈতিক আদর্শকে আমাদের কাছে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও কার্যকরী করিয়া তোলে, সে সবেরই বাস্তবিক মূল্য আছে। যেসব অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের চিত্ত নির্মল হইয়া নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত করিবার উপযোগী হয়, সেসব অনুষ্ঠানই বাস্তবিক বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত তথাকথিত ধার্মিক ব্যাপারে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, যেসব মত, বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের কোন নৈতিক অর্থ নাই এবং নৈতিক জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, সে সবের কোন মূল্যই কাণ্ট্ বুঝেন না। সেগুলি তাহার কাছে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস বা বাতুলতা মাত্র।

একান্ত আন্তরিকভাবে নৈতিক জীবন যাপন করিবার চেষ্টা, নৈতিক আদর্শ জীবনে পরিস্ফুট করিবার যথাসাধ্য প্রয়াস অপেক্ষা উচ্চতর ধার্মিক সাধনা কাণ্ট্ জানেন না। তাঁহার মতে সংবেদনমূলক বাসনাপীড়িত জীবনের বদ্ধাবস্থা হইতে প্রজ্ঞাচালিত বিষয়বিরত নৈতিক জীবনের মুক্তাবস্থায় উন্নীত হইবার সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক সাধনা। এক কথায় মুক্তির বা স্বাতন্ত্র্যের সাধনাই মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা।

কাণ্টদর্শনের তাৎপর্য

আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

কাণ্ট দর্শনের তাৎপর্য

সূচনা

কাণ্টের মতে নিশ্চয়মাত্রই জ্ঞান নয়, জ্ঞান ভিন্ন নিশ্চয়ও আছে। অন্য নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয় ও নিশ্চয় ভিন্ন কোন কোন প্রত্যয়কেও নিশ্চয় বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ ভ্রম দূর করার জন্য নিশ্চয়প্রত্যয়ের বিস্তারিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কাণ্টের দর্শনে নিশ্চয়পরীক্ষাই প্রধান বিচার। এইজন্য এই দর্শনকে 'পরীক্ষাদর্শন' (Critical Philosophy) নামে অভিহিত করা হয়।

কাণ্ট অব্যক্ত ও ব্যক্ত দুইপ্রকার পদার্থকেই নিশ্চয় স্বীকার করেন। ব্যক্ত পদার্থের নিশ্চয়কেই সাধারণতঃ নিশ্চয় বলা যায়, এই নিশ্চয়ের পরীক্ষা হইতেই অব্যক্তপদার্থনিশ্চয়ের প্রসঙ্গ উঠে। ব্যক্তবিষয়ক নিশ্চয় তাঁহার মতে মূলতঃ দুই প্রকার—জ্ঞাননিশ্চয় ও জ্ঞানেতরনিশ্চয়। প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের জ্ঞানকেই তিনি সাধারণতঃ জ্ঞান বলেন। কিন্তু স্বাধীনকৃতিস্বরূপ অবিষয় আত্মার জ্ঞানও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানেতর নিশ্চয়ও তাঁহার মতে দুইপ্রকার। এক প্রকার ঐরূপ কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞানের গর্ভীভূত, অপর প্রকার কৃতিনিরপেক্ষ. বেদনাত্মক কল্পনা হইতে প্রসূত। কাণ্টের নিশ্চয়পরীক্ষা, জ্ঞানপরীক্ষা, কৃতিপরীক্ষা ও বেদনাপরীক্ষা এই তিনভাগে বিভক্ত। জ্ঞান-পরীক্ষায় প্রধানতঃ তিনি বিষয়জ্ঞানের বিচার করিয়াছেন। কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞান ও তাহার সাপেক্ষ জ্ঞানেতর নিশ্চয়ের বিচার কৃতিপরীক্ষা গ্রন্থের অন্তর্ভূত। বেদনাপরীক্ষায় কল্পনাজন্য জ্ঞানেতর নিশ্চয়ের বিচার করা হইয়াছে।

---

(১) কৃতিপরীক্ষা বা ধর্মপরীক্ষা

জ্ঞানেতর নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া যে ভ্রম হয় তাহার মূল ও তাহার নিরাসের প্রয়োজন কৃতিপরীক্ষা হইতেই বুঝা যায়।

কর্তৃত্বজ্ঞানাত্মক কর্মকে কৃতি বলে। ক্রিয়াকল্পনার পরিণাম ভাবে প্রতীয়মান ক্রিয়াই এস্থলে কর্মশব্দের অর্থ। কর্মমাত্রেই কর্তৃত্বজ্ঞান থাকে না। ক্রিয়াকল্পনাকে আমি ক্রিয়ায় পরিণত করিতেছি, পরিণতির কারণ আমি—এইরূপ জ্ঞানকে কর্তৃত্বজ্ঞান বলে। আমি কর্ম করিতেছি এই জ্ঞানে আমি কেন করিতেছি, অর্থাৎ কি প্রবর্তনায় করিতেছি তাহার জ্ঞান থাকে। কেন করিতেছি—এই জ্ঞান দুই প্রকার। কর্মের অতিরিক্ত ইষ্টফলের জন্য করিতেছি এই এক প্রকার জ্ঞান। কর্ম ইষ্টফলসাধন বলিয়া নয়, স্বতঃই ইষ্ট বলিয়া করিতেছি এই অন্য প্রকার জ্ঞান। কর্ম যে ইষ্টবুদ্ধি বা ইষ্টসাধনবুদ্ধিতে করা যায় তাহাকে কৃতির প্রবর্তনা বলে। কৃতিপ্রবর্তক ইষ্টসাধনবুদ্ধিকে ফলতন্ত্রপ্রবর্তনা বলা যায় ও কৃতিপ্রবর্তক ইষ্টবুদ্ধিকে স্বতন্ত্রপ্রবর্তনা বলা যায়। স্বতন্ত্রপ্রবর্তনায় কৃতিই স্বতন্ত্রকৃতি। ফলতন্ত্রপ্রবর্তনায় কৃতিকে পরতন্ত্রকৃতি আখ্যা দেওয়া যায়। স্বতন্ত্রপ্রবর্তনায় ফলতন্ত্র নয় এইরূপ স্ফুট নিষেধপ্রতীতি থাকে। পরতন্ত্র নয় এই নিষেধপ্রতীতি ভিন্ন স্বতন্ত্রকৃতিই হয় না। পরতন্ত্রকৃতিতে স্বাতন্ত্র্যনিষেধের স্ফুটপ্রতীতি না থাকিতে পারে। কিন্তু ফলতন্ত্রপ্রবর্তনায় কৃতি যে পরতন্ত্র, ফলকামনা যে কৃতির অতিরিক্ত পদার্থ এই জ্ঞান স্বতন্ত্রকৃতির অপেক্ষা করে। যে কর্তার স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান হয় নাই তাহার ফলকামনা যে স্বাতিরিক্ত পদার্থ অর্থাৎ কাম যে আত্মার পর বা রিপু এই জ্ঞান হয় না। কর্তার স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান ও পারতন্ত্র্যজ্ঞান এই অর্থে পরস্পর সাপেক্ষ বলা যায়।

কৃতি স্বতঃই ইষ্ট, ইষ্টসাধন বলিয়া ইষ্ট নয়—এই প্রতীতি কর্তব্যতা বা বিধির জ্ঞানে ভিন্ন অন্যত্র হয় না। কেবল আনন্দে বা লীলাবুদ্ধিতে যদি কর্ম সম্ভব হয় সেরূপ কর্ম কর্তৃত্বজ্ঞানাত্মক বা কৃতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই কর্ম কর্তব্য বলিয়া করিতেছি, ফলকামনাবর্জিত বিধিবুদ্ধিতে করিতেছি—এই প্রতীতিই কৃতির স্বতঃইষ্টত্বের প্রতীতি। কৃতির দুই প্রবর্তক স্বীকার করা যায়—ফলকামনা ও বিধিবুদ্ধি। বিধিবুদ্ধি হইতে ভিন্ন বিধির বস্তুতা বুঝা যায় না, এইজন্য বিধিকেই স্বতন্ত্রকৃতির প্রবর্তক বলা যায়। ফলকামনা হইতে ভিন্ন ফলের জ্ঞান হয়, এইজন্য পরতন্ত্রকৃতির প্রবর্তক ফল নয়, ফলকামনা বা কাম বলিতে হয়। বিধি ও কাম এই দুইকে কৃতিপ্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

বিধির নিশ্চয় ও স্বতন্ত্রকৃতির নিশ্চয় পরস্পরসাপেক্ষ। কাণ্টের মতে উভয় নিশ্চয়ই জ্ঞান বলা যায়, একই জ্ঞানের দুই রূপ বলিলে হয়, তবে এই জ্ঞান কৃতিতন্ত্র আত্মজ্ঞান, কৃতিনিরপেক্ষ বিষয়জ্ঞান নয়। বিধিপালনরূপ স্বতন্ত্রকৃতিতেই কৃত্যাত্মক শুদ্ধ আত্মার ও বিধির যুগপৎ জ্ঞান হয়। কাণ্টের মতে কৃতিনিরপেক্ষ আত্মার জ্ঞান নাই। পরতন্ত্র কৃতিতে যে আত্মার প্রতীতি হয় তাহা কাম হইতে অভিন্ন আত্মার জ্ঞান, শুদ্ধ আত্মার জ্ঞান নয়। স্বতন্ত্র-কৃতিতেই কৃতিস্বরূপ শুদ্ধ আত্মার জ্ঞান হয়। বিধিজ্ঞানেই কৃতির স্বাতন্ত্র্য। পরতন্ত্র কৃতিতে বিধিপ্রবর্তনার নিষেধজ্ঞান থাকিতে পারে বটে কিন্তু এই নিষেধজ্ঞানে বিধির জ্ঞান হয় বলা যায় না। কর্ম কর্তব্য বলিয়া করিতেছি না এই জ্ঞানে কর্তব্যতা বা বিধির বেদনানিশ্চয় মাত্র হয়, জ্ঞান হয় না। আত্মার পাপ বা অশুদ্ধির যে অনুভূতি, আত্মার দণ্ডার্হত্ব বা দুঃখার্হত্বের বেদনারূপ যে পূর্বাভাস তাহাই বিধি যেন লঙ্ঘিত বা অপালিত অবস্থায় থাকিতেছে এই ঔপচারিক জ্ঞানরূপে আভাসিত হয়। বিধিপালনরূপ স্বতন্ত্রকৃতিই শুদ্ধাত্মজ্ঞান বা বিধিজ্ঞান। এই আত্মা হইতে আত্মজ্ঞান ভিন্ন নয়, আত্মজ্ঞান হইতে বিধিজ্ঞান ভিন্ন নয়, এবং বিধিজ্ঞান হইতে বিধি ভিন্ন নয়। সুতরাং কৃত্যাত্মক শুদ্ধাত্মা হইতে বিধি ভিন্ন নয় বলা যাইতে পারে।

পরতন্ত্রকৃতিতে উহা বিধিপ্রবর্তিত নয় এই প্রতীতি থাকিলেও তাহা বিধিজ্ঞান নয় বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্রকৃতিতে উহা কামপ্রবর্তিত নয়—এই প্রতীতি অবশ্যম্ভাবী এবং এই কামনিষেধপ্রতীতি প্রবর্তককামের জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিধিস্বরূপ আত্মার জ্ঞানে কাম হইতে অভিন্ন আত্মারও জ্ঞান হয়। বিধিপালনে একই আত্মার এই দুই রূপের জ্ঞান হয়। একই আত্মা কেন দ্বিরূপভাবে প্রকাশ হয় তাহা আমাদের বোধাতীত কিন্তু বিধিপালনে এইরূপ প্রকাশ যে হয় তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। বিধিস্বরূপ আত্মা ও কামস্বরূপ আত্মার ভেদাভেদ জ্ঞানে আত্মা একাধারে শাসিত ও শাসিতা, আদিষ্ট ও আদিষ্টা—এইরূপ অনুভব হয়।

বিধিপালন ও স্বতন্ত্রকৃতিতে কেবল বিধিই প্রবর্তক। জ্ঞাতসারে বিধি ও কাম এই দুই প্রবর্তকের মিশ্রণ হইতে পারে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিধিপ্রবর্তনায় বিধিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞাতসারে বা প্রচ্ছন্নভাবে কাম সংশ্লিষ্ট আছে এইরূপ অনুমান করা যায়। এইরূপ প্রচ্ছন্ন কাম সত্ত্বেও কৃতির স্বাতন্ত্র্যের অপলাপ হয় না। কিন্তু ইহাতে আত্মার কোনও অশুদ্ধি হয়

না বলা যায় না। স্বতন্ত্র কৃত্যাত্মক আত্মাই শুদ্ধ আত্মা, ইহাতে অশুদ্ধির সম্ভাবনা কিরূপে হয় এই সমস্যা উঠিতেছে।

বিধি ও স্বতন্ত্রকৃতি বস্তু হিসাবে এক হইলেও জ্ঞেয়তা হিসাবে ভিন্ন বলা যায়। বিধি শুদ্ধাত্মার স্বরূপ, অশুদ্ধাত্মা বা কামাত্মার অপেক্ষায় শুদ্ধাত্মাকে স্বতন্ত্রকৃতিস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি হয়। কামবর্জনরূপ ক্রিয়ার দ্বারা নিরূপিত যে শুদ্ধাত্মা তাহাই স্বতন্ত্রকৃতিভাবে জ্ঞেয়। শুদ্ধাত্মার বিধিস্বরূপতাজ্ঞানকে শুদ্ধজ্ঞান ও উহার স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান ক মিশ্র বা কামাপেক্ষ জ্ঞান বলা যায়। একই শুদ্ধাত্মার এই দুই প্রকার জ্ঞেয়তা স্বীকার করিতে হয়। স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানে আত্মা একাধারে শাসিতা ও শাসিত এই অনুভূতি থাকে। এই অনুভূতি বেদনাবিশেষ, উহা জ্ঞান নয়। বেদনা হইলেও উহা সুখদুঃখরূপ প্রাকৃত বেদনা হইতে একান্তভিন্ন। এই অপ্রাকৃত বেদনার নাম আত্মসম্মান। আত্মসম্মানে শাসিত আত্মা ভৃত্যভাব ও শাসক আত্মা প্রভুভাব অনুভব করে। ভৃত্যভাবের অর্থ নিরভিমানত্ব। প্রভুভাবের অর্থ অভিমান নয়, আত্মপ্রসাদ। এই নিরভিমান আত্মপ্রসাদের নাম আত্মসম্মান।

স্বতন্ত্রকৃতিতে শুদ্ধাত্মার জ্ঞান আত্মসম্মানরূপ বেদনার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বিধিজ্ঞানরূপ আত্মার শুদ্ধজ্ঞান অপেক্ষায় স্বতন্ত্র আত্মার জ্ঞানকে মিশ্রজ্ঞান বলা যায়। মিশ্রজ্ঞানকে জ্ঞান হিসাবে অশুদ্ধ বা দুষ্ট বলা যায় না। আত্মসম্মানরূপ বেদনা কৃতিপ্রবর্তক কামের ন্যায় শুদ্ধাত্মার পর বা রিপু নয়। এই বেদনা স্বতন্ত্রকৃতির প্রবর্তকও বলা যায় না। স্বতন্ত্রকৃতির প্রবর্তক বিধিজ্ঞান বা বিধি। আত্মসম্মান স্বতন্ত্রকৃতিরই প্রসাদ বা অপ্রাকৃত পরিণাম বলিতে হয়। কৃতি ও বেদনার ভেদাভেদবশতঃ এই বেদনা যেন কৃতিপ্রবর্তক এইরূপ আভাস হয়। স্বাতন্ত্র্যপ্রত্যয়ে কামবর্জনরূপ যে কামাপেক্ষা তাহা আত্মার অশুদ্ধি না হইলেও অশুদ্ধির বীজ বা অবকাশ বলা যায়। এই অবকাশে আত্মসম্মানরূপ বেদনা থাকিলে অশুদ্ধিবীজ অঙ্কুরিত হয় না, বীজশক্তিই ক্ষীণ হইতে থাকে। আত্মসম্মানই স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ অনুভূতি। স্বাতন্ত্র্যের অযথার্থ বা প্রতিকূল অনুভূতিও হইয়া থাকে। নিরভিমানত্ব ও আত্মপ্রসাদ—আত্মসম্মানের দুই রূপ বলা হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্যের অযথার্থ অনুভূতিরও দুই রূপ প্রসিদ্ধ—স্বাতন্ত্র্যাভিমান ও স্বাতন্ত্র্যবিলাস। কাণ্টের মতে স্বতন্ত্রকৃতি বা বিধিপালনই ধর্ম। সুতরাং এই দুই অনুভূতির নাম ধর্মাভিমান ও ধর্মবিলাস দেওয়া যায়। এই দুই থাকিলে কৃতির স্বাতন্ত্র্য লোপ হয় না।

বটে কিন্তু আত্মার অশুদ্ধিবীজ অশুদ্ধিভাবে ব্যক্ত হয়। এই অশুদ্ধিবশতঃই স্বতন্ত্রকৃতিকে বিধিপ্রবর্তনার সহিত কামপ্রবর্তনা প্রচ্ছন্নভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। আত্মার ব্যক্ত অশুদ্ধিকে কামের বা অধর্মের স্বস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

আত্মসম্মানরূপ স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতিতেই ধর্মাভিমান ও ধর্মবিলাস স্বাতন্ত্র্যের প্রতিকূল অনুভূতি ও আত্মার অশুদ্ধি বলিয়া ব্যক্ত হয়। জ্ঞানেতর নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয় বলা হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ অনুভূতি হইলে অযথার্থ অনুভূতিই এই ভ্রমের মূল এবং এই ভ্রমের নিরাস প্রয়োজন ইহা বুঝিতে পারা যায়। স্বাতন্ত্র্য বা বিধির জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে। এই জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট শুদ্ধবেদনা হইতে জ্ঞানেতর নিশ্চয় উদ্ভূত হয় এবং এই নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া যে ভ্রম হয় তাহা অশুদ্ধবেদনা-প্রসূত বলিয়া প্রতীতি হয়।

বেদনাই কল্পনার মূল। অশুদ্ধবেদনাপ্রসূত কল্পনায় কল্পিত পদার্থের নিশ্চয় হয় না। শুদ্ধাত্মবেদনাজন্য কল্পনায় নিশ্চয় হয়। নিশ্চয়াত্মক কল্পনাকে ধ্যান বলা যায়। স্বতন্ত্রকৃতি বা ধর্মের অনুভূতি শুদ্ধ আত্মার বেদনা। শুদ্ধাত্মবেদনা কৃতিনিরপেক্ষও হইতে পারে কিন্তু সেই বেদনা হইতে প্রসূত যে ধ্যাননিশ্চয় তাহা জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয় না, তাহা জ্ঞান কি না এই প্রশ্নই উঠে না। ধর্মানুভূতিজন্য ধ্যাননিশ্চয়ই জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এইজন্য প্রথমে এই ধ্যাননিশ্চয়েরই প্রসঙ্গ উঠিতেছে। ধ্যাননিশ্চয় জ্ঞান নয় এবং তাহাকে জ্ঞান বলিয়া যে ভ্রম তাহার মূল ধর্মাভিমানাদিরূপ অশুদ্ধধর্মানুভূতি—এই স্ফুটপ্রতীতি আত্মসম্মানরূপ ধর্মানুভূতিতেই উদ্ভূত হয়।

বিধিপালনরূপ স্বতন্ত্রকৃতিকে ধর্ম বা ধর্মজ্ঞান দুইই বলা যায়। ধর্ম ও ধর্মজ্ঞান একই পদার্থ। ধর্মজ্ঞান ও ধর্মবেদনার ভেদাভেদ প্রত্যয় হয়। বেদনা এস্থলে জ্ঞানাত্মক, কিন্তু জ্ঞান বেদনাত্মক নয়। ধর্মবেদনা ধর্মজ্ঞানাত্মক বলিয়া বেদনাজন্য কল্পনা অবস্তুকল্পনা নয়, নিশ্চয়াত্মক ধ্যান। জ্ঞান এস্থলে বেদনাত্মক নয় বলিয়া এই নিশ্চয় জ্ঞান নয়। ধর্মজ্ঞানেই আত্মজ্ঞান হয় ও ধর্মবেদনা হইতে আত্মবিষয়ক ধ্যাননিশ্চয় হয়। ধর্মস্বরূপ আত্মা জ্ঞেয়বস্তুও বটে, ধ্যেয়বস্তুও বটে। আত্মজ্ঞানে আত্মা অবিষয়ভাবে ও আত্মধ্যানে বিষয়ভাবে প্রতীত হয়। ধর্মের যথার্থ বা অনুকূল বেদনায় আত্মার জ্ঞেয়তা ও ধ্যেয়তার ভেদ উপলব্ধি হয়। ধর্মের প্রতিকূল বেদনায় এই ভেদাভেদ নষ্ট হয়, ধ্যেয় আত্মাকে জ্ঞেয় অবিষয় বলিয়া অথবা জ্ঞেয় আত্মাকে ধ্যেয় বিষয়

বলিয়া ভ্রম হয়। এই দুই ভ্রম যথাক্রমে ধর্মাভিমান ও ধর্মবিলাসরূপ প্রতিকূল ধর্মবেদনায় অবলম্বন বলা যায়।

বিধিপালন করিতেছি এই নিশ্চয়কে জ্ঞান বলা হইয়াছে। স্বতন্ত্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়া বা ক্রিয়াফলরূপ বিষয় যে সাধিত হয়, অর্থাৎ অবিষয় আত্মা যে অনাত্মপরিণামের কারণ—এই নিশ্চয়কে জ্ঞান বলা যায় না। স্বতন্ত্রকৃতিরূপ আত্মার জ্ঞেয়তা ও অনাত্মকার্যের স্বতন্ত্র কারণ বা কর্তৃরূপ আত্মার ধ্যেয়তামাত্র স্বীকার করা যায়। অনাত্মকার্যের অনাত্মকারণ জ্ঞেয় বটে, কিন্তু ঐ কার্যের প্রতি আত্মার কারণতার জ্ঞানেতর নিশ্চয় হয় মাত্র। স্বতন্ত্রকৃতিতে কামবর্জনরূপ কামাপেক্ষা আছে বলা হইয়াছে। স্বাতন্ত্র্যের বেদনায় এই কামাপেক্ষা হইতে আত্মার বিষয়-পরিণামের প্রতি কারণতার নিশ্চয় হয়। অনুকূল বেদনায় এই নিশ্চয় জ্ঞান নয় বলিয়া উপলব্ধি হয়। স্বাতন্ত্র্যাভিমানে এই নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয়। জ্ঞেয় অনাত্মকার্যের অনাত্মকারণ অন্য অনাত্মকারণের কার্য, সুতরাং অনাত্মকারণ পরতন্ত্র ও অনাদি বলিতে হয়। আত্মা অনাত্মকার্যের অন্যতর কারণ। এই আত্মা স্বতন্ত্রকৃতিরূপ বলিয়া স্বতন্ত্র কারণ ও আদি কারণ বলা যায়। ধর্মানুভূতিতে অনাত্মকার্যের স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র দুই কারণেরই যুগপৎ নিশ্চয় হয়। ধর্মাভিমানে পরতন্ত্র কারণের ন্যায় আত্মরূপ স্বতন্ত্র কারণও বিষয়ভাবে জানিতেছি এইরূপ অভিমান হয়।

প্রাকৃত কার্যের কারণতাপ্রসঙ্গে আত্মার অপ্রাকৃত স্বতন্ত্রকারণতার প্রথম নিশ্চয় হয়। বিষয়ভাবে জ্ঞেয় কালিক ঘটনা অর্থাৎ কালপ্রবাহে উৎপন্ন ও স্থিত পদার্থকেই প্রাকৃত কার্য বলা হয়। অপ্রাকৃত কারণের নিশ্চয় হইলে অপ্রাকৃত বা কালাতীত কার্যেরও কল্পনা হয়। অপ্রাকৃত আত্মা যেরূপ কালিক ঘটনার কালাতীত কারণ, পাপপুণ্যরূপ আত্মার অপ্রাকৃত অবস্থারও সেইরূপ কারণ। আত্মার এই কার্যাবস্থাকে কাণ্ট্ noumenal character (অপ্রাকৃত স্বভাব বা আত্মশরীর) শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কার্যের অপেক্ষায় আত্মার স্বতন্ত্রকারণতা বুঝা যায়।

স্বতন্ত্রকৃতি ফলকামনাপ্রবর্তিত নয় বটে, কিন্তু ইহার আত্মার শ্রেয়োরূপ ফল অস্বীকার করা যায় না। ফলকামনাবর্জনের বুদ্ধিতেই এই ফলের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রেয়োবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধিসাপেক্ষ, ধর্মবুদ্ধি শ্রেয়োবুদ্ধিসাপেক্ষ নয় বলা যায়। পরতন্ত্রকৃতিতে ফলকল্পনা সকাম কল্পনা। স্বতন্ত্রকৃতিতেও

ফলকল্পনা থাকিতে পারে কিন্তু এই কল্পনা নিষ্কাম। ফল এস্থলে কামের বিষয় বা ঈপ্সিত না হইলেও আত্মার ইষ্ট বা কল্যাণ বলিয়া কল্পিত হয়।

স্বতন্ত্রকৃতি বা ধর্মের বেদনা হইতে নিষ্কাম ফলকল্পনা হয়। এই বেদনা যেস্থলে অস্ফুট সেস্থলে ধর্মের ফলকল্পনা উদ্ভূত হয় না। ধর্মের ফলকে শ্রেয়ঃ, ইষ্ট বা কল্যাণ বলা যায়। ধর্মে কল্যাণফলেরও আকাঙ্ক্ষা থাকে না কিন্তু ধর্মবেদনায় কল্যাণফলের নিষ্কাম কল্পনা থাকে। পরতন্ত্রকৃতিতে সুখরূপ ফলের সকাম কল্পনা হয়। পরতন্ত্রকৃতিমাত্রই আত্মার অশুদ্ধস্বভাবের সূচনা করে বটে কিন্তু তাহা অকর্তব্যকৃতি বা অধর্ম না হইতে পারে। অধর্মরূপ পরতন্ত্রকৃতিতে যে প্রাকৃতসুখের সকাম কল্পনা হয় তাহা অনিষ্ট বা অকল্যাণ সুখ বলিয়া প্রতীতি হয়। ধর্মরূপ স্বতন্ত্রকৃতির বেদনাতে প্রাকৃতসুখের নিষ্কাম কল্পনা থাকিতে পারে। সে সুখ প্রাকৃত হইলেও ধর্মবেদনার অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ইষ্ট বা কল্যাণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। ধর্মবেদনায় দুঃখরূপ প্রাকৃত-ফলের কল্পনাও থাকিতে পারে। কিন্তু সে প্রাকৃত দুঃখ স্বতন্ত্রকৃতিজন্য ক্রিয়ার ফলমাত্র, কৃতির বা ধর্মের ফল বলিয়া কল্পিত হয় না। এরূপ স্থলে পুণ্যরূপ আত্মার অপ্রাকৃত স্থিতি বা অবস্থাই ধর্মের ফল বলিয়া প্রতীতি হয়। সর্বত্রই ধর্মের ফল এই পুণ্যরূপ আত্মস্থিতি। কিন্তু ধর্মবেদনার অনুগত সুখও ইষ্টফল বলিয়া পুণ্য ও সুখ এই উভয়সম্বলিত ধর্মফলকেই আত্মার পূর্ণ কল্যাণ বলা যায়।

পুণ্য অপ্রাকৃত কল্যাণ, সুখ প্রাকৃত কল্যাণ। স্বতন্ত্রকৃতিদ্বারা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে পুণ্য সাধিত হয়, বিধিপালক কর্তাই অপ্রাকৃত কল্যাণসাধক কর্তা— এইরূপ নিশ্চয় অনুভবসিদ্ধ। অপ্রাকৃত কল্যাণের অনুরূপ প্রাকৃত কল্যাণ বিধিপালক কর্তার দ্বারা সাধিত হইতেছে এইরূপ অনুভব নাই। এরূপ কল্যাণ হইতেছে বলিয়া সর্বত্র বোধ থাকে না। থাকিলে তাহার সাধক যে কর্তা আমি, এই নিশ্চয় হয় না। পূর্ণকল্যাণরূপ ধর্মফল অবশ্যম্ভাবী। উহার একাংশ পুণ্য আমার সাধ্য ও পুণ্যানুরূপ সুখস্বরূপ যে অপরাংশ তাহা আমার সাধ্য নয় এই নিশ্চয়াত্মক কল্পনা ধর্মবেদনা হইতে উদ্ভূত হয়। ধর্মবেদনা হইতে আত্মার স্বতন্ত্রকারণতার ধ্যাননিশ্চয় হয় বলা হইয়াছে। পূর্ণকল্যাণনিশ্চয়ও এই বেদনাজন্য ধ্যাননিশ্চয়। আত্মার স্বতন্ত্রকারণতার দ্বারা পুণ্য সাধ্য ও সুখ অসাধ্য—এই দুই নিশ্চয় পূর্ণকল্যাণনিশ্চয়ের অন্তর্ভূত।

কোনও কৃতিজন্য পুণ্যের অনুভূতিতে তাহা হইতে অধিক পুণ্যের নিশ্চয় ও তাহার সাধক অন্য কৃতির আকাঙ্ক্ষা থাকে। এইরূপে অনন্ত কৃতিসন্ততির দ্বারা সাধ্য নিরতিশয় পুণ্যের নিশ্চয়াত্মক কল্পনা হয়। অনন্ত কৃতিসন্ততির কল্পনা অনন্তকালকল্পনাসাপেক্ষ। সুতরাং পুণ্যের আত্মকর্তৃত্বসাধ্যত্বনিশ্চয় হইতে অনন্তকালাত্মক জগৎ ও অনন্তকালব্যাপী আত্মকর্তৃত্বরূপ আত্মার অমরত্বের নিশ্চয় হয়। পুণ্যের অনুরূপ সুখ অবশ্যম্ভাবী অথচ সাধক আত্মার কর্তৃত্বদ্বারা সাধ্য নয় এই নিশ্চয় হইতে কল্যাণসুখরূপ ফলদাতা সিদ্ধ ঈশ্বরের ধ্যাননিশ্চয় হয়। এইরূপে সাধক আত্মার অমরত্বের ও সিদ্ধ ঈশ্বরের নিশ্চয় পূর্ণকল্যাণরূপ নিশ্চয়ের অন্তর্ভূত বলা যায়।

আত্মার স্বতন্ত্রকারণতা, আত্মার অমরত্ব ও ঈশ্বরের সিদ্ধত্ব বা অস্তিত্ব—এই তিন অপ্রাকৃত তত্ত্বের নিশ্চয় ধর্মবেদনা হইতে প্রসূত হয়। এই নিশ্চয়ত্রয় আত্মা যেন অপ্রাকৃত বিষয় এই নিশ্চয়ের প্রকারভেদ বলা যায়। অনন্তকৃতি-সন্ততিরূপ আত্মা পূর্ণকল্যাণের ঈশ্বরনিমিত্তাপেক্ষ স্বতন্ত্রকারণ—এই নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত বিষয়ভাবে ধ্যেয় আত্মার নিশ্চয়। বিধি ও স্বাতন্ত্র্য এই উভয়াত্মক ধর্মের জ্ঞান স্বীকার করা হইয়াছে। এই জ্ঞান আত্মার অবিষয়ত্বের জ্ঞান। ধর্মের অনুকূল বেদনায় অবিষয় আত্মার জ্ঞাননিশ্চয় ও অপ্রাকৃতবিষয়ভাবে কল্পিত আত্মার ধ্যাননিশ্চয়ের একান্তভেদের উপলব্ধি হয়। ধর্মাভিমানরূপ প্রতিকূলবেদনায় এই ধ্যাননিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয়। স্বর্গলাভাদি আত্মার অপ্রাকৃত অবস্থার সাধন করিতেছি—এই কার্যকারণজ্ঞান বা উপায়-উপেয়জ্ঞানকে বিষয়জ্ঞান বলিতে হয়। স্বতন্ত্রকৃতিরূপ যে আত্মজ্ঞান তাহা কৃতিতন্ত্র-জ্ঞান। এই জ্ঞানের অপেক্ষায় বিষয়জ্ঞানকে অকৃতিতন্ত্র বা স্বতন্ত্রজ্ঞান বলিয়া নির্দেশ করা যায়। আমার বিষয়জ্ঞানের ন্যায় স্বতন্ত্র আত্মজ্ঞান হইতেছে এই অভিমানই ধর্মাভিমানের সূক্ষ্ম প্রকৃতি।

ধর্মের অনুরূপ অপ্রাকৃত আত্মকল্যাণ হইবেই এই ধ্যাননিশ্চয়কে শ্রদ্ধা বলা যায়। আমি ধর্মের দ্বারা এই কল্যাণ সাধন করিতেছি এই কর্তৃত্বাভিমানই ধর্মাভি-মান। বিধির প্রতি সম্মানেরই রূপান্তর শ্রদ্ধা, এই সম্মানের দ্বারা শ্রদ্ধা অনুপ্রাণিত। ধর্মকে কল্যাণলাভের উপায়স্বরূপ প্রয়োগ করিতেছি এই অভিমানে শ্রদ্ধা নাই। উপায়প্রয়োগ আমারই বলপ্রয়োগ, আমারই বিষয়জ্ঞানরূপ অস্ত্রের চালনা—এইরূপ শ্রদ্ধাহীন স্বতন্ত্রজ্ঞানাভিমান আছে।

ধর্মাভিমানের ন্যায় ধর্মবিলাসও ধর্মের প্রতিকূলবেদনা। বিধিপালনরূপ

কর্মে ফলনিরপেক্ষ আনন্দবোধকে ধর্মবিলাস বলা যায় না। ধর্মের অনুকূলবেদনা আত্মপ্রসাদ বটে কিন্তু আত্মপ্রসাদ কর্তৃরূপ আত্মার সুখবোধ নয়, উহা সুখদুঃখের অতীত অপ্রাকৃত আত্মবেদনা। বিধিরূপ আত্মা যে আমি আমাকে অর্থাৎ কামরূপ আত্মাকে সুশাসিত করিতেছি—এই অনুভূতিই আত্মপ্রসাদ। শাসনের অনুভূতিহীন আনন্দবোধই বিলাস। ক্রীড়ারূপ কর্মকে অথবা নৃত্যগীতাদিরূপ রসক্রিয়াকে কর্মবিলাস বলা যায়। বিধিপালনরূপ কর্মে বিলাস কর্তৃরূপ আত্মা বা সাধকের পক্ষে সম্ভব নয়, সিদ্ধ দেবতাদির পক্ষেই উহা সম্ভব বলিয়া কল্পনা করিতে পারা যায়। কর্মবিলাসে কর্তৃত্বজ্ঞান থাকিতে পারে না। বিলাসালম্বন কর্ম কৃতিই নয়। বিধিপালন সাধকের পক্ষে কৃতিবিশেষ, সুতরাং সাধকের ধর্মবিলাস ভ্রমাত্মক। কিন্তু এই ভ্রমবেদনা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সাধকের ধর্মে যে আনন্দের প্রতীতি হয় তাহা আনন্দই কিনা সংশয় হয়। এই সংশয়িত ধর্মানন্দের নাম ধর্মবিলাস।

ধর্মাভিমানে আত্মার ধ্যানকে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয়। ধর্মবিলাসে আত্মার জ্ঞান ধ্যানমাত্র এই বিপরীত ভ্রম হয়। স্বতন্ত্রকৃতি যেন কৃতিই নয়, আনন্দের স্ফূর্তিরূপ অপ্রাকৃতবিষয়ীভূত ক্রিয়ামাত্র এরূপ কল্পনা হয়। ধর্মাভিমানে আত্মার প্রতীতি যেরূপ স্ফুট, ধর্মবিলাসে সেরূপ স্ফুট নয়। ধর্মবিলাসে অনাত্মবিষয়ের প্রতীতিই স্ফুট, ধর্মাভিমানে উহা অস্ফুট। ধর্মের অনুকূলবেদনায় আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই স্ফুট প্রতীতি থাকে, তবে অনাত্মার প্রতীতি অনাত্মার হেয়ত্বের প্রতীতি। ধর্মাভিমানে আত্মার প্রতীতির সহিত গৌণভাবে অনাত্মার মিথ্যাত্ব-প্রতীতি থাকে। প্রাকৃত বিষয় যে কেবল বর্জন করিতেছি তাহা নয়, উহা স্বতন্ত্রকারণতার প্রতিরোধক হইতেই পারে না, উহার কারণতারূপ বস্তুতাই নাই এইরূপ প্রত্যয় আত্মার কারণতার আভিমানিক জ্ঞানের সহিত গূঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। ধর্মবিলাসে অনাত্মবিষয়ের জ্ঞানের সহিত কারণতাহীন আত্মার অস্ফুট প্রত্যয় থাকার বিষয়ে আত্মচ্ছায়ারূপ আভাস-পদার্থের নিশ্চয় হয়। জ্ঞেয় আত্মাকে ধ্যেয় বলিয়া যে ভ্রম ধর্মবিলাসের সূক্ষ্ম আলম্বন তাহাই এই আভাসপদার্থনিশ্চয়রূপে ব্যক্ত হয়। ধর্মাভিমানে আত্মার কারণতার যে আভিমানিক জ্ঞান, ধর্মবিলাসে তাহার স্থানে বিষয়ের স্বতন্ত্রকারণতার জ্ঞানাভিমান হয়। আত্মার স্বতন্ত্রকারণতার নিশ্চয়ে আত্মার স্বতন্ত্র স্থিতি, পুণ্যফলার্থ অনন্তকালাপেক্ষ স্বতন্ত্রকৃতিসন্ততি ও পূর্ণকল্যাণ-

সাধক ঈশ্বরের নিমিত্ততা—এই নিশ্চয়ত্রয় অন্তর্ভূ্ত। এইরূপ বিষয়ের স্বতন্ত্র কারণতার নিশ্চয়ে বিষয়ের আত্মবৎ স্বতন্ত্রস্থিতি, বিষয়ের স্বকল্যাণসাধক স্বতন্ত্র। ক্রিয়াসন্ততি ও জগতের পূর্ণকল্যাণমূর্তিত্ব বা ঈশ্বরদেহত্বের নিশ্চয় অন্তর্ভূ্ত। ধর্মের অনুকূলবেদনায় আত্মবিষয়ক নিশ্চয়ত্রয় শ্রদ্ধাত্মক ধ্যাননিশ্চয় বলিয়া ও তদনুরূপ অনাত্মবিষয়ক নিশ্চয়ত্রয় আনন্দাত্মক ধ্যাননিশ্চয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ধর্মাভিমান ও ধর্মবিলাসরূপ প্রতিকূলবেদনায় শ্রদ্ধাত্মক নিশ্চয়কে ও আনন্দাত্মক নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয়। ধর্মাভিমানে আনন্দাত্মক নিশ্চয়কে ও ধর্মবিলাসে শ্রদ্ধাত্মক নিশ্চয়কে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অনুকূলধর্মবেদনায় এই দুই নিশ্চয়ই অপ্রত্যাখ্যেয় জ্ঞানেতর নিশ্চয়। এক নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া যে প্রতীতি ও তজ্জন্য অপর নিশ্চয় প্রত্যাখ্যেয় বলিয়া যে প্রতীতি তাহা ভ্রান্ত ও বীজভূত ধর্মমল বা আত্মগত অশুদ্ধির পরিচায়ক। ধর্মরূপ আত্মার শুদ্ধির জন্য এই ভ্রমনিরাসের প্রয়োজন, অনুকূল ধর্মবেদনা হইতেই এইরূপ অনুভূতি হয়। এই বেদনায় উপলব্ধ ধ্যান ও জ্ঞানের যে ভেদ তাহারই ভাবনা ভ্রমনিরাসের উপায়। বিধিপালনরূপ ধর্মে আত্মার একপ্রকার জ্ঞান ও অনাত্মার অন্যপ্রকার জ্ঞান হয়। কিন্তু জ্ঞানের এই প্রকারভেদের উপলব্ধি থাকে না। এই অবিবেকহেতু আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরাত্মকত্বের কল্পনা সম্ভাবিত হয়। অন্যবেদনাজন্য কল্পনাতে নিশ্চয় হয় না, ধর্মবেদনাজন্য কল্পনায় নিশ্চয় হয়। প্রতিকূলধর্মবেদনায় নিশ্চয়কে জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয়, অনুকূলবেদনায় এই নিশ্চয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়। আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরাত্মকত্বের জ্ঞান হইতে পারে না কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞান নয় অথচ কল্পনামাত্র নয়—এই নির্দেশ আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। যে প্রতীত বিষয়ের জ্ঞান নাই তাহা কল্পিতমাত্র বলিয়া গৃহীত হয়। জ্ঞানেতর নিশ্চয় সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় না। ধর্মে বা ধর্মজ্ঞানেই জ্ঞানভিন্ন ধ্যাননিশ্চয়ের প্রসঙ্গ উঠে। ধর্মনিরপেক্ষ রসানুভূতিজন্য ধ্যানের সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু সেই ধ্যান নিশ্চয় হইলেও নিশ্চয় বলিয়া ঐ অনুভূতিতে প্রতীত হয় না, ধর্মবেদনাতেই নিশ্চয় বলিয়া প্রতীত হয়। অনুকূলধর্মবেদনায় ধর্মবিলাসের প্রতিকূলত্বের যে অনুভব হয় তাহাতেই প্রথমতঃ ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র রসনিশ্চয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মজ্ঞানে আত্মা বিষয় হইতে ভিন্ন এই জ্ঞান হয়। এইজন্য আত্মজ্ঞান বিষয়-

জ্ঞানকে অপেক্ষা করিলেও আত্মাকে বিষয়াপেক্ষ বলিয়া জ্ঞান হয় না। ধর্মবেদনায় বিষয়পরিমাণের প্রতি আত্মার স্বতন্ত্রকারণতার নিশ্চয় হয়, বিষয়কারণতাকে আত্মায় বিষয়ের ছায়া বলা হয়। এইভাবে আত্মাকে বিষয়াত্মক বলিয়া ধ্যাননিশ্চয় হয়। ধর্মবেদনায় যে আনন্দাত্মক ধ্যান বা রসধ্যানের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা বিষয়ে আত্মার ছায়া অর্থাৎ আত্মা হইতে বিষয় অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি। এইরূপে আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরাত্মকত্বের জ্ঞাননিশ্চয় নাই, ধ্যাননিশ্চয় আছে বলা যায়।

রসধ্যানে বিষয় আত্মচ্ছায়াযুক্ত বস্তু বলিয়া ও শ্রদ্ধাধ্যানে বিষয় আত্মবস্তুনিষ্ঠ ছায়া বলিয়া নিশ্চয় হয়। এইরূপে ধর্মবেদনায় বিষয় ছায়াও বটে বস্তুও বটে অর্থাৎ সদসৎ এই নিশ্চয় হয়। ধর্মজ্ঞানে বিষয়জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। সুতরাং বিষয়জ্ঞান যে ধর্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করে না, আত্মজ্ঞানের ন্যায় কৃত্যাত্মক জ্ঞান নয়, স্বতন্ত্র জ্ঞান, এই প্রতীতি আছে। বিষয়ের জ্ঞান স্বীকার করিলে বিষয়ের বস্তুতা স্বীকার করা হয়। ধর্মজ্ঞানেই বিষয় বস্তু বলিয়া জ্ঞান থাকে। ধর্মবেদনায় বিষয় ছায়াত্মক বা আভাসাত্মক বস্তু বলিয়া জ্ঞানেতর নিশ্চয় হয়। বিষয়জ্ঞান স্বতন্ত্র বলিয়া ধর্মজ্ঞানে গৃহীত হওয়ায় বিষয়ের আভাসাত্মক বস্তুতার যে ধর্মাপেক্ষ নিশ্চয় তাহা স্বতন্ত্র বিষয়জ্ঞানের অবিরুদ্ধ কি না প্রসঙ্গ উঠে। জ্ঞানবিরুদ্ধ ধ্যাননিশ্চয় নিশ্চয়াভাসমাত্র। স্বতন্ত্র বিষয়জ্ঞান বিষয়ের বস্তুতামাত্রজ্ঞান, আভাসাত্মক বস্তুতার জ্ঞান নয়। এইরূপ বস্তুতা জ্ঞেয়ভাবে কল্পনাই করা যায় কি না সন্দেহ হইতে পারে। স্বতন্ত্র বিষয়জ্ঞানে এইরূপ বস্তুতাজ্ঞান অস্ফুটভাবে আছে কি না বুঝিতে হইলে তাহা বিষয়জ্ঞানপদ্ধতি বা প্রমাণদ্বারা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ধর্মবেদনাপেক্ষ নিশ্চয় বিষয়প্রমাণের বিরুদ্ধ হইলে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ধর্মপরীক্ষা বা কৃতিপরীক্ষা হইতে বিষয়ের আভাসাত্মক বস্তুতার নিশ্চয় হইলেও সেই নিশ্চয় ভ্রম কি না নির্ণয় করিবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র জ্ঞানপরীক্ষার প্রয়োজন।

---

(২) জ্ঞানপরীক্ষা

১। জ্ঞানের লক্ষণ

কাণ্ট কৃত্যাত্মক বা কৃতিতন্ত্র আত্মজ্ঞান ও অকৃত্যাত্মক বা স্বতন্ত্র বিষয়জ্ঞান এই দুইপ্রকার জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। এই দুই জ্ঞানের সাধারণ ধর্ম বস্তুতানিশ্চয়। যে পদার্থের জ্ঞান হয় তাহা আছে বা নাই বা বটে বলিয়া প্রতীতি হয়। আত্মার জ্ঞান বিধি বা স্বতন্ত্রকৃতির জ্ঞান। বিধি আছে একথা ঔপচারিক, বিধি বা লিঙর্থের অস্তিত্বের কোনও অর্থ নাই, অথচ বিধি অবস্তু নয়। অস্তিত্ব বস্তুতার প্রকারবিশেষ, বিধির বস্তুতাকে অস্তিত্ব বলা যায় না, বিষয়ের বস্তুতাই অস্তিতা। বিধি বা স্বতন্ত্রকৃতিরূপ আত্মার বস্তুতাকে অস্তিত্ব বলা উপচার বা শব্দবিকল্প মাত্র। 'এই বিধি আছে' না বলিয়া 'ইহা বিধি বটে' বলা উচিত। যে পদার্থ 'থাকিতে পারে' এইরূপ প্রতীতি হয় তাহা 'নাই' বলিয়া নিশ্চয় হইলে এই নিষেধনিশ্চয়কে জ্ঞান বলা যায়। যাহা নাই বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা 'নাই বটে' বলা যায়। যাহা আছে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহাও আছে বটে, বলিয়া জ্ঞান হয়। সুতরাং সর্বত্রই বস্তুতাকে বটে-শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা যায়। পদার্থের জ্ঞাততা 'ইহা বটে' এই বাক্যে প্রকাশিত হয়। বস্তুতানিশ্চয়কে বটে-নিশ্চয় বা বিধাননিশ্চয় বলা যায়। কাণ্টের মতে জ্ঞানের অর্থ বিধাননিশ্চয়।

যে বিষয়পদার্থ থাকিতে পারে এই প্রতীতি আছে, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব-সম্ভাবনার প্রতীতি আছে, তাহা নাই এই নিষেধনিশ্চয়কে 'নাই যে তাহা বটে' এই বাক্যে প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহাকেও বিধাননিশ্চয় বলা যায়। অস্তিত্বসম্ভাবনার নিশ্চয়ও 'থাকিতে যে পারে তাহা বটে' এই বাক্যে প্রকাশ্য বলিয়া বিধাননিশ্চয় বলিতে হয়। এই সৎ পদার্থ না থাকা অসম্ভব—এইরূপ অবশ্যম্ভাবপ্রতীতিও বিধাননিশ্চয়ের অন্তর্ভূত। বিষয়পদার্থ আছে বা নাই এই নিশ্চয়ই মুখ্য বিধাননিশ্চয়। উহার উক্তরূপ সম্ভাবনানিশ্চয় ও অবশ্যম্ভাবনিশ্চয়কে গৌণ বিধাননিশ্চয় বলা যায়। বিষয়পদার্থের এইরূপ বিধাননিশ্চয়ভেদ স্বীকার করিতে হয়। বিধি বা স্বতন্ত্রকৃতিরূপ আত্মার গৌণ নিশ্চয় নাই, নিষেধ-নিশ্চয়ও নাই।

বস্তুতা ও জ্ঞাততার সম্বন্ধে কাণ্টমতের বিস্তারার্থ বিচার প্রয়োজন। জ্ঞাতপদার্থ বস্তু হইলেও উহার জ্ঞাততা হইতে উহার বস্তুতা ভিন্ন বলা যায়।

জ্ঞাততা বস্তুনিষ্ঠ পদার্থবিশেষ। এই পদার্থের নামান্তর ব্যক্ততা বা প্রকাশ। জ্ঞাততাপ্রত্যয় 'আমি জানিতেছি' এই প্রত্যয়ের নামান্তর মাত্র নয়। বিষয়-জ্ঞানে উহা জ্ঞানের সহিত বস্তুর সম্বন্ধদ্বারা ঘটিত ও সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন আগন্তুক বস্তুধর্ম বলিয়া অনুভব হয়। স্বতন্ত্রকৃতিরূপ আত্মজ্ঞানে উহা আত্মবস্তুর আগন্তুকধর্ম বলা যায় না। বিষয় জ্ঞাত হইলেই যেরূপ তাহার পূর্ব অজ্ঞাতত্বের জ্ঞান হয়, আত্মা জ্ঞাত হইলে তাহার সেইরূপ জ্ঞান হয় না। অথচ পূর্বেও তাহার বর্তমান জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞান ছিল এইরূপ প্রতীতি হয় না, বর্তমান জ্ঞানের অপেক্ষায় তাহার অসম্যক্‌জ্ঞান ছিল এইরূপ প্রতীতি হয়। বর্তমানে আত্মার জ্ঞান অপেক্ষাকৃত সম্যক্ ইহার অর্থ কেবল এরূপ নয় যে আত্মার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বর্তমানে জানা যাইতেছে অথবা আত্মার স্ফুটতর প্রকাশ হইতেছে। ইহার অর্থ আত্মার বস্তুতাই বৃদ্ধি হইতেছে, আত্মা সিদ্ধতর হইতেছে বলিয়া প্রকাশতর হইতেছে। সুতরাং আত্মা সদাপ্রকাশ বস্তু হইলেও আপেক্ষিকভাবে অপ্রকাশ বস্তুও বটে। এই অর্থে আত্মা ব্যক্তাব্যক্ত বস্তু বলা যায়। বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে অব্যক্ত, উহার ব্যক্ততা, জ্ঞাততা বা প্রকাশ আগন্তুক। কিন্তু জ্ঞাতবিষয় বাস্তববিষয় হইতে ভিন্ন এইরূপ আগন্তুকত্বের অর্থ নয়। জ্ঞাত পদার্থ বস্তু না হইলে তাহা জ্ঞাতই বলা যায় না। বিষয়বস্তু জ্ঞাত না হইতে পারে ইহাই আগন্তুকত্বের অর্থ। আত্মবস্তু একান্ত অজ্ঞাত বা অপ্রকাশ হইতে পারে না অথচ পূর্ণপ্রকাশভাবে বুঝিতে হয় না। ইহার প্রকাশে পূর্ণতর প্রকাশের নিয়ত আকাঙ্ক্ষা থাকে। এইভাবে ইহার জ্ঞাততা হইতে বস্তুতার ভেদ উপলব্ধি হয়।

প্রকাশ বস্তুতাপেক্ষ। বস্তুতা প্রকাশকে অপেক্ষা করে না, করিলেও প্রকাশের তারতম্যে বস্তুতার তারতম্য হয় না। বস্তু জ্ঞাত হইলে তাহাতে ভেদের প্রকাশ হয় এবং জ্ঞানের সহিতই ঐ ভেদ যে উৎপন্ন তাহা জ্ঞাততা-জ্ঞানে উপলব্ধ হয়। আত্মজ্ঞানস্থলে ঐ ভেদ আত্মবস্তুজন্য এবং আত্মার স্বরূপ যে কৃতি তাহা হইতে আত্মজ্ঞান অভিন্ন বলিয়া উহা আত্মজ্ঞানজন্যও বলা যায়। বিষয়জ্ঞানস্থলে উহা বিষয়বস্তুজন্য বলা যায় না, কেবল বিষয়জ্ঞানজন্য বলিতে হয়। উভয়স্থলেই ভেদ বস্তুনিষ্ঠ ও জ্ঞানজন্য। বিষয়জ্ঞানে উহা জ্ঞানমাত্রজন্য বলিয়া বস্তুনিষ্ঠ আভাস ভাবে ও আত্মজ্ঞানে বস্তুজন্য বলিয়া বাস্তবভেদ ভাবে প্রতীত হয়। উভয়স্থলেই জ্ঞান বস্তুপ্রকাশক এবং বস্তুনিষ্ঠ ভেদের ঘটক। ভেদঘটক বলিয়া জ্ঞানকে ক্রিয়া বলা যায়। জ্ঞান বস্তুতা ও

বস্তুনিষ্ঠ ভেদ উভয়েরই প্রকাশক বলিয়া প্রকাশকভাবে ক্রিয়া নয়। সুতরাং কাণ্টের মতে জ্ঞান ক্রিয়াও বটে, ক্রিয়া নয়ও বটে। জ্ঞান প্রকাশকভাবে অক্রিয়া ও ঘটকভাবে ক্রিয়া বলিতে হয়। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানক্রিয়া আত্মস্বরূপ কৃতি হইতে অভিন্ন ও কৃতিতন্ত্র। বিষয়জ্ঞানে জ্ঞানক্রিয়া কৃতি হইতে ভিন্ন এবং অকৃতিতন্ত্র বা স্বতন্ত্র বলিয়া কৃতিতন্ত্র আত্মজ্ঞানেই উপলব্ধ হয়।

বিধাননিশ্চয়ভিন্ন অন্যনিশ্চয় আছে কি না এই প্রশ্ন উঠিতেছে। না থাকিলে জ্ঞান ও নিশ্চয় একার্থ হইয়া পড়ে, জ্ঞানকে বিধাননিশ্চয় বলিয়া বিশেষিত করার প্রয়োজন হয় না। বিষয়পদার্থের যে গৌণ বিধাননিশ্চয়দ্বয় উক্ত হইয়াছে তাহাতেই বিধাননিশ্চয় বা জ্ঞানের অতিরিক্ত নিশ্চয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। সম্ভাবনাজ্ঞান ও অবশ্যম্ভাবজ্ঞান উভয়ই কোনও মুখ্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। যে পদার্থের অস্তিত্বকল্পনা মুখ্যজ্ঞানবিরোধী তাহাকে অসম্ভব পদার্থ বলে। যাহার অস্তিত্বকল্পনা এইরূপ বিরোধী নয় তাহাকে সম্ভবপদার্থ বা সম্ভাবনা বলা যায়। যাহার নাস্তিত্বকল্পনা অসম্ভব অর্থাৎ মুখ্যজ্ঞানবিরোধী তাহাকে অবশ্যম্ভাবী পদার্থ বা অবশ্যম্ভাব বলা যায়। কল্পিত বিষয়ের সহিত জ্ঞাতবস্তুর বিরোধ বা অবিরোধ জ্ঞাতবস্তুর অতিরিক্ত বস্তু নয়। এইজন্য সম্ভাবনা ও অবশ্যম্ভাবের জ্ঞান স্বীকার করা যায়। কিন্তু জ্ঞাতবস্তুর সহিত কল্পিত পদার্থের সঙ্গতি বা অসঙ্গতির জ্ঞান হয় না, বেদনামাত্র হয়। কল্পিতপদার্থ জ্ঞাননিশ্চয়বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিশেষ্যপদ হইতে পারে না। কল্পিতের সঙ্গতি বা অসঙ্গতিও কল্পিত। যে কল্পিত পদার্থ জ্ঞাতজগতের সহিত সঙ্গত বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় তাহার নিশ্চয় না থাকিলেও তাহার জগতের সহিত এই সম্বন্ধবোধকে নিশ্চয় বলিতে হয়। কল্পনার মূল যে বেদনা তাহা হইতেই এই নিশ্চয় উদ্ভূত হয়। বেদনানিশ্চয়ই বিধানেতর নিশ্চয়।

যে কল্পিত পদার্থ থাকিতে পারে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহাই যেন আছে, যেন বাস্তববিষয় বলিয়া বেদনানিশ্চয় হয়। কল্পিতপদার্থমাত্রই যেন আছে বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পদার্থের কল্পনা করিলেই তাহার অস্তিত্বের কল্পনা না হইতে পারে। অস্তিত্বকল্পনা একপক্ষে সম্ভাবনাজ্ঞান, অন্যপক্ষে আভাসবিষয়ের বেদনানিশ্চয়। এইরূপ যে কল্পিত পদার্থ না থাকিতে পারে না বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা যেন থাকা উচিত, যেন বাস্তব বিধি বলিয়া বেদনানিশ্চয় হয়। কৃতিবিষয়ক বিধিই বাস্তববিধি, অস্তিত্ববিষয়ক বিধি উপচারমাত্র, উহার অর্থ অস্তিত্বধ্যানের বিধি। ধ্যানবিধিকেও আভাসবিধি বা বিধিচ্ছায়া বলিতে হয়।

কৃতির বিধিই বিধি, ধ্যান কর্ম হইলেও কর্তৃত্বজ্ঞানরহিত বলিয়া কৃতি বলা যায় না। যে পদার্থের অবশ্যম্ভাবজ্ঞান আছে, তাহারই বেদনানিশ্চয় জ্ঞাততা বা সিদ্ধতা হইতে ব্যাবৃত ধ্যেয়তা বা সাধ্যতা (postulate) বা শ্রদ্ধেয়তার প্রতীতি হয়। ধ্যানবিধি হইতে ভিন্ন শ্রদ্ধেয় পদার্থের অস্তিত্ব নাই এইজন্য উহাকে ধ্যানবিধিস্বরূপ বলা যায়। বিধিকে আত্মার স্বরূপ পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং সম্ভাবনাজ্ঞান ও অবশ্যম্ভাবজ্ঞানের অনুরূপ বেদনানিশ্চয়ে নিশ্চিত পদার্থকে যথাক্রমে আভাসবিষয় ও আভাস-আত্মা বলা যাইতে পারে। রসবেদনা হইতে আভাসবিষয়ের নিশ্চয় ও শ্রদ্ধারূপ ধর্মবেদনা হইতে আভাসাত্মার নিশ্চয় উদ্ভূত হয়। এই দুই নিশ্চয় হইতে ভিন্ন বিধাননিশ্চয় বা বস্তুতানিশ্চয়কে জ্ঞান বলে।

২। জ্ঞাতবিষয়ের আভাসাত্মক বস্তুতা (phenomenal reality)

আত্মার কৃত্যাত্মক জ্ঞান ও বিষয়ের অকৃত্যাত্মক বা স্বতন্ত্র জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মার সম্ভাবনা বা অবশ্যম্ভাবের জ্ঞান নাই। এরূপ জ্ঞান হইতে হইলে আত্মার নাস্তিত্বের কল্পনা হওয়ার প্রয়োজন। স্বতন্ত্রকৃতিরূপ আত্মার বস্তুতাজ্ঞানে অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের প্রসঙ্গই নাই। বিষয়ের বস্তুতাজ্ঞানে তাহার নাস্তিতার কেবল কল্পনা যে হয় তাহা নয়, নাস্তিতা-সম্ভাবনার জ্ঞানই থাকে। যে বিষয় আছে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা না থাকিতে পারে এইরূপ জ্ঞানও হয়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের অবশ্যম্ভাবের জ্ঞান নাই। কোনও জ্ঞাতবিষয় হইতে অনুমিত বিষয়ান্তরের যে অবশ্যম্ভাব আছে বলা যায় তাহা পূর্বজ্ঞাতের অপেক্ষায় বলা যায়। কিন্তু পূর্বজ্ঞাতের নাস্তিত্ব সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনুমিতেরও নাস্তিত্বসম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞাতবিষয়ের নাস্তিত্ব-সম্ভাবনা নিয়ত বলিয়া উহার বস্তুতা নাস্তিত্বসম্ভাবনাত্মক বলা যায়। নাস্তিত্ব-সম্ভাবনা কল্পিতপদার্থ বা আভাস। এই আভাস বিষয়বস্তুতে নিয়ত বলিয়া জ্ঞাতবিষয়কে আভাসাত্মক বস্তু (phenomenal reality) বলিতে হয়। বেদনা হইতে কল্পিত পদার্থের নিশ্চয় হইতে পারে বটে কিন্তু সে নিশ্চয় জ্ঞান বা বিধাননিশ্চয় নয় পূর্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ কল্পিত পদার্থ বা আভাসকে বস্তু বলিয়া নিশ্চয় নাই, তাহা অবস্তু নয় বলিয়া নিশ্চয় আছে মাত্র। জ্ঞাত-বিষয়ের ঘটক যে আভাস তাহা ঐ বিষয় হইতে অভিন্ন বলিয়া বস্তুই বলিতে হয়। অথচ ঐ বিষয়বস্তু আভাসবিশিষ্ট বলিয়া যে জ্ঞান তাহা আভাসবিশেষণ

হইতে বিশেষ্যবস্তুর ভেদের জ্ঞান। জ্ঞাতবিষয়ে এইভাবে বস্তুতা ও আভাসের ভেদাভেদ স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞাতবিষয়কে আভাসাত্মক বস্তু বা বাস্তব আভাস বলা যায়।

জ্ঞাত অর্থাৎ অস্তিরূপে ব্যক্ত বিষয়কে নাস্তিত্বসম্ভাবনারূপ আভাসের দ্বারা ঘটিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই আভাস কল্পিত হইলেও জ্ঞাত পদার্থ, অস্তিরূপে ব্যক্ত পদার্থ। অস্তিরূপে ব্যক্ত যে নাস্তিত্বসম্ভাবনা তাহা বিষয়ের জ্ঞাততা বা বিষয়তার ঘটক হইলেও উহার অস্তিত্বের ঘটক বলা যায় না। বিষয়ের অস্তিত্বজ্ঞান তাহার অস্তিত্বসম্ভাবনার জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না, নাস্তিত্বসম্ভাবনাজ্ঞানের দ্বারাও বাধিত হয় না। অস্তিতাজ্ঞান প্রত্যক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভূত জ্ঞান। বিষয়ের অস্তিতাজ্ঞান অপেক্ষা করিয়া তাহার নাস্তিতাসম্ভাবনাজ্ঞানই তাহার প্রকারের জ্ঞান। যে বিষয় আছে বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা না থাকিতে পারে ইহার অর্থ তাহা এইপ্রকার না হইতে পারে, অন্যপ্রকার হইতে পারে। জ্ঞাত বিষয়ের প্রকারজ্ঞান প্রতিষিদ্ধ হইলে বিষয়ের জ্ঞান লোপ হয় কিন্তু নিশ্চয় লোপ হয় না, নিষ্প্রকারক বা অব্যক্ত-বিষয়ের নিশ্চয় থাকে। জ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞাত অর্থাৎ অস্তিরূপে ব্যক্ত নাস্তিতা-সম্ভাবনাই তাহার প্রকার বলা যায়। প্রকারসামান্য বা প্রকারতাই বিষয়ের জ্ঞাততা বা বিষয়তা। উহা হইতে তাহার অস্তিতা বা বস্তুতা ভিন্ন কিন্তু উহা অস্তিতাসাপেক্ষ। নাস্তিতাসম্ভাবনা আভাসবিশেষ বলিয়া জ্ঞাতপ্রকারকে জ্ঞাত আভাস বলা যায়। এইরূপে জ্ঞাত বিষয়কে সপ্রকার বা আভাসাত্মক বস্তু বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

৩। জ্ঞাতবিষয়ের প্রকার ও জ্ঞানক্রিয়া

বিষয়ের জ্ঞাত প্রকারকে তাহার নাস্তিতাসম্ভাবনার অস্তিত্ব বলা হইয়াছে। এই সম্ভাবনার অস্তিত্ব বিষয়ঘটক বলিয়া বিষয় হইলেও উহাকে কেবল বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বুঝা যায় না, বিষয়জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়াও স্ফুটভাবে বুঝিতে হয়। বিষয়বস্তুর প্রকার বিষয়জ্ঞানেরও প্রকার এই উপলব্ধি না হইলে প্রকারের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। বিষয় আভাসাত্মক হইয়াও কিরূপে বস্তু হইতে পারে—তাহা আভাসের এই অস্তিত্ব-উপলব্ধি বিনা বুঝা যায় না। বিষয় ও জ্ঞানের সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুভাবেই আভাসাত্মক বিষয়বস্তুর উপপত্তি হয়। বিষয় ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়েও আছে, জ্ঞানেও আছে। জ্ঞানের সহিত বিষয়ের

সম্বন্ধ বিষয়ের প্রকারবিশেষ বলা যায় না, প্রকারসামান্ত জ্ঞাততা বা বিষয়তা বলিতে হয়। বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধকে ঔপচারিক ভাবে জ্ঞানের প্রকার বলা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে জ্ঞানক্রিয়া বলা উচিত।

বিষয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে আছে বলা যায়। সম্বন্ধের অস্তিত্ব বিষয়ের অস্তিত্বকে অপেক্ষা করে, বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধের অস্তিত্বকে অপেক্ষা করে না। সম্বন্ধ বিষয়ঘটিত বটে কিন্তু বিষয় ইহাদ্বারা ঘটিত বলা যায় না। অথচ এই বিষয়ে এই বিশেষ সম্বন্ধ আছে এইরূপ প্রত্যয় থাকায় সম্বন্ধের ঘটক কোন বিশেষ ধর্ম আছে। এই বিষয় এই সম্বন্ধঘটক ধর্মের দ্বারা ঘটিত—এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। বিষয়জ্ঞানে এই সম্বন্ধঘটক ধর্মের সাক্ষাৎপ্রত্যয় নাই। বিষয়জ্ঞানের জ্ঞানে বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধঘটক জ্ঞানধর্মের সাক্ষাৎপ্রত্যয় হয়। এই বিষয়ের জ্ঞান হইতেছে—এইরূপ অনুভবসারে জ্ঞানের বিষয়ের, সহিত সামান্যকারণত্বের যে জ্ঞান হয় তাহা জ্ঞানের প্রকার বলিয়া কল্পনামনে নিশ্চয় নয়। এস্থলে এই বিষয়কে জানিতেছি এইরূপ-মাত্র নিশ্চয় হয়। বাক্যে যেরূপ কর্মপদের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সেইরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ এই সম্বন্ধ ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া নিশ্চয় হয়। বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ভাবে উপচরিত জ্ঞানের প্রকাররূপে আভাসিত হয়। জ্ঞানক্রিয়াই এই প্রকারাভাসের ঘটক জ্ঞানধর্ম। জ্ঞান বিষয়কে যে অপেক্ষা করে তাহাই জ্ঞানের ধর্ম। বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ এই অপেক্ষাক্রিয়া। জ্ঞানের সম্বন্ধ ভাক্ত পদার্থ বা বিকল্প। সম্বন্ধনরূপ জ্ঞানের অপেক্ষাক্রিয়াই জ্ঞানের সম্বন্ধ বা প্রকার বলিয়া বিকল্পিত হয়।

সম্বন্ধনরূপ অপেক্ষাকে জ্ঞানক্রিয়া বলা উপচারমাত্র কি না এই প্রসঙ্গ উঠিতেছে। কাণ্ট ক্রিয়া শব্দ ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। বিষয়ের গতিও ক্রিয়া, আত্মার কৃতিও ক্রিয়া, আত্মার জ্ঞানও ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণ তিনি নির্দেশ করেন নাই। বিচারে বুঝা যায় যাহার নিয়তঘটকত্ব আছে তাহাই ক্রিয়াশব্দে অভিহিত হইয়াছে। যে সপ্রকার বস্তু কোন পদার্থ বিনা সপ্রকার থাকে না তাহা ঐ পদার্থ দ্বারা ঘটিত বলা যায়। ঘটিত বস্তু সপ্রকার, প্রকার হিসাবেই উহা ঘটিত, বস্তুতা হিসাবে উহা অঘটিত বা স্বতন্ত্র, এই জন্য ঘটকপদার্থ হইতে উহার ভেদ উহার বস্তুতা ও ঘটকের বস্তুতা উভয়কে অপেক্ষা করে বলা যায়। ঘটিতত্বের অর্থই অবশ্যঘটিতত্ব, কিন্তু ঘটক-বস্তু ঘটক হইবেই এইরূপ নিয়ম নাই। যে ঘটকপদার্থের ঘটকত্ব নিয়ত বা

অবশ্যম্ভাবী তাহাকে ক্রিয়া বলে। জ্ঞানের বিষয় যে সপ্রকার বিষয়বস্তু তাহা প্রকার হিসাবে জ্ঞানের দ্বারা ঘটিত, এবং জ্ঞান এই বিষয়ের নিয়তঘটক বলিয়া স্বীকার করিলে জ্ঞানকে বিষয়প্রকার অথবা প্রকারিতবিষয়রূপ ফলের ঘটক ক্রিয়া বলিতে হয়। ক্রিয়াঘটিত যে ফল তাহা ক্রিয়া হইতে ভিন্ন পদার্থ হইলেও ক্রিয়াকে ঐ ফল হইতে ভিন্ন বলা যায় না। ক্রিয়াকারণক ফল হইতে ক্রিয়াঘটিত ফলের এই বিশেষ স্বীকার করিতে হয়।

৪। আকারক ও প্রকারক জ্ঞানক্রিয়া

জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ বিষয়ের প্রকারতা, বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ জ্ঞানক্রিয়া এবং বিষয়ের প্রকারবিশেষ জ্ঞানক্রিয়াঘটিত ফল বলিতে হয়। জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাততা, বিষয়তা বা প্রকারতা জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা বিশেষিত হইলে বিষয়ের প্রকার বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। প্রকারবিশেষের জ্ঞান 'এই বিষয় এই প্রকার' ইত্যাকার বাক্যে প্রকাশ করা হয়। বিশেষ্যপদ এই-বিষয়ের অর্থ জ্ঞাতার সম্বন্ধে দেশকালবিশেষে স্থিত বিষয়। বিশেষণপদ এই-প্রকারের অর্থ এই জাতীয় প্রকার, জাতিবিশেষরূপ প্রকার। দেশ-কালবিশেষে স্থিতত্বও বিষয়ের প্রকার কিন্তু জাতিরূপ প্রকার নয়। জাতিরূপ প্রকারের জ্ঞান ঐ প্রকারের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে কিন্তু ঐ প্রকারের জ্ঞান জাতিরূপ প্রকারের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। বিষয়ের জ্ঞানে বিষয়বস্তুর এই দুই প্রকার জ্ঞান হয়। প্রকার জ্ঞানক্রিয়াঘটিত বলা হইয়াছে। এই দুই প্রকারের ঘটক জ্ঞানক্রিয়াও দুই বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিষয়ের দেশকালবিশেষে স্থিতত্বের ঘটককে গ্রহণক্রিয়া ও জাতিবিশেষব্যাপ্যত্বের ঘটককে অধ্যাবসায়ক্রিয়া বলা যায়। প্রথম বিষয়প্রকার গ্রাহ্য, দ্বিতীয় বিষয়-প্রকার অধ্যবসেয়। গৃহীত অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগম্য বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞানকে অধ্যবসায় বলে।

ক্রিয়াপদের উল্লিখিত ব্যাপক অর্থ স্বীকার করিলে গ্রহণরূপ জ্ঞানকেও ক্রিয়া বলা যায়। গৃহীত বিষয় দেশকালঘটিত, তাহার গ্রহণে অন্যগৃহীত-বিষয়ের সহিত তাহার দেশকালসম্বন্ধের ও তাহার অংশগুলির পরস্পর দেশকালসম্বন্ধের জ্ঞান হয়। এই তথাকথিত সম্বন্ধের নাম সন্নিবেশ। বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞান যদি বিষয়জ্ঞান হইতে ভিন্নজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সন্নিবেশকে সম্বন্ধ বলা যায় না, কারণ বিষয়গ্রহণ হইতে সন্নিবেশগ্রহণ ভিন্ন নয়। সন্নিবেশ গ্রাহ্য পদার্থ, দুই বিষয়ের সন্নিবেশগ্রহণই

ঐ দুই-সম্বলিত এক বিষয়ের গ্রহণ। গৃহীত বিষয় স্বীয় অংশসমূহের সন্নিবেশের দ্বারা ঘটিত। এই সন্নিবেশই বিষয়ের আকার। আকারিত বিষয়দ্বয়ের সন্নিবেশ উভয়সম্বলিত এক বিষয়ের আকার। এক জ্ঞানের অন্তর্ভূত দুই জ্ঞানের দুই আকারিত বিষয় একীকৃত বা সমস্ত হইলে সমস্ত বিষয় আকারিত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। আকারিত হইলে বিষয় দুইটির সন্নিবেশ হইয়াছে বলা যায়, আকারিত না হইলে তাহাদের সম্বন্ধ হইয়াছে বলা যায়। আকারিত বিষয়দ্বয়ের নিরাকার সমাসই তাহাদের সম্বন্ধ। সাকারবিষয়ের সম্বন্ধ নিরাকার বলিয়াই বিষয়জ্ঞান হইতে বিষয়সম্বন্ধ-জ্ঞান ভিন্নজাতীয় বলিয়া প্রতীতি হয়। সন্নিবেশজ্ঞান সন্নিবিষ্ট বিষয়জ্ঞান হইতে ভিন্নজাতীয় জ্ঞান নয়। সাকার বিষয়ের জ্ঞানও সাকার বলিয়া ভান হয়। সাকার বিষয়দ্বয়ের সন্নিবেশ সাকার হইলেও সাকার জ্ঞানদ্বয়ের সমাসরূপ সন্নিবেশজ্ঞানকে তাহাদের সন্নিবেশ বলা যায় না। সন্নিবেশ আকারঘটক হইলেও সন্নিবেশজ্ঞানকে সাকার বলা যায় না। সুতরাং সন্নিবেশজ্ঞানকে সাকারজ্ঞানদ্বয়ের সম্বন্ধ বলিতে হয়। সন্নিবেশ সম্বন্ধ নয় কিন্তু এইভাবে সন্নিবেশে সম্বন্ধের ছায়া স্বীকার করা যায়। জ্ঞানদ্বয়ের সম্বন্ধ জ্ঞাত বিষয়দ্বয়েরও যেন সম্বন্ধ এইরূপ ভান হয়।

গ্রহণক্রিয়া সন্নিবেশঘটক, অধ্যবসায়ক্রিয়া সম্বন্ধঘটক। অধ্যবসায় গৃহীত বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞান বলিয়া গ্রহণকে অপেক্ষা করে বলিতে হয়। গ্রহণ অধ্যবসায়কে অপেক্ষা করে না। কিন্তু গ্রহণাত্মক সন্নিবেশে সম্বন্ধাভাস আছে বলিয়া সম্বন্ধের জ্ঞানেই সন্নিবেশের জ্ঞান হয়, অধ্যবসায়ক্রিয়ার জ্ঞানেই স্বতন্ত্র গ্রহণক্রিয়ার জ্ঞান হয় এইরূপ বলিতে হয়। বিষয়ের দুই প্রকারের পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে—দেশকালস্থিতত্ব প্রকার ও জাতিরূপ প্রকার। সম্বন্ধচ্ছায়াযুক্ত সন্নিবেশ বা আকারই দেশকালস্থিতত্ব প্রকার। জাতিরূপ প্রকার যে বিশেষ্যের বিশেষণ, জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহার আকারকে বিশেষ্য প্রকার বলা যায়। অধ্যবসায় জ্ঞানে বিষয়ের জাতিরূপ প্রকারই মুখ্য প্রকার। এই প্রকারের আশ্রয়ভাবে বিষয়কারকে বিষয়ের গৌণ প্রকার বলা যায়। মুখ্যপ্রকার-নিরপেক্ষ আকার প্রকার নয়। অধ্যবসায়ই বিষয়জ্ঞান, অধ্যবসায়ের অঙ্গভাবে গ্রহণও বিষয়জ্ঞান। অধ্যবসায়ের অঙ্গ না হইয়াও অধ্যবসায়ের আকাঙ্ক্ষা করিলে গ্রহণকে বিষয়জ্ঞান বলা যায়। সাকার বিষয়ের জাতিরূপ প্রকারজ্ঞান না থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে প্রকারজিজ্ঞাসা থাকিলে তাহার

প্রকারযোগ্যতার জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। সাকারনিশ্চয়ে প্রকার অস্ফুত বা অস্ফুট হইতে পারে বটে কিন্তু নিষ্প্রকারক সাকার বিষয়ের প্রত্যয় নিশ্চয়ই নয়, কল্পনামাত্র। এইভাবে গ্রহণকে অধ্যবসায় হইতে ভিন্ন জ্ঞানক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

৫। জ্ঞানাঙ্গ কল্পনা

পূর্বে বলা হইয়াছে যে বিষয়ের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হইতে বিষয়ের বিষয়তাজ্ঞান হয় ও জ্ঞানের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে বিষয়তার বিশেষ যে আকারপ্রকার তাহার জ্ঞান হয়। জ্ঞানের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধকে জ্ঞানক্রিয়া বলিতে হয়। এই ক্রিয়া হইতে ভিন্ন আকারপ্রকারের অস্তিত্বজ্ঞান নাই। আকারপ্রকারযুক্তবিষয়জ্ঞানে বিষয়ের জ্ঞানাপেক্ষত্বের স্ফুটজ্ঞান না থাকিলেও জ্ঞাননিরপেক্ষত্বের জ্ঞান নাই। বিষয়জ্ঞানের জ্ঞানে বিষয়ের জ্ঞানাপেক্ষত্বের জ্ঞান হয়, বিষয়বস্তুর আকারপ্রকার জ্ঞানক্রিয়া হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হইলেও বস্তুতাব্যাবৃত্ত আকারপ্রকার জ্ঞানক্রিয়া হইতে অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই অর্থে বিষয়ের জ্ঞাতবিশেষকে জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা রচিত বা কল্পিত বলিতে হয়। কল্পনা হইতে জ্ঞান একান্ত ভিন্ন বটে কিন্তু কল্পনা জ্ঞানের অঙ্গ হইতে পারে। কল্পনামাত্র হইতে জ্ঞান হয় না কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ের, আকারপ্রকারকল্পনায় আকারপ্রকারের জ্ঞান হয়। বিষয়জ্ঞানে কল্পনা ইন্দ্রিয়প্রাপ্তি অপেক্ষা করিয়া জ্ঞানাঙ্গভাবে পর্যবসিত হয়। জ্ঞানাঙ্গকল্পনাই বিষয়জ্ঞানক্রিয়া। আত্মজ্ঞানও কাণ্টের মতে ক্রিয়া, নিষ্ক্রিয় জ্ঞান তিনি স্বীকার করেন না। আত্মজ্ঞানরূপ ক্রিয়া স্বতন্ত্র কৃতি, কল্পনা নয়। বিষয়জ্ঞানে কল্পনাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়প্রাপ্তির অপেক্ষা আছে, আত্মজ্ঞানে স্বতন্ত্র কৃতির অতিরিক্ত কোনও পদার্থের অপেক্ষা নাই। জ্ঞানাঙ্গ কল্পনার দ্বারাই বিষয়ের আকার-প্রকার ঘটিত হইয়া জ্ঞাত হয়।

কল্পনা বিষয়তার বিশেষের ঘটকও বটে, প্রকাশকও বটে। গ্রহণরূপ কল্পনা আকাররূপ বিশেষের ও অধ্যবসায়রূপ কল্পনা প্রকাররূপ বিশেষের ঘটক ও প্রকাশক। বিষয়জ্ঞানে প্রকারকল্পনা আকারকল্পনাকে অপেক্ষা করে, আকারকল্পনা প্রকারকল্পনাকে অপেক্ষা না করিলেও প্রকারতার বা বিষয়তার কল্পনাকে অপেক্ষা করে। বিষয়জ্ঞানের সহিত বিষয়বস্তুর সম্বন্ধকেই বিষয়তা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিষয়ের অস্তিতাজ্ঞান নাস্তিতাসম্ভাবনাজ্ঞান বিনা হয় না, অথচ তাহা হইতে ভিন্ন। নাস্তিতাসম্ভাবনা ইন্দ্রিয়প্রাপ্তিনিরপেক্ষ

কল্পনা দ্বারা ঘটিত বলিয়া আভাস বলা যায়, অথচ জ্ঞাত বলিয়া অসৎ বলা যায় না। বিষয়বস্তু এই আভাস পদার্থ হইতে ভিন্ন ও বিষয়তা হিসাবে উহা হইতে অভিন্ন। নাস্তিতাসম্ভাবনারূপ সৎ আভাসপদার্থই বিষয়বস্তুর বিষয়তা। এই পদার্থের অস্তিত্ব জ্ঞানের সহিত বিষয়বস্তুর সম্বন্ধ ভাবেই বুঝা যায়। নতুবা আভাসের অস্তিত্ব বন্ধ্যাসুতবৎ অলীক পদার্থ বলিতে হয়। আভাস জ্ঞাত বলিয়াই সৎ বলা যায়। এইরূপ বিষয়তাকে অপেক্ষা করিয়া বিষয়ের আকার-কল্পনা হয়। আকারকল্পনাকে অপেক্ষা করিয়া প্রকারকল্পনা হইলে বিষয়ের অধ্যবসায়রূপ জ্ঞান হয়।

আকারকল্পনাকে অপেক্ষা না করিয়াও প্রকারকল্পনা হইতে পারে, কিন্তু বিষয়তাকে অপেক্ষা না করিয়া আকারকল্পনা হয় না। বিষয়ের আকার হইতে ভিন্ন জ্ঞানের আকারের অর্থই হয় না কিন্তু বিষয়াকারাপেক্ষ বিষয়-প্রকার হইতে ভিন্ন জ্ঞানের প্রকার প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ক্রিয়া হইলেও নিরর্থক বলা যায় না। বস্তুশূন্য আকারকেও বিষয়াপেক্ষ বলিতে হয় কিন্তু বস্তুশূন্য প্রকার বিষয়নিরপেক্ষ হইতে পারে। বস্তুশূন্য আকার বাস্তব বিষয়ের যোগ্যতা বা সম্ভাবনাভাবে জ্ঞেয় বলিয়া উহার গৌণ বিষয়তা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুশূন্য প্রকার জ্ঞেয় বিষয় হইতে হইলে আকাররূপ বিষয়ের যোগ্যতা বা সম্ভাবনাভাবে কল্পিত হইবে কিন্তু উহা বস্তুশূন্য আকারের ন্যায় জ্ঞেয় বিষয় হইবেই এরূপ নিয়ম নাই। বিষয়ভাবে অজ্ঞেয় হইলে উহা জ্ঞানক্রিয়ামাত্র ভাবে জ্ঞেয়। প্রকারজ্ঞান বিষয়জ্ঞান হইলে তাহার নাম অধ্যবসায়। জ্ঞান-ক্রিয়ামাত্র জ্ঞান হইলে তাহাকে গ্রহণ ও অধ্যবসায়ের অতিরিক্ত আত্মজ্ঞানেরই রূপভেদ বলিতে হয়। তাহার নাম অতিবিষয় জ্ঞান (transcendental knowledge) দেওয়া যায়। ধর্মাত্মক আত্মজ্ঞানে স্বতন্ত্রবিষয়জ্ঞান গর্ভীভূত পূর্বে বলা হইয়াছে। এই গর্ভীভূত জ্ঞান বিষয়বিশেষের জ্ঞান নয়, বিষয়-সামান্য বা বিষয়তার জ্ঞান। বিষয়জ্ঞানে অর্থাৎ বিষয়বিশেষের জ্ঞানে যে বিষয়তা-জ্ঞান হয় তাহাকে অধ্যবসায় বলিলেও আত্মজ্ঞানে যে বিষয়তামাত্র-জ্ঞানের পূর্বাভাস হয় তাহাকে অধ্যবসায় বলা যায় না। এই বিষয়তাজ্ঞানই অতিবিষয় জ্ঞান। ইহা কল্পনারূপ জ্ঞানক্রিয়াদ্বারা ঘটিতব্য জ্ঞান, ঘটিত বা পরিনিষ্ঠিত জ্ঞান নয়। এই জ্ঞানক্রিয়া কৃতি নয়, ইহা কৃত্যপেক্ষ বটে, কিন্তু কৃত্যাত্মক নয়। কৃতির ন্যায় এই ক্রিয়াও আত্মা, সুতরাং ইহার জ্ঞানকে ধর্মাত্মক আত্মার গর্ভীভূত বিষয়তাঘটক আত্মার জ্ঞান বলা যায়।

বেদনাজন্য কল্পনা ও অলীক কল্পনা হইতে জ্ঞানাঙ্গ কল্পনার ভেদ অনুভবসিদ্ধ। আকারকল্পনা, প্রকারকল্পনা ও বিষয়তাকল্পনা এই ত্রিবিধ জ্ঞানাঙ্গকল্পনা স্বীকার করা যায়। অধ্যবসায়ই বিষয়জ্ঞান ও এই ত্রিবিধ কল্পনা বিষয়জ্ঞানেরই অঙ্গ। জ্ঞানকে জ্ঞাত বিষয়ের ঘটকভাবে ক্রিয়া ও প্রকাশকভাবে পরিনিষ্ঠিত পদার্থ বলা হইয়াছে। জ্ঞানাঙ্গকল্পনা আকারপ্রকারের ঘটকভাবে ক্রিয়া ও তাহাদের প্রকাশকভাবে অক্রিয়া বা পরিনিষ্ঠিত প্রত্যয় বলিতে হয়। উহা প্রকারতা, বিষয়তা বা জ্ঞাততার প্রকাশক মাত্র, ঘটক নয়। বিষয়তাকল্পনাকে ক্রিয়া বলা যায় না, অথবা বলা যায় যে এই কল্পনা আত্মার জ্ঞাততাঘটক কৃতিরূপ ক্রিয়ারই রূপান্তরমাত্র। বিষয়তা দুই ভাবে কল্পিত হয়। বিষয়ের বিশেষ উদ্ভূত হইলে বিশেষনিষ্ঠ বিষয়তার কল্পনা ও বিশেষ অনুদ্ভূত হইলে বিষয়তামাত্রের কল্পনা হয়। আত্মজ্ঞানেই যে বিষয়জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে তাহা বিষয়বিশেষের জ্ঞান নয়, বিষয়তামাত্রের জ্ঞান। যে কৃতি হইতে আত্মজ্ঞান হয় তাহা হইতেই বিষয়তামাত্রের জ্ঞান হয়। বিষয়তাকল্পনা হইতে এই বিষয়তা অভিন্ন বলিয়া কৃতি এই কল্পনা হইতে ভিন্ন বলা যায় না। কৃত্যাত্মক বলিয়া এই কল্পনা ক্রিয়া হইলেও বিষয়জ্ঞানের অপেক্ষায় ইহা ক্রিয়া নয়, প্রকাশকমাত্র স্বীকার করিতে হয়। বিষয়তাকল্পনাকে একদিকে আত্মজ্ঞানাঙ্গ ক্রিয়া ও অপরদিকে বিষয়বিশেষকল্পনাক্রিয়ার অক্রিয় বীজ বলা যায়। প্রথমভাবে ইহাকে অতিবিষয় ক্রিয়া ও দ্বিতীয়ভাবে জ্ঞাতবিষয়ের আত্মা বা স্বরূপ বলিতে হয়। জ্ঞাতবিষয়কে জ্ঞাত বলিয়া প্রতীতির নাম প্রত্যভিজ্ঞা। এইভাবে বিষয়তাকল্পনাকে কাণ্ট্ অতিবিষয় প্রত্যভিজ্ঞা (transcendental apperception) নামে নির্দেশ করিয়াছেন।

বিষয়ের প্রকার ও আকারের জ্ঞানাঙ্গ কল্পনা বিষয়ঘটক ক্রিয়াও বটে বিষয়ের প্রকাশকও বটে। জ্ঞানাঙ্গ কল্পনাই জ্ঞান নয়। জ্ঞান হইতে হইলে কল্পনা অন্য সহকারীকে অপেক্ষা করে। বিষয়জ্ঞানের জন্য প্রকারকল্পনা আকারকল্পনাকে অপেক্ষা করে, আকারকল্পনা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুপ্রাপ্তিকে বা প্রাপ্তিসম্ভাবনাকে অপেক্ষা করে। অপেক্ষাদ্বয়ের প্রভেদ এই যে প্রকারজ্ঞানে আকার-অনপেক্ষ প্রকার অজ্ঞাতপদার্থ হইলেও কল্পিত হয় কিন্তু আকারজ্ঞানে ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ের অনপেক্ষ আকার কল্পিতই হয় না। আকারজ্ঞান ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ের না হউক, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়ের আকারজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাপ্তব্য বিষয়ের আকারের কোনও অর্থই

হয় না। সুতরাং আকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কল্পিত হইলেই জ্ঞাত হয় বলা যায়। কিন্তু নিরাকার বিষয়ের প্রকার জ্ঞাত না হইলেও নিরর্থক বলা যায় না। ইন্দ্রিয়প্রাপ্তব্য বিষয়কে নিরাকার কল্পনা করা যায় না, ইন্দ্রিয়-অপ্রাপ্তব্য নিরাকার বিষয়ের ও তাহার প্রকারের কল্পনা করা যায়।

৬। অরূপ, রূপারূপ ও সরূপ কল্পনা

প্রকারজ্ঞানে অর্থাৎ অধ্যবসায়ের অপেক্ষিত আকারজ্ঞানে আকার দুইভাবে প্রতিভাত হয়। সর্বত্রই আকার পূর্ণ বা পরিনিষ্ঠিত ভাবে জ্ঞাত হয় না, অপূর্ণ সম্পাদ্যমান বা ক্রিয়মান আকারেরও জ্ঞান হইতে পারে। বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানে সর্বত্র পূর্ণ আকারের জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষেতর জ্ঞানে, বিশেষতঃ অর্থাপত্তিতে, ক্রিয়মান আকারের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ-বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে স্থলবিশেষে কারণের এক পূর্ণ আকারের অনুমান করা যায় না, কারণ এক বলিয়া অনুমান হইলেও তাহাতে একাধিক পূর্ণ আকারের সম্ভাবনানিশ্চয় হয়। এই একাধিক আকারের সমন্বয়ে এক আকার হইবেই এই নিশ্চয় থাকিলেও সেই আকার বুদ্ধিস্থ হয় না, চিত্রকরের দ্বারা অনির্দেশ্য আকার চিত্রে সূত্রভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টার ন্যায় বুদ্ধিস্থ করিবার চেষ্টা হয় মাত্র। এইরূপ চেষ্টায় ক্রিয়মান আকার বা সূত্রাকার বুদ্ধিতে ভাসিত হয়। পরে বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে প্রত্যক্ষজ্ঞানেও পূর্ণ-আকার জ্ঞানের সহিত ক্রিয়মান আকারের জ্ঞান অস্ফুটভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। বিষয়ের নিরাকার বা অরূপ সম্বন্ধের নাম প্রকার, সরূপ সন্নিবেশের নাম আকার। প্রকারকল্পনাকে অরূপ কল্পনা ও পূর্ণ-আকার-কল্পনাকে সরূপ কল্পনা বলা যায়। ক্রিয়মান-আকারকল্পনাকে রূপারূপ কল্পনা বলিতে হয়।

আকারনিষ্ঠ প্রকারকল্পনার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় আত্মার যে জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞাতৃত্বের প্রকাশ তাহাকে বুদ্ধি বলে। প্রকার কল্পনা আকারপ্রাপ্ত না হইলেও অর্থাৎ জ্ঞানে পর্যবসিত না হইলেও বুদ্ধিক্রিয়া বলা যায়। বিষয়তাপ্রত্যয় বিষয়ঘটক ক্রিয়া না হইলেও প্রকাশকস্বরূপ বুদ্ধিধর্ম বলিতে হয়। অনাকারিতপ্রকাররূপ বুদ্ধিক্রিয়া বুদ্ধির এই প্রকাশক-ধর্মের বিশেষক বা পরিচ্ছেদক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এইরূপে বিষয়-বুদ্ধির (Understanding) প্রকাশমাত্র ভাবে, প্রকাশবিশেষকপ্রকারমাত্র ভাবে ও আকারপ্রাপ্তপ্রকার অথবা অধ্যবসায় ভাবে স্থিতিত্রয় স্বীকার

করিতে হয়। সম্বন্ধবুদ্ধিই প্রকারবুদ্ধি, সম্বন্ধের আকারিতবিষয়নিষ্ঠতাবুদ্ধির নাম অধ্যবসায়। সম্বন্ধবুদ্ধির মূল প্রত্যভিজ্ঞা। সম্বন্ধ প্রত্যভিজ্ঞেয় বিষয়মাত্র, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্তব্য নয়। সম্বন্ধনরূপ বুদ্ধিক্রিয়া বুদ্ধির প্রকাশমাত্রধর্মকে অপেক্ষা করে, প্রকাশের পরিচ্ছেদ বা বিশেষই এই ক্রিয়ার নিয়ত ফল। প্রকাশবিশেষকত্ব বিনা এই বুদ্ধিক্রিয়ার কোনও লক্ষণ দেওয়া যায় না। প্রকাশবিশেষক বুদ্ধিপ্রকারমাত্রকে আকারনিষ্ঠ প্রকার বা অধ্যবসায় হইতে ব্যাবৃত্তির জন্য উহাকে সম্বন্ধজাতি বা বৌদ্ধজাতি (concept) আখ্যা দেওয়া যায়। সাধারণতঃ জাতিশব্দ সম্বন্ধবিষয়ব্যক্তিগত সামান্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। বিষয়গত জাতি সম্বন্ধজাতি বা বৌদ্ধজাতির ছায়া বলা যায়। বৌদ্ধজাতিই মূল জাতি। বিষয়জাতির ব্যক্তির ন্যায় বৌদ্ধজাতির ব্যক্তি স্বীকার করা যায় না। সম্বন্ধ জাতিমাত্র, সম্বন্ধব্যক্তি বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। বিষয়-জ্ঞানে সম্বন্ধবুদ্ধির নিয়ত অপেক্ষা আছে। সম্বন্ধবুদ্ধিভিন্ন বিষয়জ্ঞানের অঘটক অন্যবুদ্ধিও স্বীকার করা যায়, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

অধ্যবসায়ের অপেক্ষিত গ্রহণক্রিয়ার দ্বারা আকারজ্ঞান হয়। পূর্ণাকার ও ক্রিয়মান আকার (বা সূত্রাকার) এই আকার ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ণাকারের মধ্যেও এই ভেদের ছায়ারূপ দেশাকার ও কালাকার ভেদ অনুভবসিদ্ধ। এস্থলে সন্নিবেশঘটিত যাবতীয় বিষয়ধর্মকে আকার বলা হইতেছে। বিষয়ের সসীম বা অসীম, আকার, পূর্বত্বপরত্বরূপ স্থান, অবকাশ, পরিমাণ ইত্যাদি দেশাত্মক, কালাত্মক ও উভয়াত্মকভাবে কল্পিত ধর্মকে এই ব্যাপক অর্থে 'আকার' শব্দে নির্দেশ করা যায়। গ্রহণক্রিয়ার দ্বারা যে বিষয়ধর্মের জ্ঞান হয় তাহাই আকার। সম্বন্ধজ্ঞান অসম্বন্ধ আকার বা আকারিত বিষয়কে সম্বন্ধ করে বলিয়া আকারকে সম্বন্ধের উপাদান বলা যায়। এইরূপ গ্রহণক্রিয়াদ্বারা যে অসন্নিবিষ্ট পদার্থের সন্নিবেশ বা সন্নিবেশজ্ঞান ঘটিত হয় তাহাকে সন্নিবেশের বা আকারের উপাদান বলিতে হয়। আকারিত বিষয়ের সন্নিবেশও আকারিত বিষয় হয় বটে কিন্তু প্রথম আকারকে দ্বিতীয় আকারের অংশ বলা যায়, উপাদান বলা যায় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় মাত্র, গৃহীত বা সন্নিবিষ্ট হয় না তাহাই আকারের অনাকারিত উপাদান। সম্বন্ধকে বুদ্ধিকল্পিত বলিলে সন্নিবেশকে ইন্দ্রিয়কল্পিত বলা যায়। ইন্দ্রিয়ের কল্পনাক্রিয়াই গ্রহণক্রিয়া। এই ক্রিয়া ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের 'প্রাপ্তি'রূপ ধর্মও আছে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রহণক্রিয়া দ্বারা দৈশিক সন্নিবেশ ও অন্তরিন্দ্রিয়

বা মনের গ্রহণক্রিয়া দ্বারা কালিক সন্নিবেশ হয়। এইরূপ বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত পদার্থেরও ভেদ স্বীকার করিতে হয়।

৭। বুদ্ধি, মন ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়রচনায় পরস্পরাপেক্ষত্ব

কৃতিস্বরূপ একই আত্মার স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র এই দুই মূর্তি। এইরূপ বিষয়জ্ঞানস্বরূপ একই আত্মার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই দুই শক্তি স্বীকার করিতে হয়। দুইরূপ হইয়াও কি ভাবে আত্মা এক থাকে তাহা এই দুই ক্ষেত্রেই অজ্ঞেয়। কিন্তু দ্বৈরূপ্য অনুভবসিদ্ধ ও অনপলপ্য। বুদ্ধির ক্রিয়া অধ্যবসায় ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া গ্রহণ। বুদ্ধিক্রিয়ার অপেক্ষায় গৃহীত পদার্থকে ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার অপেক্ষায় ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত পদার্থকে উপাদান বলা যায়। বুদ্ধিক্রিয়ার সাক্ষাৎ উপাদান অন্তরিন্দ্রিয়গৃহীত কালাকার বিষয়। অন্তরিন্দ্রিয় ক্রিয়ার সাক্ষাৎ উপাদান বাহ্যেন্দ্রিয়গৃহীত দেশাকার বিষয়। বাহ্যেন্দ্রিয়ক্রিয়ারও উপাদান অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু উহাকে আর জ্ঞাত বিষয় বলা যায় না। উহা অনাত্মপদার্থ বটে কিন্তু আকারপ্রকারহীন অথচ একান্ত অব্যক্তও নয়। উহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত নয়, প্রাপ্তমাত্র বলিয়া অনুভূত হয়। বাহ্যেন্দ্রিয়ে দ্বারা প্রাপ্তমাত্র পদার্থকে একান্ত অব্যক্ত অনাত্মবস্তুর দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ে কৃত বা দত্ত অভিঘাত বলিয়া নিশ্চয়াত্মক কল্পনা হয়। এই অভিঘাতরূপ উপাদান পাইলে বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রহণক্রিয়ার অবকাশ হয়। গ্রহণক্রিয়ার দ্বারা এই উপাদান হইতে দেশাকার বিষয় রচিত হয়। অন্তরিন্দ্রিয় এই দেশাকার বিষয়কে উপাদানভাবে প্রাপ্ত হইলে নিজ গ্রহণক্রিয়াদ্বারা তাহা হইতে কালাকার বিষয় রচনা করে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত অনাকারিত উপাদান অব্যক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা প্রদত্ত বাহ্য অভিঘাত বলিয়া প্রতীতি হয়। অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত দেশাকার উপাদান কিন্তু বুদ্ধিরূপ আত্মার দ্বারা দত্ত আন্তর অভিঘাত বলিয়া প্রতীতি হয়। কালাকার বিষয়কে বুদ্ধিক্রিয়ার অপেক্ষার উপাদান বলা যায় কিন্তু বুদ্ধি এই উপাদানের দ্বারা অভিহত হয় না। এই উপাদান গ্রহণও করে না, কালাকার বিষয় হইতে বিবিক্ত থাকিয়া অধ্যবসায়ক্রিয়ার দ্বারা তাহাতে সম্বন্ধাত্মক প্রকার উদ্ঘাটিত করে। এইরূপে ইন্দ্রিয়সহকারে বুদ্ধি অব্যক্ত বস্তুর দ্বারা প্রদত্ত উপাদানে আকারপ্রকাররূপ ব্যক্ততার ঘটক হইয়া আভাসাত্মক বিষয়বস্তু প্রকাশিত করে।

বিষয়জ্ঞানের এই বিবরণের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত উপাদানে দেশাকারকল্পনা, কালাকারকল্পনা ও প্রকারকল্পনা জ্ঞান—ক্রিয়ার এই ক্রম উক্ত হইয়াছে। এই ক্রম কালিক ক্রম না হইতে পারে, হইলেও প্রকার-কল্পনাতে কালাকারকল্পনা ও কালাকারকল্পনায় দেশাকারকল্পনা ক্রিয়াভাবে নাই, কল্পনাফলমাত্র ভাবে আছে একথা বলা যায় না। সুতরাং অধ্যবসায়রূপ বিষয়জ্ঞানে কল্পনাত্রয়ের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হয়। এস্থলে প্রতি কল্পনাই জ্ঞানাত্মক, অলীক কল্পনা নয়। সুতরাং এরূপও বলা যায় যে দেশাকারকল্পনায় কালাকারকল্পনা ও কালাকারকল্পনায় প্রকারকল্পনা অস্ফুট বা অবিভক্ত ভাবে থাকে। এই প্রসঙ্গে ক্রম মুখ্যতঃ অপেক্ষাক্রম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। প্রকারকল্পনাতে কালাকারকল্পনার ও কালাকার কল্পনাতে দেশাকারকল্পনার সাক্ষাৎ অপেক্ষা আছে। প্রথম কল্পনা দ্বিতীয় কল্পনাগর্ভিত ও দ্বিতীয় কল্পনা তৃতীয়কল্পনাগর্ভিত বলা যায়। প্রকারের বাহ্যবিষয়নিষ্ঠতাজ্ঞানই বিষয়জ্ঞানের স্ফুটভাব। বাহ্য বা দেশাকারবিষয়ের আন্তর বা কালাকারবিষয়ভাবে প্রতীতি না হইলে তাহাতে প্রকারপ্রতীতি হইতে পারে না এই কথা বুঝিলেই কল্পনাত্রয়ের পরস্পরাপেক্ষাঘটিত একীভাব বুঝা যায়।

বাহ্যবিষয় যে প্রত্যক্ষ হইতেছে এই জ্ঞানই ঐ বিষয়ের আন্তর বা মানস প্রত্যক্ষ। বিষয় প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায়ে প্রত্যক্ষরূপ মানস ব্যাপারেরই জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষবিষয়ের জ্ঞান হয় না। বিষয় গৌণভাবে তখন প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহা বস্তু বা অবস্তু বলিয়া প্রতীত হয় না। বাহ্যপ্রত্যক্ষের যে জ্ঞানে বাহ্যবিষয়ের বস্তুতাপ্রত্যয় বিলুপ্ত হয় না তাহাকে ঐ বিষয়ের আন্তর বা মানস জ্ঞান বলা যায়। প্রত্যক্ষের জ্ঞানে বিষয়ের বস্তুতাপ্রত্যয় বিলুপ্ত না হইলে ঐ প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষত্ব বা সাক্ষাৎভাবেরও ব্যত্যয় হয় না। বাহ্যবিষয়-প্রত্যক্ষের জ্ঞানে এইরূপ গর্ভীভূত বাহ্যবিষয়প্রত্যক্ষই বাহ্যবিষয়ের মানস-প্রত্যক্ষ। বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয়ই মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়। প্রভেদ এই যে দেশাকার বাহ্যবিষয় মানসপ্রত্যক্ষে কালাকারগ্রস্ত হয়। বাহ্যপ্রত্যক্ষরূপ মানসবৃত্তি দেশে স্থিত নয়, কালে উৎপন্ন ও স্থিত এই অর্থে দেশাকার নয়, কালাকার। মা-সবৃত্তি হইতে তাহার বিষয় ভিন্ন বলা যায়। কিন্তু বৃত্তির জ্ঞানে বিষয় হইতে বৃত্তির ভেদগ্রহ হয় না, এইজন্য বৃত্তির কালাকার বিষয়েরও কালাকারভাবে প্রতিভাত হয়। বাহ্যপ্রত্যক্ষরূপ বৃত্তির কালাকারই আছে,

দেশাকার নাই। বৃত্তির বিষয় হইতে বৃত্তি অবিভক্ত বলিয়া বিষয়ের দেশাকার হইতে এই বৃত্তিরূপ কালাকার অভিন্ন। অথচ এই কালাকার হইতে দেশাকার ভিন্ন বোধ হয়। বৃত্তির জ্ঞানে বিষয়ের কালাকার ও দেশাকারের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ 'কালাকারে দেশাকার গর্ভীভূত' এইরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত দেশাকার বিষয় অন্তরিন্দ্রিয়-গৃহীত বাহ্যপ্রত্যক্ষরূপ মানসবৃত্তির গর্ভীভূত হইয়া এইভাবে কালাকারগ্রস্ত হয়।

বাহ্যপ্রত্যক্ষে বিষয়ের দেশাকার পূর্ণ বা পরিনিষ্ঠিতভাবে প্রতিভাত হয়। বাহ্যপ্রত্যক্ষের মানসপ্রত্যক্ষে বিষয়ে দেশাকারের পূর্ণতার অপলাপ হয় না, অথচ ক্রিয়মাণত্বের ভানও হয়। ক্রিয়মানভাবে আকার যেন ক্রমশঃ অঙ্কিত হইতেছে বোধ হয়, কিন্তু পূর্ণ বলিয়া স্থিত বোধ থাকায় এই ক্রম কালিক-ক্রম বলিয়া জ্ঞান হয় না, অথচ ভ্রম বলিয়াও প্রতীতি হয় না। ক্রম কালাকার বটে কিন্তু কালাতিপাতের অপেক্ষা করে না। ক্রমাত্মক ক্রিয়মাণ আকারই পূর্ণদেশাকারের কালাকার বলা যায়। মানসপ্রত্যক্ষের মুখ্যবিষয় বাহ্য-প্রত্যক্ষ ও গৌণ বিষয় কালাকার বাহ্যবিষয়। বাহ্যবিষয়ের কালাকার উহার পূর্ণ দেশাকারেরই ক্রিয়মাণ রূপ। মানসপ্রত্যক্ষে দেশাকারের ক্রিয়মাণরূপ পূর্ণরূপের গর্ভীভূত বলিয়া জ্ঞান হয়। স্মৃতিকেও বাহ্যবিষয়ের মানসপ্রত্যক্ষ বলা যায়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষের মুখ্য বিষয় বাহ্যপ্রত্যক্ষ নয়। বাহ্যবিষয়ই মুখ্যবিষয়, বাহ্যপ্রত্যক্ষের গৌণপ্রত্যয় থাকিলেও জ্ঞান থাকে না। যে স্মৃতিতে বাহ্যপ্রত্যক্ষের জ্ঞান থাকে তাহা বুদ্ধিমিশ্র স্মৃতি, স্মৃতিমাত্র নয়। স্মৃতিমাত্রের মুখ্যবিষয় যে বাহ্যবিষয় তাহার দেশাকারেরও ক্রিয়মাণ ও পূর্ণ দুইরূপ প্রতিভাত হয়। কিন্তু এস্থলে ক্রিয়মাণরূপই প্রধান, পূর্ণরূপের গৌণপ্রত্যয় থাকে মাত্র। স্মৃতিকেও মানসপ্রত্যক্ষ বলিলে অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় কেবল বর্তমান বিষয়কে গ্রহণ করে না, অবর্তমান বিষয়কেও গ্রহণ করে স্বীকার করিতে হয়।

বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয় এইরূপে মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় না হইলে তাহার প্রকারজ্ঞান হয় না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে গৃহীত বিষয়ের অরূপ সম্বন্ধই তাহার প্রকার, সম্বন্ধ ব্যক্তিহীন বৌদ্ধজাতি ও অধ্যবসায়ে এই অরূপ জাতিকে গৃহীতবিষয়নিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান হয়। এই গৃহীতবিষয়ের এই সম্বন্ধ—ইহাই অধ্যবসায়ের রূপ বলা যায়। এই-বিষয় শব্দের অর্থ এই দেশাকার-বিশেষিত

বিষয়ব্যক্তি, এই-সম্বন্ধের অর্থ এই জাতীয় সম্বন্ধ। কোন দেশাকার ব্যক্তিতে কোন ব্যক্তিস্বহীন সম্বন্ধজাতি আছে এই জ্ঞানই মূল অধ্যবসায়। সম্বন্ধরূপ বৌদ্ধজাতি হইতে ভিন্ন যে বিষয়জাতি তাহা অনেক ব্যক্তির সাধারণ ধর্ম দ্বারা ঘটিত বলা যায়। বিষয়জাতি বিষয়ব্যক্তিতে আছে এই অধ্যবসায়ে জাতি যে বিষয়ধর্মের দ্বারা ঘটিত তাহা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া জাতির ব্যক্তিনিষ্ঠতা যেন সহজবোধ্য মনে হয়। বিষয়জাতি এইজন্য বিষয়ব্যক্তিপ্রত্যক্ষে অবিভক্তভাবে প্রত্যক্ষ হয় স্বীকার করা যায়। কিন্তু সম্বন্ধরূপ জাতি প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ধর্মের দ্বারা ঘটিত বলা যায় না। তাহার বিষয়নিষ্ঠতার জ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সম্বন্ধের দেশাকারব্যক্তিনিষ্ঠতাজ্ঞানরূপ মূল অধ্যবসায়ের নিষ্ঠতাজ্ঞানের বিশেষ বিচার প্রয়োজন।

এই বিষয়ের এই সম্বন্ধ—ইত্যাকার জ্ঞান হইতে হইলে বিষয়ে সম্বন্ধের অনুরূপ কোন ধর্মবিশেষের প্রত্যয়ের প্রয়োজন। বিষয়জাতির ঘটক যে অনেক ব্যক্তিগত সাধারণ ধর্ম তাহা সম্বন্ধরূপ জাতির ঘটক নয় বলা হইয়াছে। সুতরাং এই ধর্মবিশেষ সম্বন্ধের অনুরূপমাত্র ভাবে প্রতীত হইবে বলিতে হয়। আনুরূপ্যের অর্থ সাদৃশ্যবিশেষ। দুই প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়েরই সাদৃশ্য প্রসিদ্ধ। প্রত্যক্ষাযোগ্য পদার্থের সহিত সাদৃশ্যের যদি কোনও প্রত্যয় থাকে তবে সেই সাদৃশ্যকে আনুরূপ্য বলা যাইতেছে। প্রত্যক্ষ পদার্থের কল্পিতপদার্থের সহিত সাদৃশ্য বোধ হয়। কল্পিত পদার্থ প্রত্যক্ষ-যোগ্যও হইতে পারে, প্রত্যক্ষাযোগ্যও হইতে পারে। দুই প্রত্যক্ষযোগ্য কল্পিত পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে প্রথমের অপেক্ষায় কোনও ধর্মের আতিশয্য আছে এরূপ স্থলবিশেষ প্রত্যয় হয়। এইরূপ দ্বিতীয়ের অপেক্ষায় তৃতীয়ে, তৃতীয়ের অপেক্ষায় চতুর্থে ইত্যাদি প্রত্যয় থাকিলে কোন পদার্থে ঐ ধর্মের নিরতিশয়ত্ব বা কাষ্ঠা থাকিতে পারে, এরূপ কল্পনা হয়। এই পদার্থ প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলেও একান্ত আকারহীন বলা যায় না। উহার আকার পূর্ণ নয়, পূর্ণাকারনিষ্ঠ ক্রিয়মাণ আকারও নয়, ক্রিয়মাণ আকার মাত্র। মানসপ্রত্যক্ষগোচর বাহ্যবিষয়ের দেশাকার যে কালাকারভাবে প্রতিভাত হয়, তাহাই পূর্ণাকারনিষ্ঠ ক্রিয়মাণ আকার। ক্রিয়মাণ-আকারমাত্রবিশিষ্ট কাষ্ঠার প্রত্যয় স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থের কাষ্ঠার সহিত সাদৃশ্যের নাম আনুরূপ্য দেওয়া যায়।

সম্বন্ধ আকারহীন বটে, কিন্তু অধ্যবসায়ে উহা সাকারবিষয়নিষ্ঠা বলিয়া প্রতীতি হয়। এই প্রতীতি প্রত্যক্ষ নয় বলা হইয়াছে। উহা বিষয়াকারের আকারকাষ্ঠার সহিত আনুরূপ্য কল্পনা। বিষয়নিষ্ঠতাজ্ঞানে সম্বন্ধ আকারকাষ্ঠা ভাবে কল্পিত হয়। আকার যে অর্থে বিষয়নিষ্ঠ, সম্বন্ধ সে অর্থে বিষয়নিষ্ঠ নয়। বিষয়াকারই আকার, শূন্য আকারের প্রতীতি অবিষয়ের প্রতীতি নয়, অনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতীতি মাত্র। বিষয়নিষ্ঠতা আকারের নিয়ত ধর্ম। সম্বন্ধ যে বিষয়েরই সম্বন্ধ এরূপ নিয়ম নাই। অবিষয় আত্মার স্বাধীনকারণতাদি সম্বন্ধের কল্পনা ও কল্পনাজ নিশ্চয় হয়, পূর্বে বলা হইয়াছে। বিষয়নিষ্ঠতা সম্বন্ধের নিয়ত ধর্ম বলা যায় না। সম্বন্ধ জাতিমাত্র, সম্বন্ধব্যক্তি বলিয়া কোনও পদার্থ নাই বলা হইয়াছে। ব্যক্তিরই কাদাচিৎক ধর্ম থাকিতে পারে। সুতরাং বিষয়নিষ্ঠতা সম্বন্ধের কাদাচিৎক ধর্মও বলা যায় না। সম্বন্ধের বিষয়নিষ্ঠতা ভাক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিষয়ের সম্বন্ধ বাস্তব, কিন্তু সম্বন্ধের বিষয়ের সহিত নিষ্ঠতাসম্বন্ধ বাস্তব নয়। এই বিষয় এইরূপে সম্বদ্ধ বলা যায়, কিন্তু এই সম্বন্ধ এই বিষয়ে আছে ইত্যাকার প্রতীতিকে শব্দ বিকল্পমাত্র বলিতে হয়। ইহার অর্থ, এই বিষয় আকার-কাষ্ঠাভাবে কল্পিত সম্বন্ধের অনুরূপ। অথবা বলা যায়, বিষয়াকারের নিরাকার সম্বন্ধ আকারকাষ্ঠাভাবে কল্পিত হইতেছে। এই কাষ্ঠাকল্পনাকেই পূর্বে রূপারূপকল্পনা বা সূত্রাকারকল্পনা বলা হইয়াছে।

সম্বন্ধ বুদ্ধিকল্প্য পরিনিষ্ঠিত পদার্থ। আকারকাষ্ঠাদ্বারা উহা বিষয়ে প্রকাশ হয়। আকারকাষ্ঠা পরিনিষ্ঠিত পদার্থ নয়, কেবলক্রিয়মাণ পদার্থ। ইহাকে একপ্রকার ক্রিয়মাণ আকারও বলা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ক্রিয়মাণ আকারসমূহের ধারা বলা উচিত। অন্তরিন্দ্রিয়গৃহীত বাহ্যবিষয়ের পূর্ণদেশাকারনিষ্ঠ যে ক্রিয়মাণ আকার তাহা এই অনাদি আকারধারার শেষ আকার ও এই ধারার সহিত সঙ্গত প্রত্যক্ষ আকার। এই আকারধারা যথেচ্ছ কল্পনা নয়, বুদ্ধিকল্প্য সম্বন্ধই এই ধারার স্থিত নিয়ম। ক্রিয়মাণ আকারধারাকল্পনা নিরাকার সম্বন্ধের প্রকাশক ও উহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাহ্যে-ন্দ্রিয় বিষয়ে পূর্ণ দেশাকার কল্পনা করিলে অন্তরিন্দ্রিয় সেই আকারে ক্রিয়মাণ আকার বা কালাকার কল্পনা করে। পরে বুদ্ধিসম্বন্ধনিয়ন্ত্রিত কালাকারধারার সহিত সেই কালাকারের সঙ্গতি কল্পনা করে। এইরূপে বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়। পূর্ণাকারে সম্বন্ধের ছায়াপাত হয় না, আকারধারার নিয়মের

সহিত সম্বন্ধিরূপ বিষয়প্রকার পূর্ণাকারের বিশেষকরূপে সাক্ষাৎ প্রতিভাত হয় না, বিষয়ের যে বিশেষধর্মের প্রত্যক্ষের দ্বারা বিষয়ে সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান সম্ভাবিত হয় তাহা পূর্ণাকারে প্রতীত হয় না। পূর্ণাকারের ক্রিয়মাণ রূপেই কেবল-ক্রিয়মাণ আকারকাষ্ঠার অবভাস হয়। এই অবভাসেরই নাম বিষয়প্রকার।

অপ্রকারিত কালাকারেরও জ্ঞান নাই বলা যায়। আকারক ক্রিয়া বা অঙ্কনক্রিয়া গতিবিশেষ। হস্তাদির দ্বারা অঙ্কনক্রিয়া বিষয়নিষ্ঠ গতি, কল্পনাদ্বারা অঙ্কনক্রিয়া জ্ঞাত আকারের ঘটক হইলে তাহাকে ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ গতি বলিতে হয়। গ্রহণক্রিয়াকে জ্ঞানাঙ্গ অঙ্কনক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিলে এই গতিকে উপচার-মাত্র বলা যায় না। যে আকারকল্পনায় জ্ঞান হয় না তাহাকে জ্ঞাতার বা ইন্দ্রিয়ের গতি বলা উপচারমাত্র। গতিপ্রত্যয়মাত্রেই দিক্‌প্রত্যয় আছে, কিন্তু দিক্‌প্রত্যয়ে গতিপ্রত্যয় না হইতে পারে। স্থিত দেশেও দিকের প্রত্যয় হয়, তাহা গতিকল্পনা হইতে প্রসূত বলা যায় না। দেশপ্রত্যয় কালপ্রত্যয়জন্ম নয়, উহা কালপ্রত্যয় দ্বারা স্ফুটীকৃত হয় মাত্র। দিক্ বিনা গতির প্রত্যয় নাই, সুতরাং কালাকার অঙ্কনাত্মকগতিরও এই দিক্ স্বীকার করিতে হয়। দেশাকার নানা ধারায় বা দিশায় অঙ্কিত হইতে পারে। ক—খ এই রেখা ক হইতে খ'র দিকে অথবা খ হইতে ক'র দিকে গতিদ্বারা অঙ্কিত হয়। স্থিত দৈশিক আকারে এককালে পরস্পর বিপরীত দিক্ প্রত্যয় হয়, কিন্তু গতির প্রত্যক্ষে তাহা হয় না, একই দিক্ প্রত্যক্ষ হয়। তবে তাহার সহিত উহা বিপরীত দিক্ নয় এই নিষেধপ্রত্যয় থাকে, অর্থাৎ দিকের প্রত্যক্ষে দিকের অনন্যত্ব প্রত্যয় হয়। সর্বত্রই অনন্যত্ব প্রত্যয় বুদ্ধিজন্ম। এই হেতু কালাকার অঙ্কনগতির দিকের এই অনন্যত্বপ্রত্যয় প্রকারেরই প্রত্যয় বলিতে হয়। যে কালাকার কল্পনায় এক দিকের প্রত্যয় হয়, অথচ তাহার অনন্যত্বের প্রত্যয় থাকে না, অর্থাৎ কালাকারের প্রকারপ্রত্যয় থাকে না, সে কল্পনা জ্ঞান নয়, যেন কালাকার এইরূপ আভাস-প্রতীতিমাত্র। কালাকার জ্ঞাত হইলে প্রকারিত ভাবেই জ্ঞাত হয়।

জ্ঞাত আকারমাত্রই প্রকারিত বলা যায়। কিন্তু আকারের জ্ঞান প্রকার-জ্ঞান না হইতে পারে। প্রকারজ্ঞানরহিত দেশাকার জ্ঞান হয়, কালাকারজ্ঞান হয় না। বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রহণক্রিয়ার এই ভেদ স্বীকার করিলে তাহাদের ক্রিয়েতর প্রাপ্তিধর্মেরও ভেদ স্বীকার করিতে হয়। ইন্দ্রিয় অভিঘাত-প্রাপ্ত না হইলে আকার গ্রহণ করে না, সুতরাং প্রাপ্তি আকারক ক্রিয়ার

অপেক্ষা করে না বলা যায়। প্রকারজ্ঞান বিনা দেশাকার জ্ঞান হয়, এইজন্য বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রাপ্তির প্রতি প্রকারকক্রিয়ারও কারণতা স্বীকার করা যায় না। এই প্রাপ্তি কোন জ্ঞানক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। এইজন্য ইহার কারণ একান্ত অজ্ঞাত বা অব্যক্ত বলিতে হয়। অন্তরিন্দ্রিয় দেশাকারউপাদান প্রাপ্ত হইয়া কালাকার গ্রহণ করে। প্রকারজ্ঞান বিনা কালাকারজ্ঞান হয় না, সুতরাং মনের দ্বারা দেশাকারউপাদান প্রাপ্তির প্রতি বুদ্ধির প্রকারক ক্রিয়ার কারণতা অস্বীকার করা যায় না। পূর্বে যে বলা হইয়াছে অব্যক্ত বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়কে অভিহত করে, ও বুদ্ধিরূপ আত্মা অন্তরিন্দ্রিয়কে অভিহত করে, তাহা এইরূপ অর্থেই বুঝা যায়।

আকারকাষ্ঠাকে সম্বন্ধ ও কালাকারের মধ্যে সেতু বলিয়া কল্পনা করা যায়। সম্বন্ধ বুদ্ধিক্রিয়া দ্বারা গৃহীত নয়, উহা সম্বন্ধনরূপ বুদ্ধিক্রিয়ার স্বরূপ। উহার বিষয়নিষ্ঠতার অর্থ বিষয়ের উদ্দেশ, বাক্যে সকর্মক ক্রিয়াপদ যেরূপ কর্মপদের উদ্দেশ করে সেইরূপ উদ্দেশ। বিষয়ের উদ্দেশে যে বুদ্ধিক্রিয়া অর্থাৎ সম্বন্ধবুদ্ধির অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য কালাকারপ্রাপ্তির যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই আকারকাষ্ঠাকল্পনা বা সূত্রাকার কল্পনা। কালাকার ক্রিয়মাণ হইলেও কালাকারকল্পনা সরূপকল্পনা। সূত্রাকারকল্পনা রূপারূপকল্পনা, সম্বন্ধবুদ্ধির অপেক্ষায় সরূপ ও কালাকারের অপেক্ষায় অরূপ। ইহা অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নয়, অন্তরিন্দ্রিয়ের দিকে বুদ্ধির ক্রিয়া। সূত্রাকার কল্পনা বুদ্ধিকল্পনা হইলেও সম্বন্ধকল্পনার অপেক্ষায় কালাকার কল্পনা বলা যায়। এই কালাকার বুদ্ধিকল্পিতমাত্র, বুদ্ধিগৃহীত নয়। বুদ্ধি বিষয় গ্রহণ করে না, প্রকাশ করে মাত্র। ইন্দ্রিয় বিষয় প্রকাশ করে না, গ্রহণ করে মাত্র। ক্রিয়া উপাদানপ্রাপ্তির অপেক্ষা করে। বাহ্যেন্দ্রিয় অনাকারিত উপাদানকে দেশাকারভাবে গ্রহণ করে, অন্তরিন্দ্রিয় বা মন দেশাকার উপাদানকে কালাকারভাবে গ্রহণ করে। বুদ্ধি এই কালাকার উপাদানকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকারিত বিষয়ভাবে প্রকাশ করে। মনের দ্বারা গৃহীত দেশাকারগর্ভ কালাকার বিষয় বুদ্ধিক্রিয়ার পূর্বে নিষ্প্রকার থাকে না, উহাতে প্রকার অবিভক্ত ভাবে থাকে, এবং বুদ্ধিক্রিয়ার দ্বারা বিভক্ত হইয়া অভিব্যক্ত বা প্রত্যভিজ্ঞাত হয়।

৮। প্রত্যভিজ্ঞাপক ক্রিয়ার জ্ঞাততাঘটকত্ব

বিষয়ে যাহা প্রকাশিত হয় তাহা বিষয়ে অপ্রকাশ ভাবে ছিল এই প্রতীতি হয়। অপ্রকাশ ভূত পদার্থেরই প্রকাশ বলা যায়। এই অপ্রকাশের প্রকাশ-

প্রত্যয়ের নাম প্রত্যভিজ্ঞা। বিষয়ের প্রকাশমাত্রকে পূর্বে জ্ঞাতবিষয়-প্রত্যভিজ্ঞা বলা হইয়াছে। ইহা বিষয়ের প্রতি জ্ঞানক্রিয়া বলা যায় না, কৃতিরূপ আত্মজ্ঞানের ক্রিয়া বলিতে হয়। বুদ্ধির সম্বন্ধকত্ব বা প্রকারকত্ব বিষয়জ্ঞানক্রিয়া, ইহা প্রকাশমাত্রের বিশেষক বলিয়া প্রকাশক বা প্রত্যভিজ্ঞাপক ক্রিয়া বলা যায়। বিষয়ের প্রকারের দ্বারাই প্রত্যভিজ্ঞা হয়। অধ্যবসায়ে বিষয়ের কালাকারও প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। ইন্দ্রিয়গৃহীত এই আকার আকার-কাষ্ঠাগত সেই নিয়মের দ্বারা প্রকারিত—ইত্যাকার প্রতীতি আকারের প্রত্যভিজ্ঞা। কিন্তু এই আকার সেই আকার—এইরূপ প্রকারনিরপেক্ষ আকার-প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। এই অর্থে আকারের প্রকাশ নাই, আকারক ইন্দ্রিয় গ্রাহকমাত্র, প্রকাশক নয় বলা যায়। বাহ্যগ্রহণক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়াভিঘাতমাত্র ভাবে প্রাপ্ত অনির্দেশ্য উপাদানে দেশাকার অবিভক্তভাবে স্থিত হইয়া অথবা মানসগ্রহণক্রিয়ায় দেশাকার ভাবে প্রাপ্ত উপাদানে কালাকার অবিভক্ত ভাবে স্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ হয়—এরূপ কথার কোনও অর্থ নাই। এইজন্য আকারক ক্রিয়া বিষয়াকারের নিয়ত ঘটক বলিতে হয়। প্রকাশক ক্রিয়া বিষয়প্রকারেরই ঘটক বলা যায় না, আভাসাত্মার স্বাধীনকর্তৃস্বরূপ প্রকারেরও ঘটক হইতে পারে স্বীকার করা যায়।

জ্ঞানক্রিয়া বিষয়ের আকারপ্রকারের ঘটক বলা হইয়াছে। আকারঘটক ক্রিয়াকে অঙ্কন বলা যায়, প্রকারঘটক ক্রিয়ার নাম আবিষ্কার বা উদ্ঘাটন দেওয়া যায়। জ্ঞাতবিষয় ইন্দ্রিয়ের গ্রহণক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কিত হয় ও বুদ্ধির প্রত্যভিজ্ঞাপক ক্রিয়ার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কার ক্রিয়াকেও বিষয়ঘটক বলা যায়। অনাবিষ্কৃতপ্রকার বা অবিভক্তপ্রকার আকারের প্রত্যয় ও বিষয়-জ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা বস্তুর প্রত্যয় হইলেও 'এই বস্তু অন্য বস্তু নয়' বলিয়া প্রত্যয় নয়। স্ফুটজ্ঞানে বিষয় 'এই বস্তু অন্য বস্তু নয়' বলিয়া নিশ্চয় হয়। এই তত্তা বা অনন্যত্বের প্রত্যয়ই বিষয়গত প্রকাশবিশেষের প্রত্যয়। যে আকারিত বিষয়ের জ্ঞানে প্রকারজ্ঞান স্ফুট নয় তাহার প্রকাশমাত্র আছে, প্রকাশবিশেষ নাই বলা যায়। আবিষ্কার ক্রিয়া সুতরাং বিষয়ের তত্তা, অনন্যত্ব বা প্রকাশবিশেষের ঘটক বলিতে হয়। প্রকার অস্ফুট থাকিলে আকারিত বিষয়ের তত্তায় জ্ঞান হয় না। কিন্তু তত্তায় জ্ঞান না হইলে বিষয়ের জ্ঞান হয় না—একথা বলা যায় না। গ্রহণক্রিয়ার দ্বারা বিষয়ের জ্ঞাততামাত্র হয়, অনন্যস্বরূপে বিশেষিত জ্ঞাততা হয় না। তত্তাপ্রকাশরহিত বিষয়ের

জ্ঞাততার নামই আকার বলা যায়। জ্ঞাততা মাত্রকে বিষয়ের প্রকাশ বলা যায় না, কারণ অপ্রকাশ ভূতজ্ঞাততার বা আকারের কোন অর্থ নাই।

৯। দেশাকার ও কালাকারের পূর্বপরত্ব

আকারজ্ঞানে তত্তারূপ বিশেষের জ্ঞান না থাকিলেও আকারভেদরূপ বিশেষের জ্ঞান আছে। একাধিক আকারের সমষ্টিভাবে অথবা সমষ্টি আকারের অন্যতর ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন আকারের জ্ঞান হয় না। সমষ্টি আকার ও ব্যষ্টি আকার—ইহাদের একের জ্ঞান মুখ্য হইলে অপরের জ্ঞান গৌণভাবে থাকে। সমষ্টিআকার পূর্ণ হইলে তাহাতে ব্যষ্টিআকারের গৌণতাপ্রত্যয় তাহার ক্রিয়মাণত্বেরই প্রত্যয়। এইরূপ বিপরীত ভাবেও বলা যায়। বাহ্যবিষয়ের ক্রিয়মাণ-ব্যষ্টি-আকার-গর্ভিত পূর্ণ সমষ্টি-আকারই দেশাকার ও পূর্ণ ব্যষ্টি আকারের দ্বারা ক্রিয়মাণ সমষ্টি-আকারই কালাকার বলা যায়। অন্তরিন্দ্রিয়গৃহীত বাহ্যবিষয়ে এইরূপ দেশাকার ও কালাকারের যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হয়।

মানসবিষয়ের জ্ঞান বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, কিন্তু মানস-বিষয়ের জ্ঞানকে বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষা করে না। বাহ্যবিষয় বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়েরই গ্রাহ্য বলিয়া উহার দেশাকার ও কালাকার উভয়েরই জ্ঞান আছে। মানসবিষয় অন্তরিন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্য বলিয়া কালাকারমাত্র, বাহ্যবিষয় দেশাকার হইলেও বাহ্যপ্রত্যক্ষরূপ মানসবিষয় দেশাকার নয়। বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান না হইলে বাহ্যপ্রত্যক্ষ প্রভৃতি মানসবিষয়ের জ্ঞান হয় না। এই অর্থে কালাকারজ্ঞানের পূর্বে দেশাকার জ্ঞান হয় বলা যায়। দেশাকার ও কালাকার যুগপৎ থাকিলেও উহাদের জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকার করা যায় না। বাহ্যবিষয়ের অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণরূপ কালাকারজ্ঞানে দেশাকারজ্ঞান বিলুপ্ত হয় না বটে, কিন্তু দুইজ্ঞানের সহভাব নাই। কালাকারজ্ঞান দেশাকারজ্ঞান-গর্ভিত, দেশাকারজ্ঞান হইতে পৃথক নয়। কালাকারজ্ঞানের পূর্বে দেশাকার-জ্ঞান প্রকট হয় বটে, কিন্তু দেশাকারগ্রহণরূপ জ্ঞানক্রিয়া কালাকারগ্রহণরূপ জ্ঞানক্রিয়ার পূর্বে হয় এরূপ বলা যায় না। ইন্দ্রিয় অক্রিয়ভাবে বিষয় প্রাপ্ত হয় ও সক্রিয়ভাবে বিষয় গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয়প্রাপ্তি বিষয়ের কোনও বিশেষের ঘটক নয়, গ্রহণ বিষয়ের আকাররূপ বিশেষের ঘটক—এই অর্থে গ্রহণকে ক্রিয়া বলা হইয়াছে। আকারজ্ঞানই গ্রহণ, গ্রহণ আকারের ঘটক না হইলে,

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকারের সাক্ষাৎপ্রাপ্তি হইলে অনুভবসিদ্ধ ক্রিয়মাণ আকারের কোনও অর্থ থাকে না। অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়জ্ঞানে বিশেষের পূর্ণ দেশাকারের যে ক্রিয়মাণ বা কালাকার ভাবে প্রতীতি হয় তাহাই বাহ্যেন্দ্রিয়ের গ্রহণক্রিয়ার দ্বারা দেশাকার রচিত বা অঙ্কিত হওয়ার সাক্ষাৎ অনুভব। ক্রিয়ার অনুভবই ক্রিয়ার অস্তিত্ব। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যপ্রত্যক্ষ গৃহীত হইলেই বাহ্যবিষয় তাহার দ্বারা গৃহীত হয়। বাহ্যবিষয় বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত না হইলে অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয় না বটে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় বাহ্যপ্রত্যক্ষরূপ মানসবিষয় গ্রহণের অর্থ মানসবিষয়ে পূর্ণ কালাকার রচনা, ও বাহ্যবিষয় গ্রহণ করার অর্থ বাহ্যবিষয়ে ক্রিয়মান দেশাকার রচনা। এই পূর্ণ কালাকার ক্রিয়মাণ দেশাকারের পূর্বে রচিত হয়। সুতরাং দেশাকার ও কালাকারের যৌগপদ্য, দেশাকারের পূর্বত্ব ও কালাকারের পূর্বত্ব এই তিনই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্বীকার করা হয়।

১০। জ্ঞানক্রিয়ার জ্ঞাতত্তাঘটকত্ব অনুভবসিদ্ধ

বাহ্যেন্দ্রিয় দেশাকার যে রচনা করে তাহা অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায়। এইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় কালাকার যে রচনা করে তাহা বুদ্ধিগম্য। অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়মাণ বাহ্য-আকারই বাহ্যেন্দ্রিয়ের দেশাকাররচকত্বের প্রমাণ। এইরূপ বুদ্ধিপ্রকাশ্য ক্রিয়মাণ মানস-আকার অন্তরিন্দ্রিয়ের কালাকাররচকত্বের প্রমাণ বলা যায়। এই ক্রিয়মান মানসাকারকেই পূর্বে কেবলক্রিয়মান সূত্রাকার বলা হইয়াছে। বুদ্ধি পূর্ণকালাকার বা মানসাকারকে উপাদানভাবে প্রাপ্ত হইয়া তাহারই সূত্র বা নিয়মভাবে প্রকট হয়।

জ্ঞানক্রিয়া যে জ্ঞাতবিষয়ের ঘটক তাহা এযাবৎ অনুভবসিদ্ধ বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধিক্রিয়া আকারের তত্তা বা অনন্যত্বের প্রকাশক রূপে ঘটক, অন্তরিন্দ্রিয়ক্রিয়া বাহ্যাকারের কালাকারত্বের রচকরূপে ঘটক ও বাহ্যেন্দ্রিয়-ক্রিয়া দেশাকারের রচকরূপে ঘটক। এই তিনেরই নিশ্চয় বুদ্ধির অনুভব হইতে হয় বলা যায়। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বুদ্ধিও অক্রিয়ভাবে বিষয়প্রাপ্ত হইয়া সক্রিয়-ভাবে বিষয় ঘটনা করে। এই বুদ্ধি নিজের ক্রিয়াফল, তাহার গর্ভীভূত মনের ক্রিয়াফল ও তাহার গর্ভীভূত বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াফলকে অনুভব করে।

যে বিষয়প্রাপ্তি জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা উপাদানভাবে অপেক্ষিত তাহাকে বিষয়ের অনুভব বলা যায় না। যে প্রাপ্তির পর জ্ঞানক্রিয়ার অবকাশ থাকে না তাহাই অনুভবপদবাচ্য। অন্তরিন্দ্রিয় বাহ্যেন্দ্রিয়প্রাপ্ত অনাকারিত উপাদানকেও প্রাপ্ত হয় বলা যায়, কিন্তু সেই উপাদানকে আকারিত করে না, তাহার ক্রিয়া দেশাকার উপাদানে কালাকার ঘটনা করে। অনাকারিত উপাদানের প্রতি মনের কোনও ক্রিয়া নাই বলিয়া মনের এই উপাদান-প্রাপ্তিকে একপ্রকার অনুভব বলা যায়। এইরূপ মনের ন্যায় বুদ্ধিও দেশাকার-বিষয়কে উপাদানভাবে প্রাপ্ত হয় বলা যায়, কিন্তু বুদ্ধির প্রকারক ক্রিয়া সেই উপাদানের প্রতি ক্রিয়া নয় বলিয়া দেশাকার উপাদানপ্রাপ্তিকে বুদ্ধির একপ্রকার অনুভব বলিতে হয়। কিন্তু দুই স্থলেই উপাদানপ্রাপ্তির পর অন্ত উপাদানের প্রতি ক্রিয়ার অবকাশ আছে। প্রকারিত কালাকারকে যে নিষ্ক্রিয় অতিবিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই প্রাপ্তিই যথার্থ অনুভব। বুদ্ধির প্রকারিত-কালাকার-অনুভবেই দেশাকার-অনুভব হয়, ও তাহাতেই অনাকারিত উপাদান অনুভব হয়।

এই অনুভব জ্ঞান কি জ্ঞানেতর নিশ্চয় এই প্রশ্ন উঠিতেছে। সাধারণ প্রমাণের বিরুদ্ধ হইলে অনুভবকে বিষয়ের জ্ঞান বলা যায় না, কৃতিতন্ত্র আত্মজ্ঞানের গর্ভীভূত বিষয়জ্ঞানচ্ছায়া বলিতে হয়। জ্ঞাতবিষয় যে জ্ঞানক্রিয়ার দ্বারা ঘটিত তাহা অনুমানাদি বিষয়প্রমাণদ্বারা জানা যায় না, অনুভবেই জানিতে হয়। কিন্তু রূপরসাদির ন্যায় আকারপ্রকারকেও জ্ঞানকরণ যে নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত হইতে পারে না তাহা বিষয়প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। ইহা জানিলেই আকারপ্রকারের জ্ঞানক্রিয়াঘটিতত্বের অনুভব সাধারণ-প্রমাণবিরুদ্ধ নয় বলা যায়, এবং জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায়।

১১। অনুভবের প্রামাণ্যবিচার

(ক) আকারক ক্রিয়া সম্বন্ধে

আকার যে রূপরসাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলপ্রাপ্ত নয় তাহা প্রমাণ করিলে আকারাশ্রয় প্রকারের সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রমাণ হয়। এইজন্য কাণ্ট আকারের সম্বন্ধেই জ্ঞানপরীক্ষার প্রথম ভাগে ঐরূপ প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। দেশাকার ও কালাকারের সম্বন্ধে একই প্রমাণপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। বিষয়ের প্রত্যক্ষে তাহার স্থান ও আধেয়ের প্রত্যক্ষ

হয়। এক বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষে তাহার সহিত সন্নিবিষ্ট অন্য বাহ্যবিষয়েরও প্রত্যক্ষ হয়। একের স্থানপ্রত্যক্ষে অপরের স্থানপ্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ স্থানপ্রত্যক্ষে একাধিক বিষয়ের স্থানপ্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষে তাহার আধাররূপ অন্যবিষয়ের অথবা বিষয়ভাবে আভাসিত শূন্যদেশের সাক্ষাৎপ্রত্যয় হয়। শূন্যদেশের প্রত্যয় তাহাতে আধানযোগ্য অনির্দিষ্ট বিষয়েরই প্রত্যয়। বিষয় গৃহীত হইলে গৃহীত বা গ্রহণযোগ্য বিষয়ান্তরের সহিত সন্নিবেশসম্পর্কে অথবা আধেয়তাসম্পর্কে অবস্থিত ভাবেই গৃহীত হয়। বিষয়ের দৈশিক-ধর্মপ্রত্যক্ষেই দৈশিকধর্মী অন্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, বিষয়ের রূপরসাদি প্রত্যক্ষে রূপাদিধর্মী অন্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। দৈশিকধর্মাবচ্ছিন্ন বিষয়তা নিজেকেই অপেক্ষা করে কিন্তু রূপাদি-অবচ্ছিন্ন-বিষয়তা সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। এই অর্থে দেশকে স্বাপেক্ষ পদার্থ বলা যায়। দেশের এই স্বাপেক্ষত্বপ্রত্যয় হইতেই দেশ যে বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা অভিঘাতভাবে প্রাপ্ত হয় না তাহা প্রমাণিত হয়। অভিঘাতপ্রত্যয় অভিঘাতপ্রত্যয়কে অপেক্ষা করে না, দেশপ্রত্যয় দেশপ্রত্যয়কে অপেক্ষা করে।

কোনও দেশাকারের প্রত্যক্ষে তাহার সীমা বা অবধির প্রত্যক্ষ হয়। অবধির প্রত্যক্ষে অবধির বহির্ভূত দেশেরও প্রত্যক্ষ হয়। এই বহির্ভূত দেশের অবধির প্রত্যক্ষ নাই, অথচ অবধিহীন বলিয়াও উহার প্রত্যক্ষ হয় না। দেশাকার অজ্ঞাত-অবধিক দেশের অংশ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সসীম বা জ্ঞাতাবধিক দেশেরও অংশভাবে ক্ষুদ্রতর দেশ প্রত্যক্ষ হয়। অংশীর অবধি ও কোনও অংশের অবধির মধ্যে অন্তরালের প্রত্যক্ষ হইলে অংশীর অন্তর্ভূত ও ঐ অংশের ব্যাপক অন্য অংশ প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপে অংশী ও অংশের অবধিদ্বয়মধ্যে অসংখ্য অংশাবধি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সুতরাং দুই অবধির মধ্যে অন্য অবধিই আছে, অপরিচ্ছেদ্য অন্তরাল নাই স্বীকার করিতে হয়। সসীম দেশাকারের অন্তর্ভূত নিরন্তর দেশাকারসন্ততির যেরূপ প্রত্যয় হয় উহার বহির্ভূত ক্রমপ্রবৃদ্ধ দেশাকারসন্ততিরও সেইরূপ প্রত্যয় হয়। হ্রাস ও বৃদ্ধি উভয়েরই নিরন্তর ক্রম প্রতীত হইলেও তাহাদের ভেদেরও প্রত্যয় হয়। হ্রাসমুখী অন্তঃসন্ততি সান্ত, অর্থাৎ শেষ হইতেছে, এবং বৃদ্ধিমুখী বহিঃসন্ততি অনন্ত বা শেষ হইতেছে না, এই প্রত্যয় দেশাকারের সসীমত্বপ্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভূত বলা যায়। অন্তঃসন্ততির সমষ্টিভাবে সসীমদেশ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া এই সন্ততি দৈশিকপ্রত্যক্ষের বিষয়।

বহিঃসন্ততি অনন্ত বা অসমস্ত বলিয়া দৈশিকপ্রত্যক্ষের বিষয় বলা যায় না। দেশাকারের অন্তঃসন্ততির নাম দেশপরিমাণ। দেশের অবধি ও পরিমাণ-প্রত্যয়রূপ বিশেষের দ্বারা জাতিপ্রত্যয় হইতে দেশপ্রত্যয় ব্যাবৃত্ত হয়। জাতির অবধি আছে বলা যায়, কিন্তু অন্য অজ্ঞাত-অবধিক জাতির অংশ ভাবে ইহার অবধির প্রত্যয় হয় না।

সম্বন্ধ প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ নয় বটে কিন্তু বিষয়ের প্রত্যক্ষে যে দেশের প্রত্যক্ষ হয় তাহা সম্বন্ধভাবে প্রতিভাত হয়, রূপরসাদির ন্যায় বিষয়গুণভাবে প্রতিভাত হয় না। দেশ বিষয়গত সম্বন্ধ ও স্বগত সম্বন্ধ—এই দুইভাবে যেন প্রত্যক্ষ হয়। বিষয়গত প্রত্যক্ষসম্বন্ধ দুই প্রকার—সন্নিবেশ ও আধেয়তা। বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা বিষয়ান্তরের সম্পর্কে সন্নিবিষ্ট বলিয়া ও শূন্য-দেশরূপ আধারে স্থিত বা অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া প্রত্যয় হয়। শূন্যদেশের প্রত্যয় তাহাতে আধানযোগ্য অনির্দেশ্য বিষয়েরই প্রত্যয়। দেশের স্বগত সম্বন্ধও দুই প্রকার-অবধি ও সমষ্টি। দেশাকার প্রত্যক্ষ হইলেই তাহার সীমা বা অবধি প্রত্যক্ষ হয়। দেশাকারের বহির্ভূত দেশের সহিত সম্বন্ধই তাহার অবধি বলা যায়। সসীম দেশের প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা অংশসমষ্টি বলিয়া প্রত্যয় নয়। অংশাংশিসম্বন্ধই সমষ্টিসম্বন্ধ বা দৈশিক পরিমাণ। এই অবধি ও পরিমাণরূপ সম্বন্ধ হইতে বিষয়ের সম্বন্ধ ভিন্ন, বিষয়সম্বন্ধ বিষয়গত দেশের সহিত সম্বন্ধ না হইতে পারে। বিষয় দৈশিকভাবে এক ও পূর্ণ হইলেও অদৈশিকভাবে অনেক বা অপূর্ণ হইতে পারে। এইজন্য এই সম্বন্ধদ্বয়কে দেশের স্বগত সম্বন্ধ বলা হইয়াছে।

রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া উহার দ্বারা দেশাকার রচনার সহিত দেশাকারবিষয়ের গুণভাবে প্রত্যক্ষ হয়। রূপাদি বিষয়ভাবে প্রত্যক্ষ হইলেও বিষয়ের সম্বন্ধ বা দেশের সম্বন্ধভাবে প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বলিতে হয়। এইজন্য দেশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত বলা যায় না। সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রতিভাত হইলেও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সম্বন্ধ অনেক-বৃত্তি পদার্থ, অভিঘাতমাত্রভাবে অনুভূত প্রাপ্ত পদার্থ অনেকবৃত্তি বলিয়া প্রত্যয় হয় না। অনেকের এক প্রাপ্তিপ্রত্যয় হয় না, এককালীন প্রাপ্তিপ্রত্যয় হইলেও তাহা একপ্রত্যয় বা অনেক প্রত্যয় বলিয়া অনুব্যবসায়েও নিশ্চিত হয় না।

দেশের সম্বন্ধাত্মকত্বপ্রতীতির বিস্তার প্রয়োজন। প্রত্যক্ষবিষয়ের বিষয়ান্তরের সহিত সন্নিবেশসম্বন্ধ নিয়ত। এই সন্নিবেশ বিষয়দ্বয়ব্যাপক-

একদেশভাবে প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং দেশকে বিষয় হইতে অভিন্ন ও বিষয়ের ঘটক বলা যায়। এইরূপ প্রত্যক্ষবিষয়ের শূন্যদেশব্যাপ্যত্বসম্বন্ধও নিয়ত। আধাররূপ দেশ বিষয়ের আধেয়তাঘটক হইলেও বিষয় হইতে ভিন্ন বলিয়া বিষয়ঘটক বলা যায় না। বিষয়ের নিয়ত আধেয়তাসম্বন্ধও বিষয়ের ঘটক নয় বলিতে হয়। বিষয়ের ঘটক ও অঘটক উভয় ভাবেই দেশ বিষয়ের সম্বন্ধের নিয়তঘটক বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। রূপরসাদি কোনও ভাবেই বিষয়ের নিয়তঘটক বলিয়া প্রত্যয় হয় না।

দেশাকারের স্বগত সম্বন্ধও নিয়ত বলিয়া প্রত্যয় হয়। রূপাদিবিষয়গুণে অবধি ও পরিমাণের ঘটক একপ্রকার সম্বন্ধের কল্পনা করা যায়। কিন্তু তাহা সম্বন্ধভাবে প্রতিভাত হয় না। রূপাদির ইয়ত্তা প্রত্যক্ষ হয় বটে কিন্তু দৈশিক ইয়ত্তার ন্যায় সম্বন্ধঘটিত বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। বুদ্ধিকল্পনা হয় মাত্র। বাহ্যবিষয়ের অবধি ও পরিমাণ প্রত্যক্ষযোগ্য না হইতে পারে, হইলে তাহা দৈশিকভাবে প্রতীয়মান হইবে। বাহ্যবিষয়ের অবধির প্রতিযোগী অন্য বাহ্য-বিষয় হইতে পারে, দেশমাত্রও হইতে পারে। দেশমাত্র হইলে অবধি বিষয়ের সম্বন্ধভাবে প্রত্যক্ষ হয় না, ঐ বিষয়মাত্রবৃত্তি আকারধর্মভাবে প্রত্যক্ষ হয়। দেশাকারের অবধি বহির্দেশের সহিত সম্বন্ধভাবে প্রত্যক্ষ হয়, এবং প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহার সহিত দেশাকারের নিরন্তরত্বের প্রত্যয় হয়। সন্নিবিষ্ট আকারদ্বয়ের মধ্যে অন্তর থাকিলে ঐ অন্তরও আকার বলিয়া উহাদের ও এই অন্তর-আকারের মধ্যে যে অবধি তাহা আর অন্তর নয়। আকারের অবধি তাহা হইতে নিরন্তর আকারের সহিত সম্বন্ধ বলা যায়। এই ভাবে দেশকে সম্বন্ধাত্মক অথচ এক নিরন্তর পদার্থ স্বীকার করিতে হয়।

দৈশিক পরিমাণেও একপ্রকার নিরন্তরত্বের প্রত্যক্ষ হয়। অংশী দেশের পরিমাণ অংশদেশের পরিমাণের দ্বারা ঘটিত। এক অংশদেশ যেন বর্ধিত হইয়া অংশীদেশ হয় এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়। এই বৃদ্ধি কালিক বৃদ্ধি নয়, দেশ প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা বৃদ্ধিযুক্ত বলিয়া অর্থাৎ বৃহত্তর দেশের অংশীভূত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। কালিক বৃদ্ধির ন্যায় এই বৃদ্ধিও ক্রমাত্মক। অংশপরিমাণ ও অংশিপরিমাণের ভেদ প্রত্যক্ষ হইলে পরিমাণভাবেই প্রত্যক্ষ হয়। এই পরিমাণও ক্রমবৃদ্ধিঘটিত দেশ। উহা অংশ-অংশীর মধ্যে অন্তরভাবে প্রত্যক্ষ হয়, ও তাহার ফলে অংশপরিমাণ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর নিরন্তর অংশধারাভাবে বর্ধিত হইয়া প্রকৃত অংশি-পরিমাণে পর্যবসিত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

এইরূপে প্রত্যক্ষ অংশী দেশে নিরন্তর হ্রাসক্রমে অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ক্রমে অসংখ্য অংশী-সন্ততির প্রত্যয় হয়। প্রত্যক্ষ অংশী দেশে বৃদ্ধিক্রমেও অংশীসন্ততি হইতে পারে। এই সন্ততিকে পূর্ব সন্ততির অপেক্ষায় বহিঃসন্ততি বলা যায়। দুই সন্ততির অসংখ্য অংশীর সন্ততি বলিয়া কল্পনা করা যায়, কিন্তু অন্তঃসন্ততিতে অংশী হ্রাস পাইয়া শেষ হয় বলিয়া এই সন্ততি সান্তভাবে প্রত্যক্ষ হয়। বহিঃসন্ততির শেষ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহাকে অপ্রত্যক্ষ বলিতে হয়।

অন্তঃসন্ততিই দেশের প্রত্যক্ষ পরিমাণ। অবধি ও পরিমাণ দেশগত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। সন্নিবেশ ও আধেয়তা দৈশিকবিষয়গত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধমাত্রই দেশাকারকে রূপাদি হইতে ব্যাবৃত্ত করে। দেশকে বিষয়সম্বন্ধের ঘটক ও স্বগত সম্বন্ধদ্বারা ঘটিত বলা যায়। বিষয়ের দৈশিক সম্বন্ধকে দেশঘটক সম্বন্ধ বলা যায় না কিন্তু দেশঘটক সম্বন্ধকে বিষয়ের দৈশিক সম্বন্ধের ঘটক বলা যায়। অবধি ও পরিমাণ সম্বন্ধ দেশের সাক্ষাৎ ঘটক ভাবে ও বিষয়ের সন্নিবেশ ও আধেয়তারূপ দৈশিক সম্বন্ধের পরম্পরাসূত্রে ঘটকভাবে প্রত্যক্ষ হয়। রূপাদি বিষয়ধর্ম বিষয়ের দৈশিক সম্বন্ধের ঘটক নয় ও তাহার দ্বারা ঘটিতও নয়। দেশাকারস্বরূপ বিষয়ধর্ম ঘটকও বটে, ঘটিতও বটে। রূপাদি রূপাদিমৎ বিষয়ের ন্যায় দেশঘটক অবধি ও পরিমাণের দ্বারা পরম্পরাসূত্রে ঘটিত বলা যায় কিন্তু তাহারা দেশের বা বিষয়ের ঘটক বলা যায় না।

দেশঘটিত বা দেশঘটক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। সন্নিবেশ ও আধেয়তা সম্বন্ধ দেশঘটিত বলিয়া দেশকে রূপাদিযুক্ত বিষয়ে নিয়তনিষ্ঠ বলা যায়। নিয়তনিষ্ঠ বলিয়া উহারা রূপাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়প্রাপ্তির অপেক্ষা করে না। অবধি ও পরিমাণসম্বন্ধের দ্বারা দেশ ঘটিত বলিয়া সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন একপ্রকার বিষয়ই বলিতে হয়। এই বিষয়ীভূত দেশ রূপাদি ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত পদার্থের অপেক্ষা করে না ও রূপাদিযুক্ত বিষয় এই দেশকে অপেক্ষা করে বলিয়া দেশকে রূপাদিযুক্ত বিষয়ের নিয়তব্যাপক শুদ্ধবিষয় বলিতে হয়। প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধের ঘটকভাবে দেশ প্রত্যক্ষবিষয় নয়, প্রত্যক্ষসম্বন্ধঘটিতভাবে দেশ প্রত্যক্ষবিষয়। এইজন্য দেশকে বিষয়ে নিয়তনিষ্ঠ অবিষয় ও বিষয়ের নিয়তব্যাপক বিষয় বলিতে হয়। প্রত্যক্ষ আধেয়তা-সম্বন্ধের ঘটক দেশ শূন্য দেশ। প্রত্যক্ষ সন্নিবেশ সম্বন্ধের ঘটক শূন্যদেশ হইতে পারে বলিয়া

বিষয়াধিকৃত দেশকেও শূন্যদেশভাবে সন্নিবেশঘটক বলিতে হয়। শূন্যদেশ অপ্রত্যক্ষ বিষয়, বিষয়ের প্রত্যক্ষেই তাহার উপলব্ধি হয় বলিয়া বিষয়ভাবে কল্পিত হয় মাত্র। অবধি ও পরিমাণরূপ প্রত্যক্ষসম্বন্ধের দ্বারা ঘটিত শুদ্ধ-দেশও প্রত্যক্ষ বিষয়, রূপাদিযুক্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষেই ঐ বিষয়ব্যাপক শুদ্ধ-দেশের প্রত্যক্ষ হয়।

দেশকে গ্রহণক্রিয়াত্মক বলিয়া অনুভব হয়। বিষয়প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষ শূন্যদেশ ও প্রত্যক্ষ বিষয়গতদেশের যে নিয়ত উপলব্ধি হয় তাহার সহিত এই অনুভব অবিরুদ্ধ বা সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ বা জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিষয়প্রত্যক্ষসঙ্গত অনুভবে জানা যায় যে সম্বন্ধঘটক শূন্যদেশ প্রাপ্তিনিরপেক্ষ গ্রহণরূপ জ্ঞানক্রিয়ামাত্র ও সম্বন্ধঘটিত বিষয়গতদেশ এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা ঘটিত বিষয়। দেশ বাহ্যেন্দ্রিয়ে অভিঘাতভাবে প্রাপ্ত পদার্থ নয়, বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রাপ্তিনিরপেক্ষ জ্ঞানক্রিয়া। এই ক্রিয়াঘটিত দেশ বিষয় হইলেও ক্রিয়া তাহা হইতে অভিন্ন। সুতরাং অব্যক্ত বিষয়বস্তুকে দেশের কারণ বলা যায় না, ইন্দ্রিয়রূপ আত্মাই দেশের কারণ বলিতে হয়। দেশ আত্মার ক্রিয়াও বটে, ক্রিয়াঘটিত ফলও বটে। রূপাদি বিষয়ধর্ম দেশাকারিত বলিয়া আত্মক্রিয়াকে অপেক্ষা করে বটে কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বলিয়া অব্যক্ত কারণকেও অপেক্ষা করে। সুতরাং আত্মক্রিয়া উহা হইতে ভিন্ন, উহা ঐ ক্রিয়ানিমিত্ত ফল, দেশের ন্যায় ক্রিয়াঘটিত ফল নয় বলিতে হয়। দেশ সম্বন্ধঘটিত বলিয়া আত্মক্রিয়াঘটিত বলা যায়। বিষয়ের প্রকার বা জাতিও সম্বন্ধঘটিত ও ক্রিয়াঘটিত কিন্তু দেশঘটক-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বা সাকার ও প্রকারঘটক সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ বা নিরাকার বলিয়া দেশঘটক ক্রিয়াকে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ও প্রকারঘটক ক্রিয়াকে বুদ্ধিক্রিয়া বলিতে হয়।

জ্ঞাতবিষয় বিচার করিয়া দেশকে রূপাদি হইতে ব্যাবৃত্ত করা হইয়াছে। বিষয়জ্ঞান বিচারেও এই ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হয়। দেশ যে জ্ঞানক্রিয়া হইতে ভিন্নাভিন্ন তাহা অনুভবসিদ্ধ। বিষয়ে ভেদাভেদরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না, সুতরাং ভেদাভেদ-অনুভবের অনুরূপ কোনও বিষয়গত ভেদাভেদ প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয়জ্ঞানগত ভেদাভেদে কিন্তু বিরোধ নাই। রূপাদিযুক্ত-বিষয়জ্ঞান ও তাহার গর্ভীভূত দেশরূপ শুদ্ধবিষয়জ্ঞান এই দুই জ্ঞানের ভেদাভেদ স্বীকার করিলে বিষয়জ্ঞান হইতেই রূপাদি হইতে দেশের ব্যাবৃত্তি প্রত্যয় হয়।

শূন্যদেশকে অপ্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। বিষয়প্রত্যক্ষেই উহার যে উপলব্ধি তাহা যেন প্রত্যক্ষ এইরূপ উপলব্ধি। বিষয়ব্যাপক দেশকে শূন্যদেশের অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে। দেশের অবধি ও পরিমাণরূপ স্বগত সম্বন্ধ পরম্পরাভাবে বিষয়েরও প্রত্যক্ষসম্বন্ধ বলিয়া উহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। সাক্ষাৎভাবে যে উহা বিষয়ের সম্বন্ধ নয় তাহার প্রমাণ এই সম্বন্ধ বিষয়গত-রূপাদির দ্বারা ঘটিত নয়, রূপাদির ভেদে এই সম্বন্ধের ভেদ হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে উহা যে দেশগত সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় কি না, অর্থাৎ বিষয়প্রত্যক্ষে বিষয়ব্যাপক দেশমাত্রেরও প্রত্যক্ষ হয় কি না এই প্রশ্ন উঠিতেছে। ব্যাপকতাপ্রত্যক্ষে ব্যাপ্তের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও ব্যাপ্ততা-প্রত্যক্ষে ব্যাপকতাপ্রত্যক্ষ স্বীকার করা যায় না। বিষয়-ব্যাপক দেশমাত্রের প্রত্যক্ষ বাহ্যপ্রত্যক্ষ বলা যায় না, মানসপ্রত্যক্ষ বলিতে হয়। বাহ্যপ্রত্যক্ষের মানসপ্রত্যক্ষ হইলেই বাহ্যবিষয়ের মানসপ্রত্যক্ষ হয় পূর্বে বলা হইয়াছে। এই মানসপ্রত্যক্ষই বাহ্যতাঘটক দেশমাত্রের প্রত্যক্ষ। বাহ্যপ্রত্যক্ষে দেশমাত্রের প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া যে প্রতীতি হয় তাহা শূন্যদেশের ভাক্ত প্রত্যক্ষমাত্র। এইজন্য অবধি ও পরিমাণ-সম্বন্ধকে দেশ হইতে অবিভক্ত প্রত্যক্ষ কালিক সংবন্ধ বলিতে হয়। শূন্যদেশ সম্বন্ধভাবে আভাসিতও হয় না বলিয়া উহা কালিক ভাবে প্রত্যক্ষ হয় বলা যায় না।

দেশের জ্ঞানক্রিয়াত্মকত্ব প্রতিপাদনে যেরূপ যুক্তির নির্দেশ করা হইল সেইরূপ যুক্তির দ্বারা কালেরও জ্ঞানক্রিয়াত্মকত্ব প্রতিপাদিত হয়। কালও বিষয়ের সন্নিবেশ ও আধেয়তাসম্বন্ধের ঘটক ও অবধি ও পরিমাণসম্বন্ধের দ্বারা ঘটিত। এস্থলে প্রত্যক্ষ কালসম্বন্ধেরই প্রসঙ্গ হইতেছে। কালসম্বন্ধ বাহ্যবিষয়েই দেশসম্বন্ধের সহিত পরম্পরাপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ হয়। মানস-বিষয়ের কালসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয় বটে কিন্তু তাহা বাহ্যবিষয়গত কালসম্বন্ধ হইতে পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না। বাহ্যবিষয়ে কালসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইলে তাহা মানসবিষয়ের কালসম্বন্ধ বলিয়া প্রত্যয় না হইতে পারে। কিন্তু মানসবিষয়ে কালসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা বাহ্যবিষয়ে কালসম্বন্ধের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রত্যয় হয়। কোনও স্ফুট মানসকালসম্বন্ধে অনুগত বাহ্যকালসম্বন্ধের প্রত্যয় অস্ফুট থাকিলে মানসকালসম্বন্ধের প্রত্যয় কল্পনামাত্র হইতে ব্যাবৃত্ত প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত হয় না।

বাহ্যবিষয়গত কালসম্বন্ধের সহিত তদ্গত দেশসম্বন্ধের যুগপৎ প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষে কাল দেশভাবে ও দেশ কালভাবে উপচারিত হয়। বাহ্যবিষয়গত কালাকার ও দেশাকারের আকার হিসাবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ হিসাবে কোনও প্রভেদ নির্দেশ করা যায় না। এইজন্য একই যুক্তির দ্বারা দেশ ও কালের জ্ঞানক্রিয়াত্মকত্ব প্রমাণিত হয়। প্রভেদ অনির্দেশ্য বলিয়া কেহ কেহ দেশাকার ও কালাকারসম্বলিত এক আকার কল্পনা করেন, এবং তাহাকে কেহ দেশাকারমাত্র, কেহ কালাকারমাত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই আকারের প্রভেদ অনির্দেশ্য হইলেও অনুভবসিদ্ধ, উহাদের সম্বলিত এক আকারের অনুভব নাই, শাব্দিক কল্পনা বা ঔপচারিক প্রত্যয় হয় মাত্র। বাহ্যবিষয়গত কাল দেশের দ্বারা ও দেশ কালের দ্বারা পরিমাপিত করা যায় বটে, কিন্তু এই পরিমাপণ বুদ্ধিকৃত রূপারূপ কল্পনা, ইন্দ্রিয়কৃত সরূপকল্পনা নয়, সুতরাং পরিমাপক ও পরিমাপিত আকারসম্বলিত এক আকারের জ্ঞান নাই বলিতে হয়। আকার যেরূপ বুদ্ধিসম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া প্রত্যয় হয় সেইরূপ কালাকার ও দেশাকারও পরস্পরের অনুরূপমাত্র বলা যায়, এক আকার বলা যায় না।

আকার জ্ঞানক্রিয়া অথচ শুদ্ধবিষয় বলিয়া ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ের সহিত উহার ভেদাভেদ প্রত্যয় হয়। দেশ ও কাল আভাসবিষয় এবং ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত সাকার বিষয় আভাসবস্তু বলিয়া ধর্মজ্ঞানে যে অনুভব হয় স্বীকৃত হইয়াছে তাহা এই ভেদাভেদ প্রত্যয়ের দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়।

১২। অনুভবের প্রামাণ্যবিচার

(খ) প্রকারকক্রিয়াসম্বন্ধে

বিষয়ের আকার জ্ঞানাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে বিষয়ের প্রকারও জ্ঞানক্রিয়াত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রকারের জ্ঞানাভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্য পৃথক বিচারের প্রয়োজন নাই, কারণ প্রকার আকারনিষ্ঠ হইয়াই বিষয়নিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধ হয়। কিন্তু আকারজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ সমস্যা উঠে না প্রকারজ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ সমস্যার উদয় হয় বলিয়া প্রকারজ্ঞানের বিশেষ বিচার প্রয়োজন। বিষয়ের আকার ও প্রকার উভয়ই অসংখ্য। কিন্তু সকল আকারই দেশাকার ও কালাকারের অন্তর্ভূত। এই দুই মূলাকার প্রসিদ্ধ, ইহাদের নির্ণয়ের জন্য কোনও বিচারের অবকাশ নাই।

মূল প্রকারভেদ এইরূপ প্রসিদ্ধ নয়, ইহার উপপত্তি বা প্রমাণের প্রয়োজন। এইরূপ আকার-প্রত্যয় যে গ্রাহ্যবিষয়েরই জ্ঞান এই সম্বন্ধে কোনও সংশয় উপস্থিত হয় না। কিন্তু কোন প্রকারের প্রত্যয় হইলেই তাহা জ্ঞেয়বিষয়ের প্রকার বলিয়া বিনা বিচারে স্বীকার করা যায় না। তাহা বিষয়ের প্রকার বলিয়া কল্পনাযোগ্যই না হইতে পারে, অথবা বিষয়ের প্রকার বলিয়া কল্পনীয় হইলেও জ্ঞেয় না হইতে পারে। মূল প্রকারগুলি যে জ্ঞেয়বিষয়ে প্রযুজ্য তাহাও উপপত্তি বা প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা করে। মূল প্রকারের বিভাগ ও প্রামাণ্যের জন্য বিশেষ বিচারের প্রসঙ্গ উঠিতেছে।

খ (১) মূল প্রকারের বিভাগ-উপপত্তি

এই বিষয় এইপ্রকার—এইরূপ বাক্যে অধ্যবসায়রূপ বিষয়জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়। অধ্যবসায়কে এইজন্য বাক্যানুপাতী জ্ঞান অথবা সংক্ষেপে বাক্যজ্ঞান বলা যায়। উক্ত বাক্যে এই-বিষয় উদ্দেশ্য ও এই-প্রকার বিধেয়, এবং তাহাদের সম্বন্ধের নাম বিধেয়তা। এই-বিষয়ের অর্থ এই প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষযোগ্য আকারিত বিষয়। উদ্দেশ্যজ্ঞান বাক্যানুপাতী জ্ঞানের অঙ্গ হইলেও মূলতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া বিধেয়তাজ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। প্রকাররূপ বিধেয়ের জ্ঞান কিন্তু বিধেয়তাজ্ঞানেই হয়। বাক্য-জ্ঞানের অঙ্গভাবেই প্রকারজ্ঞান বুঝা যায়। এই বিষয়ের এই প্রকার —বাক্যের এই সাধারণরূপে বিষয় ঘটপটাদিনামে বিশেষিত বা নির্দিষ্ট না হইতে পারে। কোন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট বিষয়রূপ উদ্দেশ্যের প্রতি বিধেয়পদার্থকে প্রকার বলা যায়। প্রকার বিধেয়তাসম্বন্ধঘটিত পদার্থ, বিধেয়তাসম্বন্ধনিরপেক্ষ প্রকারের কোনও অর্থ নাই। বিধেয়তাসম্বন্ধের নানা ভেদ স্বীকার করা যায়, এই ভেদ হইতেই প্রকারের মূলভেদ নির্ণীত হয়।

বিষয়বুদ্ধিগোচর পদার্থমাত্রই বিধেয়তাসম্বন্ধের অপেক্ষা করে। যে বুদ্ধিকে কাণ্ট অতিবিষয়প্রত্যভিজ্ঞা বলেন তাহা বিষয়তামাত্রের প্রতীতি। বিধেয়তাসম্বন্ধই বিষয়তা, প্রকারতা বা জ্ঞাততা। সম্বন্ধ ব্যক্তিহীন জাতিমাত্র পূর্বে বলা হইয়াছে। সম্বন্ধ নিরাকার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ, প্রত্যক্ষ দেশকালসম্বন্ধ সম্বন্ধের আভাসমাত্র। প্রত্যক্ষ দেশকালসম্বন্ধ ব্যক্তিনিষ্ঠ বলা যায়, অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ব্যক্তিনিষ্ঠ নয়। 'এই ব্যক্তির এই সম্বন্ধ' জ্ঞানে ব্যক্তিকে সম্বন্ধের অঙ্গ বলিয়া প্রতীতি হয়, আশ্রয় বলিয়া প্রতীতি হয় না। সম্বন্ধের ভেদ বা

বিভাগেই সম্বন্ধ স্থিত, বিভাগহীন সম্বন্ধ নাই। বিধেয়তাই চরম বা ঊর্ধ্বতম সম্বন্ধ, উহা অন্য কোনও সম্বন্ধের ভেদ বা বিভাগ বলা যায় না। নিম্নতম সম্বন্ধ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। সম্বন্ধব্যক্তি সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রত্যয় হয়। যে সম্বন্ধে সম্বন্ধপদার্থও নিম্নতরসম্বন্ধভাবে প্রতিভাত হয় সে সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে ঐ পদার্থের সম্বন্ধ নয়, শেষ যে সম্বন্ধ পদার্থ সম্বন্ধভাবে প্রতিভাত হয় না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষব্যক্তি, তাহারই সম্বন্ধ। সম্বন্ধব্যক্তির ভেদ অপেক্ষা করিয়া সম্বন্ধের ভেদ হয়, অপেক্ষা না করিয়াও সম্বন্ধের ভেদ হয়। দ্বিতীয় স্থলে সম্বন্ধের ভেদকে শুদ্ধ ভেদ বলা যায় ও তাহার অপেক্ষায় প্রথম স্থলে সম্বন্ধভেদকে অশুদ্ধ ভেদ বলিতে হয়। প্রকারভেদ সম্বন্ধভেদেরই ছায়া। বিধেয়তাসম্বন্ধের শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদের ছায়াই বিষয়ের শুদ্ধ অশুদ্ধ প্রকারভেদ প্রকারকে সম্বন্ধের ছায়া বলিলে সম্বন্ধ হইতে প্রকারের ভাক্ত ভেদ স্বীকার করা হয়। এই ছায়া প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ে অশুদ্ধ সম্বন্ধের ছায়া যেন প্রত্যক্ষ এইরূপ প্রতীতি হয়। শুদ্ধ সম্বন্ধের ছায়ায় এইরূপ প্রত্যক্ষাভাসও হয় না, বুদ্ধিনিশ্চয়মাত্র হয়। অশুদ্ধ ভেদ শুদ্ধ ভেদকে অপেক্ষা করে। শুদ্ধভেদের মধ্যেও মূল ভেদ ও মূলাপেক্ষ ভেদ স্বীকার করা যায়। মূলাপেক্ষ ভেদ একাধিক মূল ভেদে বিশ্লেষিত করা যায়। মূল ভেদের বিশ্লেষণ করা যায় না। বিধেয়তাসম্বন্ধ মূল সম্বন্ধ ভেদে স্বতঃঅভিব্যক্ত।

সম্বন্ধের বিষয়গত ছায়া অর্থাৎ প্রকার হইতে বুদ্ধিগত সম্বন্ধ বা সম্বন্ধনরূপ বুদ্ধিক্রিয়া নির্ণয় করিতে হয়। বিষয়ের মূল প্রকারবিভাগ অথবা বিধেয়তা-সম্বন্ধের মূল বিভাগ হইতে অতিবিষয়প্রত্যভিজ্ঞতার প্রকাশক বুদ্ধির সম্বন্ধন-ক্রিয়া বা প্রকারক ক্রিয়ার মূল বিভাগের নির্দেশ পাওয়া যায়। সম্বন্ধের স্বরূপ উহার প্রত্যভিজ্ঞেয়ত্বমাত্র বা অনন্যত্বমাত্র পূর্বে বলা হইয়াছে। এইজন্য সম্বন্ধের শুদ্ধভেদের স্বরূপ এই যে উহা অন্য যাবতীয় শুদ্ধভেদকে অপেক্ষা করে। সুতরাং সম্বন্ধের শুদ্ধভেদসমূহ পরস্পরাপেক্ষ ও সাকল্যে ঐ সম্বন্ধের সমান, এই অনুভব না হইলে সম্বন্ধবিভাগ সিদ্ধ হয় না, প্রাপ্ত সম্বন্ধভেদগুলি শুদ্ধ ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সম্বন্ধ বা জাতির অশুদ্ধ অর্থাৎ ব্যক্তিভেদাপেক্ষ ভেদ এইরূপ ভেদসমুদায় অপেক্ষা করে না। শুদ্ধভেদবিভাগে স্বতঃপ্রামাণ্যের অনুভব থাকে। বিধেয়তাসম্বন্ধের শুদ্ধভেদবিভাগে ভেদগুলি পরস্পরকে অপেক্ষা করে ও অন্য কোনও ভেদ থাকিতে পারে না এই অনুভব না থাকিলে ঐ বিভাগে বিধেয়তাসম্বন্ধ প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না।

বিধেয়তাসম্বন্ধের শুদ্ধমূলভেদ-অনুগত বাক্যের আকারভেদ স্বীকার করা যায়। 'বাক্য'শব্দে এস্থলে বিষয়জ্ঞানবাচী উদ্দেশ্য-বিধেয়-অন্বয়ে অন্বিত পদ-সংগ্রহ বুঝা যাইতেছে। লোট্ বা লিঙর্থবাক্য বিষয়জ্ঞানবাচী নয় বলিয়া আপাততঃ উপেক্ষিত হইতেছে। বিষয়জ্ঞানবাচী বাক্যের আকারবিভাগই বিধেয়তাসম্বন্ধের বিভাগ। বিধেয়তাসম্বন্ধ আর্থিকসম্বন্ধ বা জ্ঞাতবস্তুসম্বন্ধের শাব্দিক ছায়া। বাক্যে উদ্দেশ্য-অর্থের বিধেয়-অর্থের সহিত ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ, ধর্মি-ধর্মসম্বন্ধ, কারণকার্যসম্বন্ধ ও বিষয়বিষয়িসম্বন্ধ এই চারিটি আর্থিক সম্বন্ধ শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। এই চারিটির শাব্দিক ছায়ার নাম ব্যাপ্যতা, ধর্মিতা, কারণতা ও জ্ঞাততা দেওয়া যায়। এই বিষয় এই জাতির দ্বারা ব্যাপ্য, এই ধর্ম-বিশিষ্ট, এইরূপ কার্যের কারণ ও এইভাবে জ্ঞাত বিষয়—বাক্যমাত্রেরই এই চতুর্বিধ অর্থ। যে ভাবে বিষয় জানা যায় তাহা বিষয়ের ভাব বলিলে জ্ঞানপ্রকারের অনুরূপ বিষয়প্রকার স্বীকার করা হয়। বিধেয়তা-সম্বন্ধাত্মক বিষয়মাত্রই জ্ঞাত বিষয়। সুতরাং জ্ঞাততাকে বিষয়ের প্রকারভেদ বলা যায় না। কিন্তু জ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞাততার স্ফুটজ্ঞান না থাকিতে পারে, স্ফুটজ্ঞান থাকিলে তাহা অহেতুক নয়, বিষয়নিষ্ঠ কোনও ধর্ম তাহার হেতু বলিতে হয়। জ্ঞাততার স্ফুটজ্ঞানহেতু বিষয়ধর্মকে বিষয়ের প্রকারভেদ বলা যায়। অধ্যবসিত বিষয়ের সম্ভাবনা, অস্তিত্ব বা অবশ্যম্ভাবের জ্ঞানে জ্ঞাততার স্ফুটজ্ঞান হয়। সুতরাং এই তিন বিষয়ধর্মকে বিষয়ের প্রকারভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। জ্ঞাততার স্ফুটজ্ঞান না থাকিলেও স্ফুটবিষয়জ্ঞান বা অধ্যবসায় হয়। কিন্তু ব্যাপ্যতা, ধর্মিতা ও কারণতায় স্ফুটজ্ঞান বিনা স্ফুট অধ্যবসায় হয় না।

অধ্যবসায়ের অঙ্গীভূত দেশকালাকারজ্ঞানকে অস্ফুট অধ্যবসায় বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাহাতে ব্যাপ্যত্বাদি প্রকারমাত্রই অস্ফুট, বিষয়ের জ্ঞান হইলেও তাহা জ্ঞান হইতে অব্যাবৃত্ত বিষয়ের জ্ঞান বলিতে হয়। জ্ঞান হইতে বিষয় ভিন্ন এই জ্ঞান না থাকিলে স্ফুট অধ্যবসায় হয় না। জ্ঞাততাপ্রকার অস্ফুট থাকিলেও স্ফুট অধ্যবসায় হয়। কিন্তু ব্যাপ্যত্বাদি তিন প্রকারক সম্বন্ধ অস্ফুট থাকিলে জ্ঞানব্যাবৃত্ত বিষয়ের জ্ঞান হয় না, সুতরাং স্ফুট অধ্যবসায় হয় না। ব্যাপ্যত্বাদি প্রকারকসম্বন্ধত্রয়ের দ্বারাই জ্ঞান হইতে বিষয়ের ভেদের জ্ঞান হয়। বিষয়ের জ্ঞানব্যাবৃত্তিজ্ঞানই তাহার বস্তুতা জ্ঞান। এই বিষয় বিষয়ান্তরের কারণ, এই জ্ঞানেই বিষয়ের বস্তুতাজ্ঞান হয়। বাস্তববিষয়েরই

ব্যাপ্যত্ব ও ধর্মিত্বের প্রকারের প্রত্যয়কে কল্পনামাত্র হইতে ব্যাবৃত্ত জ্ঞান বলা যায়। ব্যাপ্যত্ব ও ধর্মিত্বের জ্ঞান না থাকিলে কারণতার জ্ঞান হয় না। ধর্মি-বিষয়ান্তরদ্বারা ব্যাপ্ত ধর্মিবিষয়কেই ঐ বিষয়ান্তরের কারণ বলা যায়। ব্যাপ্যত্বধর্মিত্ব-অপেক্ষ কারণতাজ্ঞানেই বস্তুতা জ্ঞান হয় ও বাস্তববিষয়েরই ব্যাপ্যত্বাদি প্রকারকসম্বন্ধত্রয়ের জ্ঞান হয়। সুতরাং স্ফুট অধ্যবসায়ে এই তিন প্রকারক-সম্বন্ধই স্ফুট বলিতে হয়।

স্ফুট জ্ঞাততারূপ প্রকারকসম্বন্ধের সম্ভাবনা, অস্তিত্ব ও অবশ্যম্ভাব– এই তিন ভেদে ব্যাপ্যত্ব, ধর্মিত্ব ও কারণতা এই তিন প্রকারকসম্বন্ধান্তরের আভাস পাওয়া যায়। বিষয়ের অবশ্যম্ভাবজ্ঞান অনুমানাত্মক। অস্তি বলিয়া জ্ঞাত-বিষয় অন্য এইরূপ জ্ঞাত বিষয় হইতে অনুমিত হইলে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্ণীত হয়। এই অনুমানঘটক ব্যাপ্তিজ্ঞানই সম্ভাবনাজ্ঞান। সুতরাং অবশ্যম্ভাবজ্ঞানে অস্তিতাজ্ঞান ও সম্ভাবনাজ্ঞানের অপেক্ষা আছে বলা যায়। অস্তিতাজ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি। অস্তিতা অনুমিত হইলেও অবশ্যম্ভাব হইতে ভিন্ন। যে অনুমানের সহিত অনুমাতব্য পদার্থের প্রত্যক্ষ বা অন্য অনুমান দ্বারা অস্তিত্বনিশ্চয় থাকে তাহার দ্বারা নিশ্চিত ঐ পদার্থের অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাব বলা যায়। যে অস্তিত্বের অনুমানের সহিত এইরূপ অন্য সংবাদী প্রমাণ উপস্থিত নাই তাহা অবশ্যম্ভাব নয়। যে অস্তিত্বের জ্ঞান অবশ্যম্ভাবের জ্ঞান নয় তাহা ধর্মিত্বেরই জ্ঞাততাজ্ঞান। যে পূর্বজ্ঞাত অস্তিপদার্থ যে অন্য জ্ঞাত অস্তিপদার্থ হইতে অনুমিত হয় তাহাদের মধ্যে কারণতাসম্বন্ধের জ্ঞাততাজ্ঞানই অবশ্যম্ভাবজ্ঞান। জ্ঞাত পদার্থদ্বয়ের একের অস্তিত্ব দ্বারা অন্যের অস্তিত্বকে নিয়ত অপেক্ষাকেই কারণতা বলা যায়। এই পদার্থ ঐ পদার্থের কারণ, ইহার অর্থ এই পদার্থ আছে বলিয়া ঐ পদার্থ আছে। কারণতাজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে। এই জাতীয় পদার্থ যদি থাকে ঐ জাতীয় পদার্থ থাকিবে, ইহাই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বাক্যাকার। তাহার অর্থ এই পদার্থের সম্ভাবনার সহিত ঐ পদার্থের সম্ভাবনা নিয়তবদ্ধ। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানই সম্ভাবনাজ্ঞান বলা হইয়াছে। এইরূপ স্ফুট জ্ঞাততাপ্রকারের ভেদত্রয়ের জ্ঞানকে জ্ঞাতবিষয়ের ব্যাপ্যত্ব, ধর্মিত্ব ও কারণতারূপ প্রকারত্রয়ের জ্ঞাততাজ্ঞান বলা যায়। স্ফুটজ্ঞাততাপ্রকারই জ্ঞাত বিষয়ের প্রকার।

বিষয়ের অবশ্যম্ভাব প্রকারের স্ফুটজ্ঞানের অর্থ বিষয়ের জ্ঞাততার অবশ্যম্ভাবজ্ঞান। অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতেছে এই জ্ঞানই জ্ঞাততার

অবশ্যম্ভাবজ্ঞান। অনুমানাত্মকত্বজ্ঞান এই অবশ্যম্ভাবজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। বিষয়ের সম্ভাবনা ও অস্তিতাপ্রকারের স্ফুটজ্ঞানও জ্ঞাততা অনুমানাত্মকত্বের জ্ঞান। কিন্তু অনুমানাত্মকত্বের জ্ঞান উহার নামান্তরমাত্র নয়। জ্ঞাততার এই প্রকারদ্বয়ের জ্ঞান অনুমান বলিয়া সাক্ষাৎ অনুভব নাই, অনুমান বিনা হইতে পারে না এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান হয় মাত্র। একজাতীয় বিষয় জ্ঞাত হইলে অন্যজাতীয় বিষয়ও জ্ঞাত হইবে, এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই 'এই বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে' ইত্যাকার সম্ভাবনাজ্ঞানের স্বরূপ। ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভূত হইলেও প্রত্যক্ষ বলা যায় না, অনুমান বলিয়াও উহার সাক্ষাৎ অনুভব নাই, অথবা অহেতুক বা প্রাতিভজ্ঞান নয় এইরূপ অনুভব আছে। ভিন্নজাতীয় ক ও খ এই দুই বিষয়ের সহচারিত্বাদি প্রত্যক্ষ হইতে ক জাতীয় কোনও নূতন বিষয় জ্ঞাত হইলে খ জাতীয় কোনও বিষয় জ্ঞাত হইবে এইরূপ যে প্রতীতি উদ্ভূত হয় তাহা জ্ঞান বলিয়া অনুভূত হয় বলিয়া হেতুনির্দেশ করা না যাইলেও কোনও হেতু গ্রহণ করিয়াই হয় বলিতে হইবে। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনির্দেশ্য হেতুক অনুমান এইভাবে সম্ভাবনাত্মকজ্ঞানকে অনুমানাত্মক বলা যায়। অস্তিতারূপ জ্ঞাততাপ্রকারজ্ঞানও অনুমানাত্মক। বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে তাহা কল্পিত বলিয়া প্রতীত হয় না বটে কিন্তু তাহা অস্তিতারূপ জ্ঞাততাপ্রকারের দ্বারা প্রকারিত বলিয়া জ্ঞান হয় না। সেরূপ জ্ঞান হইতে হইলে যাহা প্রত্যক্ষ তাহা সৎ, এই বিষয়প্রত্যক্ষ, সুতরাং সৎ—ইত্যাকার অনুমানপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এইরূপ প্রক্রিয়ায় অনুভব নাই, অথচ তাহা বিনা অস্তিতাপ্রকারের স্ফুটজ্ঞান হইতে পারে না। এস্থলে প্রত্যক্ষত্ব অস্তিতা-অনুমানের হেতু, কিন্তু হেতু বলিয়া স্ফুটভাবে গৃহীত নয় বলিয়া অস্তিতাপ্রকার জ্ঞানকে অস্ফুট অনুমিতি বলা যাইতে পারে। এইভাবে জ্ঞাততাপ্রকারমাত্রই অনুমানাত্মক বলা যায়। প্রত্যেকের মধ্যে ব্যাপ্তি, পক্ষধর্মতা ও অনুমিতি এই ভেদত্রয় স্বীকার করিতে হয়। উহার জ্ঞাততাপ্রকারের প্রকার বলা যায় না।

জ্ঞাততাপ্রকারের গর্ভীভূত ভেদত্রয়ের অনুরূপ জ্ঞাতবিষয়েরও ভেদত্রয় থাকিবে। এই ভেদে কিন্তু বিষয়ের প্রকারভেদ হয়। সম্ভাবনা, অস্তিতা ও অবশ্যম্ভাবকে ব্যাপ্ততা, ধর্মিতা ও কারণতার জ্ঞাততাপ্রকার বলা হইয়াছে। সম্ভাবনাপ্রকার, অস্তিতাপ্রকার ও অবশ্যম্ভবপ্রকারের প্রত্যেকের অন্তর্ভূত ভেদত্রয়ের অনুরূপ যথাক্রমে ব্যাপ্ততা, ধর্মিতা ও কারণতারূপ জ্ঞাতবিষয়ের প্রকারত্রয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে জ্ঞাতবিষয়ের নয় প্রকার ও তাহার

জ্ঞাততার তিন প্রকার-সাকল্যে বারটি বিধেয়তাসম্বন্ধের মূলপ্রকার নির্দেশ করা যায়।

ব্যাপ্ততা, ধর্মিতা, কারণতা ও জ্ঞাততা—ইহাদের প্রত্যেকের যে প্রকারত্রয় তাহার মধ্যে স্ফুটতম প্রকারকে অপর প্রকারদ্বয় হইতে অনুমিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই ব্যক্তি এইজাতিব্যাপ্য, ইত্যাকার বাক্যে ব্যাপ্যতার স্ফুটতম প্রকারের প্রকাশ হয়। এই ব্যক্তি এই ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া এই ধর্মনিরূপিত জাতির দ্বারা ব্যাপ্য, এইরূপ অনুমানের দ্বারা উক্ত প্রকারজ্ঞানের উপপত্তি হয়। এই ব্যক্তিতে যে ধর্ম প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা অন্য অনেক ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং এইজন্যই উহাদিগকে জাতিবিশেষের ব্যক্তি বলিয়া নিশ্চয় হইয়াছে বলিয়া এই ব্যক্তি এই জাতিব্যাপ্য ইত্যাকার জ্ঞান হয়। উক্ত অনুমানে 'এই ধর্মবিশিষ্টমাত্রই এই জাতিব্যাপ্য' এবং 'পূর্বজ্ঞাত অনেক ব্যক্তি এই জাতিব্যাপ্য' এই দুই বাক্যাকার জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। প্রথম বাক্যে উদ্দেশ্য এক জাতি ও বিধেয় তাহার সহিত সমান বা ব্যাপকতর জাতি, সুতরাং ইহা জাতির জাতিব্যাপ্যত্বের আকার। দ্বিতীয় বাক্যে উদ্দেশ্য এই ধর্মবিশিষ্ট সকল ব্যক্তি নয়, অনেক ব্যক্তি, ইহা অনেকের জাতি-ব্যাপ্যত্বের আকার। অনুমিতিবাক্য ব্যক্তিবিশেষের জাতিব্যাপ্যত্বের আকার। ব্যাপ্যত্ব বা জাতিব্যাপ্যত্ব ও একব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধের এই ভাবে সর্ব-(ব্যক্তি)-ব্যাপ্যত্ব, অনেক ব্যাপ্যত্ব, ও একব্যাপ্যত্ব এই প্রকারত্রয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ এই বিষয় এই ধর্ম-বিশিষ্ট, এই ধর্মবিশিষ্ট নয় ও এই ধর্মের অভাববিশিষ্ট ইত্যাকার বাক্যত্রয় ধর্মিত্বসম্বন্ধের প্রকারত্রয়ের আকার বলা যায়। অভাববৈশিষ্ট্যই ধর্মিত্বের স্ফুটতম প্রকার। এই ধর্মের অভাব অন্যধর্মবিশিষ্ট বিষয়েই নিশ্চয় করা যায়। সুতরাং সেই নিশ্চয়ে প্রকৃতবিষয়ে অন্য ধর্ম আছে ও এই ধর্ম নাই—এই নিশ্চয়দ্বয় অপেক্ষিত। ধর্মিত্ব সম্বন্ধের এই ভাবে ভাব-(ধর্ম)-বৈশিষ্ট্য, ভাবাবৈশিষ্ট্য ও অভাববৈশিষ্ট্য এই প্রকারত্রয় সিদ্ধ হয়।

কারণতা সম্বন্ধের উপাদানকারণতা, নিমিত্তকারণতা ও অন্যোন্যকারণতা এই প্রকারত্রয় স্বীকার করা যায়। ক ও খ এই দুই বিষয়ের মধ্যে ক খ'তে ও খ ক'তে যুগপৎ বিকার উৎপাদন করিলে তাহাদের সম্বন্ধকে অন্যোন্য কারণতা বলা যায়। ক খ-এর যে বিকারের কারণ একই কালে সেই বিকার হইতে ভিন্ন কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন খ ক-এর বিকারের কারণ হইতে

পারে। এইভাবে ক ও খ পরস্পরের কারণ স্বীকার করিলে প্রত্যেকেই স্বগত বিকারের উপাদানকারণ ও অপরগত বিকারের নিমিত্তকারণ বলিতে হয়। এইরূপ অর্থে অন্যোন্যকারণতা উপাদানকারণতা ও নিমিত্তকারণতাকে অপেক্ষা করে বলিয়া উহাকে স্ফুটতম কারণতা বলা যায়। ক ও খ এই অস্তিপদার্থদ্বয়ের অস্তিতাঘটিত সম্বন্ধের নাম কারণতা। খ ক-রূপে আছে, কিন্তু না থাকিতেও পারে—এখানে ক-এর অস্তিত্ব খ-এর অস্তিত্ব হইতে অভিন্ন—এই অর্থে ক খ-ই, এইরূপ উপাদানকারণতার বাক্যাকার বলা যায়। অস্তিত্ব হিসাবে খ ক হইতে ভিন্ন, কিন্তু ক আছে বলিয়াই খ আছে, এই অর্থে 'যদি ক থাকে খ-ও আছে' এইরূপ নিমিত্তকারণতার বাক্যাকার। 'ক খ-ই' এই বাক্যে ক-খ-ব্যাপ্য হইলেও ক-এর অস্তিত্ব খ-এর অস্তিত্ব হইতে অভিন্ন। যদি ক থাকে খ ও আছে, এই বাক্যে ক-এর অস্তিত্ব খ-এর অস্তিত্ব-দ্বারা ব্যাপ্য। ক ও খ-এর অস্তিত্ব ভিন্ন এবং উহাদের যে কোনটি না থাকিলে অপরটিও থাকে না, এইরূপ অর্থে 'হয় ক আছে না হয় খ আছে' এইরূপ বাক্য অন্যোন্যকারণতার রূপ বলা যায়।

অবশ্যম্ভাবরূপ জ্ঞাততাপ্রকারদ্বারা অপর দুই জ্ঞাততাপ্রকারের অপেক্ষা, জ্ঞাততাপ্রকারমাত্রের অনুমানাত্মকত্ব, ঐ প্রকারত্রয়ের অনুরূপ ব্যাপ্যতাধর্মিতা-কারণতারূপ জ্ঞাতবিষয়-সম্বন্ধ ও প্রতিসম্বন্ধের প্রকারত্রয় স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিপন্ন হয়। অধ্যবসায়ের দুইরূপ—বিষয়মাত্রজ্ঞান ও বিষয়ের জ্ঞাততাজ্ঞান। দ্বিতীয় জ্ঞানেই প্রথম জ্ঞানের প্রতীতি হয়। দ্বিতীয়জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ প্রকারত্রয় হইতেই প্রথম জ্ঞানের নবধাত্ব সিদ্ধ হয়। বিধেয়তাসম্বন্ধের এই দ্বাদশপ্রকার অনুমানাত্মক অবশ্যম্ভাবপ্রকারের বিস্তার বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অনুমানাত্মকত্বের অর্থ ব্যাপ্তি-পক্ষধর্মতা অনুমিতি এই অবয়বত্রয়সম্বলিতত্ব। এই অনুমানগত ত্রিত্বরূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রকারবিভাগ সিদ্ধ বলিয়া বিভাগ যে সম্যক্ অর্থাৎ এই দ্বাদশ মূল প্রকার যে পরস্পরাপেক্ষ ও তাহার অতিরিক্ত কোনও প্রকার নাই তাহা উপপন্ন হয়। বিধেয়তাসম্বন্ধের দ্বাদশপ্রকার হইতে তাহার অনুরূপ প্রকারক বুদ্ধিক্রিয়ারও দ্বাদশ সংখ্যা সিদ্ধ হয়।

খ (২) মূলপ্রকারের প্রামাণ্য উপপত্তি

বিধেয়তাসম্বন্ধের প্রত্যয়মাত্রই বিষয়জ্ঞান নয়। উদ্দেশ্যবিধেয়াত্মক বাক্য জ্ঞেয়বিষয়ের প্রকাশক না হইতে পারে। এই বিষয় অকারণ অর্থাৎ

স্বভাববশতঃ আরব্ধ বা নিয়তিবশতঃ আরম্ভক—এইরূপ বাক্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং স্বভাব ও নিয়তি বিষয়ের প্রকারভাবে কল্পিত হয়, কিন্তু ইহারা প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইলে বচনব্যাঘাতদোষ হয়। বিশ্বজগৎ নিজেরই কারণ বা কার্য—এই বাক্যে স্বকারণতা বিষয়ের প্রকার বলিয়া কল্পিত হয়, কিন্তু কাণ্টমতে বিশ্বরূপ বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত কারণতা-প্রকারের জ্ঞান হয় না, জ্ঞানেতর নিশ্চয় হয় মাত্র। দেশকালাকারপরিচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইলেই উল্লিখিত দ্বাদশপ্রকারের জ্ঞান হয়। কিন্তু দেশকালনিরপেক্ষ পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের ও তাহার প্রতি প্রযুক্ত প্রকারের কল্পনা করা যায়। এইরূপ কল্পনা বিষয়ের নিশ্চয়ই নয়, অলীক কল্পনামাত্র। সুতরাং এই তিনক্ষেত্রেই প্রকারের কল্পনা হইতে জ্ঞান হয় না বলা যায়। কেবলমাত্র উল্লিখিত দ্বাদশপ্রকার যে দেশকালাকার পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াই জ্ঞাত হয় তাহার প্রমাণের প্রয়োজন।

সপ্রকার বা প্রকারযোগ্য বিষয়েরই জ্ঞান বা জ্ঞাততা বুঝা যায়। জ্ঞাত-বিষয়বাচক বাক্যমাত্রের উদ্দেশ্য বিষয় ও বিধেয় প্রকার। বিষয়ের প্রতি, পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রতি ও দেশকালাকারপরিচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রযুজ্য না হইলে প্রকার যে জ্ঞাত হইতে পারে না তাহার প্রমাণ প্রয়োজন। কাণ্ট এই ত্রিবিধ প্রযুজ্যতা বিষয়জ্ঞানের পক্ষে ও বিষয়ের জ্ঞাততাপক্ষে স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এই দুই প্রমাণধারাকে প্রকারজ্ঞানোপপত্তি ও প্রকার-জ্ঞাততোপপত্তি (Subjective and Objective Deduction of Categories) নামে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকারজ্ঞানোপপত্তি জ্ঞানের অনুভবের উপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকৃতপক্ষে প্রমাণ নয়। জ্ঞাততা-উপপত্তি বিষয় প্রমাণ-সাপেক্ষ বলিয়া প্রমাণপদবাচ্য।

খ (২ক) প্রকার জ্ঞানোপপত্তি

আকারকল্পনা ও প্রকারকল্পনা এই দুই কল্পনার পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে। আকারকল্পনার নামান্তর গ্রহণ। স্মৃতিকেও আকারকল্পনা বা গ্রহণ বলা যায়। এই দুই কল্পনা (বিষয়) জ্ঞানক্রিয়া বা অধ্যবসায়ের অঙ্গ বলা যায়। উহারা জ্ঞানের অঙ্গ না হইতেও পারে, জ্ঞানাঙ্গ হইলে প্রত্যেককে জ্ঞান বা অধ্যবসায় বলা যায়। জ্ঞানাঙ্গপ্রকারক জ্ঞানই স্ফুট অধ্যবসায়, উহার অপেক্ষায় জ্ঞানাঙ্গআকার জ্ঞান বা গ্রহণকে অস্ফুট অধ্যবসায় বলিতে হয়। বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞানই অধ্যবসায়। সম্বন্ধজ্ঞান সম্বন্ধনরূপ বুদ্ধিক্রিয়া। প্রকারক

সম্বন্ধনই স্ফুট বুদ্ধিক্রিয়া। গ্রহণ ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইলেও জ্ঞানাজ গ্রহণ বা আকারক সম্বন্ধনকে অস্ফুট বুদ্ধিক্রিয়া বলিতে হয়। স্মৃতিকে গ্রহণ বলা যায় বটে, কিন্তু স্মৃত্যপেক্ষ সম্বন্ধনকে আকারক ও প্রকারক উভয় সম্বন্ধন হইতে ভিন্ন বুদ্ধিক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। স্মৃতআকার বা আকারিত বিষয়ের সম্বন্ধনরূপ ক্রিয়াকে আকারক জ্ঞান বলা যায় না, অথচ উহা স্ফুট প্রকারকজ্ঞান না হইতে পারে। যে বিষয়কে কোনও প্রত্যক্ষবিষয় স্মরণ করাইয়া দেয় তাহার ঐ প্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ স্মৃতিতে প্রতিভাত না হইতে পারে। হইলে সেই সম্বন্ধকে আকারক সন্নিবেশমাত্র বলিয়া জ্ঞান হয় না, এবং উহা বিধেয়তা-সম্বন্ধ হইলেও স্মৃতিমাত্রে বিধেয়তাসম্বন্ধ বলিয়া উপলব্ধ হয় না। সুতরাং স্মৃতিরূপ জ্ঞানে স্বতন্ত্রসম্বন্ধনক্রিয়ার অপেক্ষা আছে বলিতে হয়। বিধেয়তা-সম্বন্ধের জ্ঞানই স্ফুট প্রকারজ্ঞান। স্ফুট প্রকারজ্ঞানকে প্রকারপ্রত্যভিজ্ঞা বলা যায়। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও প্রকারপ্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞানত্রয়ের ঘটক সম্বন্ধন-ক্রিয়াত্রয় অনুভবসিদ্ধ।

এই ক্রিয়াত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ প্রয়োজন। প্রকারপ্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতিকে ও স্মৃতি প্রত্যক্ষকে অপেক্ষা করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ স্মৃতিকে ও স্মৃতি প্রত্যক্ষভিজ্ঞাকে অপেক্ষা করে না। "প্রকার" শব্দে কেবল মূলপ্রকার বুঝা যায় না। বাক্যে বিধেয় পদের অভিধেয় সম্বন্ধজাতিমাত্রই প্রকার। উদ্দেশ্যবিষয় বিধেয়জাতির আশ্রয় ব্যক্তিবিশেষ—এই জ্ঞানে ঐ জাতির আশ্রয় অন্য স্মৃতব্যক্তির সহিত উদ্দেশ্য বিষয়ের সাদৃশ্যাদি স্মারক সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। ঐ অন্যব্যক্তির জ্ঞান ও তাহার সহিত উদ্দেশ্যব্যক্তির সাদৃশ্যাদিজ্ঞান একই জ্ঞান। এই সাদৃশ্যাদিজ্ঞানই স্মৃতিঘটক সম্বন্ধনক্রিয়া। এই ভাবে প্রকারপ্রত্যভিজ্ঞাঘটক বা প্রকারক সম্বন্ধন ক্রিয়াতে স্মৃতিঘটক বা স্মারক সম্বন্ধনের অপেক্ষা আছে বলা যায়। স্মারকসম্বন্ধনেও প্রত্যক্ষ-ঘটক বা সন্নিবেশক সম্বন্ধনের অপেক্ষা আছে। স্মারকসম্বন্ধের সম্বন্ধী দুই প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়। প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় দেশকালাকার বা সন্নিবেশাত্মক। সন্নিবেশজ্ঞানে স্মারকসম্বন্ধনের ও স্মারকসাদৃশ্যাদিজ্ঞানে প্রকারকসম্বন্ধনের অপেক্ষা নাই। পূর্বপ্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত পরপ্রত্যক্ষবিষয়ের সন্নিবেশ-জ্ঞান হয় বটে কিন্তু এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ, স্মৃতি নয়। এইরূপ স্মারক ও স্মারিত বিষয়ের সম্বন্ধ প্রকারক সম্বন্ধ বটে কিন্তু স্মৃতিতে উহাকে প্রকারকসম্বন্ধ বলিয়া জ্ঞান হয় না। প্রকারপ্রত্যভিজ্ঞাই স্ফুট সম্বন্ধজ্ঞান।

সম্বন্ধ ব্যক্তিহীন জাতি ও উহার জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা মাত্র পূর্বে বলা হইয়াছে। স্মারকসম্বন্ধ ও সন্নিবেশকসম্বন্ধ সম্বন্ধজাতি বলিয়া অনুভূত হয় না। উহারা সম্বন্ধব্যক্তিভাবে আভাসিত হয়। প্রকারকসম্বন্ধজ্ঞানে তাহার অঙ্গীভূত বা গর্ভীভূত সন্নিবেশসাদৃশ্যাদিজ্ঞান সম্বন্ধজ্ঞান বলিয়া উপলব্ধ হয় এইজন্য সন্নিবেশ-সাদৃশ্যাদিকে সম্বন্ধ বলা যায়।

বাক্যের বিধেয়পদাভিধেয়কে ব্যাপক অর্থে প্রকার বলা যায়। এই প্রকার বিষয়প্রকার না হইলে বাক্যানুপাতী প্রত্যয়কে বিষয়জ্ঞান বলা যায় না। প্রত্যভিজ্ঞেয়ত্বই বিষয়প্রকারের লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রকারের অনুভবে তাহার প্রত্যভিজ্ঞেয়ত্ব বা অপ্রত্যভিজ্ঞেয়ত্বের অনুভব হয়। যে প্রকার অপ্রত্যভিজ্ঞেয় বলিয়া অনুভব হয় তাহা বিষয়প্রকার নয়। স্বভাবনিয়তি-আদি অপ্রত্যভিজ্ঞেয় প্রকার বলিয়া অনুভব থাকায় উহারা বিষয়প্রকার নয়। নিষ্কারণ আরব্ধত্ব বা আরম্ভকত্বের নাম স্বভাব বা নিয়তি। কারণের অভাবের কোনও অনুভব নাই, কারণ-জ্ঞানের অভাবেরই অনুভব হয়। এই জ্ঞানাভাবের অনুভবই নিষ্কারণত্ব-অনুভব। বিষয়জ্ঞানের অনুভব বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞেয়ত্বের অনুভব, ঐ জ্ঞানাভাবের অনুভব বিষয়ের অপ্রত্যভিজ্ঞেয়ত্ব-অনুভব। এই ভাবে নিষ্কারণ স্বভাবাদি-প্রকারের অনুভবকে প্রকারের অপ্রত্যভিজ্ঞেয়ত্বের অনুভব বলা যায়। সুতরাং অপ্রত্যভিজ্ঞেয় প্রকার বিষয়ের প্রতি প্রযুজ্য নয় বলিতে হয়।

প্রকার প্রত্যভিজ্ঞেয় হইলেও জ্ঞেয়বিষয় না হইতে পারে। যে প্রকারকবুদ্ধি স্মারকবুদ্ধি অপেক্ষা করে না তাহাদ্বারা বিষয়জ্ঞান হয় না। পরিচ্ছিন্ন বিষয়েরই সাদৃশ্যাদি স্মারক সম্বন্ধের প্রত্যয় হইতে পারে, অপরিচ্ছিন্ন বিষয় অর্থাৎ বিশ্বজগতের কাহারও সহিত সাদৃশ্যাদির অর্থ নাই। স্মারকবুদ্ধিও সন্নিবেশক-বুদ্ধি অপেক্ষা না করিলে বিষয়জ্ঞান হয় না। দৈশিক ও কালিক সন্নিবেশ-ভিন্ন অন্যবিধ সন্নিবেশ কল্পনা করা যায় না। বিষয়প্রত্যয়ে প্রকারকবুদ্ধি স্মারকবুদ্ধিকে ও স্মারকবুদ্ধি সন্নিবেশকবুদ্ধিকে অপেক্ষা না করিতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞেয় প্রকার অপরিচ্ছিন্ন বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে অথবা দেশকালাতীত পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে জ্ঞাত হয় না বটে, কিন্তু নিরর্থক হয় না। দেশকালাতীত পরিচ্ছিন্ন বিষয় বা অপরিচ্ছিন্ন বিষয় যে নাই তাহার জ্ঞান নাই। তবে এরূপ বিষয়ের ও তাহার প্রতি প্রযুক্ত প্রকারের জ্ঞান নাই বলা যায়।

খ (২খ) প্রকারজ্ঞাততা উপপত্তি

জ্ঞানের অনুভব হইতে এইরূপে প্রকারজ্ঞানের উপপত্তি হয়। পূর্বেই জ্ঞাতবিষয়ে প্রকার ও কালাকারের পরস্পর সাপেক্ষতা বিচার প্রসঙ্গে প্রকারজ্ঞাততার উপপত্তির আভাস দেওয়া হইয়াছে। কালাকারে ভিন্ন বিষয় প্রকারিত হয় না। অপ্রকারিত কালাকারও বিষয়ভাবে জ্ঞাত হয় না। অবশ্যম্ভাবই জ্ঞাততার স্ফুটতম প্রকার বলা হইয়াছে। কারণতার জ্ঞাততা-জ্ঞানই অবশ্যম্ভাব। কারণতা কালাকারে ভিন্ন জ্ঞাত হয় না। এইজন্য কালাকারেই অবশ্যম্ভাবরূপ প্রকারমূল জ্ঞাত হয় বলা যায়। কালাকার-কল্পনা বা মানস অঙ্কনগতির দিক্ অনন্ত বলিয়া প্রত্যয় অর্থাৎ 'এই দিক্ অন্য দিক্ নয়' এই প্রত্যয় না হইলে কালাকার জ্ঞান হয় না। এই দিক্‌প্রত্যয়ই কালাকারগত প্রকারের জ্ঞান। বিষয়ের জ্ঞাততা মানস বা অন্তরিন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎগ্রাহ্য বিষয় ও মানসবিষয়ের কালাকারে ভিন্ন সত্তাই নাই, এইজন্য কালাকারেই কারণতাজ্ঞান হয় বলিতে হয়। মানসবিষয় কালাকার মাত্র, দেশাকার নয় কিন্তু মানসবিষয়জ্ঞান দেশকালাকার বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাততাজ্ঞান পূর্বে বলা হইয়াছে। জ্ঞাত মানস বিষয় প্রকারিত কালাকার, তাহার প্রকারই জ্ঞাতবাহ্যবিষয়ের প্রকার। বিষয়ের স্ফুট বা অস্ফুট অবশ্যম্ভাবই বিষয়ের জ্ঞাততা বা প্রত্যভিজ্ঞেয়ত্ব, অবশ্যম্ভাব কারণতাসম্বন্ধের জ্ঞাততা, কারণতাসম্বন্ধে বিষয়ঘটকসম্বন্ধ মাত্রই অন্তর্ভূত, কালাকারাপেক্ষ কারণতারই ও কারণতাপেক্ষ কালাকারেরই জ্ঞাততা হয়, এবং জ্ঞাততারূপ কালাকার মানসবিষয়ের জ্ঞানই দেশকালাকার বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান। সুতরাং বিষয়মাত্রের জ্ঞাততা প্রকার ও কালাকারের পরস্পর-সাপেক্ষতার জ্ঞাততা বলা যায়।

প্রকারজ্ঞাততা যে মানসবিষয় ইহাই জ্ঞাততা-উপপত্তির মূল কথা বলা যায়। আত্মার সপ্রকার জ্ঞাততা নাই ও উহার জ্ঞাততাকে মানসবিষয় বলা যায় না। বিষয়ের জ্ঞাততা প্রকারজ্ঞাততা, উহা মানসবিষয় বলিয়াই লৌকিকপ্রমাণাপেক্ষ উপপত্তি আকাঙ্ক্ষা করে। আত্মজ্ঞাততায় অনুভব মাত্র আছে, কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞানে বিষয়জ্ঞাতা আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, এই প্রত্যভিজ্ঞার জন্য বিষয়প্রকারজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কৃতিস্বরূপ আত্মার অনুভবেই বিষয়জ্ঞাতা আত্মার প্রত্যভিজ্ঞা, উহা বিষয়প্রমাণ অপেক্ষা করে না। কিন্তু বিষয়ের স্ফুটজ্ঞান যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহা উহার জ্ঞাততারূপ

মানসবিষয়ের বিষয়প্রমাণাপেক্ষ বিশ্লেষণ বিনা সম্যক্ উপপন্ন হয় না। বিষয়-জ্ঞানের অনুভব বিষয়প্রমাণ অপেক্ষা না করিয়া যে স্বতঃবিশ্লেষিত হয় সেই প্রত্যভিজ্ঞাত্মক বিশ্লেষণই প্রকারজ্ঞানোপপত্তি। উহা অনুভবমাত্র, প্রমাণাপেক্ষ জ্ঞাততা-উপপত্তির দ্বারা দৃঢ়ীভূত না হইলে উহাকে প্রমাণ বলা যায় না।

বিষয়জ্ঞানের বিশ্লেষণ হইতে যে বুদ্ধিক্রিয়াত্রয় অনুভূত হয় তাহার ফলরূপ পদার্থত্রয় বিষয়জ্ঞাততার বিশ্লেষণ হইতে উপলব্ধ হয়। প্রত্যভিজ্ঞাপক বুদ্ধি-ক্রিয়ার ফল জ্ঞাততাসম্বন্ধ, স্মারকবুদ্ধিক্রিয়ার ফল জ্ঞাতবিষয়সম্বন্ধ ও সন্নিবেশক বুদ্ধিক্রিয়ার ফল সন্নিবেশসম্বন্ধ বলা যায়। জ্ঞাততাসম্বন্ধের স্ফুট রূপ অবশ্যম্ভাব, জ্ঞাতবিষয়সম্বন্ধের স্ফুট রূপ কারণতা ও সন্নিবেশসম্বন্ধের স্ফুট রূপ কালিকসম্বন্ধ বলা যায়। বুদ্ধিক্রিয়াত্রয়ের অনুরূপ জ্ঞাতসম্বন্ধত্রয়ের নাম অবশ্যম্ভাব সম্বন্ধ, কারণতাসম্বন্ধ ও কালিকসম্বন্ধ। বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা অবশ্যম্ভাবজ্ঞানকে, স্মৃতি কারণতাজ্ঞানকে ও প্রত্যক্ষ কালিকসম্বন্ধজ্ঞানকে অপেক্ষা করে; বিষয়ের অবশ্যম্ভাবজ্ঞান বিনা প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। কারণতাজ্ঞান বিনা স্মৃতি হয় না ও কালিকসম্বন্ধজ্ঞান বিনা প্রত্যক্ষ হয় না। বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা বিষয়ে প্রকারের প্রত্যভিজ্ঞা। প্রকারের বিষয়নিষ্ঠতার অর্থ বিষয়ের জ্ঞাততা-প্রকারেরই জ্ঞাততা। প্রকারের স্ফুট জ্ঞাততার নাম অবশ্যম্ভাব, জ্ঞাততাজ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা, সুতরাং বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞার অর্থ উহার অবশ্যম্ভাবজ্ঞান। প্রত্যক্ষ সন্নিবেশ সম্বন্ধজ্ঞান, কালিক সন্নিবেশই সম্বন্ধের ছায়া বলিয়া স্ফুটভাবে প্রতিভাত হয় ও দৈশিক সন্নিবেশের মানসপ্রত্যক্ষে উহা যে কালিক সন্নিবেশের দ্বারা ঘটিত তাহার উপলব্ধি হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষকে কালিকসম্বন্ধের জ্ঞান বলা যায়। স্মৃতি স্মারকসম্বন্ধের জ্ঞান। স্মারক ও স্মারিতবিষয়ের যে সম্বন্ধ স্মৃতিমাত্রেই উপলব্ধ হয় তাহা ঐ জ্ঞাত বিষয়দ্বয়ের কালাকারগত প্রকারের ঐক্যস্বরূপ সাদৃশ্য। স্মৃতিতে এই যে সাদৃশ্যের অনুভব তাহাতে বিষয়দ্বয়ের সাধারণ প্রকারের জ্ঞান অস্ফুটভাবে গর্ভীভূত বলা যায়। কারণতাসম্বন্ধে জ্ঞাতবিষয়ের সম্বন্ধমাত্রই অন্তর্ভূত। এইজন্য স্মারক সাদৃশ্যের অনুভবকে কারণতাজ্ঞানের অস্ফুট অনুভব বলিতে হয়। কালিকসন্নিবেশঘটিত প্রত্যক্ষ-যোগ্য বিষয়দ্বয়ের সাদৃশ্যানুভবঘটিত স্মৃতির অস্ফুট বিষয়ীভূত কারণতাসম্বন্ধের জ্ঞাততাজ্ঞান বা অবশ্যম্ভাব জ্ঞানেই বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা হয়।

প্রকারক বুদ্ধিক্রিয়ার দ্বারা সর্বত্র জ্ঞান হয় না। আত্মার স্বাধীনকারণতারূপ প্রকারের জ্ঞান নাই, জ্ঞানেতর নিশ্চয়মাত্র আছে পূর্বে বলা হইয়াছে।

বিষয়প্রকারেরই জ্ঞান হইতে পারে। বিষয়প্রকারের জ্ঞাততাও বিষয়, মানস বা কালিক বিষয়। এই বিষয়কে কালাকারাপেক্ষ প্রকার বা প্রকারিত কালাকার, উভয়ই বলা যায়। আত্মার প্রকারের কালাকার-অনপেক্ষ নিশ্চয় আছে বলিয়াই বিষয়প্রকারের জ্ঞাততার প্রকার ও কালাকারের অভেদসত্বেও ভেদের প্রত্যয় হয়। এইজন্য বলিতে হয় যে প্রকারকবুদ্ধি কালাকারগ্রহণকে অপেক্ষা না করিলে জ্ঞান হয় না, ও কালাকার প্রকারিতভাবেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ কালাকারের গ্রহণ প্রকারজ্ঞানে গর্ভীভূত বিষয়জ্ঞান বিশেষ। কালাকার গৃহীত হইলেই জ্ঞাত হয়, প্রকার বুদ্ধিক্রিয়াদ্বারা নিশ্চিত হইলেও কালাকারে প্রযুক্ত না হইলে জ্ঞাত হয় না। বিষয়জ্ঞানে প্রকার-কল্পনা কালাকারকল্পনার অপেক্ষা করে। এই আকাজ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে প্রকারজ্ঞান হয় না। কালাকার-গ্রহণই এই আকাজ্ক্ষা পূর্ণ করে। কালাকারের গ্রহণের পূর্বে তাহার যে প্রকারবুদ্ধিগত আকাজ্ক্ষা তাহাকেই পূর্বে সূত্রাকারকল্পনা বলা হইয়াছে। যে প্রকার সূত্রাকারভাবে কল্পনাযোগ্য নয় তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। (দেশ) কালে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রযুজ্য প্রকারেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ এইরূপ প্রকারই সূত্রাকারভাবে কল্পিত হইতে পারে।

১৩। সূত্রাকার ও সৌত্র অধ্যবসায় (Scheme & Principle)

সূত্রাকার কল্পনার দ্বারা প্রকারক বুদ্ধিক্রিয়া কালাকার বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে বিষয়জ্ঞান বা অধ্যবসায় হয়। সূত্রাকার প্রকারনিয়ন্ত্রিত অনাদি আকারধারা পূর্বে বলা হইয়াছে। (গৃহীতকালাকারে) এই কল্পিত আকার-ধারা অবসানের নাম কালাকারে প্রকারের প্রয়োগ। কালাকারমাত্ররূপ শুদ্ধবিষয়ে প্রকারের প্রয়োগে যে অধ্যবসায় হয় তাহাকে সৌত্র-অধ্যবসায় বলা যাইতে পারে। প্রকারভেদে সূত্রাকারভেদ হয় ও সূত্রাকারভেদে সৌত্র-অধ্যবসায়ের ভেদ হয়। ব্যাপ্যতা, ধর্মিতা, কারণতা ও জ্ঞাততারূপ চারি প্রকারক সম্বন্ধের অনুরূপ কালাকারের চারিভাব কল্পনা করা যায়। ব্যাপ্যতার অনুরূপ কালিকসন্ততি (series), ধর্মিতার অনুরূপ (ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত বিষয় ধর্মের) কালে স্থিতি (contents), কারণতার অনুরূপ (গৃহীত বিষয়ের) কালিক নিত্যসম্বন্ধ (order) ও জ্ঞাততার অনুরূপ কালরূপ শুদ্ধপদার্থের (তদ্গত বিষয়ের সহিত) সম্বন্ধ (comprehension)—কালাকারের এই চারি ভাব

নির্দেশ করা যায়। এই চারি ভাব অপেক্ষায় সূত্রাকারের ও সৌত্র অধ্যবসায়ের বিভাগ নির্ণয় করিতে হয়।

বিষয়ের জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধই জ্ঞাততা বা বিষয়তা। এই সম্বন্ধ জ্ঞাত-বিষয় হইলে সূত্রকালরূপেই প্রতিভাত হয়। শুদ্ধকাল পদার্থ কালিক বা কালাবচ্ছিন্ন বিষয়কে যে আকাঙ্ক্ষা করে সেই আকাঙ্ক্ষাই ঐ বিষয়ের সহিত কালের স্বরূপসম্বন্ধ, সুতরাং উহাকে সূত্রভূতকালই বলিতে হয়। কালের সূত্রভাবই বিষয়ের বা কালাকারের জ্ঞাততাভাব। এই সূত্রভাব-প্রত্যয়েই কাল ও কালিকবিষয়ের ভেদপ্রত্যয় হয়। বিষয়ভাবে জ্ঞাতকালে কালিক-বিষয় থাকিবেই, এই যে কালিকবিষয়-জ্ঞানের পূর্বে তাহার জ্ঞেয়ত্বজ্ঞান ইহাই সূত্রভূতকালের জ্ঞান। বিষয়জ্ঞানের পূর্বে বিষয়ের জ্ঞেয়ত্বজ্ঞানে জ্ঞেয়ত্বকে সিদ্ধ বা পরিনিষ্ঠিত বিষয় বলা যায় না, সাধ্যবিষয় (Postulate) বলিতে হয়। জ্ঞাততাকে যে মানস বা কালাকারবিষয় বলা হইয়াছে তাহা জ্ঞেয়তারূপ সাধ্যবিষয়। এই সাধ্যবিষয়ের জ্ঞান হয়। কৃতিজ্ঞানে যে আত্মার স্বাধীন-কর্তৃত্বাদির প্রত্যয় হয় তাহাও সাধ্যবিষয়, কিন্তু এই প্রত্যয় নিশ্চয় হইলেও জ্ঞান নয়। জ্ঞেয়তারূপ সাধ্যবিষয়ে সিদ্ধবিষয়ের ঘটকপ্রকার ও (দেশ) কালাকার গর্ভীভূত বলিয়া তাহারও সাধ্যবিষয়। সূত্রভূত কাল ও তাহার গর্ভীভূত প্রকার সূত্রকালাকারপ্রকারভাবে ও পূর্ণকালাকার প্রকার্যমানভাবে অর্থাৎ সৌত্র-অধ্যবসায়ভাবে ব্যক্ত হয়। সিদ্ধবিষয়ঘটক সূত্রভূত পদার্থমাত্রই সাধ্যবিষয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাপ্ত ও গৃহীত বিষয়ের সহিত একীভূত হইয়া ইহারা সিদ্ধবিষয়ে পরিণত হয়।

বিষয়ের জ্ঞাততাই সূত্রকাল। জ্ঞাতবিষয় যে কোনও কালে থাকিতে পারে (অর্থাৎ কালিকনিয়মসঙ্গত), এই কালে আছে এবং সর্বকালেই আছে, এই তিন অধ্যবসায়কে সম্ভাবনা, অস্তিতা ও অবশ্যম্ভাবরূপ তিন জ্ঞাততাপ্রকারের অনুরূপ সৌত্র-অধ্যবসায় বলা যায় ও এই অধ্যবসায়ের অঙ্গস্বরূপ সূত্রকালের ত্রিবিধ বিষয়াকাঙ্ক্ষাকে ঐ তিনপ্রকারের সূত্রাকার বলিতে হয়। জ্ঞাতবিষয় কালে থাকিবেই, সুতরাং কালিক বিষয়ের অন্য কালিক বিষয়ের সহিত নিত্যকালিক সম্বন্ধ থাকিবে, এই অধ্যবসায়ই কারণতা-রূপ প্রকারকসম্বন্ধের অনুরূপ সৌত্র-অধ্যবসায়। উপাদানকারণতা, নিমিত্ত-কারণতা ও অন্যোন্যকারণতারূপ প্রকারত্রয়ের অনুরূপ, উপাদানের সহিত তাহার বিকারের নিত্যসম্বন্ধ, বিকারান্তররূপ নিমিত্তের সহিত বিকারের

নিত্যসম্বন্ধ ও উপাদানদ্বয়ের তদ্গত বিকারঘটিত নিত্যসম্বন্ধ—এই ত্রিবিধ নিত্যকালিকসম্বন্ধ স্বীকার করা যায়। এই নিত্য-সম্বন্ধত্রয় হইতে সৌত্র-অধ্যবসায়ত্রয় ও সূত্রাকারত্রয় নির্দেশ করা যায়। কালিকবিষয়ের তদন্তবিষয় যে শুদ্ধকাল তাহার সহিত সম্বন্ধকে জ্ঞাততাসম্বন্ধের ছায়া বলা যায়। কারণতা-সম্বন্ধের ছায়া কালিকবিষয়ের অন্যকালিকবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ। দুই কালিক-সম্বন্ধই কালিকবিষয়ের অন্যের সহিত সম্বন্ধ। কাল ও ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ধর্ম এই উভয় সম্বলিত বিষয়ের নাম কালিকবিষয়। বিষয়াপেক্ষ কালের বিষয়ানপেক্ষ স্বগত সম্বন্ধকে ব্যাপ্যতাসম্বন্ধের কালিকছায়া বলা যায়। এইরূপ কালানপেক্ষ অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ধর্মের কালাপেক্ষ স্বগতসম্বন্ধকে ধর্মিতাসম্বন্ধের কালিকছায়া বলা যায়। এই দুই কালিকছায়াযুক্ত স্বগতসম্বন্ধকেও কালিকসম্বন্ধ বলা যায়।

ব্যাপ্যতা ও ধর্মিতাসম্বন্ধের ছায়ারূপ কালিকসম্বন্ধের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কালিকবিষয়ের কাল হিসাবে ও ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ধর্ম হিসাবে দুইপ্রকার পরিমাণ স্বীকার করা যায়। দেশাকার কালাকারের গর্ভীভূত বলিয়া এস্থলে কালশব্দে দেশও উপলক্ষিত হইতেছে। দেশকাল হিসাবে এক বিষয় অপর বিষয় অপেক্ষা বৃহত্তর, এই জ্ঞানে যে দেশকালঘটিত অতিশয়ের জ্ঞান হয় তাহাকে বিষয়ের ব্যাপকপরিমাণ বা বহিঃপরিমাণ (extensive quantity) বলা যায়। এই পরিমাণের অপেক্ষায় এক রূপিবিষয় অপর রূপিবিষয় অপেক্ষা উজ্জ্বলতর এই জাতীয় জ্ঞানে ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ধর্মরূপাদিদ্বারা ঘটিত যে অতিশয়ের জ্ঞান হয় তাহাকে বিষয়ের ইয়ত্তাপরিমাণ বা অন্তঃপরিমাণ (intensive quantity) বলিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই আপেক্ষিক অতিশয়কে পরিমাণ না বলিয়া পরিমাণের পরিমাপক বলা উচিত। পরিমাণ এক বিষয়গত ধর্ম, উহার প্রত্যক্ষে ঐ বিষয়-প্রত্যক্ষভিন্ন অন্য-প্রত্যক্ষের অপেক্ষা নাই, কিন্তু উহার পরিমাণে অর্থাৎ এতাবত্তার স্ফুটজ্ঞানে এইরূপ অপেক্ষা আছে। আপেক্ষিক অতিশয়জ্ঞানের দ্বারা একবিষয়গত পরিমাণের এতাবত্তা জ্ঞান হয়।

বহিঃপরিমাণের এতাবত্তা জ্ঞান ও অন্তঃপরিমাণের এতাবত্তাজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ আছে। কোনও বিষয়ের বহিঃপরিমাণপ্রত্যক্ষের সহিত তাহার অংশিদ্বের প্রত্যক্ষ থাকিলে তাহার অংশাপেক্ষ অতিশয়ের দ্বারা ঐ পরিমাণ পরিমাপিত হয়। বিষয়ধর্মের অন্তঃপরিমাণ-প্রত্যক্ষে ঐ ধর্ম

অংশী বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ঐ প্রত্যক্ষের সহিত ঐ ধর্মের অল্পতরপরিমাণযুক্ত বিষয়ান্তরের জ্ঞান থাকিলে সেই পরিমাণাপেক্ষ অতিশয়ের দ্বারা ঐ ধর্মপরিমাণ পরিমাপিত হয়। বহিঃপরিমাণের অংশাপেক্ষ অতিশয় ঐ পরিমাণ হইতে অভিন্ন কিন্তু ঐ পরিমাণের প্রত্যক্ষ ঐ অতিশয় প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন। অন্তঃপরিমাণের অল্পতর পরিমাণাপেক্ষ অতিশয় ঐ পরিমাণ হইতে ভিন্ন কিন্তু ঐ পরিমাণের প্রত্যক্ষ ঐ অতিশয়ের প্রত্যক্ষ হইতে অভিন্ন। এইজন্য বলা যায় যে বিষয়ের বহিঃপরিমাণের এতাবত্তা বিষয়ের কালব্যাপ্যতা ও বিষয়ধর্মের অন্তঃপরিমাণের এতাবত্তা বিষয়ের কালধর্মিতা। বহিঃপরিমাণের প্রত্যক্ষ তাহার এতাবত্তাপ্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন বলিয়া ঐ এতাবত্তা বিষয়ের যেন কালধর্মিতা অর্থাৎ ভাক্তধর্মিতা বলিয়া প্রতীতি হয়। এইরূপ অন্তঃপরিমাণের এতাবত্তা বিষয়ের ভাক্তব্যাপ্যতা বলিয়া প্রতীতি হয়। কালব্যাপ্যতার অর্থ বিষয়-ব্যাপি-কালের সন্ততিরূপ অতিশয়ক্রম, ও কালধর্মিতার অর্থ কালব্যাপ্ত বিষয়ধর্মের ঘনত্বরূপ অতিশয়ক্রম। কালিকসন্ততিরূপ অতিশয়ক্রমকে সংখ্যা বলা যায়, ও কালিকঘনত্বরূপ অতিশয়ক্রমকে ইয়ত্তা নাম দেওয়া যাইতে পারে। বহিঃপরিমাণ বিষয়ের ব্যাপক বা সংখ্যাত্মক পরিমাণ। অন্তঃপরিমাণ প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের পরিমাণ নয়, বিষয়ের ইয়ত্তাধর্মিত্ব। বিষয়ধর্মের ইয়ত্তা বিষয়েরই ধর্ম, বিষয় ইয়ত্তাধর্মী। পরিমাণ বিষয়ের ধর্ম নয়, বিষয়ের অংশের সহিত সম্বন্ধ। বিষয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়ধর্মের প্রত্যক্ষ হইতে অভিন্ন কিন্তু বিষয়পরিমাণের প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন। পরিমাণকে ধর্ম বলিয়া ও ধর্মকে পরিমাণ বলিয়া ঔপচারিক প্রতীতি হয় মাত্র।

বিষয়ের তথাকথিত অন্তঃপরিমাণের এতাবত্তা অর্থাৎ বিষয়ের ইয়ত্তা বিষয়ের ধর্মিত্ব। বহিঃপরিমাণের এতাবত্তা বিষয়ের ধর্মিত্ব নয়, বিষয়ের ব্যাপ্যতা। অল্পাধিককালস্থায়িত্বে ধর্মবিষয়ের ভেদ হয় না। কিন্তু কোনও বিষয়ধর্মের অল্পাধিক্যে বিষয়ের ধর্মিত্বভেদ হয়। অল্পাধিককালস্থায়িত্বের অর্থ অল্পাধিক কালসন্ততি দ্বারা বিষয়ের ব্যাপ্যতা। কালসন্ততি সমপরিমাণ কালাংশের সংখ্যাদ্বারা পরিমাপিত হয়। কোনও অংশ অপেক্ষা অংশসমষ্টির অতিশয়ও ঐ সমষ্টির অংশ। এইজন্য কালসন্ততি কালাংশবিশেষের পুনরাবৃত্তিঘটিত সমষ্টি বলা যায়। সমষ্টিঘটক পুনরাবৃত্তিই সংখ্যা। সংখ্যা কালসন্ততির কেবল পরিমাপক নয়, ঘটকও বটে। বিষয়ধর্মের অতিশয়ক্রমকেও

সন্ততিভাবে কল্পনা করা যায়। অন্তঃপরিমাণ কালসন্ততিরূপ উপাধি-দ্বারা পরিমাপিত হয় বলিয়া উহাকে ভাক্তসন্ততি বলা যায়। সংখ্যা এই ভাবে অন্তঃপরিমাণের পরিমাপক হইলেও উহার ঘটক বলা যায় না। বিষয়ের ইয়ত্তা ইয়ত্তাংশবিশেষের পুনরাবৃত্তিদ্বারা ঘটিত সমষ্টিরূপে পরিমাপনার্থ কল্পনা করা যায়। বহিঃপরিমাণে পুনরাবৃত্তি সমপরিমাণ অংশসমূহের সন্নিবেশজসমষ্টি। অন্তঃপরিমাণে পুনরাবৃত্তি এইরূপ অংশসমূহের সমষ্টিভাবে কল্পিত হইলেও সন্নিবেশজ বলিয়া কল্পিত হয় না, সংক্রমণজন্য বা অন্তঃ-প্রবেশজন্য বলিয়া কল্পিত হয়। বহিঃপরিমাণকে সন্নিবেশাত্মক বা ব্যাপক কালসন্ততি বলিলে অন্তঃপরিমাণকে সংক্রামণাত্মক কালসন্ততি বলা যায়। অন্তঃপরিমাণ বস্তুতঃ ক্রমবর্ধিষ্ণু পদার্থ অর্থে সংক্রামণাত্মক সন্ততি। কাল-সন্ততি উহার পরিমাপনার্থ উপাধি বলিয়া উহাকে কালিক পদার্থ বলা যায়। অন্তঃপরিমাণের পরিমাপক ইয়ত্তাও এই অর্থে কালিক পদার্থ। বৌদ্ধব্যাপ্যতাসম্বন্ধের সূত্রকালাকার সংখ্যা ও বৌদ্ধধর্মিতাসম্বন্ধের সূত্রকালা-কার ইয়ত্তা। বিষয়ের সংখ্যাত্মক পরিমাণ থাকিবেই ও বিষয়ের পরিমাণকল্প ইয়ত্তা থাকিবেই, এই দুই অধ্যবসায়কে ঐ সূত্রাকারদ্বয়ের অনুরূপ সৌত্র-অধ্যবসায় বলা যায়।

* * * *

১৪। অধ্যবসায়কবুদ্ধি (Understanding) ও উপপত্তিবুদ্ধি (Reason)। সৌত্র-অধ্যবসায় (Principle of Understanding) ও কাষ্ঠানিশ্চয় (Idea of Reason)।

কারণতাসম্বন্ধের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধই জ্ঞাততাসম্বন্ধ। কারণতার কালিকছায়া নিত্যকালিক সম্বন্ধ, জ্ঞানের কালিকছায়া শুক্তকাল। সুতরাং জ্ঞাততার কালিকছায়া নিত্যকালিকসম্বন্ধের সহিত কালের সম্বন্ধ বলিতে হয়। জ্ঞাততার তিন প্রকারের অনুরূপ কালের এই সম্বন্ধের তিন প্রকার আছে, অর্থাৎ কালিকসম্বন্ধ তিনভাবে নিত্য বলা যায়। কালে ক থাকিলে খ থাকিবেই ইহাই নিত্যকালিকসম্বন্ধপ্রকাশক বাক্য। ইহাতে যে ক কালে থাকিবে এরূপ সূচনা না থাকিতে পারে। ক থাকুক বা না থাকুক, যদি ক থাকে খও থাকিবে ইত্যাকার তর্কবাক্যের তাৎপর্যকে সম্বন্ধের কালিকসম্ভাবনা বা নিয়ম বলা যায়। ক কালে আছে বলিয়া জ্ঞাত সুতরাং খও আছে বলিয়া জ্ঞাত হইবে—ইহাই উহাদের কালিকসম্বন্ধের

কালিক অস্তিতা বা বর্তমানতা। ক ও খ দুইই কালে আছে বলিয়া পূর্ব হইতে জ্ঞাত থাকিলে ক আছে বলিয়া খ আছে ইহাই কালিক সম্বন্ধের কালিক অবশ্যম্ভাব বা বর্তমান নিয়ম। নিয়ম, বর্তমানতা ও বর্তমাননিয়ম—এই তিনভাবে কালিক কারণতা সম্বন্ধের নিত্যতা বুঝা যায়।

প্রত্যভিজ্ঞেয়ত্বই প্রকারকসম্বন্ধের সম্বন্ধত্ব, প্রত্যভিজ্ঞেয়ত্ব যে পদার্থের অবশ্যম্ভূত লক্ষণ তাহাই নিত্য, এইজন্য প্রকারকসম্বন্ধ বা প্রকারমাত্রেই নিত্য বলা যায়। নিয়মাদিকালিক নিত্যতা ভাবে উপলভ্য নিত্যপ্রকারই জ্ঞেয়প্রকার। অবশ্যম্ভাবকে স্ফুটতম জ্ঞেয়প্রকার বলা হইয়াছে। অবশ্যম্ভাব-জ্ঞানের স্ফুটরূপ অনুমান। অনুমানে বর্তমাননিয়মরূপ কালিকনিত্যতার জ্ঞান হয়। নিয়মমাত্রজ্ঞানে সম্বন্ধের বর্তমানতা জ্ঞান না হইতে পারে বটে কিন্তু যে নিয়মের বর্তমানতাজ্ঞান নাই তাহা অবর্তমান নিয়ম নয়, তাহার বর্তমানতার যোগ্যতা আছে বলা যায়। এই যোগ্যতাহীন নিয়মেরও কল্পনা করা যায়, তাহা কালিক নিত্যতা নয়, কালাতীত নিত্যতা। অনুমানে যে বর্তমাননিয়মরূপ কালিকনিত্যতার জ্ঞান হয় তাহার সহিত এই কালাতীত নিত্যতারও একপ্রকার নিশ্চয় থাকে। অনুমিতির বিষয় অবশ্যম্ভাবরূপ জ্ঞাততা। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞানের সমাহারে যে জ্ঞান তাহার বিষয় ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্মতারূপ জ্ঞাততা। অনুমিতিরূপ জ্ঞানে এই সমাহারজ্ঞান গর্ভীভূত। অনুমানক্রিয়ার জ্ঞানদ্বয়ের এই অন্তঃসম্বন্ধের অনুরূপ জ্ঞাততা-দ্বয়ের অন্তঃসম্বন্ধের অনুরূপ জ্ঞাততাদ্বয়ের অন্তঃসম্বন্ধের নিশ্চয় থাকে। জ্ঞাতবিষয়নিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞাততারূপ সম্বন্ধেরও জ্ঞাততা আছে বলা যায় কিন্তু জ্ঞাততাসম্বন্ধদ্বয়ের অন্তঃসম্বন্ধ জ্ঞাতবিষয়নিষ্ঠ বলা যায় না। সুতরাং উহার জ্ঞাততা স্বীকার করা যায় না। অথচ ইহা অলীক বলিয়া প্রত্যয় হয় না। জ্ঞাততাসম্বন্ধের সূত্রকালাকার কল্পনা করা যায় বলিয়া উহার জ্ঞাততা স্বীকার্য কিন্তু জ্ঞাততার অন্তঃসম্বন্ধের কোনও সূত্রকালাকার নাই বলিয়া জ্ঞাততাও নাই বলিতে হয়। উহার নিশ্চয়স্বীকার করিলে নিত্যতাস্বীকার করা হয় কিন্তু এই নিত্যতা কালিক নিত্যতা নয়, কালাতীত নিত্যতা। জ্ঞাততার নিত্যতা কালিক নিত্যতা। অনুমান ক্রিয়ায় যে জ্ঞাততার অন্তঃসম্বন্ধের প্রত্যয় হয় তাহার নিত্যতা কালাতীত, অর্থাৎ বর্তমানতাযোগ্যতাহীন নিয়মমাত্র। এই অন্তঃসম্বন্ধের নাম উপপত্তি।

অনুমানে উপপত্তিকে অনুমিতির ঘটক বলিয়া প্রত্যয় হয়। ঘটক বলিয়া উপপত্তি অনুমিতি হইতে অভিন্ন ও উহা অনুমিতির অতিরিক্ত উভয়ই বলা যায়। প্রথম ভাবে উপপত্তিকে জ্ঞাত অবশ্যম্ভাব বলিতে হয়। অবশ্যম্ভাবজ্ঞানেই সৌত্র-অধ্যবসায়ের জ্ঞান হয় এইজন্য জ্ঞাত অবশ্যম্ভাবকে সৌত্র-অধ্যবসায় বলা যায় ও অনুমিতিগত উপপত্তিকে সৌত্র-অধ্যবসায়মাত্র-বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। অনুমিতির অতিরিক্তভাবে প্রতীত উপপত্তি সৌত্র অধ্যবসায় বা কালাপেক্ষ অবশ্যম্ভাব নয়। এইরূপ উপপত্তিরই কালাতীত নিত্যতা স্বীকার করা যায়। কালিক উপপত্তিকে সৌত্র-অধ্যবসায় বা অনুমিতি বলিলে কালাতীত উপপত্তিকে সৌত্র-অনুমিতি বলিতে হয়। সৌত্র-অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিই অধ্যবসায়ক বা প্রকারক বুদ্ধি (Understanding)। সৌত্র-অনুমিত্যাত্মক বুদ্ধিকে উপপত্তিবুদ্ধি, যুক্তিবুদ্ধি বা তর্কবুদ্ধি (Reason) বলা যায়।

যে জ্ঞাততা হইতে কোন জ্ঞাততার উপপত্তি হয় সে জ্ঞাততারও অন্য জ্ঞাততা হইতে উপপত্তি হয় এইজন্য উপপন্ন জ্ঞাততার ঘটক উপপত্তিকে অনাদিপ্রবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞাততার উপপত্তি সর্বত্র প্রকট না হইলেও উপপত্তিহীন জ্ঞাততার কোনও অর্থ নাই। এইজন্য জ্ঞাততামাত্রই অনাদিউপপত্তিপ্রবাহদ্বারা ঘটিত বলা যায়। জ্ঞাততা স্থিত বা বর্তমান পদার্থ। অনাদিপ্রবাহ এই স্থিত পদার্থে অন্তঃপ্রাপ্ত বা পর্যবসিত হয় বলিয়া উহাকেও একপ্রকার স্থিত পদার্থ বলা যায়। অনাদি সান্তপ্রবাহকে স্থিতবিষয়ভাবে কল্পনা করিলে ঐ স্থিত বিষয় নিরতিশয় বা কাষ্ঠাভূত বিষয় বলিয়া প্রতীত হয়। এইজন্য উপপত্তিবুদ্ধিকে কাষ্ঠাবুদ্ধি বলা যায়। কোনও প্রকৃত জ্ঞাততা হইতে অন্য জ্ঞাততার উপপত্তি, তাহা হইতে অন্য জ্ঞাততার উপপত্তি ইত্যাকার অনবস্থাকে সাদি ও অনন্ত উপপত্তিপ্রবাহ বলিলে এইরূপ প্রবাহকে বিষয়ভাবে কল্পনাই করা যায় না। অনাদিসান্তউপপত্তিপ্রবাহরূপ নিরতিশয় বিষয়কে জ্ঞেয়বিষয় বলা যায় না বটে, কিন্তু উহাকে অলীকপদার্থও বলা যায় না। জ্ঞেয় নয় অথচ অলীক নয়, এইরূপ বিষয়ই ধ্যেয় বিষয়।

পূর্বে বুদ্ধির প্রকারক বা অধ্যবসায়ক ধর্ম ও অতিবিষয়প্রত্যভিজ্ঞারূপ ধর্ম—এই দুই ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। অধ্যবসায়ধর্ম বুদ্ধির ক্রিয়া, প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান হিসাবে ক্রিয়া না হইলেও কৃতিরূপ ক্রিয়ার গর্ভীভূতভাবে ক্রিয়া বলা যায়। এই অর্থে ক্রিয়াভূত অতিবিষয়প্রত্যভিজ্ঞাই উপপত্তিবুদ্ধি।

বিষয়জ্ঞানের আত্মভূত যে অতিবিষয়প্রত্যভিজ্ঞা ও অনুমানরূপ বিষয়জ্ঞানের ঘটক যে উপপত্তিপ্রত্যয়—দুইই বিষয়জ্ঞানের অতিরিক্ত প্রত্যয়। এই প্রত্যভিজ্ঞা কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞানের বিষয়জ্ঞানে ছায়া ইহা পূর্বে সূচিত হইয়াছে। এই ছায়ারূপ ক্রিয়াই উপপত্তিসম্বন্ধপ্রত্যায়ক ক্রিয়া। উপপত্তির কালাতীত নিত্যতা নিরতিশয় বিষয়ভাবে কল্পিত হয়, এই কল্পনা নিষ্প্রয়োজন বা নিরর্থক নয়। ধ্যানই ইহার প্রয়োজন, ধ্যানেই ইহার সার্থকতা। প্রকারক বুদ্ধিক্রিয়া জ্ঞানপ্রয়োজনে পরিচ্ছিন্ন বা সাতিশয়বিষয়ে প্রযুজ্য হইলেও অপরিচ্ছিন্ন বা নিরতিশয় বিষয়কে নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করে। জ্ঞান-পরীক্ষায় এই আকাঙ্ক্ষা বুদ্ধির স্বভাব বা নিয়তিমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। ধর্ম বেদনায় বুদ্ধির জ্ঞাপক ও অজ্ঞাপক ক্রিয়ামাত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয় বলিয়া এই আকাঙ্ক্ষারূপ অজ্ঞাপক বুদ্ধিক্রিয়ারও প্রয়োজন স্বীকার করিতে হয়। এই প্রয়োজন ধর্মতন্ত্র বা কৃত্যাত্মক প্রয়োজন। কৃতিতে যে বিষয়তা বা বিষয়ের জ্ঞাততার নিত্য আকাঙ্ক্ষা, ধর্মবেদনায় তাহাই বিষয়জ্ঞানক্রিয়ার প্রয়োজন বলিয়া নিশ্চিত হয়। সুতরাং এই জ্ঞাততার ঘটক উপপত্তিপ্রবাহরূপ নিরতিশয় বিষয়ের প্রত্যয়কে ধর্মপ্রয়োজিত ক্রিয়া বলিতে হয়। ধর্মপ্রয়োজিত বলিয়া এই ক্রিয়া নিশ্চয়াত্মক, কল্পনামাত্র নয়।

১৫। আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর এই কাষ্ঠাত্রয়ের উপপত্তি

সম্ভাবনা, অস্তিতা ও অবশ্যম্ভাব—জ্ঞাততার এই তিন প্রকার। তিন প্রকারই অনুমিত হইতে পারে। অবশ্যম্ভাবজ্ঞানই অনুমিতি, সুতরাং এই তিনপ্রকারের অনুমিতিকে সম্ভাবনা, অস্তিতা ও অবশ্যম্ভাবের অবশ্যম্ভাব বলা যায়। কারণতার জ্ঞাততাই অবশ্যম্ভাব পূর্বে বলা হইয়াছে। এই তিন প্রকার অবশ্যম্ভাব বা অনুমিতিকে তিনপ্রকার কারণতার জ্ঞাততা বলা যায়। সম্ভাবনা-অনুমিতিকে উপাদানকারণতার, অস্তিতা-অনুমিতিকে নিমিত্তকারণতার ও অবশ্যম্ভাব-অনুমিতিকে অন্যোন্যকারণতার জ্ঞাততা বলিতে হয়। এই তিন কারণতাজ্ঞাততার ঘটক তিন উপপত্তিপ্রবাহ স্বীকার করা যায়। এক এক প্রবাহ এক এক নিরতিশয় বিষয়ভাবে নিশ্চিত হয়। উপাদানকারণতাজ্ঞাততার ঘটক প্রবাহ নিরতিশয় আত্মা বলিয়া, নিমিত্তকারণতাজ্ঞাততার ঘটক প্রবাহ নিরতিশয় জগৎ বলিয়া ও অন্যোন্যকারণতা-জ্ঞাততার ঘটক প্রবাহ নিরতিশয় ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় হয়। আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বর—এই তিন নিরতিশয় বা কাষ্ঠাভূত বিষয় অজ্ঞেয় ধ্যেয় পদার্থ।

উপাদানকারণতারূপ বিধেয়তাসম্বন্ধজ্ঞানে উপাদান বিশেষ্য ও বিকার বিশেষণ বলিয়া জ্ঞান হয়। এই উপাদান এই বিকারবিশিষ্ট—ইহাই এই জ্ঞানজ জ্ঞাততা-আকার। এই উপাদানেরও উপাদান আছে, তাহারও উপাদান আছে, এইরূপ অনাদিসান্তউপাদানপ্রবাহের নিশ্চয় হয়। ইহাকে জ্ঞাততাভাবে বিশেষ্যপ্রবাহও বলা যায়। বিশেষ্য বিশেষ্যান্তরের বিধেয়, বিশেষ্যপ্রবাহে কাষ্ঠাভূত বিশেষ্যের নাম আত্মা। যে বিশেষ্য বিশেষ্যান্তরের বিশেষণ নয় অথবা যাহা স্ববিশেষ্য তাহাই আত্মা। এইরূপ এই বিকারের নিমিত্ত অন্য বিকার, তাহার নিমিত্ত অন্য বিকার ইত্যাকার অনাদিসান্ত নিমিত্ত-প্রবাহেরও নিশ্চয় হয়। জ্ঞাততাহিসাবে উপাদানকে বিশেষ্য বলিলে বিকারকে বিশেষণ বলা যায়। সুতরাং নিমিত্তপ্রবাহকে বিশেষণপ্রবাহ বলা যায়। বিশেষণীভূত বিকারের নিমিত্তবিকার ঐ বিশেষণের ব্যাপ্য বিশেষণ। নিমিত্ত-প্রবাহ বা বিকারপ্রবাহই জগৎরূপ স্থিতপদার্থভাবে কল্পিত হয়। জ্ঞাততাহিসাবে বিশেষ্যকাষ্ঠা আত্মার অপেক্ষায় ইহাকে অনাত্মভূত বিশেষণকাষ্ঠা বলিতে হয়। অন্যোন্যকারণতার জ্ঞাততা বিশেষিতবিশেষ্যতাভাবে প্রতীত হয়। দুই উপাদানের প্রত্যেকে অপরের বিকারের নিমিত্ত হইলে উহাদের অন্যোন্য-কারণতাসম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ ঐ দুই সম্বলিত এক সংস্থানের ঘটক বলা যায়। এই সংস্থানের জ্ঞাততাই বিশিষিতবিশেষ্যতা। সংস্থান বিশেষ্য ও প্রত্যেক উপাদান তাহার অঙ্গ বা বিশেষণ। সংস্থান ব্যাপকতর সংস্থানের অঙ্গ, সেই সংস্থানও ব্যাপকতর সংস্থানের অঙ্গ, ইত্যাকার সংস্থান বা বিশেষিতবিশেষ্যের অনাদিসান্তপ্রবাহের নিশ্চয় হয়। বিশেষণকাষ্ঠা জগৎ ও বিশেষ্যকাষ্ঠা আত্মা— এই দুই সম্বলিত এক বিশেষিতবিশেষ্যকাষ্ঠাই এই প্রবাহের কাষ্ঠা। জগৎ বা অনাত্মকাষ্ঠারূপ দেহবিশিষ্ট আত্মাই নিরতিশয় বস্তু বা বস্তুতাকাষ্ঠা। এই কাষ্ঠার নাম ঈশ্বর।

সম্বন্ধের অনাদিসান্ত প্রবাহকে স্থিতপদার্থভাবে কাষ্ঠা বলা যায়। কাষ্ঠা সম্বন্ধও বটে, সম্বন্ধবিষয়ও বটে, এইজন্য ইহাকে স্বসম্বন্ধ বা স্বসম্বন্ধ পদার্থ বলিতে হয়। জ্ঞেয়প্রকার বিচারে বিষয়ের ব্যাপ্যতা, ধর্মিতা, কারণতা ও জ্ঞাততা (বা বিষয়তা)-রূপ সম্বন্ধচতুষ্টয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্ঞাততা বা বিষয়তাসম্বন্ধকে পূর্ব সম্বন্ধত্রয়ের সম্বন্ধ বলা যায়। স্বসম্বন্ধ বা স্বসম্বন্ধ পদার্থও ব্যাপ্যতাদি সম্বন্ধত্রয় ভাবে কল্পিত হয়। আত্মা ও জগৎ পরস্পর হইতে অন্য বলিয়া তাহাদের জ্ঞাততা বা বিষয়তারূপ অন্যের সহিত সম্বন্ধ কল্পনা করা

যায়। কাষ্ঠাভূত ঈশ্বরের অন্যপদার্থ বা তাহার সহিত সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। আত্মা ও জগতের চারিপ্রকার সম্বন্ধ ও ঈশ্বরের তিনপ্রকার মাত্র সম্বন্ধ কল্পনীয় বলিতে হয়। কাষ্ঠা ধ্যেয় পদার্থ, জ্ঞেয় নয়, বলা হইয়াছে। ধ্যেয় পদার্থকে জ্ঞেয়ভাবে কল্পনারূপ মৌলিক ভ্রমের পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে। আত্মা ও জগৎ বিষয়ে যে মৌলিক ভ্রম তাহা প্রত্যেকের সম্পর্কে চারি প্রকার ও ঈশ্বরবিষয়ক যে মৌলিক ভ্রম তাহার তিন প্রকার, কান্ট নির্দেশ করিয়াছেন।

কাষ্ঠামাত্রকে স্বব্যাপ্য, স্বধর্মী ও স্বকারণভাবে কল্পনা করা যায়। আত্মা ও জগৎকে স্ববিষয়ী বা স্ববিষয় ভাবে কল্পনারও অর্থ আছে, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা নিরর্থক। আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা জ্ঞান বলিয়া ভ্রম হয় কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহা হয় না। অথবা বলা যায় ঈশ্বরের স্বকারণতা ও স্ববিষয়তা একার্থক। ঈশ্বররূপ কাষ্ঠা আত্মা বা জগতের ন্যায় কেবল স্থিত বা পরিনিষ্ঠিত পদার্থভাবে কল্পিত হয় না, অদ্বিতীয় পদার্থ বলিয়াও কল্পিত হয়। আত্মা ও জগৎ পরস্পরের দ্বিতীয় বটেই, উহাদের প্রত্যেকের অনেকত্ব কল্পনাও প্রতিষিদ্ধ নয়। আত্মা ব্যাপ্যতা সম্বন্ধে এক বটে কিন্তু জ্ঞাতবিষয়ের একত্ব যেরূপ অন্য জ্ঞাতবিষয় অপেক্ষায় বুঝিতে হয়, আত্মার একত্ব সেরূপ অন্য আত্মার অপেক্ষায় বুঝিতে হয় না, অথচ আত্মার প্রত্যয়ে অন্য অপেক্ষায় নিষেধপ্রত্যয়ত্ব নাই। এইরূপ জগৎ সম্বন্ধেও বলা যায় তবে আত্মায় যেরূপ দেহিভাবে অনেকত্বের প্রসক্তি আছে, জগতের অনেকত্বের সেরূপ প্রসক্তি নাই। অনেক জগৎ আছে কিনা এই প্রশ্ন স্বতই উঠে না কিন্তু অনেক জগতের কল্পনা অসম্ভব নয়। আত্মার যে অর্থে একত্ব বুঝা যায়, দেশ বা কালেরও সেই অর্থে একত্ব বুঝা যায়, অর্থাৎ তাহাদের অনেকত্বনিষেধপ্রত্যয় নাই। দেশকালরূপ মূল আকার প্রসিদ্ধ। বিষয়ের মূল প্রকারজ্ঞান যেরূপ উপপত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, দেশকালরূপ মূল আকারজ্ঞান সেরূপ উপপত্তি আকাঙ্ক্ষা করে না পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকারের উপপত্তির পর আকার উপপত্তিরও প্রসঙ্গ উঠে। দেশকাল বা দেশকালাত্মক জগৎ অনেক হইতে পারে কিনা এই প্রশ্ন স্বতঃ উত্থিত না হইলেও এই প্রসঙ্গে উত্থিত হয়।

১৬। ব্যাপ্যতাদি সম্বন্ধে আত্মা ও জগতের চারি ভাব ও ঈশ্বরের তিন ভাব।

আত্মা ব্যাপ্যতা সম্বন্ধে এক, ধর্মিতাসম্বন্ধে নিরবয়ব, কারণতাসম্বন্ধে দ্রব্য ও বিষয়তাসম্বন্ধে দেহরূপ আত্মার সহিত সম্বন্ধ অর্থাৎ দেহী—এই চারি ভাবে

জ্ঞেয় বলিয়া ভ্রম। জগৎ ব্যাপ্যতাসম্বন্ধে সসীম বা অসীম দেশকালঘটিত ধর্মিতাসম্বন্ধে অবিভাজ্য বা বিভাজ্য অংশদ্বারা ঘটিত, কারণতাসম্বন্ধে সনিমিত্ত বা নির্নিমিত্ত নিমিত্তপ্রবাহ ও জ্ঞাততাসম্বন্ধে সোপপাদক বা নিরুপপাদক উপপাদকপ্রবাহ—এই চারি দ্বন্দ্ব ভাবে জ্ঞেয় বলিয়া ভ্রম হয়। ঈশ্বর ব্যাপ্যতাসম্বন্ধে জগদাত্মা, ধর্মিতাসম্বন্ধে পূর্ণ ও কারণতাসম্বন্ধে আত্ম-পূর্ণভাবে জ্ঞেয় বলিয়া ভ্রম হয়। বিষয়জ্ঞানে কারণতার জ্ঞাততা (বা অবশ্যম্ভাব) অপেক্ষা করিয়া ধর্মিতার জ্ঞাততা (বা অস্তিতা), ও ধর্মিতার জ্ঞাততা অপেক্ষা করিয়া ব্যাপ্যতার জ্ঞাততা (বা সম্ভাবনা) বুঝিতে হয় বটে কিন্তু ধর্মিতা ব্যাপ্যতাকে ও কারণতা ধর্মিতাকে অপেক্ষা করে বলিতে হয়। ধর্মিতার অর্থ ধর্মের দ্বারা ধর্মীর ব্যাপ্যতা ও কারণতার অর্থ ধর্মীর দ্বারা ধর্মীর ব্যাপ্যতা। জ্ঞাততা বা বিষয়তার উপপত্তিপ্রবাহভাবে কাষ্ঠার প্রত্যয় হয় বলিয়া এই প্রত্যয়ে কাষ্ঠার কারণতা হইতে ধর্মিতা ও ধর্মিতা হইতে ব্যাপ্যতা বুঝিতে হয়। আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কারণতাভাব হইতে আরম্ভ না করিলে উহাদের ধর্মিতা ও ব্যাপ্যতাভাব বুঝাই যায় না। এইজন্য কাণ্ট উহাদের প্রথমভাবত্রয় বিপরীতক্রমে বুঝাইয়াছেন। জগৎ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি তাহা কেন করেন নাই তাহার কারণ নির্দেশ করা প্রয়োজন।

জগৎ জ্ঞেয় অনাত্মা না হইলেও অনাত্মভাবেই কল্পিত হয় ঈশ্বরের অর্থ জগদ্বিশেষিত বা জগৎসম্বলিত আত্মা। জগৎ ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে কাষ্ঠাকে আত্মা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ বিশেষণবর্জিত বিশেষ্য। বিশেষ্য বিশেষণহীন বলিয়াও কল্পনা করা যায়। বিশেষ্যের বিশেষণ বলিয়াই বিশেষণকে বুঝিতে হয়। বিশেষণপ্রত্যয়ে বিশেষ্য ও বিশেষণের ভিন্ন ও অভিন্ন উভয় ভাবেই প্রত্যয় হয়। অনাত্মবিষয় বিশেষ্যভাবে কল্পিত হইলে তদূর্ধ্ব বিশেষ্যের বিশেষণভাবে কল্পিত হইবেই এই ভাবে অনাত্মভূত বিশেষণপ্রবাহরূপ জগৎ আত্মভূত বিশেষ্যের বিশেষণ বলিলে আত্মা ও জগতের ভেদাভেদ কল্পনা করিতে হয়। আত্মা কৃত্যাত্মক বস্তু, তাহার সহিত ভিন্নাভিন্ন বলিয়াই অনাত্মাকে আভাসাত্মক বস্তু বলা হইয়াছে। জগতের ব্যাপ্যতাদিকে আত্মাভিন্ন ও আত্মভিন্ন এই দুইরূপে কল্পনা করিতে হয়। জগৎরূপ কাষ্ঠার প্রতি ভাবই দ্বন্দ্বাত্মক, উহার ব্যাপ্যতাদি ভাবত্রয় আত্মা-ভিন্নরূপে কারণতাধর্মিতাব্যাপ্যতাক্রমে ও আত্মভিন্নরূপে জ্ঞেয়বিষয়ের

ন্যায় বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ব্যাপ্যতাধর্মিত্বাকারণতাক্রমে নির্দেশ করা যায়।

আত্মা ও জগৎ প্রত্যেকের ব্যাপ্যতাদিসম্বন্ধে চারি ভাব ও ঈশ্বরের তিন ভাবের ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কারণতাসম্বন্ধেই আত্মার প্রথম কল্পনা হয়। এই সম্বন্ধে আত্মাকে দ্রব্য বলা হইয়াছে। দ্রব্যের এস্থলে অর্থ স্ববিশেষ্য-পদার্থ। জ্ঞাত উপাদান ও বিকারকে জ্ঞাততা হিসাবে বিশেষ্য ও বিশেষণ বলা যায়। যে উপাদানকারণ উপাদানান্তরের বিকার নয় তাহাই চরম দ্রব্য ও জ্ঞাততা হিসাবে স্ববিশেষ্য পদার্থ। যে বিশেষ্য অন্য বিশেষ্যের বিশেষণ নয় তাহাকে জ্ঞাততার্থে নিজেরই বিশেষণ বা স্ববিশেষ্য বলিয়া কল্পনা করিতে হয়। চরমদ্রব্যেরই জ্ঞাততাপ্রকার বলিয়া স্ববিশেষ্য আত্মাকে কারণতাসম্বন্ধে দ্রব্য বলা যায়। দ্রব্যেরই সাবয়বত্ব বা নিরবয়বত্ব কল্পনা করা যায়। অবয়বীদ্রব্য অবয়বের বিকার বলা যায় না, অবয়ব অবয়বী হইতে অভিন্ন হইলেও উহার উপাদান বলা যায় না, উহার ধর্মই বলিতে হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যায় অবয়ব ধর্মী, অবয়বী এই ধর্মীর ধর্মী অর্থাৎ অবয়বের ধর্মিত্ব অবয়বীর ধর্ম। অবয়বীকে অবয়ব-বিশিষ্ট বলা যায় কিন্তু বিকারকে উপাদানবিশিষ্ট বলা যায় না। অবয়বী এই বিশেষক ধর্মের ধর্মী। এই ভাবে অবয়বীভাবও নিরবয়ব দ্রব্যের ধর্ম বলা যায়। নিরবয়ব আত্মার নিরবয়বত্ব আত্মারই ধর্মিত্ব। নিরবয়ব আত্মাকে স্বব্যাপ্য অর্থে এক বলা যায়। এই একত্ব অনেকত্ব অপেক্ষা করে না পূর্বে বলা হইয়াছে। আত্মা স্ববিশেষ্য দ্রব্য হইলেও দেহরূপ অনাত্মার দ্বারাও বিশেষ্য। এই অনাত্মবিশেষ্যতাই আত্মার বিষয়তা।

জগৎ ব্যাপ্যতাদিসম্বন্ধে দ্বন্দ্বরূপে কল্পিত হয়। জগৎ অখণ্ড দেশকালের দ্বারা ব্যাপ্য। পূর্বে দেশের পরিমাণবিচারে দেশকে অসংখ্য-অংশিসন্ততি-ঘটিত নিরন্তর পদার্থ বলা হইয়াছে। সসীম দেশাকারে বা অংশীদেশে পর্যাপ্ত বা পর্যবসিতভাবে যে সন্ততি প্রত্যক্ষ হয় তাহা অংশীদেশের অন্তঃসন্ততি বলা হইয়াছে। যে অংশীদেশের সন্ততি এইরূপ পর্যবসিত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না তাহা, অর্থাৎ বহিঃসন্ততি, অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া তাহার পূর্বে বিচার করা হয় নাই। যে অখণ্ড দেশকাল জগতের ব্যাপক তাহা এই বহিঃসন্ততি। জগদ্ব্যাপক দেশকালকে অথবা ব্যাপ্য জগৎকে অসীম বা সসীম উভয় ভাবেই কল্পনা করা যায়। উভয়ভাবেই জগৎ অসংখ্য-

অংশিসন্ততি বলিয়া কল্পিত হয়। অংশীকে বিভাগক্রমে অসংখ্য অংশসন্ততি বলা যায়। অংশীদ্রব্যের অংশ বা অবয়ব উহার ধর্ম বলা হইয়াছে। জগৎরূপ অংশীদ্রব্যকে অংশসন্ততি বলিলে উহার চরম অংশ বা অবয়বকে ধর্মিতা সম্বন্ধে নিরবয়ব বা সাবয়ব উভয় ভাবেই কল্পনা করা যায়। কারণতাসম্বন্ধে নিমিত্ত-প্রবাহাত্মক জগৎ অনাদি বা নিমিত্তহীন ও সাদি বা স্বনিমিত্তাপেক্ষ ইত্যাকার দ্বন্দ্বভাবে অবশ্যকল্পনীয়। নিমিত্তপ্রবাহের অতিরিক্ত কোনও নিমিত্ত নাই, অথবা স্বতন্ত্র বা স্বনিমিত্ত নিমিত্ত আছে—এই উভয়কোটিই অপরিহার্য। এইরূপ জ্ঞাততাসম্বন্ধে উপপাদক প্রবাহাত্মক জগতের অরিরিক্ত বা গর্ভীভূত কোনও আত্মসাধক উপপাদক নাই অথবা আছে—এই কোটিদ্বয় অবশ্যকল্প্য।

নিমিত্ত হইতে কার্যের যে অনুস্যূতি বা উপপাদকের সহিত উপপাদিতের যে সম্বন্ধ তাহার নিমিত্ত বা উপপাদক আছে কিনা এই প্রশ্ন অপরিহার্য। অংশী যে বৃহত্তর অংশীর ঘটক অথবা অংশী যে অংশে বিভাজ্য তাহার উপপত্তির আকাঙ্ক্ষা নাই কিন্তু উপপত্তির সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। আকারক সম্বন্ধ যে সন্নিবেশ তাহাও আকারভাবে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া আকারক নিয়ম উপপত্তির আকাঙ্ক্ষা করে না। কারণতা বা জ্ঞাততাসম্বন্ধ প্রত্যক্ষযোগ্য নয় বলিয়া ঐ সম্বন্ধাপেক্ষ নিয়ম উপপত্তি-আকাঙ্ক্ষা বিনা কল্পনা করা যায় না। এইজন্য জগতের ব্যাপ্যতা ও ধর্মিতাসম্বন্ধে যে দ্বন্দ্বদ্বয়ের কল্পনা করা যায় তাহারা অবশ্যকল্পনীয় বলা যায় না, অর্থাৎ দ্বন্দ্বের দুইকোটিই অলীক হইতে পারে। কারণতা ও জ্ঞাততা সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব অবশ্যকল্প্য বলিয়া তাহার দুই কোটিই বাস্তব হইতে পারে। কাষ্ঠামাত্রই যেন বাস্তব বলিয়া অবশ্যকল্প্য, যেন জ্ঞেয় বিষয় বলিয়া কল্পনা হইতেও পারে, না হইতেও পারে। ব্যাপ্যতা ও ধর্মিতাভাবে জগৎ যেন জ্ঞেয় এইরূপ কল্পিত হয় না, যেন বাস্তব এইরূপ মাত্র কল্পিত হয়। যেন জ্ঞেয় বলিয়া কল্পনাই অবশ্যকল্প্য। কারণতা ও জ্ঞাততাভাবে জগতের অবশ্যকল্পনা স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যাপ্যতাদি ভাবত্রয় যেন জ্ঞেয় বলিয়া কল্পনীয়। আত্মা কোনও ভাবেই যেন জ্ঞেয়বিষয় বলিয়া কল্পনীয় নয়। আত্মার কৃত্যাত্মক জ্ঞাততা স্বীকার করা যায়। আত্মার কল্পনাত্মক জ্ঞাততার অর্থই নাই।

জগৎসম্বন্ধে কারণতাদিভাবের জ্ঞেয়তাকল্পনা হইলেও সে কল্পনা স্ফুট না হইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যাপ্যতাদি ভাবত্রয়ের জ্ঞেয়তাকল্পনা

নিত্যস্ফুট। ঈশ্বররূপ কাষ্ঠা জ্ঞেয় বা প্রমাণগম্য বলিয়াই কল্পিত হয়। ঈশ্বরপ্রমাণ ও প্রমিত ঈশ্বর একই পদার্থ। ঈশ্বরের জগদাত্মতা, পূর্ণতা ও আত্মপূর্ণতা ভাবত্রয় ঈশ্বরসাধক প্রমাণত্রয় হইতে অভিন্ন। পূর্বে জ্ঞাততা ও বস্তুতার সম্বন্ধবিচারে বলা হইয়াছে যে কাণ্টমতে জ্ঞাততা বা জ্ঞেয়বিষয়তা বস্তুতাকে অপেক্ষা করে, বস্তুতা জ্ঞাততাকে অপেক্ষা করে না। আত্মা জ্ঞেয়বিষয়ভাবে কল্পিতই হয় না। কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞানে কৃতিরূপ আত্মার বস্তুতাপ্রত্যয় হইতে যে জ্ঞাততার প্রত্যয় হয় তাহা জ্ঞেয়বিষয়তা নয়। জগৎ কারণতাভাবে বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় ও উহার বস্তুতা অপেক্ষা করিয়াই জ্ঞেয়বিষয়তা কল্পিত হয়। আত্মা ও জগৎ বাস্তব বলিয়া প্রতীত হওয়ায় জ্ঞেয় বলিয়া প্রতীত হয়, উহাদের বস্তুতাপ্রত্যয় জ্ঞেয়তাপ্রত্যয়কে অপেক্ষা করে না। একমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞেয়তাপ্রত্যয় হইতে বস্তুতা-প্রত্যয় হয়। যাহার জ্ঞেয়তাই বস্তুতার উপপাদক, যাহার অজ্ঞাতবস্তুতার অর্থই নাই তাহার নাম ঈশ্বর। জগৎ ও ঈশ্বর উভয়ই জ্ঞেয়-বিষয়-বস্তু বলিয়া কল্পিত হয়। জগৎ বস্তু বলিয়া জ্ঞেয়বিষয় ভাবে ও ঈশ্বর জ্ঞেয়বিষয় বলিয়া বস্তুভাবে কল্পিত হয়। জগৎ জ্ঞাততাসম্বন্ধে যে স্বোপপাদক বস্তু অপেক্ষা করে তাহা ঈশ্বর বটে, কিন্তু তাহার বস্তুতা নিজের জ্ঞাততা দ্বারা উপপাদিত হয় না, জগতের জ্ঞাততা দ্বারা উপপাদিত হয় বলিয়া জগদ্বি-চারমাত্রে তাহা ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হয় না।

ঈশ্বরের কারণতাসম্বন্ধের অর্থ উপপাদকতা। ঈশ্বরের জ্ঞাততা তাহার বস্তুতার উপপাদকভাবে কারণ বা প্রয়োজক বলা যায়। ঈশ্বরের কল্পনা নিরতিশয় বা চরমবস্তু ভাবে জ্ঞেয়বিষয় বলিয়া কল্পনা। চরমবস্তুভাবে জ্ঞেয়তা তাঁহার বস্তুতার উপপাদক বা কারণ বলিয়া কল্পনাই মুখ্য ঈশ্বর-প্রমাণ বলিয়া কল্পিত হয়। কোন পদার্থ জ্ঞেয় বলিয়া প্রতীত হইলেই তাহা বস্তু বলিয়া নিশ্চয় হয় না। কিন্তু চরমবস্তুভাবে জ্ঞেয় বলিয়া প্রতীত হইলেই চরমবস্তু বলিয়া নিশ্চয় হয়। এই নিশ্চয়কে জ্ঞান বা প্রমাণ বলিয়া কল্পনা অবশ্যম্ভাবী হইলেও উহা প্রমাণ নয়। কাণ্টমতে তথাকথিত ঈশ্বরপ্রমাণের অর্থ উহার প্রমাণতার অবশ্যকল্পনামাত্র। এই অর্থে ঈশ্বরের চরমবস্তুভাবে জ্ঞেয়তারূপ কারণের দ্বারা চরমবস্তুতা প্রতিপাদনকে জ্ঞেয়তাপ্রযুক্ত ঈশ্বর-প্রমাণ (Ontological Proof) বলা যায়। চরমবস্তুতাই পূর্ণতা, পূর্ণ বলিয়া জ্ঞেয়তা পূর্ণবস্তুর আত্মা বা স্বরূপ বলা যায়, এইজন্য স্বরূপের দ্বারা

উপপাদিত পূর্ণবস্তু ঈশ্বরকে আত্মপূর্ণ বলিতে হয়। জ্ঞাতবিষয়মাত্রই কার্য, কার্য অপূর্ণধর্মী, অপূর্ণধর্মীর পূরকভাবে পূর্ণধর্মীর উপপত্তি হয়, এই পূর্ণধর্মীই ঈশ্বর ইত্যাকার ঈশ্বর প্রতিপাদনকে অপূর্ণ-প্রযুক্ত প্রমাণ (Cosmological Proof) বলা যায়। এই প্রমাণে ঈশ্বরকে পূর্ণ বলিয়া নিশ্চয় হয়। বিষয়-জাতের জ্ঞানে তাহাদের অন্যোন্যকারণতা বা একসংস্থানবর্তিতার জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানে তাহাদের পরস্পরসঙ্গতি বা উপায়-উপেয়-সম্বন্ধের প্রতীতি হয়, সংস্থানেরও ব্যাপকতর সংস্থানের সহিত এইরূপ সঙ্গতির প্রতীতি হয় এবং তাহা হইতে সঙ্গতিরূপ বৈচিত্র্যময় পূর্ণসংস্থানরূপ জগতের কল্পনা হয়। পূর্ণজগৎ বিষয়ভাবে কল্পিত হওয়ায় উহার কল্পনাও অপূর্ণের কল্পনা। এই অপূর্ণের পূরককে পূর্ণজগতের দ্বারা ব্যাপ্য জগদাত্মা বলিয়া কল্পনা করা হয়। পূর্ণজগৎ-জগদাত্মার গর্ভীভূত—ইহাই এস্থলে ব্যাপ্যতার অর্থ। এইরূপ ঈশ্বর প্রতি-পাদনকে জগৎ-প্রযুক্তপ্রমাণ (Physico-theological Proof) বলা যায়। প্রথম প্রমাণে জ্ঞেয়তা, দ্বিতীয় প্রমাণে অপূর্ণ ও তৃতীয় প্রমাণে জগৎ ঈশ্বরবস্তুতার প্রয়োজক।

১৭। কাষ্ঠাত্রয়ের ধ্যেয়তা

আত্মাদি কাষ্ঠাত্রয় জ্ঞেয় পদার্থ, ধ্যেয় পদার্থ নয়, আত্মা ও জগৎ প্রত্যেকের ব্যাপ্যতাদি ভাবচতুষ্টয় ও ঈশ্বরের ব্যাপ্যতাদি ভাবত্রয়—এই একাদশ পদার্থ ধ্যেয় বস্তুর মূল প্রকারভেদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পূর্বে শ্রদ্ধাধ্যান ও আনন্দধ্যান এই দ্বিবিধ ধ্যানের উল্লেখ হইয়াছে। কাষ্ঠাত্রয়ের প্রত্যেকেই দ্বিবিধ ধ্যানের আলম্বন। শ্রদ্ধাধ্যানের মুখ্য আলম্বন আত্মা, আনন্দধ্যানের মুখ্য আলম্বন অনাত্মা বা বিষয়। আত্মার চারি ভাবের মধ্যে প্রথম তিনটির ধ্যানে জ্ঞেয় বিষয়ের কোনও কল্পনা থাকে না। আত্মার দেহিস্বরূপ চতুর্থ ভাবের ধ্যানে দেহরূপ জ্ঞেয় বিষয়ের কল্পনা থাকিলেও সে কল্পনা গৌণ। জগতের প্রথম দুই ভাব বিষয় বলিয়া কল্পিত হইলেও জ্ঞেয়বিষয় বলিয়া কল্পিত হয় না। কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞানেই বিভুপরিমাণ ও পূর্ণধর্মী জগতের কৃত্যাত্মক জ্ঞান হয় পূর্বে বলা হইয়াছে। এইজন্য এইরূপ জগতের ধ্যান আত্মার ধ্যানের অন্তর্ভূত বলা যায়, উহা মুখ্যভাবে আত্মধ্যান ও গৌণভাবে বিষয়ধ্যান বলিতে হয়। জগতের শেষ দুই ভাব জ্ঞেয়বিষয়ভাবেই কল্পিত হয়। ঈশ্বর আত্মপূর্ণ-ভাবে জ্ঞেয় বলিয়া কল্পিত হইলেও বিষয় বলিয়া কল্পিত হয় না। ঈশ্বরের

এই ভাবের ধ্যানকে আত্মালম্বনধ্যানই বলা যায়। পূর্ণ ও জগদাত্মভাবে ঈশ্বরের কল্পনায় বিষয়ের কল্পনা আছে। পূর্ণ ঈশ্বরকল্পনায় বিষয়কল্পনা গৌণ, জগদাত্ম-কল্পনায় বিষয়কল্পনা মুখ্য। এইজন্য পূর্ণকল্পনা মুখ্যতঃ আত্মালম্বনধ্যান ও জগদাত্মকল্পনা মুখ্যতঃ বিষয়ালম্বনধ্যান বলা যায়।

যাহা শ্রদ্ধাধ্যানেরই আলম্বন অথবা মুখ্যতঃ শ্রদ্ধাধ্যানের আলম্বন ধর্মাভি-মানবশতঃ তাহাকে জ্ঞেয় বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ যাহা আনন্দধ্যানেরই বা মুখ্যতঃ আনন্দধ্যানের বিষয় তাহাকে ধর্মবিলাসবশতঃ জ্ঞেয় বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমনিরাসার্থ ই কাণ্টের নিশ্চয়পরীক্ষার প্রয়োজন। এই ভ্রমনিরাস ধর্মবুদ্ধিশুদ্ধির আপাদক বলিয়া নিশ্চয়পরীক্ষাকেও ধর্মধ্যান বা শ্রদ্ধাধ্যান বলা যায়। এই শ্রদ্ধাধ্যান ধর্মাত্মক আত্মজ্ঞানেরই বিস্তার বা বিবর্ত, এইজন্য নিশ্চয়পরীক্ষাকে জ্ঞানও বলা যায়।

(৩) বেদনাপরীক্ষা

১। বিধেয়বিশেষণক ও বিধেয়বিশেষ্যক অধ্যবসায়

(Determinative & Reflective Judgment)

কাষ্ঠামাত্রধ্যানে কাষ্ঠক বস্তু বলিয়া নিশ্চয় হয়। এই নিশ্চয় 'কাষ্ঠা বাস্তব' এইরূপ উদ্দেশ্যবিধেয়াত্মক বাক্যে প্রকাশ করা যায় বটে কিন্তু এই বাক্যে বিধেয় হইতে উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। বস্তুতাপ্রত্যয়রহিত কাষ্ঠাপ্রত্যয় হয় না। সুতরাং এই বাক্য শাব্দিক ভাবে মাত্র বাক্য বলা যায়, আর্থিক ভাবে নয়। কাষ্ঠকে কোন জ্ঞেয় পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বলিয়াও নিশ্চয় হয়। সেরূপ নিশ্চয়ে গৌণভাবে কাষ্ঠার ধ্যান হয় বলা যায়। এই বিষয় এই কাষ্ঠাস্বরূপ ইত্যাকার নিশ্চয়বাক্যে উদ্দেশ্য বিধেয় হইতে ভিন্ন বলিতে হয়, কারণ সর্বত্র বিষয়জ্ঞানে কাষ্ঠাস্বরূপজ্ঞান থাকে না। কাষ্ঠার এইরূপ গৌণধ্যান উদ্দেশ্যবিধেয়াত্মক বাক্যের দ্বারাই ভাষায় প্রকাশ করা যায়। যে নিশ্চয় বাক্যদ্বারা অবশ্যপ্রকাশ্য তাহাকে ব্যাপক অর্থে অধ্যবসায় বলা যায়। এইভাবে বিষয়জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায় হইতে ভিন্ন ধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ও স্বীকার করা যায়। জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ে প্রকার বিধেয় বিশেষ্য, উদ্দেশ্যবিষয় বিশেষণ। এই বিষয় এই কাষ্ঠাস্বরূপ—এই বাক্যের অর্থ এই কাষ্ঠা এই বিষয়ে যেন প্রকার বা বিশেষণ। বস্তুতঃ ইহা প্রকার নয় বিশেষ্য বস্তু—

উদ্দেশ্যবিষয়রূপ উপাধিদ্বারা বিশেষিত বিশেষ্যবস্তু। বিধেয়বিশেষণক জ্ঞানবাচী বাক্যের অপেক্ষায় এইরূপ ধ্যানবাচী বাক্যকে বিধেয়বিশেষ্যক বাক্য বলিতে হয় (Determinative & Reflective Judgment)। মুখকে চন্দ্রভাবে কল্পনায় যেরূপ বিধেয় চন্দ্রপদার্থই মুখ্য, মুখ গৌণ, সেইরূপ জ্ঞেয় বিষয়কে কাষ্ঠাভাবে কল্পনায় বিধেয় কাষ্ঠাপদার্থই মুখ্য, বিষয় গৌণ। প্রভেদ এই যে প্রথম কল্পনায় নিশ্চয় হয় না, দ্বিতীয় কল্পনায় নিশ্চয় হয়। দ্বিতীয় কল্পনাকে বিধেয়বিশেষ্যক অধ্যবসায় বলা যায়।

২। আনন্দধ্যানানুগত অধ্যবসায়—রসাত্মক ও উপযোগিতাত্মক
(Aesthetic & Teleological Judgment)

পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের কাষ্ঠাভূত আত্মার গৌণধ্যান শ্রদ্ধাধ্যান বা আনন্দধ্যান দুই প্রকারই হইতে পারে। শ্রদ্ধাধ্যানে আত্মা আলম্বন, আত্মা যেন পরিচ্ছিন্ন বিষয়, এইরূপ নিশ্চয় হয়। আনন্দধ্যানে বিষয় আলম্বন, পরিচ্ছিন্ন বিষয় যেন আত্মা এইরূপ নিশ্চয় হয়। কাণ্ট বিধেয়বিশেষ্যক অধ্যবসায়ের বিচার প্রধানতঃ আনন্দধ্যানপ্রসঙ্গে অবতারণা করিয়াছেন। জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ের আলম্বন পরিচ্ছিন্ন বিষয়, এইরূপ উদ্দেশ্যবিষয়ের প্রতি প্রকারকক্রিয়ামূল অতিবিষয় প্রত্যভিজ্ঞারূপ আত্মার বিধেয়তা প্রত্যয়ই জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়। বিধেয় এই স্থলে বিষয়ের বিশেষণ এই প্রভেদ, নতুবা আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায় ইহার তুল্য প্রত্যয় বলা যায়। বিষয়জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ের সূত্ররূপ বিচারে বলা হইয়াছে যে জ্ঞাতবিষয়ের বহিঃপরিমাণ ও অন্তঃপরিমাণ থাকিবে। অন্য জ্ঞাত বিষয়ের সহিত নিত্য কালিক সম্বন্ধ থাকিবে এবং সেই কালিকসম্বন্ধ কালে কোনও ভাবে থাকিবে—বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞান আছে। কিন্তু জ্ঞাতবিষয়ের পরিমাণ কত হইবে, কাহার সহিত তাহার কালিক সম্বন্ধ থাকিবে ইত্যাদির নির্দেশ এই জ্ঞানে নাই, তাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ। এইরূপে জ্ঞাতবিষয়ের অখিল সমষ্টির নাম জগৎ। বিষয়মাত্রের প্রকার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞান থাকিলেও সমষ্টিভূত জগৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ কোন জ্ঞানই হয় না। জগৎ ধ্যেয় পদার্থ, জগতের জ্ঞান না হইলেও ইহার সম্বন্ধে ধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ের মূলসূত্ররূপের ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ নিশ্চয় অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ের মূলসূত্র এই যে বিষয়মাত্রে প্রকারগর্ভ প্রত্যভিজ্ঞাস্বরূপ আত্মধর্মের ছায়া আছে। ধ্যানাত্মক

অধ্যবসায়ের মূলসূত্র এই যে বিষয়সমষ্টি বা জগতে স্বপ্রকারক বিশেষ্যস্বরূপ আত্মার ছায়া আছে, অর্থাৎ জগৎ যেন আত্মার ন্যায় নিজকে প্রকারিত করিতেছে। জ্ঞানপক্ষে বিষয়পরিচ্ছেদ অজ্ঞেয়বস্তুতে জ্ঞাত আত্মার দ্বারা রচিত আভাসাত্মক প্রকার ধ্যানপক্ষে বিষয়পরিচ্ছেদ আত্মভূত জগতের স্বরচিত প্রকার, জগৎরূপ স্বকারণক আত্মার বাস্তব ব্যাপার।

জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ের স্ফুট-অস্ফুট ভেদ স্বীকার করা যায়। অস্ফুট অধ্যবসায়ে বিষয় গৃহীতভাবে স্ফুট, প্রকারিতভাবে অস্ফুট অর্থাৎ উহার প্রকার জানা নাই; প্রকারের আকাঙ্ক্ষা আছে মাত্র। স্ফুট অধ্যবসায়ে বিষয় প্রকারিত ভাবেও স্ফুট, অর্থাৎ বিষয় এই প্রকার বলিয়া নিশ্চয় আছে। আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায়েরও এইরূপ স্ফুট-অস্ফুট ভেদ নির্দেশ করা যায়। ধ্যানের আলম্বন যে বিষয়পরিচ্ছেদ বা আকার তাহা আত্মভূত জগতের স্বরচিত বা স্বাভিপ্রেত প্রকার বা ব্যাপার—এই প্রতীতি অস্ফুট বা স্ফুট হইতে পারে। অস্ফুট প্রতীতিতে এই প্রকারের আকাঙ্ক্ষা বা ইঙ্গিত মাত্র আকারে প্রকাশ হয়। এই ইঙ্গিত প্রকাশকে পরিচ্ছিন্ন বিষয়ের রসস্ফূর্তি বলা যায়। উহা জগৎরূপ আত্মার কি অভিপ্রায় বা আকূতের প্রকাশ তাহার উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোনও অনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের প্রকাশ বলিয়া বেদনাত্মক নিশ্চয় হয়। এইরূপ অস্ফুট প্রকাশ দুইভাবে অনুভূত হয়। অনির্দিষ্ট অভিপ্রায় কোথাও কল্পনীয় বলিয়া, কোথাও বা অকল্পনীয় বা কল্পনাতীত বলিয়া প্রতীতি হয়। প্রথম স্থলে বিষয়ের রসস্ফূর্তির নাম শোভা বা সৌন্দর্য, দ্বিতীয় স্থলে রসস্ফূর্তির নাম মহাভাব। বিষয়ে শোভা ও মহাভাবরূপ অস্ফুট প্রকাশের নিশ্চয়কে রসাত্মক অধ্যবসায় (aesthetic judgment) বলা যায়। দুইএরই অনুভূতি আনন্দ। শোভানুভূতি আনন্দমাত্র, মহাভাব-অনুভূতি দুঃখাশ্রিত আনন্দ। অনির্দিষ্ট জগদভিপ্রায়ের কল্পনীয়ভাবে প্রতীতি কৌতূহলবিশেষ, এই কৌতূহল শোভারূপ রসস্ফূর্তির অনুকূল আভিমানিক ক্রিয়া। এ অভিপ্রায়ের কল্পনাতীত ভাবে প্রতীতিতে কৌতূহলরূপ অভিমানের নিরোধ বোধ হয়। এই বোধ অপ্রাকৃত দুঃখবিশেষ। কিন্তু দুঃখ বিরোধীভাবেই মহাভাবরূপ রসস্ফূর্তির আনুকূল্য করে।

বিষয়ে জগদভিপ্রায়ের স্ফুটপ্রতীতির অর্থ কি অভিপ্রায় তাহার নিশ্চয় অস্ফুটপ্রতীতি "এই বিষয় সুন্দর বা মহান্" ইত্যাকার অধ্যবসায়বাক্যে প্রকাশ করিতে হয়। "এই বিষয় এই অভিপ্রায়ের উপযোগী" ইহা

স্ফুটপ্রতীতিপ্রকার অধ্যবসায়-বাক্য। এই স্ফুটপ্রতীতিকে উপযোগিতা অধ্যবসায় (teleological judgment) বলা যায়। রসাত্মক অধ্যবসায় এই অধ্যবসায়ের অস্ফুটরূপ বলা যায়, বিষয়ের আনন্দময়ত্বপ্রতীতি আত্মভূত জগতের অভিপ্রায়-উপযোগিত্বের বেদনা মাত্র। স্ফুট উপযোগিতা নিশ্চয় ও আনন্দবেদনা। কিন্তু এই বেদনায় বুদ্ধিক্রিয়া বা প্রকারকল্পনা গর্ভীভূত। আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ে জগদভিপ্রায়ই বিষয়ের ধ্যেয় প্রকার। উপযোগিতানিশ্চয়ে তাহা প্রকার বলিয়া বোধ থাকে, রসনিশ্চয়ে এরূপ বোধ থাকে না। উপযোগিতানিশ্চয় দুই প্রকার। এক প্রকারে প্রকৃতবিষয় যে জগদভিপ্রেতার্থের উপযোগী তাহা ঐ বিষয়ের অতিরিক্ত বা বাহ্য অর্থ ভাবে কল্পিত হয়, অপর প্রকারে তাহা ঐ বিষয়েরই অতিশয় বা প্রেয়োরূপ আন্তর অর্থ বা প্রয়োজন ভাবে কল্পিত হয়। আত্মভূতজগতের অভিপ্রেতার্থমাত্রই উহার আন্তর প্রয়োজন বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতবিষয়ের সম্পর্কে তাহা বাহ্য প্রয়োজনও হইতে পারে, আন্তর প্রয়োজনও হইতে পারে। প্রাণবং বিষয় যে জগদভিপ্রায়ের উপযোগী তাহা ঐ বিষয়েরই আন্তর প্রয়োজন বা প্রেয়ঃ বলিয়া কল্পিত হয়। ইহা হইতে সমগ্র জগৎই প্রাণবৎ পদার্থ বলিয়া কল্পনার অবকাশ হয়। এইভাবে কল্পিত জগৎকে পূর্বোক্ত তৃতীয় ঈশ্বর প্রমাণের প্রয়োজক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

৩। শ্রদ্ধাধ্যানানুগত অধ্যবসায় · ধর্মাধ্যবসায়
(Moral Judgment)

এই বিষয় সুন্দর বা মহান্, এই বিষয়ের এই বাহ্য বা আন্তর প্রয়োজন—ইত্যাকার নিশ্চয়কে আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায় বলা যায়। এই অধ্যবসায় জ্ঞান নয়, জ্ঞানেতর নিশ্চয়। শ্রদ্ধাধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ের বাক্যাকার "এই-ক্ষেত্রে এই কর্ম কর্তব্য বা শ্রেয়ঃ কর্ম"। পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্বাধীন কৃতির বিষয়াপেক্ষ আছে। বিধি ও আত্মার স্বাতন্ত্র্য একই কৃত্যাত্মক জ্ঞানে জ্ঞেয়, এইজন্য বিধিরও বিষয়াপেক্ষা আছে। কর্মক্ষেত্র বিষয়, ক্ষেত্রবিশেষে বিহিত কর্মবিশেষও বিষয়। বিধি এই কর্মবিশেষরূপ বিষয়কে অপেক্ষা করে। এই কর্ম কর্তব্য এই প্রত্যয়ে এই-কর্ম বিষয়, কর্তব্যতা বা বিধি ইহার শ্রেয়োরূপ প্রকার বলা যায় বলিয়া এই প্রত্যয়কে শ্রদ্ধাত্মক বা ধর্মাত্মক ধ্যানের অনুগত অধ্যবসায় বলা যায়। আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায় হইতে এই অধ্যবসায়ের

বিশেষ প্রভেদ স্বীকার করিতে হয়। দুই অধ্যবসায়ই বিধেয়বিশেষ্যক বটে, কিন্তু আনন্দধ্যানের অনুগত অধ্যবসায়ে উদ্দেশ্য এই-বিষয় ধ্যানালম্বন, শ্রদ্ধাধ্যানের অনুগত অধ্যবসায়ে উদ্দেশ্য এই-কর্ম ধ্যানালম্বন নহে। আনন্দধ্যানে বিষয়ই আলম্বন, শ্রদ্ধাধ্যানে আত্মা আলম্বন। শ্রদ্ধাধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ে বিধেয় শ্রেয়ঃ বা বিধি স্বতন্ত্র আত্মা হইতে অভিন্ন। সুতরাং বিধেয় বিশেষ্যই ধ্যানালম্বন। আত্মা বা বিধির ধ্যানে উহার বিষয়াকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় হয়। বিধিপালনেই বিহিত কর্মবিশেষরূপ বিষয়ের অনুসন্ধানাত্মক ধ্যান প্রবর্তিত হয়। ধর্মপ্রবর্তনায় আমার এই ক্ষেত্রে কি ধর্ম এইরূপ যে জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত হয় তাহাই এই ধ্যানাত্মক বিষয়াকাঙ্ক্ষা। ধর্মধ্যানে যে আমার এই কর্মই ধর্ম বলিয়া প্রজ্ঞা হয় তাহা এই আকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসায় তৃপ্তি বলিয়া নিশ্চয়। এই কর্ম শ্রেয়ঃ বা ধর্ম—এই নিশ্চয় এই কর্মরূপ পরিচ্ছিন্নবিষয় জিজ্ঞাসারূপ আত্মাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছে বলিয়া নিশ্চয়। আনন্দাত্মক অধ্যবসায়ে বিধেয় বিশেষ্য যে আত্মভূত-জগদভিপ্রায় তাহা পরিচ্ছিন্ন বিষয়কে আকাঙ্ক্ষা করে এরূপ বলা যায় না। অপরিচ্ছিন্ন বিষয়ও অভিপ্রেত হইতে পারে, এমন কি অভিপ্রেত পদার্থ বিষয়ই না হইতে পারে। সুতরাং এই অধ্যবসায়ে উদ্দেশ্যবিষয় বিধেয় আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছে—এরূপ নিশ্চয় হয় না। আত্মার অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে আত্মার স্ফুরণ অর্থাৎ আত্মার অহেতুক স্ফূর্তিই আনন্দস্ফূর্তি।

শ্রদ্ধাধ্যানাত্মক অধ্যবসায় আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ের ন্যায় জ্ঞানেতর নিশ্চয় নয়। উহাকে জ্ঞানই বলিতে হয়, তবে এই জ্ঞান বিষয়জ্ঞান নয়, ইহা কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞানেরই বিস্তার। অধ্যবসায়মাত্রের রূপ 'এই বিষয় প্রকার'। সর্বত্রই উদ্দেশ্যবিষয় গৃহীত বা ইন্দ্রিয়প্রাপ্তব্য বিষয় ও বিধেয় প্রকার গ্রহণ-নিরপেক্ষ আত্মক্রিয়াঘটিত আত্মাভাস। আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ে বিষয়ে আত্মাভাস অহেতুক। জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ে উহা সহেতুক, আত্মক্রিয়ার যে বিষয়াকাঙ্ক্ষা তাহা গৃহীত বিষয়ের দ্বারা পূর্ণ হইলেই জ্ঞান হয় বলিয়া এই আকাঙ্ক্ষাকেই এস্থলে হেতু বলা যায়। এস্থলে বিষয়াকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষিত বিষয় একার্থ। বিষয়জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ে এই আকাঙ্ক্ষার নাম সূত্রকাল। আত্মজ্ঞানভূত শ্রদ্ধাধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ে এই আকাঙ্ক্ষার নাম সূত্রজগৎ দেওয়া যাইতে পারে। ধর্মপ্রবর্তনায় এই জগতে কোন্ কর্ম আমার ধর্ম এইরূপ যে অবশ্যজিজ্ঞাসা হয় তাহা জগৎরূপ ধর্মক্ষেত্রেরই সৌষ্ঠবাকাঙ্ক্ষা

বলা যায়। ক্ষেত্রোচিত কর্মই ক্ষেত্রের অর্থাৎ আত্মভূত জগতের সৌষ্ঠব বা কল্যাণ এই নিশ্চয়কল্পনা অপেক্ষা করিয়া এই কল্যাণমূর্তি স্বষ্টু জগতের আকাঙ্ক্ষাকে স্বত্রজগৎ বলা যায়। উভয় অধ্যবসায়েই আত্মার বিষয়াকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতেছে—এই বিধাননিশ্চয়ই আছে, স্বতরাং উভয়কেই জ্ঞান বলিতে হয়। কিন্তু প্রভেদ এই যে প্রথম অধ্যবসায়ে আকাঙ্ক্ষিত স্বত্রকাল প্রকারক্রিয়াত্মক আত্মা হইতে অভিন্ন, দ্বিতীয় অধ্যবসায়ে আকাঙ্ক্ষিত স্বত্রজগৎ বিধিপালক স্বতন্ত্র আত্মা হইতে ভিন্ন। কাণ্টমতে কাল আত্মার গ্রহণক্রিয়া, আত্মারই রূপবিশেষ, আত্মভিন্নবিষয় বলিয়া উহার জ্ঞান হয় মাত্র। কিন্তু কাষ্ঠাভূত জগৎকে কাষ্ঠাভূত আত্মার ক্রিয়া বা রূপবিশেষ বলা যায় না, আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়াই উহার প্রত্যয় হয়। স্বতরাং স্বত্রজগৎকে আত্মার জ্ঞেয় স্বত্রাকার বলা যায় না, আত্মার ধ্যেয় প্রতীক বলিতে হয়। কল্যাণময় জগৎকে ধর্ম বা স্বতন্ত্র আত্মার প্রতীকভাবে ধ্যান করিয়া জগদ্বর্তী কর্মবিশেষরূপ বিষয়ে যে আত্মাভাসের জ্ঞান হয় তাহাই শ্রদ্ধাধ্যানাত্মক অধ্যবসায়।

(৪) নিশ্চয়সংগ্রহ

এ যাবৎ গৃহীত বিষয়ের বুদ্ধিগোচর প্রকারনিশ্চয়কে অধ্যবসায় বলা হইয়াছে। প্রকারনিশ্চয়ের পূর্বে বিষয় গৃহীত হয়—এই অর্থে উদ্দেশ্যবিষয়-নিশ্চয় হইতে বিষয়প্রকারনিশ্চয় ভিন্ন এবং অধ্যবসায় এই দুই নিশ্চয়ের সংযোজক বলা যায়। বিষয়জ্ঞানভূত অধ্যবসায় কিন্তু সংযোজক না হইতেও পারে। মানুষ মরণশীল—এই অধ্যবসায়ে উদ্দেশ্যনিশ্চয় হইতে বিধেয়নিশ্চয় ভিন্ন বলিয়া অধ্যবসায় সংযোজক। মানুষ জীববিশেষ এই অধ্যবসায়ে উদ্দেশ্য মানুষের নিশ্চয়ে বিধেয় জীবত্বনিশ্চয় অন্তর্ভূত বলিয়া অধ্যবসায় সংযোজক বলা যায় না, বিশ্লেষক বলিতে হয়। বিষয়জ্ঞানরূপ অধ্যবসায় বিধেয়বিশেষণক বলা হইয়াছে। এইরূপ অধ্যবসায় বিশ্লেষক হইলেও বিধেয়বিশেষণক। উদ্দেশ্য মানুষব্যক্তির বিধেয় জীবত্ব বিশেষণ। কিন্তু মানুষত্বজাতিকে উদ্দেশ্য বলিলে বিধেয় জীবত্বজাতি উহার বিশেষ্য বলিতে হয়। দুই জাতিই মনুষ্যব্যক্তির বিশেষণ কিন্তু মানুষত্ববিশেষণের অপেক্ষায় জীবত্ববিশেষণ বিশেষ্য। মানুষ জীববিশেষ—এই বিশ্লেষক অধ্যবসায়ে মানুষব্যক্তিই উদ্দেশ্য, কিন্তু মানুষত্ব-জাতিনিশ্চয় মানুষব্যক্তিনিশ্চয় হইতে অভিন্ন বলিয়া মানুষত্বকেও উদ্দেশ্য বলা যায়। এইজন্য এই বিশ্লেষক অধ্যবসায়কে মুখ্যতঃ বিধেয়বিশেষণক ও গৌণতঃ

বিধেয়বিশেষ্যক বলা যায়। সংযোজক জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থের সম্বন্ধ বুঝিতে উহাদের মধ্যে সেতুভূত সূত্রাকার বা সূত্রপ্রতীক কল্পনা করিতে হয়। বিশ্লেষক অধ্যবসায়ে এইরূপ সেতুকল্পনার প্রয়োজন হয় না। এস্থলে উদ্দেশ্যপ্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ বলিতে হয়।

পূর্বে যে সৌত্র-অধ্যবসায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সংযোজক বিষয়জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়। জ্ঞেয় বিষয়ের পরিমাণ থাকিবে—এই সৌত্র-অধ্যবসায়ে পরিমাণিত্বপ্রত্যয় বিষয়তাপ্রত্যয়ের অন্তর্ভূত বলা যায় না। অথচ বিষয়ের প্রতি পরিমাণিত্বের বিধেয়তা স্বতঃসিদ্ধ বলিতে হয়, কারণ এই বিধেয়তাজ্ঞানের জন্য ঐন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত্যপেক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ অধ্যবসায়কে স্বতঃসিদ্ধ সংযোজক অধ্যবসায় বলা যায়। সন্নিবিষ্ট আকারদ্বয়ের এক বৃহত্তর আকারে প্রত্যয়ও এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সংযোজক অধ্যবসায়। স্বতঃসিদ্ধ হইলেও এরূপ অধ্যবসায়ে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থের সম্বন্ধ বুঝিতে সূত্রাকালরূপ সেতু কল্পনা করিতে হয়। মানুষ জীববিশেষ—এই বিশ্লেষক অধ্যবসায়ে মানুষব্যক্তির সহিত জীবত্বের সম্বন্ধ কালিক হইলেও মানুষত্ব ও জীবত্বের সম্বন্ধ কালিকভাবে জ্ঞেয় নয়। সুতরাং সূত্রকালকল্পনার অপেক্ষা নাই বলা যায়। উক্ত বিশ্লেষক জ্ঞানাত্মক অধ্যবসায় স্বতঃসিদ্ধ ও একভাবে বিধেয়বিশেষ্যক বলিয়া গ্রহণ করা যায় বলা হইয়াছে। ধ্যানাত্মক অধ্যবসায় মাত্রই সংযোজক, স্বতঃসিদ্ধ ও বিধেয়বিশেষ্যক। আনন্দধ্যানাত্মক অধ্যবসায় জ্ঞানেতর নিশ্চয়মাত্র। সুতরাং সংযোজক হইলেও সংযোগবিধায়ক সেতুকল্পনা নাই। শ্রদ্ধাধ্যানাত্মক অধ্যবসায় বিষয়জ্ঞান নয় বটে, কিন্তু উহাকে আত্মজ্ঞান বলা যায়। আত্মজ্ঞানাত্মক সংযোজক অধ্যবসায়ে সূত্রজগৎরূপ প্রতীক সংযোগ-বিধায়ক সেতু বলিয়া কল্পিত হয়। কৃতিস্বরূপমাত্র আত্মার জ্ঞান আছে, অধ্যবসায় নাই। আত্মজ্ঞানাত্মক অধ্যবসায়ে কৃত্যাত্মক আত্মার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান হয়, কিন্তু এই সম্বন্ধজ্ঞান বিষয়জ্ঞান নয়, আত্মজ্ঞানেরই বিস্তার। কাষ্ঠাভূত আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বরের ধ্যাননিশ্চয় হয়, জ্ঞান হয় না, ধ্যানাত্মক অধ্যবসায়ও হয় না। নিশ্চয়পরীক্ষাও শ্রদ্ধাত্মক অধ্যবসায় ও কৃত্যাত্মক আত্মজ্ঞানের বিস্তার। কিন্তু এই বিস্তার সংযোজক অধ্যবসায় নয়। উহা ঐ আত্মজ্ঞানের বিশ্লেষণমাত্র।